MAUPASSANT RACHANABALI
VOL. II

Translated by : Sekhar Sengupta

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
রথযাত্রা
আষাঢ় ১৩৬৭

প্রকাশক :
অরুণ পুরকায়স্থ
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীতুলসীচরণ বক্সী
ন্যাশনাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৩৩ডি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা

জুলি রোমেন

[Julie Romain]

দু'বছর আগের এক বসন্তকালে আমি ভূমধ্যসাগর-উপকূল বরাবর হেঁটে চলেছি। স্বপ্নের জগতে বিলুপ্ত ঐ পথে লম্বালম্বি পায়চারি করার চেয়ে সুখকর অনুভূতি কি আর হতে পারে? আপনি হাঁটছেন এক জ্যোতির্ময় ভুবনে সোহাগী বাতাসের মধ্য দিয়ে, কখনো পাহাড়ের ঢালু জায়গায়, কখনো বা সমুদ্র-কিনারে। এবং আপনি স্বপ্ন দেখছেন! কী অতীন্দ্রিয় প্রেম ও দুঃসাহস ঐ ঘণ্টা দুয়েকের পদচারণাকালে ভবঘুরে কল্পনাকে উজ্জীবিত করে রাখে! হাজারো আনন্দঘন প্রত্যাশা মৃদু উষ্ণ বাতাসের মধ্য দিয়ে আপনার মনের তন্ত্রীতে আঘাত করে যায়। মৃদু বাতাসের সঙ্গেই আপনি তাদের গ্রহণ করেন, আপনার অন্তরে তারা সৃষ্টি করে সুখের জন্য স্পৃহা—যে স্পৃহার উৎস ঐ দীর্ঘ পদযাত্রা। সুখময় ভাবনাগুলি ডানা মেলে দেয় এবং পাখির মতন গেয়ে ওঠে।

সেণ্ট র‍্যাফেল থেকে ইতালী পর্যন্ত দীর্ঘপথ আমি অতিক্রম করছি। এতো শুধু পথ নয়, যেন চলমান দৃশ্যাবলী,—যে প্রাকৃতিক দৃশ্য পৃথিবীর যাবতীয় প্রেমের কবিতার প্রেরণা-স্থল।

এ রকম একটা ভাবনাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি ক্যানানে দাঁড়িয়ে। জায়গাটা স্থির-প্রতিজ্ঞ অর্থসন্ধানীদের স্বর্গ, যেখানে এসে জড়ো হয় যত রাজ্যের জুয়ারীরা, এই মনোরম উলঙ্গ আকাশের নীচে উড়ন্ত-টাকা পাকড়াতে তারা মত্ত। এখানকার গোলাপ-বাগিচায়, লেবু-বনে যতরকমের ক্ষুদ্র অহঙ্কার, কাণ্ডজ্ঞানহীন-ছল-চাতুরি, নোংরা ধন-লিপ্সা স্ফীত হয়ে ওঠে; মানুষের আত্মাকে তারা পরিণত করে স্থূল কামনাময়, বুদ্ধিহীন, গর্বিত ও লোভী।

হঠাৎ পাহাড় ও পথের হালকা রঙ একটি বাঁক-মুখে আমি গুটি কয়েক বাগান-বাড়িকে দেখতে পেলাম। সংখ্যায় তারা চার-পাঁচটির বেশী নয় এবং সব কয়টিই পাহাড়ের সানুদেশে, দুই বিশাল উপত্যকা-পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্র ও গহন পাইন বনের মধ্যবর্তী স্থানে। উপত্যকার মাঝ বরাবর কোন পথ-রেখা দৃষ্ট হয় না; সম্ভবত ওখান থেকে আগমন ও নির্গমনের কোন দুয়ারই খোলা নাই।

কাঠের তৈরী কুটীরগুলির মধ্যে একটি এমন নয়ন-শোভন যে আমি তার দরজার সামনে নিশ্চল দাঁড়িয়ে পড়ি। তামাটে রঙের কিছু কাঠ থাকে থাকে সাজিয়ে এটি একটি ছোট্ট সাদা বাড়ি, যার গোটা ছাদটা লতিয়ে ওঠা গোলাপ গাছ ও গোলাপ ফুলে আচ্ছাদিত।

এবং লক্ষণীয় এর বাগানখানা—বিবিধ চেহারার হরেক রঙের খাপছাড়া-ভাবে ছড়ানো ছিটানো অজস্র ফুটন্ত গোলাপের বিশৃঙ্খল, বুনো অথচ যেন এক প্রকৃত গালিচা পাতা। এগিয়ে এসে তারা লনটুকুও দখল ক'রে বসে আছে। ছাদের প্রতিটি খাঁজের মধ্যে গোলাপেরা উঁকি-ঝুঁকি মারে। গুচ্ছ গুচ্ছ সবুজ অথবা হলুদ রঙ যেন জানালা বেয়ে ঝরে পড়ছে অস্পষ্ট দেয়ালের ওপর। ফোঁটা ফোঁটা রক্তেরই মতন লতানো ফুলগুলি ঝুলছে এই আশ্চর্য বাড়ির বারান্দার প্রতিটি পাথরের পিলারে।

বাড়ির পিছনে দেখছি, লেবু-বন আচ্ছাদিত দীর্ঘ ও সংকীর্ণ পথের ফালি পৌঁছে গেছে সোজা পাহাড়ের পায়ের কাছে।

দরজায় ছোট ছোট সোনালী হরফে লেখা: "ভিলা দ্যঁ এন্‌তান্‌।"

বিস্মিত আমি ভাবি, কোন কবি বা পরীর নিবাস এটি! কোন সংসার-ত্যাগী প্রাণ এমন নন্দন-কাননের আবিষ্কারক এবং কোন প্রেরণায় তিনি অমন একটি স্বপ্নিল আবাস গড়ে তুলেছিলেন! ফুলের স্তবকে স্তবকে আজো সেই অনুভূতি যেন সঞ্চারিত।

অদূরে রাস্তার পাশে বসে একজন মজুর পাথর ভাঙ্গছিল। আমি তার কাছে জানতে চাইলুম, এই রত্নময় আবাসের মালিক কে।

'জুলি রোমেন।'—সে জবাব দেয়।

জুলি রোমেন!

আমি যে এ নামের সঙ্গে সুদূর শৈশবে পরিচিত হয়েছিলেম! রেচিলের প্রতিদ্বন্দ্বী সেই সুখ্যাতা অবিসংবাদী অভিনেত্রী!

কোন নারীর উদ্দেশ্যেই আজ পর্যন্ত অত সোচ্চার প্রশংসা-বাণী উচ্চারিত হয়নি। তাঁর মতন প্রেম ও অনুরাগ আর কোন মহিলার ভাগ্যেই বা জুটেছে! বিশেষতঃ তাঁর মতন প্রেম-ধন্যা রমণী দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁর কৃপা-দৃষ্টির জন্য কত না ডুয়েল লড়া হয়েছিল, কতজন করেছিল আত্মহত্যা!

কত বয়স এখন এই 'সারসী'র ? *

ষাট, সত্তর, পঁচাত্তর ? জুলি রোমেন ! এখানে, এই বাড়িতে !

এই সুন্দরীর প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক ও শ্রেষ্ঠতম কবি।

এখনো মনে আছে, কি দারুণ উত্তেজনায় সেদিন [আমার বয়স তখন বছর বারো] তামাম ফ্রান্স কেঁপে উঠেছিল, যখন দেশময় রটে গেল— গায়কের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করে কবিকে নিয়ে সিসিলির পথে পাড়ি জমিয়েছেন জুলি রোমেন।

সেই সন্ধ্যায় তিনি অপেরার দর্শকদের সামনে মাত্র আধঘণ্টার জন্য উপস্থিত ছিলেন ; কিন্তু এরপর এগারো বার পর্দা ওঠা বা নামার সময় দর্শকরা আকুল হয়ে তাঁকে দেখতে চেয়েছে।

কবির সঙ্গে দ্রুতগামী ঘোড়ার গাড়িতে চেপে তিনি মিলিয়ে গেলেন। দুই বা ততোধিক ঘোড়ায় টানা গাড়ি ব্যবহৃত হতো সেই যুগে। তাঁরা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে প্রেমের স্বাদ গ্রহণ করতে গেলেন প্রাচীন সুসভ্য দ্বীপ, গ্রীসের মানস-কন্যা—সিসিলিতে। সিসিলির বিশাল ছায়াঘন কমলালেবুবীথি ঘিরে আছে পেলারমোকে, যার নতুন নামকরণ—'কংক দ্যঁ অর'।

কিভাবে তাঁরা অতিক্রম করলেন এটানের সোপানশ্রেণী, কিভাবে ভয়াবহ আগ্নেয়গিরির মুখ-গহ্বর ঝুলতে ঝুলতে পার হয়ে গেলেন, কিভাবে বাহুতে বাহু বদ্ধ রেখে গালে গাল ঠেকিয়ে তাঁরা হয়েছিলেন অপরূপ গভীরতায়—ইত্যাকার গাথাগুলি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো।

যিনি এই আলোড়নকারী কবিতা লিখেছিলেন, তিনি আজ মৃত। কিন্তু তাঁর কবিতার সুদূরপ্রসারী প্রভাবে গোটা সমকালীন যুগই বুঝি ছিল দিশাহারা। এর অন্তর্দর্শী আবেদন, রহস্যময়তা নতুন যুগের কবিদের কাছে অন্যভুবনের সন্ধান দিয়েছিল।

আর দ্বিতীয়জন, যাঁকে এই মহিলা ত্যাগ করেছিলেন, তিনিও আজ জীবিত নেই। তিনি প্রেয়সীর জন্য সৃষ্টি করেছিলেন এমন সব স্বরমধুর সংগীত যা প্রত্যেক জীবিত মানুষের স্মৃতিতে আজো অম্লান। যুগপৎ উল্লাস ও

* হোমার রচিত 'ওডিসি'র এক মায়াবিনী নারী চরিত্রের নাম সারসী

নৈরাশ্যের সুর-ঝংকার মানুষের শরীর থেকে যেন তার হৃদপিণ্ডকে তুলে আনতো।

এবং সেই মহিলা রয়েছেন এখানে,—এই পুষ্পিত কুটীরে!

মুহূর্তমাত্র দ্বিধা না করে আমি বেল টিপি।

বছর আঠারোর ছোটখাটো চেহারার অপরিচ্ছন্ন চাকর নোংরা হাতে দরজা খুলে দাঁড়ায়। আমি আমার কার্ডে বৃদ্ধা অভিনেত্রীর প্রতি শুভেচ্ছা-স্তুতি লিখে একান্ত আগ্রহ জানাই, তিনি যেন আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি দেন।

হয়তো উনি আমার নাম জানেন; আমার জন্য দরজা খুলে দিতে তাঁর আপত্তি ছিল না।

বার্তাবাহক ছোকরাটি চলে যায়, তারপর আবার ফিরে আসে; আমাকে অনুসরণ করতে বলে।…সে আমাকে লুই ফিলিপীয় কায়দায় কঠিন ও সুশৃঙ্খল-ভাবে সাজানো একখানা ঘরে প্রবেশ করতে ইঙ্গিত করে। ঐ ঘরে দেখতে পাচ্ছি, পুরাকালীন বড় বড় আসবাবপত্র; ষোলো বছরের বেশ রুগ্ন কিন্তু সুন্দর মুখশ্রীর পরিচারিকা আমার সম্মানেই ঘর দোর আরও ফিটফাট করতে থাকে।

আমি এখন এই ঘরে একমাত্র অনুপ্রবেশকারী।

দেয়ালে ঝুলছে তিনজনের প্রতিমূর্তি। একটি অভিনয়রত অভিনেত্রীর; দ্বিতীয়টি ফ্রক-কোট ও শীতের জামা পরিহিত কবির; অন্যটি গায়কের—বাজনার সামনে বসে আছেন।

ছবিতে অভিনেত্রী রূপসী, আকর্ষণীয়া, নীলাক্ষি; সেই যুগ-অনুযায়ী তাঁর পারিপাট্য, মুখাবয়বে মোহিনী হাসি। ছবি তিনটি আঁকা হয়েছিল ধৈর্য ও যত্নের সঙ্গে—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আঁকা সুচারু ও প্রাণহীন ছবি। তাঁরা যেন তখনও তাঁদের উত্তরপুরুষদের ওপর নিজেদের প্রভাব লক্ষ্য করছেন!

যে দিনগুলি হারিয়ে গেছে, যা আজ নিছকই অতীত, ছবি তিনটি তাদের কথাই বলছে।

দরজা খুলে গেল। প্রবেশ করলেন—ছোট-খাটো চেহারার এক মহিলা; বয়স অনেক, অতি বৃদ্ধা, খুবই ছোট্ট দেহখানা তাঁর। সাদা চুল, সাদা ভুরু, দেখে মনে হয়, যেন একটি প্রকৃতই সাদা ইঁদুর নিঃশব্দ ও দ্রুতপায়ে এ ঘরে এসে ঢুকেছে।

তিনি তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন, সুন্দর স্পষ্ট গলায় বললেন, 'তোমাকে দেখে খুব খুশি হলাম। তোমার মতন একজন যুবক আমার মতন এক বৃদ্ধাকে তবু দয়া করে মনে রেখেছে! বসো।'

আমি একে একে বর্ণনা করি,—তাঁর বাড়িখানা দেখে আমি কত মুগ্ধ হয়েছিলাম এবং যখন এর মালিকিনীর নাম জানতে পারলাম, তখন আর দরজায় ধাক্কা না দিয়ে পারিনি!

'আমার আনন্দ আরো গভীর', তিনি বললেন, 'কারণ, এখানে এই প্রথম এমন একটি ঘটনা ঘটলো। যখন তোমার সুন্দর লেখা সহ কার্ডখানা আমার হাতে এসে পৌঁছলো, আমি এতটা কেঁপে উঠেছিলাম যেন কুড়ি বছর পর এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে মুলাকাৎ হতে চলেছে।

দেখছো তো, আমি আজ মৃত! কেউ আর আমার খোঁজ রাখে না। মৃত্যুর শেষ দিনটি অব্দি কেউ আমাকে নিয়ে ভাববেও না। শুধু মারা যাবার পর দিন তিনেক ধরে সংবাদপত্রগুলি ব্যস্ত থাকবে জুলি রোমেনের জন্য। তখন তারা আমার জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করবে, প্রশংসা করবে। তারপর—তারপর আমার সব শেষ।'

তিনি থামলেন। কিছুক্ষণ নীরবতার পর আবার বলতে আরম্ভ করেন, 'এবং সেই পরিণতি ঘনায়মান। মাত্র কয়েক মাস অথবা কয়েকদিন পর এই সাধারণ জীবিত মহিলার কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না, শুধুমাত্র ছোট্ট একটা কঙ্কাল ছাড়া!'

তিনি চোখের পাতা মেলে তাকালেন নিজেরই ছবির দিকে। ছবিটা যেন হাসছে এই বৃদ্ধাকে দেখে। দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে তিনি অপর দুই প্রতিকৃতির দিকে তাকান—গর্বিত কবি ও উৎসাহী সংগীতজ্ঞ; ওঁরাও যেন বলছেন: "ওহে বিগত-যৌবনা, আমাদের কাছে তোমার আর কি করার আছে!"

বিজাতীয় তীব্র দুঃখবোধ আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ভারাক্রান্ত মনে অনুশোচনা হয় তাঁদের জন্য, যাঁরা জীবিত থেকেও মৃত, যাঁরা গভীর জলে ডুবন্ত মানুষের মতন নিছক অতীত-স্মৃতিকে, পাথেয় ক'রে বেঁচে থাকবার সংগ্রামে রত।

আমি আমার আসনে বসে বাইরের এক দৃশ্য দেখতে পেলাম,—নিস্ থেকে মোনাকোর পথে তীরগতিতে ছুটে চলেছে কয়েকটি শকট। গাড়ির

ভেতর বসে আছে সুশ্রী, সুখী, উজ্জ্বল শুচিস্মিতা যুবতীরা এবং খুশি খুশি মুখে যুবকরা।

জুলি রোমেন আমার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে ধারণা করতে পারলেন, আমি কি ভাবছি। মৃদু-নরম হাসির সঙ্গে বিষণ্ণ সুরে বললেন, 'কেউ চিরদিন বাঁচে না, বেঁচে থাকে না।'

'তবু আপনার জীবন কত আশ্চর্য!'—আমি মন্তব্য করি।

গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তিনি উচ্চারণ করেন, 'আশ্চর্য এবং মধুর। সেই জন্যই বর্তমানকে আমি এত এড়িয়ে চলি।'

আমি দেখছি তিনি তাঁর বর্ণময় অতীত নিয়ে কিছু বলতে চাইছেন। আমিও যথেষ্ট সাবধানে কথা বলছি, পাছে কোন কারণে তিনি আঘাত পান।

তাঁকে প্রশ্ন করতে শুরু করি।

তিনিও বলে চললেন তাঁর সাফল্য, বাঁধনহারা আনন্দ, বন্ধুদের সাহচর্য—তাঁর বিপুল বিজয়খ্যাপক ইতিকথা।

আমি জিজ্ঞেস করি, 'আপনি কি থিয়েটারেই প্রকৃত সুখ ও আনন্দ খুঁজে পেয়েছিলেন?'

'আরে না, না'—তিনি জোরের সঙ্গে অস্বীকার করেন।

আমি হাসি। তিনি আবার বিষণ্ণ চোখে সেই দুই পুরুষের ছবির দিকে তাকান, বলেন, 'সুখ ও আনন্দ খুঁজে পেয়েছিলাম ওঁদের দু'জনের মধ্যে।'

আমি না বলে পারি না, 'দু'জনের মধ্যে কে আপনার বেশি প্রিয় ছিলেন?'

'দু'জনই। কখনো কখনো অতীতের কথা ভাবতে গিয়ে দু'জনকেই একে অপরের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলি। অবশ্য ওঁদের একজনের কথা ভাবলে আজো আমার খুব অনুতাপ হয়।...'

'তা হলে মাদাম, আপনি মানুষের প্রেমের প্রতিই কৃতজ্ঞ। এঁরা দু'জন সেই প্রেমেরই প্রতিভূ।'

'হয়তো তাই। কিন্তু কি বিস্ময়কর এই প্রতিভূরা।'

'কিন্তু এমনও তো হতে পারে, কোন একজন সাধারণ অখ্যাত মানুষ আপনাকে সর্বান্তঃকরণে ভালোবাসতেন, যিনি তাঁর সমস্ত জীবন, সমস্ত ধারণা, ভাবনা, তাঁর প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি মুহূর্ত আপনাকেই নীরবে নিবেদন ক'রে

গেছেন। আর সেই সময় এই প্রেমিকদ্বয় আপনাকে দিয়েছেন ছুই প্রবল পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী—সংগীত এবং কবিতা?'

তাঁর বিচিত্র স্বর অস্থিরভাবে ধ্বনিত হয়, 'না তুমি যা বলছো, তা নয়। অন্য কোন লোক আমাকে আরো গভীরভাবে ভালোবাসতে পারে, কিন্তু এই দু'জনের প্রেম-পদ্ধতির সঙ্গে দুনিয়ার কোন কিছুরই তুলনা হয় না। তাঁরা দু'জনে আমাকে গান গেয়ে শোনাতো; পৃথিবীর আর কেউ কোনদিন সেই অলৌকিক গান ঐভাবে গাইতে পারবে না। কি সুখ পেতাম আমি তাদের সাহচর্যে! শব্দ এবং স্বর সাজিয়ে পৃথিবীর আর কোন মানুষ কি অমন মহৎ সৃষ্টির অধিকারী হতে পারবে? তুমি যদি তোমার প্রেমে স্বর্গীয় সংগীতের মূর্চ্ছনা আনতে পারো, তবে সেই শুষ্ক প্রেমের মূল্য কি?···তারা জানতো, কি ভাবে শব্দের লালিত্যে ও সংগীতের মাধুর্যে একজন রমণীকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে হয়! হাঁ, হয়তো আমাদের আবেগে বাস্তবের চেয়ে কল্পনার প্রাধান্য ছিল অধিক। কিন্তু কল্পনা তোমায় নিয়ে যায় মেঘের জগতে, আর বাস্তব সর্বদাই তোমাকে আটকে রাখে শক্ত মাটির সঙ্গে।

আরো অনেকে আমাকে ভালোবাসতে পারে, কিন্তু একমাত্র ঐ দু'জনের মাধ্যমেই আমি বুঝেছিলাম, প্রেম কি বস্তু। তারাই আমাকে শিখিয়েছিল প্রেমকে মর্যাদা দিতে।'

বলতে বলতে হঠাৎ তিনি কেঁদে ফেলেন।

তাঁর নিরুচ্চার কান্না অশ্রুবিন্দুতে ঝরে পড়ে।

আমি তাঁর মুখের দিকে চাইতে পারছি না, তাকিয়ে আছি দূরের আকাশের দিকে। কিছুক্ষণ পর আবার তাঁকে বলতে শুনি—'তুমি জানো, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনও বুড়িয়ে যায়। আমি কিন্তু এর ব্যতিক্রম। আমার এই শীর্ণ দেহের বয়স ঊনসত্তর এবং আমার এই নরম মনের বয়স মাত্র কুড়ি। এবং সেই কারণেই তো ফুল ও স্বপ্নঘেরা পরিবেশে আমি একা থাকি।'

আবার দীর্ঘ নীরবতা। তিনি ইতিমধ্যে আবেগের রাশ টেনে ধরেছেন, সামান্য হেসে বলেন, 'তুমি হয়তো হেসে উঠবে, যদি জানতে পারো···তুমি যদি দেখো, কিভাবে আমি আমার সন্ধ্যাগুলি অতিবাহিত করি···সেই মুহূর্তগুলি আমার কাছে অপূর্ব!··পরে আমি নিজের কাছেই লজ্জিত হই, দুঃখবোধ করি!'

তাঁর এই উক্তির তাৎপর্য বুঝবার জন্য বৃথাই বার বার অনুরোধ করি; তিনি আমাকে কিছুতেই ব্যাপারটা খুলে বলতে রাজি হলেন না। তখন আমি ফিরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াই।

'এখনই চলে যাবে?'—তিনি আহত স্বরে বলেন।

জানালুম, আমি আজ অবশ্যই মণ্টিকার্লোতে ডিনার খাবো।

তিনি সলজ্জভাবে প্রস্তাব রাখেন, 'আমার সঙ্গে খাবার টেবিলে বসতে তোমার কি আপত্তি আছে? আমি খুব খুশি হবো, যদি মত দাও।'

সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলুম। তিনি সানন্দে বেল বাজালেন। পরিচারিকাকে প্রয়োজনীয় কিছু কথা বলে তিনি আমাকে নিয়ে চললেন বাড়ির অপর দিকটাতে।

খাবার ঘর লতানো পাতায় সজ্জিত কাঁচের বারান্দায় ঘেরা। ঐ কাঁচের মধ্য দিয়ে আমি পাহাড়ের সানুদেশ অব্দি বিস্তৃত লেবু-বন আচ্ছাদিত পথ-রেখা দেখতে পাচ্ছি। একটি ছোট্ট চারা গাছের নিচে নীচু আসন দেখতে পাচ্ছি,—সম্ভবতঃ ওখানেই বৃদ্ধা অভিনেত্রী কখনো-সখনো বসে থাকেন।

তারপর আমরা নেমে এলাম ফুলের বাগানে। ক্রমশঃ সন্ধ্যা ঘনায়মান। উষ্ণ নিরুত্তর সন্ধ্যা মাটির ঘ্রাণ বয়ে আনে।

আমরা যখন টেবিলের সামনে বসেছি, তখন অন্ধকার রীতিমত জমাট বেঁধেছে। খাবার পরিমাণ যেমন প্রচুর, স্বাদও তেমনি অপূর্ব। আমরা এখন পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হয়েছি,—তিনি এবং আমি। তিনি বুঝতে পারছেন, তাঁর প্রতি আমার সহানুভূতি কত অকৃত্রিম ও গভীর।

মাত্র 'দু আঙুল পরিমাণ' মদ তিনি পান করলেন; ফলতঃ তিনি আমার আরো ঘনিষ্ঠ, আরো অকপট।

'এসো, আমরা ঐ চাঁদের পানে চেয়ে থাকি'; তিনি বললেন, 'দয়ালু চাঁদ আমায় টানে। ও আমার গোটা আনন্দঘন অতীতের সাক্ষী। মনে হয়, আমার যাবতীয় স্মৃতি লুকিয়ে আছে ওর বুকে; এবং তাই যখনই চাঁদের দিকে তাকাই, স্মৃতিময় দিনগুলি যেন তৎক্ষণাৎ আমার কাছে ফিরে আসে। উপরন্তু···কখনো কখনো অন্ধকারে···দেখতে পাই কি মনোরম দৃশ্য···সুন্দর···রমণীয়···তুমি কল্পনা করতে পারো?···কিন্তু না, আমাকে নির্ঘাৎ ঠাট্টা করবে, উপহাস করবে··আমি পারবো না···আমার সাহস হচ্ছে না···না···না···সত্যি, আমি সাহস পাচ্ছি না।'

আমি মিনতি করি, 'আমাকে দেখান না···কি জিনিস? আমাকে নির্দ্বিধায় বলুন। প্রতিজ্ঞা করছি, হাসবো না···প্রতিজ্ঞা করছি···আমাকে দেখতে দিন।'

তিনি দ্বিধা করছেন। আমি তাঁর শীর্ণ প্রাচীন হিম হাত নিজের হাতে তুলে নিই; তারপর দুই হাতেই বেশ কয়েকবার চুমু খেলাম, যেমনটি অতীতে তাঁর প্রেমিকেরা করতেন। তিনি কেঁপে উঠলেন। দারুণ সংকোচ তাঁর ভেতর।

'তুমি প্রতিজ্ঞা করছো,—হাসবে না?'

'হাঁ, প্রতিজ্ঞা করছি।'

'তা হলে এসো।'

উঠে দাঁড়ালেন অভিনেত্রী।

তিনি উঠে দাঁড়াতেই তাঁর নোংরা চেহারার চাকরটি চেয়ারখানা তুলতে যায়; তিনি নীচু হ'য়ে ওর কানে কানে কি যেন বললেন।

'হাঁ মাদাম,' সে জবাব দেয়, 'এখুনি ব্যবস্থা করছি।'

তিনি আমার হাত ধরে বারান্দায় নিয়ে গেলেন।

কমলালেবু কুঞ্জে এখন এক অপূর্ব দৃশ্য! আকাশের ভরাট চাঁদ ঐ বনভূমিতে পাতলা রূপালী পথ বিছিয়ে দিয়েছে, হলুদ বালুভূমি ও ঘোর-অন্ধকার বনভূমির মধ্যবর্তী এলাকায় আলোর একটি দীর্ঘরেখা। সুফলা গাছগুলি থেকে ভেসে আসা মিষ্টি সুবাস রাতকে আরো রমণীয় ক'রে তুলেছে। কালো ও সবুজবর্ণ ছায়ায় অজস্র মিটি মিটি নক্ষত্রের মতন জ্বলছে নিভছে জোনাকির ঝাঁক।

আমি জোরে বলে উঠি, 'আহ্! এই তো প্রেমের পরিবেশ।'

তিনি হাসলেন, 'সত্যি কি তাই নয়? তাই নয় কি? দাঁড়াও, আরো দেখবে।'

আমাকে পাশে নিয়ে তিনি বসলেন।

'ঠিক এই জন্যই আমি বর্তমানকে উপেক্ষা করি। কিন্তু তোমরা, আধুনিক যুগের লোকেরা হয়তো এর মর্মার্থ গ্রহণ করতে পারবে না। তোমরা সব দালাল, ব্যবসায়ী, কাজের মানুষ। তোমরা আমাদের কথা বুঝতেও পারোনা। এখনকার প্রেম কোন দর্জির প্রাপ্য-না-মিটিয়ে-দেওয়া

বিলের সামিল। যদি তুমি মনে করো, ঐ বিলটা তোমার প্রেয়সীর চেয়ে বেশী দামী, তবে সরে দাঁড়াও। কিন্তু তুমি যদি প্রেয়সীর জন্য ঐ সামান্য বিলের টাকাকে উপেক্ষা করতে পারো, তবে অবশ্যই বিল তার প্রাপ্য পেয়ে যাবে—তুমি হবে যথার্থ প্রেমিক। কত মধুর পথ···প্রেম কী রমণীয়।'

তিনি আমার হাত আকর্ষণ করেন।

'দেখো।'

আমি বিস্ময়ে ও পুলকে রোমাঞ্চিত। উপত্যকার প্রত্যন্তে চন্দ্রালোকিত পথের ওপর এক জোড়া যুবক-যুবতী পরস্পর ঘনিষ্ঠ হ'য়ে হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে তারা আমাদেব কাছে চলে আসে, আমাদের সামনেই তারা আলিঙ্গনবদ্ধ হয়; গভীর সুখে ছোট ছোট গর্বিত পদক্ষেপে তারা আবার ফিরে যায়। ছেলেটির পরণে গত শতকের উটপাখির পালকে ঢাকা রেশমী কোট। আর মেয়েটি পরেছে ফাঁপানো গ্রাউন, ঝুরঝুরে চুলগুলি সাজানো রয়েছে রাজপরিবারের সম্রান্ত মহিলাদের মতন।

আমাদের থেকে একশ' পা দূরে তারা দাঁড়িয়ে পড়ে; সংকীর্ণ পথের মধ্যস্থানে দাঁড়িয়ে যেন কোন উৎসবের মৌতাতে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে।

সহসা আমি তাদের চিনতে পারি—আরে, এরা তো এই বাড়িরই বেটে-খাটো পরিচারক-পরিচারিকা!···এরপরই আমার যা অবস্থা, তাতে হয়তো কৌতুকে-হাসিতে আপনার খেঁচুনি ধরে যেত; আমি শুধু আরো জোরে নিজেকে চেয়ারের সঙ্গে আটকে রাখি। আমি অট্টহাসিতে ফেটে পড়িনি, আপ্রাণ চেষ্টায় নিজেকে সংযত রেখেছি। অথচ আমার ভেতর রুদ্ধ হাস্যাবেগ এমন এক অনুরণন তুললো, যেন মনে হচ্ছে যুদ্ধে আমার একখানা পা কাটা পড়েছে এবং আমার গলা ও চোয়াল কাঁপিয়ে একটা শব্দ ঠেলে বের হ'য়ে আসতে চাইছে।

ততক্ষণে কিন্তু ঐ যুগ্মমূর্তি রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। যেন একটি স্বপ্ন ধীরে ধীরে লীন হয়ে গেল আমাদের দৃষ্টির সামনে থেকে।

এখন তাদের আর দেখা যাচ্ছে না। গোটা বাগানটাই বিরাট শূন্যতায় বিষাদমগ্ন।

আমিও ফিরে চলি। ফিরে যাচ্ছি এই কারণে যে, যাতে ঐ দৃশ্য আর আমাকে দেখতে না হয়। আমি বুঝেছি, ঐ অভিনয় চলবে বহুক্ষণ ধরে। ঐ দৃশ্যগুলিই জুলি রোমেনের অতীতকে জাগিয়ে তুলবে—সেই প্রেম, অভিনয়,

সৌজন্য,—মনোমুগ্ধকর অতীত তার সত্য-মিথ্যা নিয়ে বাস্তব হ'য়ে উঠবে তাঁর কাছে, যিনি স্বয়ং শক্তিময়ী অভিনেত্রী ও সার্থক প্রেমিকা ছিলেন !

চিতা

[The Funeral Pile]

গত সোমবার এতারতাতে বাপুসাহেব খান্ডেবাও ঘাটগাও নামক জনৈক ভারতীয় রাজপুরুষ দেহ রেখেছেন। তিনি বম্বে প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাটের এক দেশীয় রাজ্য বরোদার মহামান্য মহারাজা গাইকোয়াড়ের আত্মীয়।

ঘটনাটি ঘটবার দশ দিন আগে থেকেই দশজন ভারতীয় তরুণকে এখানকার রাস্তায় ইতস্তত ভ্রাম্যমান অবস্থায় দেখা গেছে। আকৃতিতে তাঁরা ছোট-খাটো, চেহারায় কমনীয় ভাব, গায়ের রঙ রীতিমত কালো, পরণে ধূসর বর্ণের স্যুট এবং মাথায় সূক্ষ্মাগ্র কাপড়ের টুপি। তাঁরা বিশিষ্ট রাজবংশের, য়ুরোপে এসেছেন এখানকার উন্নত জাতিগুলির কাছ থেকে সামরিক শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে। ঐ দলে ছিলেন তিনজন প্রিন্স, একজন তাঁদের সম্ভ্রান্ত বন্ধু, একজন দোভাষী এবং তিনটে চাকর।

এই মিশনের যিনি প্রধান, তিনিই মারা গেছেন। 'বিয়াল্লিশ বছরের ঐ বৃদ্ধ' বরোদার মহামান্য মহারাজা গাইকোয়াড়ের ভাই সম্পৎরাও শোভনরাও গাইকোয়াড়ের শ্বশুর। তাঁর জামাতাও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন রাজা খেশরাও গাধবের মাসতুতো ভাই গণপৎরাও শোভনরাও গাইকোয়াড়, দোভাষী ও সেক্রেটারী বাসুদেবমাধব সমর্থ এবং তিন পরিচারক—রামচন্দ্র বাজাজি, গনুবিন পুকারাম খোটে, রামভাজিবিন চোবজি।

ভদ্রলোক স্বদেশত্যাগ কালেই বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন ; তাঁর তখন মনে হয়েছিল, এই তাঁর অন্তিমযাত্রা। তাঁর আসবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু মাননীয় আত্মীয় বরোদার প্রিন্সের ইচ্ছাতেই দেশত্যাগ করতে হয়েছিল তাঁকে।

গ্রীষ্মের শেষ সপ্তাহগুলি কাটাবার জন্য এতারতাতে তাঁদের আগমন। উৎসাহী লোকেরা প্রতিদিন সকালে রোচেস ব্লাঙ্কেস্-স্নানাগারে তাঁদের স্নান করতে দেখতে পেত।

দিন পাঁচ-ছয় আগে বাপুসায়েব খান্তেরাও ঘাটগাও প্রথম তাঁর মাড়িতে যন্ত্রণা অনুভব করেন ; ক্রমশ মাড়ির ব্যথা সঞ্চারিত হয় কণ্ঠ-নালীতে ; কর্কট রোগ—পচন শুরু হয়। সোমবার নাগাদ চিকিৎসকরা তাঁর তরুণ বন্ধুদের জানিয়ে দিলেন, এ রুগীর বাঁচার কোন আশা নাই। তাঁর অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। শেষে মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তাঁর সাথীরা তাঁকে ধরাধরি ক'রে বিছানা থেকে তুলে এনে মেঝের ওপর শুইয়ে দেন,—যেন ঈশ্বর ব্রহ্মার বিধানে ধরিত্রী মাতা তাঁর সন্তানকে আশ্রয় দেন।

ঐদিনই তাঁরা মেয়র মঁসিয়ে বুঁসির কাছে মৃতদেহ সৎকারের অনুমতি চেয়ে পাঠান। এটা তাঁদের ধর্মেরই অনুশাসন। মেয়র সামান্য ইতস্তত করে তাঁর ওপরমহলকে এই মর্মে টেলিগ্রাম করলেন যে, যদি সময়মত কর্তৃপক্ষের নির্দেশ না পাওয়া যায় তবে তিনি দাহের অনুমতি দেবেন। যেহেতু রাত ন'টার মধ্যেও কোন উত্তর এলো না, তিনি ওঁদের সৎকারের অনুমতি দিলেন।

তাঁর এই অনুমতির বিরুদ্ধে বলার কিছুই ছিল না। কারণ, তিনি যুক্তি দেখিয়েছিলেন, এ রোগ অত্যন্ত ছোঁয়াচে এবং দাহ করাই যুক্তিযুক্ত। বুদ্ধিমান ও বিবেচক পৌরপতি ডাক্তারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেটও যোগাড় করে নিয়েছিলেন।

সেই রাতেই এক নাচের আসরে জমাটি পরিবেশ। শরৎ আসবার আগেই শারদীয় আমেজ, ঈষৎ হিম হিমও বটে। সমুদ্র থেকে ধেয়ে আসে প্রবল বাতাস, যদিও সমুদ্র তরঙ্গসঙ্কুল নয় ; ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। মেঘেরা আসছে দূর দিগন্ত থেকে, চাঁদের কাছাকাছি আসবার পর তাদের রং হয় সাদা। মেঘেরা চাঁদকে দ্রুত ঢেকে ফেলে এবং কয়েক মুহূর্তের জন্য চাঁদ প্রায় অদৃশ্য। এতারতাতে সাগর-বেলা ঘিরে আছে যে উত্তুঙ্গ দুই পাহাড়, যাদের বলা হয় 'প্রবেশ পথ', তখন যেন অন্ধকারে ডুব দিয়েছে ; চাঁদের আলোতে ঐ পাহাড়দ্বয়ের বিশাল কালো ছায়া বালু-বেলার ওপর প্রতিবিম্বিত।

সারাটা দিন ধরে সেদিন বৃষ্টি আর বৃষ্টি।

নাচের আসরে অর্কেষ্ট্রার তালে তালে চলেছে দ্বৈত ও পুরাকালীন চারি-যুগলের নৃত্য।

হঠাৎ সমবেত দর্শকদের মধ্যে একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ে। লোকেরা বলাবলি করছে, হোটেল দ্য বেনসে এইমাত্র একজন ভারতীয় রাজপুরুষ নাকি মারা গেছেন এবং কর্তৃপক্ষের কাছে নাকি শবদাহের অনুমতি চাওয়া হয়েছে। গল্পটা কারুর কাছেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না; অথবা কেউ কল্পনাও করতে পারলো না, এ রকম একটি ঘটনা শীঘ্র ঘটতেও পারে। কারণ, এটা আমাদের সামাজিক নিয়মের বাইরে এবং রাত আরো বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে যার আবাসে ফিরে যায়।

মধ্যরাতে একে একে পথের হলুদ গ্যাস-বাতিগুলিকে নিভিয়ে দেবার জন্য নির্দিষ্ট লোকটি এক রাস্তা থেকে অন্য রাস্তায় চক্কর দিতে থাকে। এতক্ষণ ঐ বাতিগুলিই পাহারা দিচ্ছিলো নিদ্রিত বাড়িগুলিকে, কাদা ও জলাকে। সে একটু থমকে দাঁড়ায়,—তার সামনে তখন শহর শূন্য ও নিরুচ্চার।

বায়না পেয়ে দুপুর থেকে এক ছুতোর সমানে কাঠের টুকরো কেটে চলেছে। অবাক হয়ে সে ভাবে, কি হবে এত কাঠ দিয়ে এবং কেনই বা মূল্যবান কাঠগুলিকে এভাবে নষ্ট করা হলো! একটা দু'চাকার গাড়িতে কাঠগুলিকে বোঝাই করা হলো। এবং যখন সেই বোঝাই গাড়ি ধীরে ধীরে সমুদ্র-বেলার দিকে চলেছে, মুষ্টিমেয় পথচারীর কেউ কোন সন্দেহ করেনি।

কাঠ নিয়ে গাড়ি পৌঁছায় পাহাড়ের সানুদেশে। তিন ভারতীয় নফর তখন চিতা প্রস্তুতে লেগে যায়। চিতার পরিমাপ এক মানুষের চেয়ে বড়। তারা কাজ করে চলেছে নীরবে,—এই কাজে তাদের সাহায্য করার আর কেউ নেই।

দুপুর একটা নাগাদ মৃতের আত্মীয়দের কাছে খবর গেল, তাঁদের ইচ্ছা-পূরণে কোন বাধা নাই। তাঁরা যে ছোট্ট বাড়িতে বাস করতেন, তার দরজা খোলা হলো। সংকীর্ণ স্বল্পালোকিত ঘরের মেঝেতে আমরা দেখতে পেলাম সিল্কের কাপড়ে মোড়া শায়িত ভারতীয় প্রিন্সকে। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলাম।

ভারতীয়রা উঠে দাঁড়ালেন, তাঁরা শুদ্ধ ও পবিত্র। মৃতের পায়ের কাছে বসে তাঁদের একজন একটানা একঘেয়ে বিলাপের সুরে দুর্বোধ্য মন্ত্র পাঠ করছেন। একসময় উঠে দাঁড়িয়ে তিনি মৃত রাজপুরুষকে প্রদক্ষিণ করেন, ওঁকে স্পর্শ করেন; তারপর তিনটে শিকলে জড়ানো দুই নল বিশিষ্ট একটি

পাত্র থেকে পবিত্র গঙ্গাজল ছিটোতে থাকেন। হিন্দুরা যেখানেই যাক্ সঙ্গে গঙ্গাজল নেবেই।

তাঁদের মধ্যে চারজন শবের মাচা কাঁধে তুলে নেন এবং শ্লথ গতিতে বাড়ির বাইরে চলে আসেন। আকাশে চাঁদ ঢাকা পড়ায় পথ-ঘাট অন্ধকার, জনশূন্য, কর্দমাক্ত। কেবলমাত্র চলমান মাচাটাকেই সজীব বলে মনে হয়। কারণ, মৃতের সিল্কের কাপড়ের দারুণ চাকচিক্য। অন্ধকার রাত্রে ওরকম একটা চকচকে বস্তু পার হয়ে যাওয়া—এ এক অভাবনীয় দৃশ্য।

শববাহকদের গায়ের রঙ এত কালো যে এই অন্ধকারে তাদের সনাক্ত করাই দুঃসাধ্য। তিনজন ভারতীয় শবযাত্রী, তাঁদের পিছন পিছন চলেছে তাঁদের য়ুরোপীয় বন্ধু দীর্ঘদেহী এক ইংরাজ, যিনি মাথা ও কাঁধের উচ্চতায় এঁদের সকলকে ছাড়িয়ে গেছেন।

হিমেল কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশের নীচে উত্তরমুখী ভেজা মাটিতে দাঁড়িয়ে আমি যেন কোন প্রতীকী দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। মনে হলো, যেন এক বিজিত ভারতীয় প্রতিভার শবযাত্রায় যোগ দিয়েছেন ধূসরবর্ণের দীর্ঘ কোট পরা এক বিজয়ী ইংরাজ প্রতিভা!

চারজন শব-বাহক ঢালুতে দাঁড়িয়ে ক্ষণিকের জন্য বিরাম নেন, তারপর আবার পা-পা হাঁটতে থাকেন, রীতিমত হাঁপ ধরে গেছে তাঁদের।

অবশেষে তাঁরা চিতার কাছে পৌঁছে গেলেন। চিতা প্রস্তুত হয়েছে তিন শ' ফিট উঁচু পাহাড়ের গোড়ায় এক গুহার সামনে। চিতার উচ্চতা প্রায় ফুট তিনেক। শব নামানো হলো; একজন ভারতীয় জানতে চাইলেন, ধ্রুবতারা কোন দিকে? তাঁকে দেখিয়ে দেওয়া হলো এবং সেই মত রাজার পা রাখা হলো তাঁর জন্মভূমির দিকে।

বারো বোতল পেট্রোলিয়ম উপুড় করা হয়েছে চিতার ওপর। শব ঢাকা হলো ফার-গাছের তক্তা দিয়ে। এক ঘণ্টা ধরে মৃতের-আত্মীয়রা ঐ টুকরো টুকরো কাঠের খণ্ড দিয়ে চিতা সাজিয়েছেন।

আরো কুড়ি বোতল তেল ঢালা হলো ঐ কাঠের স্তূপে। কয়েক হাত দূরে একটা-ব্রঞ্জের স্পিরিট-ল্যাম্প জ্বলছে শব আনার পর থেকেই।

অতঃপর লগ্ন উপস্থিত। আত্মীয়েরা চিতার আগুন ধরাতে এগিয়েও এলেন। যেহেতু বাতিটা ভালোভাবে জ্বলছিল না, তাঁদের একজন ওতে কিছুটা তেল ঢেলে দেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সহসা আগুনের শিখা দপ্ করে জ্বলে

ওঠে, গোটা বিশাল পর্বতগাত্র উজ্জ্বল হয়। যে ভারতীয়টি ল্যাম্পে তেল দিয়েছিলেন, তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, তিনি তাঁর দুই বাহু উপরের দিকে তুলে কনুই জোড়া আড়াআড়ি রাখেন,—তখনই তাঁর বিরাট কালো ছায়া পাহাড়ের গায়ে এমন এক মূর্তির সৃষ্টি করে, যেন ভগবান বুদ্ধ তাঁর পরিচিত অবয়বে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। ভারতীয়টির ছোট টুপি যেন ভগবান তথাগতের চুলের ঝুঁটি। দৃশ্যটি এমন আকস্মিক ও তাৎপর্যময় যে, চকিতে আমার মনে এক অলৌকিক প্রতীত এসে ভর করে। এই প্রাচীন পবিত্র দেবমূর্তি বুঝি পূর্বদেশের অন্তঃস্থল হতে ছুটে এসে য়ুরোপে তাঁর সন্তানের অন্তর্জলি-যাত্রা অবলোকন করছেন!

ছায়া অপসারিত হয়।

তাঁরা বাতি হাতে আগুয়ান। সমাধি-স্তূপের ওপর আগুন লাগানো হলো···দ্রুত আগুনের লেলিহান শিখা বিস্তারিত হয় সমস্ত কাঠগুলিতে, গোটা উপকূলভাগ আলোকিত, জলস্রোতে ক্ষয়প্রাপ্ত নুড়িসমূহ ও বালুবেলায় ভেঙ্গে পড়া সফেদ ঢেউগুলির মাথায় মাথায় সেই একই ঔজ্জ্বল্য প্রতিফলিত। প্রতি মুহূর্তে আগুনের প্রসার ভয়াল, ক্রমে দূর-সমুদ্রেও সেই আগুনের রেখা-গুলিকে প্রতিবিম্বিত হতে দেখা যায়। প্রচণ্ড জোরে সামুদ্রিক বাতাস ঝাপটা মারে, আগুনের শিখা সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ লেলিহান,—লেলিহান কাঁপা কাঁপা শিখাগুলি কখনো নেমে আসে, কখনো এঁকে বেঁকে দপ্ করে জ্বলে ওঠে, হাজার হাজার ফুলকি ছিটকে ছিটকে পাহাড়ের গা বেয়ে আলোর-গতিতে ছুটে হারিয়ে যাচ্ছে আকাশে—মিশে যাচ্ছে নক্ষত্রের সংসারে।

কিছু সংখ্যক সামুদ্রিক পাখির ঘুম ভেঙ্গে যায়; তারা বিলাপ করতে করতে সেই উজ্জ্বল অগ্নিকুণ্ডের ওপর দিয়ে পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে পাহাড় ও বাঁকগুলি পার হয়ে আবার অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

অল্প সময়ের মধ্যেই সমাধি-স্তূপটি জ্বলন্ত কাঠের স্তূপে পরিণত হলো। আগুনের রং লাল নয়, সামান্য হলুদ, মৃত্যুর মত হলুদবর্ণ, বাতাসের স্পর্শে উজ্জীবিত। হঠাৎ এক দমকা বাতাসের সজোর ঝাপটায় চিতার একাংশ সমুদ্রে ভেঙ্গে পড়ে। মৃতদেহের কিছুটা অংশ আবরণহীন হয়ে পড়ে, স্পষ্ট দেখা যায়—কালো মতন কি একটা কদর্যবস্তু যেন শুয়ে আছে অগ্নি-শয্যায়, পুড়ছে দীর্ঘ নীলাভ শিখায়।

যখন ডান দিক থেকে চিতার একাংশ ভেঙ্গে পড়ে, শবটিকে তখন

মানুষের বলে চেনা যায়। অবশ্য তরিৎ-তৎপরতায় নতুন কাঠ সাজিয়ে ভাঙ্গা চিতা জোড়া লাগানো হলো।

আবার পূর্ণ তেজে আগুন জ্বলে উঠলো।

সময়ের স্রোত বেয়ে রাত শেষ হয়, ভোরের আলো ফুটতে থাকে। সকাল পাঁচটা নাগাদ কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না,—শুধু ভস্মের একটি স্তূপ ছাড়া। আত্মীয়রা ঐ চিতাভস্ম তুলে নেন, কিছুটা উড়িয়ে দেন বাতাসে, খানিকটা ত্যাগ করেন সমুদ্রে এবং কিছু ভস্ম রেখে দেন একটি পাত্রে ভারতবর্ষে নিয়ে যাবেন বলে। তারপর তাঁরা ফিরে চললেন মৃতের জন্য শেষ বিলাপ করতে।

এইভাবেই এইসব তরুণ ভারতীয় প্রিন্স ও তাঁদের পরিচারকরা খুব সামান্য রসদ দিয়েই বিরল দক্ষতায় ও যথাযথ পবিত্রতায় শবদাহ করলেন। সমস্ত কিছুই সুসম্পন্ন হলো তাঁদের ধর্মীয় অনুশাসন মেনে। মৃত পুরুষ এখন পরম শান্তিতে নিদ্রামগ্ন।

পরের দিন এত্রারতাত শহরে দারুণ চাঞ্চল্য। কেউ কেউ বলছে, একজন জীবন্ত লোককে নাকি পুড়িয়ে মারা হয়েছে! অন্য অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করছে, কোন এক গুরুতর অপরাধ ঢাকা দেওয়া হয়েছে। এ রকমও বলা হলো,—মেয়রের জেল হতে পারে।

আবার অনেকের ধারণা, ভারতীয় রাজপুত্র কলেরায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। পুরুষরা হলো বিস্মিত এবং মেয়েরা প্রকাশ করে তাদের ঘৃণা।

সারাটা দিন ধরে পরিত্যক্ত চিতার ধারে জনতার ভিড়,—তারা তখনো উষ্ণ পোড়া কাঠের গাদায় মানুষের হাড় খুঁজে বেড়াচ্ছে! অনেক হাড়ের টুকরোই খুঁজে পাওয়া গেল, যা দিয়ে অন্ততঃ দশটা কঙ্কাল দাঁড় করানো যায়; কারণ, স্থানীয় গ্রামের লোকেরা তাদের মৃত ভেড়াগুলিকে ঐ সমুদ্র-চরাতেই ফেলতো। জুয়ারীরা সাবধানে কয়েক টুকরো হাড় তাদের ব্যাগের মধ্যে পুরে ফেলে; কিন্তু তাদের কেউই মৃত ভারতীয় প্রিন্সের এক টুকরো হাড়ও পায়নি।

সেই সন্ধ্যায় একজন সরকারী প্রতিনিধি এলেন ব্যাপারটার তদন্ত করতে।

তিনি মোটামুটি স্থির ও বুদ্ধিমান লোক। কিন্তু রিপোর্টে কি লিখবেন তিনি? ভারতীয়রা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, যদি ফ্রান্সে তাঁদের শব-দাহের অনুমতি না মেলে, তবে তাঁরা ঐ শব বয়ে নিয়ে যাবেন অপেক্ষাকৃত উদার কোন রাষ্ট্রে, যেখানে তাঁরা পারলৌকিক কাজ যথাযথ ভাবে শেষ করতে পারবেন।

এই ভাবেই আমি এক মৃতজনকে চিতায় ভস্মীভূত হতে দেখলুম। দেখে আমার মনেও বাসনা জাগে, মৃত্যুর পর আমাকেও যেন ঐভাবে পুড়িয়ে ফেলা হয়। সব কিছুই কত চকিতে শেষ হয়ে গেল! মাসের পর মাস মাটির নীচে পোতা কফিনে না পচার চেয়ে মুহূর্তে মানুষের হাতে ভস্মীভূত হওয়া শ্রেয়তর। দেহ মৃত এবং আত্মা মুক্তিপ্রাপ্ত। পবিত্র আগুন বাতাসে ছড়িয়ে দেয় সেই বস্তু, যা একদিন মানুষের আকৃতিতে ছিল; এখন নিছক ভস্ম; অসহনীয় পচন ধরার চেয়ে এই ব্যবস্থাকে মেনে নেওয়া স্বস্তিদায়ক। এটাই পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়। স্যাঁতসেঁতে আবদ্ধ কফিনের মধ্যে নিহিত দেহ কালো পূতিগন্ধময় একটা মণ্ডে পরিণত হয়,—কফিনের আধারে ঐভাবে মড়া পচানো দারুণ অপ্রীতিকর ও অত্যাচারের নামান্তর। কর্দমাক্ত গহ্বরে স্থাপিত অন্ধকার কফিন আত্মাকে বিরামহীন যন্ত্রণা দেয়, আর স্বর্গমুখী উড্ডীন চিতার আগুনে খুঁজে পাই মহত্ব, সৌন্দর্য ও পবিত্রতা।

আমার স্ত্রী

[My wife]

প্রীতিভোজের শেষে উপস্থিত সকলে—বিবাহিত লোকেরা, পুরনো বন্ধুরা, যাঁরা অতীতে কখনো অবিবাহিতদের মতন স্ত্রীদের সঙ্গে না নিয়ে জমায়েত হতেন, আলোচনায় রত। অনেকক্ষণ ধরে খানাপিনা হয়েছে তাঁদের, প্রচুর মদ্যপানও করেছেন, হরেক বিষয়ে বাক্যালাপ করছেন নিজেদের মধ্যে, টেনে আনছেন তাঁদের অতীতের মধুময় স্মৃতিকে; আবেগবহুল সুখস্মৃতি ঠোঁটের কোণে ফুটিয়ে তোলে স্মিত হাসি, কম্পন তোলে বুকে।

কে একজন বললেন:

'মনে আছে জর্জ, সেবার মণ্টমার্টির দুটি যুবতীসহ কেমন সেণ্ট-জর্মনে বেড়াতে গিয়েছিলাম?'

'নিশ্চয়। আছে বৈকি!'

এবং তাঁরা খুঁটি-নাটি হাজার রকমের ব্যাপার নিয়ে স্মৃতিচারণ শুরু করে দেন। আজো সেই অতীত তাঁদের সুখ দেয়।

এক সময় তাঁরা বিয়ে নিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করেন এবং প্রত্যেকেই যথেষ্ট আন্তরিকতার গলায় বলেন: 'আহা, যদি আবার সেই সুযোগ আসতো…।'

জর্জ ডু্যপরদিন বললেন, 'এটা কি আশ্চর্য ব্যাপার নয় যে, তোমরা সব কত সহজেই এতে জড়িয়ে পড়ো! তুমি হয়তো মানসিক দিক থেকে প্রস্তুতই ছিলে না; তারপর এক বসন্তে বেড়াতে গেলে গ্রামাঞ্চলে, যেখানকার জলবায়ু মনোরম, উষ্ণ—আগুয়ান গ্রীষ্মকে টের পাওয়া যায়। সমস্ত কিছু প্রস্ফুটিত। সেই সময় এক বন্ধুর বাড়িতে তুমি পরিচিত হলে এক যুবতীর সঙ্গে··ব্যস, তারপর আর তর সয় না! যা হবার হয়ে গেল। বিবাহিত পুরুষটি হয়ে ফিরে এলে ঘরে।'

পেঁরী লিজেলী উঁচু গলায় বলে ওঠেন: 'ঠিক তাই। কেবল আমার বেলাতেই ঘটনাটা বড় বিচিত্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল··'

কথা শেষ হবার আগেই তাঁর বন্ধু বাধা দেন, 'থাক, তোমার অন্ততঃ এ ব্যাপারে অভিযোগের কিছু থাকতে পারে না। তুমি নিশ্চয় এই দুনিয়ার সবচেয়ে আকর্ষণীয়া মহিলাকে স্ত্রী হিসাবে পেয়েছো। তিনি অপরূপা, নম্র, নিষ্কলঙ্ক। আলবাৎ তুমি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সুখী লোক!'

আগের লোকটি বললেন, 'তার জন্য আমি তো দায়ী নই।'

'কি দায়ী নও?'

'এটা সত্যি যে, আমার স্ত্রীর কোন খুঁত নাই। কিন্তু আমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে বিয়ে করেছিলুম।'

'কি বাজে বকছো।'

'হাঁ; গল্পটা তবে শোনো;—আমি তখন ত্রিশ বছরের যুবক, বিয়ের চাইতে ফাঁস-কাঠে ঝোলাই আমার কাছে তখন বেশী বাস্তব। যুবতী মেয়েদের মনে হয় নীরস; হৈ-হুল্লোড় করে সময় কাটাতেই ভালো লাগতো।

মে মাসে খুড়তুতো ভাই সাইমন দ্যঁ এরাবেলের বিয়েতে আমন্ত্রিত হয়ে

গেলাম নর্মাণ্ডিতে। সেটা বাস্তবিক এক নরম্যান বিয়েই বটে। বিকেল পাঁচটায় সকলে টেবিলের সামনে গিয়ে বসলো এবং রাত এগারোটা পর্যন্ত সমানে চললো তাদের খানাপিনা। আমার পাশটিতে জায়গা নিয়েছিল এক অপসরপ্রাপ্ত কর্ণেলের মেয়ে মিস্ ডুমৌলিন। সামরিক পরিবারে লালিতা এক দারুণ চন্‌মনে মেয়ে, নিটোল স্বাস্থ্য, প্রগল্‌ভা। সারাটা দিন সে আমার পিছু ছাড়েনি, কখনো আমাকে নিয়ে পার্কে পায়চারি করেছে, কখনো আমাকে তার নাচের জুটি করেছে; আমি পছন্দ করি বা না করি তার ভ্রূক্ষেপ নাই। ফলতঃ তার সঙ্গ আমার কাছে একঘেয়ে মনে হচ্ছিলো।

আমি নিজেকেই নিজে বললাম: অন্ততঃ আজকের দিনটির জন্য আমাকে এ সব সহ্য করতে হবে। কিন্তু আগামীকাল আমি বরদাস্ত করবো না। অনেক হয়েছে।

রাত প্রায় এগারোটার সময় মেয়েরা যে যার ঘরে শুতে গেল; আর পুরুষরা তখনো বসে রইলো ধূমপান করতে করতে মদ খেতে অথবা, মদ খেতে খেতে ধূমপান করতে।

খোলা জানালার মধ্য দিয়ে গ্রাম্য নাচ নজরে আসছিল। গ্রামের ছোকরা-ছুকরীরা গোল হ'য়ে হেঁড়ে গলায় গাইছে আর ধেই ধেই ক'রে নাচছে, ওদের এই বুনো উল্লাসের সঙ্গে বৃথাই তাল মেলাবার চেষ্টা করছে একটা কিচেন-টেবিলের ওপর দাঁড়ানো এক বেহালাবাদক ও এক বংশীবাদক। হরেক গলার রৈ রৈ এলোপাথাড়ি চাৎকারে বাজনাগুলি সময় সময় একেবারে তলিয়ে যায়; বাজনার দুর্বল শব্দ গ্রাম্যদের বল্গাহারা কণ্ঠস্বরে যেন আকাশ থেকে টুকরো টুকরো হ'য়ে আছড়ে পড়ছিল। মশাল দিয়ে ঘিরে রাখা দুটো বিশাল পিঁপেতে মজুত রয়েছে অঢেল মদ। দুটো লোক গ্লাস তুলে তুলে সেই মদ বিলি করতে দারুণ ব্যস্ত, যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব পানার্থীদের পানপাত্র তারা পূর্ণ করে দিচ্ছে; তাদের গ্লাস থেকে প্রতিমুহূর্তে মদের অথবা খাঁটি আপেল থেকে তৈরি পানীয়র রক্তাভ অথবা সোনালী বর্ণ যেন ছুটে বেড়াচ্ছিল।

এবং তৃষ্ণার্ত নাচিয়েরা, প্রশান্তমুখ প্রবীণরা, ঘর্মাক্ত যুবতীরা যে কোন ধরনের পাত্র নিয়েই দুই হাত বাড়িয়ে ছুটে আসছে উত্তেজক পানীয় নিতে, আকণ্ঠ পান ক'রে পিছন দিকে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ফিরে যাচ্ছে তারা।

একটা উন্মুক্ত টেবিলে থরে থরে সাজানো অঢেল রুটি, মাখন, পনির ও

মাংসের কাবাব। থেকে থেকে আনন্দ-উৎসারিত প্রত্যেকেই ঐ টেবিল থেকে খাবার তুলে মুখ ভর্তি করে। নক্ষত্রালোকিত আকাশের নীচে এই যে নির্ঝরধারার অমৃতনাদকম্প্র উত্তেজক উৎসব, ক্রমশঃ আমার রক্তেও অনুরণন সৃষ্টি করে ; ইচ্ছা হয়, স্বয়ং ওদের দলে যোগ দিই, বিশাল পিঁপে থেকে আকণ্ঠ মদ্য পান করি, মাখন ও কাঁচা পেঁয়াজের সঙ্গে শক্ত রুটি চিবুই।

এমনই এক স্বার্থসত্ত্বহীন উদগ্র বাসনার তাগিদে আমি আমার সঙ্গীদের ছেড়ে ওদের দলে ঝাঁপিয়ে পড়ি, ওদের অনন্ত উৎসবের সামিল হই।

অস্বীকার করছি না, ইতিমধ্যেই নেশায় আমি বেসামাল এবং বর্তমানে ঐ বেসামাল অবস্থাতেই আরো-আরো পানোন্মত্ত।

আমি এক শক্তিময়ী সংঘাতজর্জরা কৃষককন্যার হাত ধরে আমার সান্নিধ্যে টেনে আনি। মদির রোমাঞ্চে ওকে জাপটে ধরে পাগলের মত নাচতে থাকি। নাচতে নাচতে হাঁপ ধরে যায়।

তখন ঐ পিঁপের সামনে দাঁড়িয়ে আরেক প্রস্থ মদ্য পান হলো আমার। এবার অন্য একটি রসবতী যুবতীকে জাপটে ধরে নিজেকে নতুন ক'রে মাতিয়ে তুলি···আবার এক পাত্র সুরা পান হলো এবং শুরু হয়ে গেল আমার এমন দাপাদাপি যেন কেউ বুঝি আমাকে বেঁধে রেখেছে!

আমি বেঁকে-চুরে ত্রিভঙ্গ মূর্তি। ছোকরারা আহ্লাদে আটখানা। তারা আমার ভাব-ভঙ্গী অনুকরণের চেষ্টা করছে। সব মেয়েদেরই বাসনা, রতি-রোল্লাসে নাচবে আমার সঙ্গে, গরুর খাদ্য ঘাঁসের মতন কাঁপতে কাঁপতে দুলতে দুলতে তারা আগুয়ান আমার দিকে।

অবশেষে ভীষণ নাচা-নাচির পর, গ্লাসের পর গ্লাস মদ খাবার পর, রাত দুটোয় আমি ক্লান্ত, জড়জঙ্গম—দুই পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকাই কষ্টকর।

আমি কিন্তু আমার অবস্থা সম্পর্কে সচেতন এবং আমি চাইছিলুম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজের বিছানায় ফিরে যেতে। গোটা সম্ভ্রান্ত পল্লী-নিবাসটিই এখন ঘুমে অচৈতন্য, নিশ্চুপ, অন্ধকারময়।

আমার কাছে কোন আলো নেই। যে যার বিছানায় ঘুমিয়ে আছে। যে মুহূর্তে আমি এ বাড়ির প্রথম ঘরে ঢুকেছি, আমার মাথা ঘুরে যায়। আমি সহজে উপরে উঠবার সিঁড়িই খুঁজে পাচ্ছি না ; হাতড়াতে হাতড়াতে দৈবাৎ রেলিংটা খুঁজে পেলাম, টলতে টলতে ওটাকে খামচে ধরি, প্রথম সিঁড়িতে

কিছুক্ষণ বসে বুদ্ধির গোড়ায় কিছুটা ধোঁয়া দেবার চেষ্টা করি—আমি এখন কোথায় যাবো ও কি করবো!

হুঁ, মনে পড়েছে. আমার শোবার ঘরটা হচ্ছে দোতলায়, বাঁ দিক থেকে তিন নম্বর দরজা। আমার যে একেবারে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়নি, এ মস্ত বড় স্বস্তি। নিজের স্মৃতি ও চেতনা সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হয়ে যথেষ্ট মেহনতের সঙ্গে উঠে দাঁড়াই; একটার পর একটা সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে থাকি,—লোহার রলিংটা শক্ত হাতেই চেপে ধরে আছি, যাতে টলে না পড়ে যাই! আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, যাতে আমার কোন শব্দে ঘুমন্ত এই পুরী সন্ত্রস্ত না হয়।

তিন-চার বার বিপথগামিতায় আমার পা ফস্কে গিয়েছিল এবং প্রতিবারই আমি হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়েছিলাম। শুধুমাত্র হাতের শক্তি ও অঢেল মনোবলে নিশ্চিত পতনের হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেছি।

অবশেষে দোতলায় উঠে এসেছি। দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে কড়িডোর বরাবর হেঁটে চলেছি। এখানে একটা দরজা! আমি গণনা করি, "এক"। কিন্তু ঠিক তখনই আমার চোখে ভয়াবহ অন্ধকার, মাথা ভয়ানক ঘুরতে থাকে এবং সেই ঘূর্ণনের ধাক্কাতে আমি অপর ধারের দেয়ালের সঙ্গে ঠোক্কর খাই! তবু আমি সন্ধানী মন নিয়ে সমান্তরাল হেঁটে যাবার প্রয়াসী। প্যাসেজটা দীর্ঘ ও দুর্গম বোধ হয়। আমি দুর্গমতা অতিক্রম করছি। সাবধানে অন্ধকারে সাঁতরাতে সাঁতরাতে অনুধাবনের চেষ্টা করি, আমার ঘরটা আর কতদূরে! এমন সময় আমি আমার নাগালের মধ্যে আর এক জোড়া কপাট খুঁজে পেলাম। নিজের প্রত্যয়কেই জোরদার করবার জন্য উচ্চারণ করি, "দুই"। তারপর আবার এগিয়ে চলা এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই খুঁজে পেলাম তিন নম্বরকে। যথারীতি নিজেকেই নিজে শোনাই, "তিন"। অর্থাৎ, এটাই আমার।

দরজায় চাবির ধাক্কা লাগাতেই কপাট খুলে গেল। মনে খটকা লাগলেও ভাবছি, দরজা যখন খুলে গেল তখন এ ঘরটা আমার না হয়ে যায় না! আস্তে কপাট ভেজিয়ে অন্ধকার ঘরে সামনের দিকে আসতে থাকি।

নরম মতন কি যেন ঠেকলো—হাঁ, আমার কাউচ; আমি ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি।

ঐ অবস্থাতে আর আমি আমার রাত্রিকালীন ব্যবহার্য টেবিলটা কোথায়,

খুঁজে দেখিনা ; মোমবাতি বা দেয়াশলাইও খুঁজে বের করবার চেষ্টা করি না। ওসব খুঁজতে গেলে আরো ঘণ্টা দুয়েক সময় লেগে যেত। তারপর শরীর থেকে একে একে পোষাকগুলিও খুলে ফেলতে ঐ রকমই সময় লাগতো, হয়তো তাও সম্ভব হতোনা। সুতরাং, আমি আর চেষ্টাও করলুম না।

জুতো জোড়া খুলে ফেলি, হাতকাটা জামার বিশ্রীভাবে আটকে থাকা বোতামগুলি খুলি ; তারপর প্যাণ্টটাও আলগা ক'রে ঘুমের অতলান্তে তলিয়ে যাই।

নিশ্চয় বহুক্ষণ ধরে ঘুমিয়েছিলুম। হঠাৎ জেগে উঠি বেশ কাছাকাছি কোন কণ্ঠস্বরে : এই যে অলস মেয়ে, এখনো ঘুম। জানো, এখন দশটা বাজে ?

সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে এক স্ত্রীকণ্ঠ উত্তর দেয় : এর মধ্যেই ! গতকাল যা ধকল গেছে।

আধো ঘুমে আধো জাগরণে অর্ধচেতন আমার অনুভূতি। ওদের বাক্যালাপের তাৎপর্য বুঝবার চেষ্টা করছি।

আমি কোথায় ? আমি কি করেছি ?

আমার মন যেন ঘন মেঘে আচ্ছন্ন—দুর্নিরীক্ষ্য রহস্য ভেদ করতে পারছি না।

প্রথম স্বর বলে : আমি কিন্তু পর্দা সরিয়ে ঢুকছি।

তারপরই শুনতে পাই কার আগুয়ান পদশব্দ। উঠে বসি, হতবুদ্ধি হয়ে অপেক্ষা করতে থাকি।…এক সময় একখানা হাত আমার মাথা ছুঁয়ে যায়। আমি চকিতে নড়ে চড়ে উঠি।

অস্থির গলায় সেই স্বর ধ্বনিত হয় : কে এখানে ?

আমি একেবারে নির্বাক।

একজোড়া ক্রুদ্ধ হাত আমাকে ঠেসে ধরে। পাল্টা আমিও সেই অদৃশ্য-জনকে জাপটে ধরি। শুরু হয়ে গেল সেই অন্ধকার পরিশরে এক দারুণ শক্তির পরীক্ষা ! খুব লড়ছি আমরা ! আসবাব-পত্র উল্টে-পাল্টে, দেয়ালে টক্কর খেতে খেতে—সে এক ভয়ানক মল্লযুদ্ধ !

আমরা যখন শক্তি পরীক্ষায় মত্ত, এ ঘরের বামাকণ্ঠ তখন সমানে আর্তনাদ ছাড়তে থাকে : বাঁচাও ! কে আছো, বাঁচাও !

সেই চীৎকারে বাড়ির চাকর-বাকর, প্রতিবেশীরা, ভয়ার্ত মেয়েরা—

সকলে দুপ্ দাপ্ ছুটে আসতে থাকে এ ঘরের দিকে। ঘরের খড়খড়ি ঝিলমিলি দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারতে থাকে অনেকে : কেউ কেউ সাহস ক'রে এগিয়ে এসে পর্দাটাও খুলে ফেলে।

তখনই পরিষ্কার আলোতে আমি আবিষ্কার করি,—আমি এতক্ষণ তবে কর্ণেল ডুমৌলিনের সঙ্গে হাতাহাতি করছিলুম! এবং এও বুঝতে পারি, কাল সারাটা রাত আমি তাঁর মেয়ের পাশেই শুয়েছিলুম।

যে মুহূর্তে আমরা দু'জন আলাদা হয়ে গেছি, আমি ভয়ে আতঙ্কে সটান ছুটে পালাই নিজের ঘরে। ঘরের কপাট বন্ধ ক'রে দিই এবং একটা চেয়ারের ওপর পা গুটিয়ে গুম মেরে বসে থাকি। আমার জুতোজোড়া পড়ে আছে ঐ যুবতীর ঘরে।

শুনতে পাচ্ছি, গোটা বাড়িময় উত্তেজনার হিল্লোল—উত্তপ্ত আলোচনা, উত্তেজিত দাপাদাপি। দুম্-দাম্ দরজা-জানালা খুলছে, বন্ধ করছে ; ফিস্-ফাস্ কথা বলছে যেন কারা ; দ্রুত পদক্ষেপে ছোটাছুটি করছে বহুজনে।

আধঘণ্টা পর কে যেন আমার দরজায় ধাক্কা মারে।

আমি চীৎকার করে উঠি, 'কে ?'

দরজা ধাক্কাচ্ছেন আমার কাকা অর্থাৎ গত সন্ধ্যায় আমার যে খুড়তুতো ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে, তার বাবা।

আমি দরজা খুলে দিই।

রাগে-ক্ষোভে তাঁর মুখের রঙ রক্তবর্ণ, আমার ওপর হাড়ে হাড়ে চটেছেন।

'শুনছো হে। তুমি একটি ইতর। এ বাড়ির সুনাম তুমি নষ্ট করেছো।'

তারপরই অপেক্ষাকৃত চাপা গলায় আমাকে বলেন, 'কি গাধার মতন ধরা পড়লে বলো তো। করেছো, করেছো,—কিন্তু সকাল দশটা পর্যন্ত মড়া কাঠের গুঁড়ির মতন শুয়ে রইলে কেন ? তোমার উচিত ছিল কাজ হয়ে গেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঐ ঘর ছেড়ে চলে আসা।'

আমি হাত-পা নেড়ে বোঝাবার চেষ্টা করি, 'কিন্তু কাকা, আমি শপথ করে বলছি, রাত্রে খারাপ কিছু আমরা ক'রে ফেলিনি। আসলে ব্যাপারটা হলো, খুব মাল টেনেছিলাম তো। নেশার ঘোরে ঘর চিনতে আমার ভুল হয়ে গিয়েছিল।'

তিনি তাঁর কাঁধ ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলেন, 'খুব হয়েছে হে। ও সব ভাঁওতা আমাকে দিতে এসো না।'

মরীয়া হ'য়ে হাত তুলে বলি, 'আমি নিজের নামে দিব্যি কাটছি—'

কাকা ব্যঙ্গ করেন, 'হাঁ-হাঁ, ঠিক আছে—তুমি যে ওরকম কথাই বলবে, আমার তা জানা ছিল।'

কাকার বিদ্রূপে এবার আমি যথার্থ রেগে উঠি এবং গড় গড় ক'রে গত রাত্রের বিভ্রান্তিকর গল্পটি বলে গেলাম। তিনি আমার দিকে এমন অবাক চোখে চেয়ে রইলেন যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না, তাঁর এই ভাইপোটিকে বিশ্বাস করা উচিত কিনা।

তারপর আবার তিনি চলে গেলেন কর্ণেলের সঙ্গে ফয়সালা করতে। আমিও এখানে বসে শুনতে পাচ্ছি, এ বাড়ির মায়েরা এক বিচারসভা বসিয়েছেন এবং এই ঘটনা নানা রঙে সাজিয়ে তাঁদের দরবারে পেশ করা হচ্ছে।

ঘণ্টাখানেক বাদে কাকা ফিরে এলেন। এবার তিনি বিচারকের ভঙ্গীতে দম নিয়ে বসেন। বলেন, 'ঘটনা যাই ঘটে থাকুক, আমি দেখছি, তোমার নিস্তার পাবার মাত্র একটাই উপায় আছে এবং তা হচ্ছে কুমারী ডুমৌলিনকে বিয়ে করা।'

শুনে তো আমি আঁতকে উঠি।

'বটে। কোনদিন তা হতে পারে না।'

কাকা গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার উদ্দেশ্যখানা কি?'

আমি সাফ বলে দিলাম, 'জুতোজোড়া ফেরৎ পেলেই আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো।'

কাকা দপ্‌ ক'রে জ্বলে ওঠেন, 'ইয়ার্কি, না! কর্ণেল ঠিক করেছেন, তোমাকে দেখলেই এক গুলিতে খুলি উড়িয়ে দেবেন; এবং জেনে রেখো, ফাঁকা আওয়াজ দেবার মানুষ তিনি নন।' আমি 'ডুয়েল' লড়ার প্রস্তাব দিয়েছিলাম; তিনি জবাবে বললেন—আমি এখন একটা কথাই বুঝি এবং তা হলো নচ্ছারের খুলিটা পিস্তলের মুখে উড়িয়ে দেওয়া···

তাছাড়া এই ঘটনাটাকে অন্য একটা দৃষ্টিকোণ থেকেও বিচার করা উচিত আমাদের। হয়তো তুমি ঐ মেয়েটির বারোটা বাজিয়েছো অথবা তোমার গল্পানুসারে মাতাল অবস্থায় তোমার একটা বিষম বিভ্রম ঘটেছিল মাত্র।

কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রেই তোমার অপরাধটা খুব বেশী। এতবড় একটা অন্যায় করে ন্যাকা সেজে বসে থাকবে, তা তো হয় না। ঘটনা যেভাবেই ঘটে থাকুক, মোদ্দা কথা হলো—ঐ মেয়েটার মুখে চুণ-কালি পড়েছে; কারণ, মাতালকে আবার কে কবে বিশ্বাস করে? যত দুর্ভোগ ওকেই ভোগ করতে হবে। ভেবে দেখো।'

এই পর্যন্ত বলে তিনি আবার উঠলেন। আমি তাঁর পিছনে চীৎকার করে বলি, 'যা ইচ্ছে আপনারা আমাকে বলতে পারেন, কিন্তু বিয়ে আমি ওকে করছি না।'

এরপর আরো ঘণ্টাখানেক আমি একা।

তারপর এলেন আমার কাকিমা। তিনি আবার চোখের জল ফেলছিলেন। সজল চোখে আর্দ্র গলায় তিনিও অনেক রকম চেষ্টা করলেন আমাকে তাঁর স্বমতে আনতে।—কেউই নাকি আমার ভুলকে মেনে নেবে না; কেউ নাকি বিশ্বাসই করবে না, একটি যুবতী মেয়ে কোন বদ উদ্দেশ্য ছাড়াই বাড়ি ভর্তি মানুষ থাকা সত্বেও রাত্রে তার ঘরের দরজা খুলে রেখেছে। কর্ণেল নাকি তাঁর মেয়েকে যথেষ্ট মারধোর করেছেন এবং সে সারাটা সকাল ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। এ একটা ভয়ানক কেচ্ছা, যাকে কেউ এড়িয়ে যেতে পারে না।

এবং আমার করুণাময়ী কাকিমা অবশেষে পরামর্শ দিলেন, 'যাই হোক, তুমি ওকে বিয়ের প্রস্তাব দাও। আমার মনে হয়, এই বিয়ের কথাবার্তা চালাচালি করতেই অনেকদিন সময় লেগে যাবে এবং এতদিনে নানা রকম ফন্দি-ফিকির বের করে রেহাই পেয়ে যাবে। আপাততঃ মত দিয়ে দাও।'

কাকিমার এই যুক্তিটাকে বেশ বুদ্ধিগ্রাহ্য মনে হলো। এবং আমি আমার প্রস্তাব লিখিতভাবে জানাতে রাজি হয়ে গেলাম।

আরো ঘণ্টা খানেক বাদে আমি রওনা হলাম প্যারিসের পথে।

পরের দিনই জানতে পারলুম, আমার আবেদন নাকি মঞ্জুর করা হয়েছে।

অতঃপর সপ্তাহ তিনেক ধরে হরেক রকম কৌশল করেও আমি সেই অনিবার্য পরিণতিকে এড়াতে পারলুম না। যথারীতি গির্জায় প্রস্তাবিত বিবাহের বিজ্ঞপ্তি ছাপানো হলো। এক সোমবারের সকালে আমাকে দেখা গেল, একটি আলোকিত চার্চের ভেতর আমি দাঁড়িয়ে আছি, আমার পাশে

ক্রন্দনরতা এক যুবতী এবং মেয়রের কাছে আমাদের যৌথ শপথবাক্য উচ্চারিত হয়েছে: আমৃত্যু আমরা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হবো না।

সেই সন্ধ্যা থেকেই আমি একবারও ওর মুখের দিকে তাকাইনি। এখন মাঝে মাঝে রাগ ও বিরক্তির সঙ্গে আড়চোখে তাকাচ্ছি।

নিজেকেই নিজে বলি: এই একটা মেয়েমানুষ, যে আমার দিনগুলিকে একঘেয়ে ক'রে তুলবে।

সেও কিন্তু উৎসবের সন্ধ্যা না আসা পর্যন্ত একবারও আমার মুখের দিকে তাকায়নি। একটা কথাও বলেনি।

রাত-গভীরে বাসর ঘরে ঢুকলুম। আমি মনে মনে স্থির করে নিয়েছি, আমার কঠিন সিদ্ধান্ত আজই ওকে জানিয়ে দেবো। কারণ, এখন তো আমিই ওর প্রভু।

দেখতে পাচ্ছি, সে একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে আছে, দিনের পোশাকও বদলায়নি।

ওর দুই চোখ রক্তবর্ণ, মুখের রঙ ফ্যাকাশে।

আমি ঘরে ঢোকা মাত্রই সে উঠে দাঁড়ায় এবং অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে।

'দেখুন', সে আমাকে সরাসরি বলে, 'আপনি যা বলবেন, তাই আমি করতে রাজী আছি। যদি চান তো আত্মহত্যাও করতে পারি।'

কর্ণেলের মেয়ে এমন সুন্দরভাবে এই সাহসিক শব্দগুলি উচ্চারণ করলো যে আমি মুগ্ধ না হয়ে পারি না। নিজের অধিকার বলেই তৎক্ষণাৎ আমি তাকে আমার বুকের সঙ্গে লেপ্টে ধরি এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রমাণ পেয়ে গেলাম,—না, আমি ঠকিনি।

আমাদের বিয়ে হয়েছে আজ পাঁচ বছর এবং আজ পর্যন্ত কখনো কোন পারিবারিক হতাশা আমাকে গ্রাস করেনি।

পেঁরী লিতোলী তাঁর গল্প বলা শেষ করেন।

তাঁর বন্ধুরা হেসে ওঠেন। একজন মন্তব্য করেন: বিয়ে হচ্ছে লটারী খেলার সামিল। বেশী সংখ্যায় মেয়ে পছন্দ ক'রে বেড়ানো উচিত নয়। দৈবাৎ বা, বিশৃঙ্খলভাবে যে এসে গেল কাছে, তাকেই ধরে নিতে হবে সর্বোত্তমা।

অন্য আর একজন উপসংহার টানেন : হাঁ, কিন্তু মনে রেখো বন্ধু, ঈশ্বরের নেকনজর মাতালদের দিকেই থাকে এবং সেই কারণেই পৌরীর জিত হয়েছে।

প্রেমাসক্তি

[Caresses]

না, বন্ধু, আর এ ধরনের কথা ভাববে না।

তুমি আমার কাছে যা চেয়েছো, তা আমাকে ক্ষুব্ধ করেছে, বিরক্ত করেছে।

আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি ; আর ঈশ্বর তাঁর প্রতিটি সুন্দর সৃষ্টির সঙ্গে এমন এক একটি ভয়ানক জিনিস জুড়ে দেন যা পরিণামে সমস্ত সৌন্দর্যকে হত্যা করে।

তিনি এই পৃথিবীর পবিত্রতম বস্তু প্রেম দিয়েছেন। কিন্তু যখনই তিনি দেখলেন, প্রেম আমাদের পক্ষে অত্যন্ত সুকুমার ও প্রীতিকর, তখনই তিনি আমাদের ভিতর সেই অনুভূতির জন্ম দিলেন, যা অত্যন্ত লজ্জাস্কর, বিষাক্ত, বিক্ষোভপূর্ণ, পাশবিক—যা আমাদের শরীরকে উত্তেজিত করে, স্নায়ুমণ্ডলীকে করে তোলে হিংস্র।

তিনি এই ভয়ানক জিনিসটি এমন এক গোপন জায়গায় এনে রাখলেন যে, ওর কথা ভাবতেই গভীর লজ্জা আমাদের আচ্ছন্ন ক'রে রাখে।

খুব চাপা ও প্রায়শ নীরব-ভাষাতেই আমরা এর সম্পর্কে আলোচনা করে থাকি। এটি যে লজ্জার মোড়কে ঢাকা। এটা লুকিয়ে থেকেও আত্মাকে ক্ষুব্ধ করে, চক্ষুকে বিরক্ত করে। নৈতিকভাবে পরিত্যক্ত, আইন কর্তৃক সতর্কিত এই জিনিসটা অপরাধীর মতন অন্ধকারেই লুকিয়ে থাকে।

তুমি আমার কাছে এ সম্পর্কে আর কখনো প্রস্তাব রেখোনা, কখনো নয়।

আমি জানিনা, তোমাকে আমি ভালোবাসি কিনা। কিন্তু আমি জানি, তোমার সঙ্গ আমাকে আনন্দ দেয় ; তোমার দৃষ্টি আমার কাছে খুব মিষ্টি ; এবং তোমার কণ্ঠস্বর আমাকে তৃপ্ত করে।

কিন্তু যেদিন থেকে তুমি আমার দুর্বলতাকে তোমার বাসনার কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে, সেদিন থেকে তুমি আমার ঘৃণার পাত্র হ'য়ে দাঁড়াবে।

যে সুকুমার বন্ধনে আমরা উভয়ে আবদ্ধ, তা ভেঙ্গে যাবে।

তোমার আর আমার মধ্যে বিরাজ করবে কলঙ্কের এক অতলস্পর্শী নরক।

আমরা যেখানে আছি, সেখানেই থাকতে দাও।··এবং···যদি তুমি এ ভাবেই ভালোবাসতে পারো, আমিও বাসবো। ইতি—

তোমার বান্ধবী
জেনিভিভি।

মাদাম, তুমি আমাকে কঠিন অকপটতার সঙ্গে, একঘেয়ে নিয়মকে বাদ দিয়ে, এমন এক বান্ধবীর কাছে নিজের বক্তব্য রাখতে দেবে, যে সারা জীবন ধরে একটা বিশেষ শপথকে বুকে বয়ে বেড়াতে ইচ্ছুক?

আমিও জানিনা, তোমাকে আমি ভালোবাসি কিনা। যে বস্তুর জন্য তোমার এত ক্ষোভ, সেই বস্তুটি না পাওয়া পর্যন্ত এই ভালোবাসা সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তও নিতে পারছি না। তুমি কি মুসেড়ের কবিতা ভুলে গেছ:

ভয়ঙ্কর যা বস্তু তুমি ভাবো,
ভয়ঙ্কর সে নয়।
দেহ! সে তো প্রেমেরই আধার,
দেহকে কেন ভয়?

আমরা ভয় পাই, আমাদের অপ্রবৃত্তি জাগে তখনই, যখন আমাদের রক্তের উন্মাদনা কোন হেত্বর্থক দুঃসাহসিক ঘটনার মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়।

কিন্তু যখন কোন রমণীকে পছন্দ করতে শুরু করি, যখন তাকে অসাধারণ রূপসী মনে হয়, যখন তার সঙ্গ কখনো পুরনো হয় না,—যেমনটি তোমাকে মনে হয় আমার,—তখনই প্রেম ও সোহাগ শানিত হয়ে ওঠে, প্রেম তার পূর্ণতা লাভ করে এবং দেয় সীমাহীন আনন্দ।

এই যে মোহাকর্ষণ, মাদাম, এটাই কিন্তু প্রেমের প্রমাণ।

যদি তীব্র আলিঙ্গনের পরই আমাদের আবেগ মরে যায়, তবে আমরা নিজেদেরই বঞ্চিত করবো।

আর যদি আবেগ আরো স্ফীত হয়ে ওঠে, তবে আমরা পরস্পরকে ভালোবাসতে পারবো।

একজন দার্শনিক, যিনি তাঁর মতবাদ প্রচারে উদ্যোগী হ্ননি, প্রকৃতির এই ফাঁদ সম্পর্কে আমাদের সতর্ক ক'রে দিয়েছেন। 'প্রকৃতি চায় নতুন জীবন', তিনি বলেছেন, 'এবং সে বাধ্য করছে নতুন জীবনের জন্ম দিতে। এই জন্য যে ফাঁদের সৃষ্টি, তারই চারিদিকে টোপ হিসেবে প্রকৃতি সাজিয়ে রেখেছে যুগপৎ প্রেম ও সুখ।'

তিনি আরো বলেছেন, 'যে ক্ষণে আমরা আমাদের জোর ক'রে সরিয়ে নেবো, যে মুহূর্তে ঐ ক্ষণিক উন্মাদনা আমাদের ত্যাগ করবে, আমাদের অন্তঃকরণ এক গভীর বিষাদে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠবে ! বঞ্চনা করবার কৌশল ধরতে পারবো, জানতে পারবো সেই গুপ্ত রহস্য, যা আমাদের উৎক্ষিপ্ত করে ; এই গোপনতাকে প্রত্যক্ষ করে, অনুভব করে ও স্পর্শ করে আমাদের হতাশা গভীরতর হবে।'

এই ব্যাখ্যা প্রায়শই সত্যি। এই ভাবেই আমরা অনুভূতির আকস্মিক পরিবর্তনের মধ্যে গিয়ে পড়ি।

প্রকৃতি আমাদের জয় করেছে ; আমরা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই প্রকৃতির বাসনায় উন্মুক্ত বাহুর মধ্যে নিজেদের সমর্পণ করি।

হাঁ, আমি জানি, বিচিত্র ওষ্ঠদ্বয়ের ওপর হিম ও বন্য চুম্বন কেমন চাপ সৃষ্টি করে। চক্ষুতে ফুটে ওঠে এমন নিবদ্ধ জ্বলন্ত দৃষ্টি, যা বুঝি আগে কখনো দেখা যায়নি এবং ভবিষ্যতেও দেখা যাবে না। অতঃপর, আমি বলতে পারি, ঐ বিশেষ মুহূর্তটি পার হয়ে যাবার পর আমাদের মন কত তিক্ত বিস্বাদে ভরে ওঠে।

কিন্তু এই স্নেহের মেঘ, যাকে আমরা নাম দিয়েছি প্রেম, যদি একজোড়া নর-নারাকে দীর্ঘকাল অধিকার করে থাকে, ফলতঃ এই সম্পর্ক যদি আরো নিবিড় হয়, প্রেমময় স্মৃতিগুলি তখন অহরহ জীবন্ত হ'য়ে উঠবে, একে অপরের স্বর শুনবার জন্যও ব্যগ্র হ'য়ে থাকবে, তারা পরস্পরকে নয়নে হারাবে···এবং এরই পরিণামে এমন একটি মুহূর্ত কি অনিবার্য হ'য়ে উঠবে না, যখন তারা দু'জনে পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, চুম্বনের উষ্ণতায় দুটি ঠোঁট ঘনিষ্ঠ সংবদ্ধ এবং চূড়ান্ত সুখের নেশায় দুটি দেহও এক হতে চাইছে ?···

তুমি কি কখনো চুম্বনের প্রত্যাশী হওনি ?

বলো, ওষ্ঠ কি কখনো ওষ্ঠকে কাছে ডাকে না? হৃদয়বিদ্ধকারী উজ্জ্বল কটাক্ষ কি দুর্দমনীয় ও ব্যাপক কামনার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয় না?

তুমি হয়তো জবাব দেবে: এটাই তো ফাঁদ, এখানেই তো লজ্জা।

কিন্তু তাতে কি এমন আসে যায়? আমি ঐ ফাঁদকে চিনি, ঐ রহস্যময়তার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছি ও তাকে ভালোও বেসে ফেলেছি। প্রকৃতি আমাদের ভেতর যে প্রেমজ মোহ ও কাম দিয়েছে, তা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমাদের উত্তরপুরুষদের জন্ম দিয়ে যাচ্ছে।

এখন এসো, আমরা ঐ মোহ ও আসক্তিকে চুরি করি। তুমি তোমার ইচ্ছানুযায়ী ওকে পরিবর্তিত করবে, বিশুদ্ধতর করবে। ঐ ভাবে আমরা প্রকৃতিকেও ফাঁকি দেবো। প্রকৃতি যা চেয়েছিল, আমরা তার চেয়ে ভিন্ন ধরনের কিছু তৈরি করলুম; প্রকৃতি যা আমাদের শিক্ষা দিতে চেয়েছিল, আমরা তার চেয়েও কিছু বেশী শিখে ফেললুম। আমাদের এই প্রেমাসক্তি যেন মাটি থেকে তুলে আনা একটুকরো কাঁচা মূল্যবান ধাতু, যাকে আমরা মনের মতন ক'রে গড়ে তুলতে পারি, কাজে লাগাতে পারি। প্রেমাসক্তি মূলতঃ মানুষের অন্তরের এক আকুতি, যে চেতনাকে আমরা ঈশ্বরও বলতে পারি। আর আমরা যেহেতু সমস্ত কিছুকেই আদর্শ ক'রে গড়তে চাই, এই আসক্তিকেও তার ভয়াবহ পাশবিক সংঘাত সত্ত্বেও আদর্শ ক'রে নেবো।

এসো, আমরা যেমন বিবেকহীন মদ্য-পানে আনন্দিত হই, যেমন প্লেটের ওপর সাজানো রসালো ফলের টুকরোগুলি দেখে লালায়িত হই, যেমন শরীরে আনন্দ ও রোমাঞ্চ সৃষ্টি হলে আমরা আপ্লুত হই, তেমনি যেন এই অন্তঃসংজ্ঞায় উৎসারিত কামাবেগকেও সানন্দে স্বীকৃতি দিতে পারি।

আমাদের ভালোবাসতে দাও রমণী-দেহের সেই মাংসল অংশ, যা সুন্দর, শুভ্র ও বর্তুলাকার, যা চুম্বন করতে অথবা, হাত দিয়ে স্পর্শ করতে অনাবিল সুখ আর সুখ!

যখন কোন শিল্পী তাঁর শৈল্পিক উন্মাদনায় বিরলতম ও পবিত্রতম কোন ছবি আঁকতে মনস্থ করবেন, তখন প্রথমেই ছবির বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচিত করবেন গোলাপসম মুকুর বিশিষ্ট রেখাবদ্ধ স্তন।

আমি "চিকিৎসাবিদ্যার অভিধান" নামক একখানা পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থে নারীর বক্ষ সম্পর্কে একটা চমৎকার উক্তি পড়েছিলাম, যাকে এম যোশেফ প্রথমের ভাষায় বলা যায়:

"নারীর বক্ষ একাধারে প্রয়োজনীয় বস্তু, অন্যধারে সুখেরও উৎস।"

যদি তোমার অমত না থাকে, এসো, আমরা ঐ 'প্রয়োজনীয়' কথাটা উহ্য রেখে শুধু 'সুখ'টুকুই বজায় রাখি। নারীর স্তন কি শুধু শিশুদের স্বাস্থ্যের জন্য ?

হাঁ মাদাম, ঐ সব নীতিবিশারদদের বাদ দাও, মাত্রাতিরিক্ত বিনয় এবং ডাক্তারী সতর্কতাও ভুলে যাও, চুলোয় যাক সেই সব কবিরা, যাঁরা দেহহীন প্রেমের মধ্যে আত্মার মিলন কল্পনা করেন। কু-দর্শনা মেয়েরা নিজেদের কর্তব্য নিয়েই ব্যস্ত থাকুক এবং যুক্তিবাদী লোকেরা নিছক নিজেদের স্বার্থ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করুক। সমাজপতিরা তাঁদের নিয়ম আঁকড়ে পড়ে থাকুক। পুরোহিতরা ব্যস্ত থাকুক তন্ত্র-মন্ত্র নিয়ে। আর আমরা? আমরা তখন গ্রহণ করি সেই প্রচণ্ড কামাবেগ, যা আমাদের উত্তেজিত ও মাতাল ক'রে রাখবে, অথচ যার শিহরণ পাতলা বাতাসের চেয়েও হাল্কা, যা শানিত তলোয়ারের চেয়েও তীক্ষ্ণমুখ, দ্রুত ও হৃদয়বিদ্ধকারী, যার প্রভাবে মানুষ কখনো প্রার্থনায় বসে, কখনো যে কোন ধরনের অপরাধ ক'রে বসে এবং যার প্রভাবে সাধারণ জনও অতি সাহসের পরিচয় দেয়।

আমাদের প্রেম হবে এই রকম: অধীর, স্বাভাবিক, আইনানুগ,—অথচ ভয়াল, উন্মাদ এবং বন্ধনহীন। মানুষ যেমন সোনা ও হীরার জন্য লালায়িত, আমরাও তেমনি এই প্রেমের জন্য প্রত্যাশী হয়ে থাকবো। আমাদের প্রেম সোনা ও হীরার চেয়েও দামী,—আদতে কোন মূল্যস্তর দিয়ে এর মূল্যায়ন সম্ভব নয়। কোন তোষামোদ ছাড়াই আমরা যেন এই আবেগকে স্থায়ী করতে পারি। এই অস্থির সুখের মধ্য দিয়েই যেন আমাদের জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

মাদাম, তোমাকে আমি এমন এক সত্যের সন্ধান দিচ্ছি, কোন বইতে যার ব্যাখ্যা পাবে না। এই পৃথিবীতে সেই সব মেয়েরাই সুখী, যাদের প্রতি আসক্তি ও সোহাগের কখনো অভাব ঘটে না। তারা দুশ্চিন্তাহীন জীবন কাটায়, মানসিক গ্লানিতে কখনো ভেঙ্গে পড়ে না, পরবর্তী প্রেম-চুম্বন ছাড়া তাদের আর কোন আকাঙ্খা নাই এবং প্রতিটি চুম্বনই পূর্বতন চুম্বনের মতন আনন্দ ও আশ্লেষপূর্ণ।

আর যে সমস্ত মেয়েদের কাছে প্রেমাসক্তি ক্ষণায়ু অথবা, বিরক্তিকর অথবা, বিরল, তারা হাজার রকমের দুশ্চিন্তার পাহাড় মাথায় নিয়ে

ভারাক্লান্ত, তাদের মন প্রায়ই অধিকার ক'রে রাখে ধন-লিপ্সা অথবা অহঙ্কার —পরিণতি যাদের বাস্তবিক দুঃখময়।

কিন্তু প্রেমাসক্তিতে সমর্পিতা নারীর আর কিছুরই দরকার নাই, তারা কিছু প্রার্থনাও করে না, পার্থিব বস্তুর প্রতি তাদের অনীহা।

তারা স্বপ্ন, সুখ ও মৃদু হাস্যময় এক অন্যভুবনে বাস করে। খুব কদাচিৎই তাদের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে, কারণ প্রেমাবেগ তো তাদের সবই দিয়েছে—আনন্দ ও মুক্তি দুই-ই।

আরো অনেক কিছু আমি এখনো বলতে পারি···

ইতি—

হেনরী।

গতকাল, রবিবার, বেলা একটার পর একটি ছোট্ট রুশ চামড়ায় মোড়া পকেট বুকে জাপানী রাইস-কাগজে লেখা এই দু'খানি চিঠি পাওয়া গেছে।

পিশাচ

[Devil]

মুমূর্ষু মহিলার বিছানার ধারে ডাক্তারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে চাষী লোকটি। বৃদ্ধার মুখাবয়ব প্রশান্ত, সম্পূর্ণ সজ্ঞানতায় শুনছেন এদের কথোপকথন। মৃত্যুর জন্য তাঁর কোন অভিযোগ নেই, তিনি প্রস্তুত—বয়স যে বিরানব্বুই।

জুলাইয়ের সূর্যালোক খোলা জানালা ও দরজার মধ্য দিয়ে এসে পড়েছে, চারপুরুষ ধরে ব্যবহৃত বাদামী মাটির বুকে সেই আলোর চাকচিক্য। তপ্ত বাতাসে ভাসে মাটির গন্ধ, ঘাসের ঘ্রাণ, দুপুরের রোদে পোড়া পাতার বাস। ভেসে আসে গঙ্গা-ফড়িংদের অবিরাম ঝিম্ ঝিম্ রব।

ডাক্তার চড়া গলায় বললেন, 'হোনোর, তুমি তোমার মাকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে যেওনা। যে কোন মুহূর্তে উনি মারা যেতে পারেন।'

চাষী মাথা নাড়ে, 'কিন্তু আমার ফসলগুলি অনেকক্ষণ ধরে মাঠে পড়ে আছে। এই বেলা তুলে না আনলে অনেক ক্ষতি হবে। তুমি কি বলো, মা?'

মৃতপ্রায় বৃদ্ধার এখনো নর্যাণসুলভ ধনলিপ্সা, চোখ ও মুখের অভিব্যক্তিতে যেন সম্মতি জানালেন—হাঁ, যাও।

কিন্তু রেগে উঠলেন ডাক্তার, পা ঠুকে বললেন, 'বুঝলে, তুমি খুব নিষ্ঠুর। আমি তোমাকে যেতে বলতে পারি না। মাঠের ফসল কাটা যদি তোমার এখন এতই জরুরী হয়, যেতে পারো। কিন্তু খেয়াল রেখো, দিন একদিন তোমারও ঘনাবে; সেদিন কিন্তু তোমার কাছে এসে আমি দাঁড়াবো না—কুকুরের মতো মারা যাবে তুমি, বুঝলে?'

রোগা লম্বা লোকটা ডাক্তারের কথায় দ্বিধান্বিত—একদিকে তার ভবিষ্যতের ভয়, অন্যদিকে বৈষয়িক ভাবনা। বললো, 'কতক্ষণ ধরে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলছেন?'

'তা আমি কি করে জানবো।' কড়া গলায় ধমকালেন ডাক্তার, 'সেটা বরং ওঁর সঙ্গেই ঠিক করে নাও। ডাক্তার হিসেবে আমি তাঁর আরো কয়েক ঘণ্টা পরমায়ু চাই। বুঝলে?'

লোকটা তার মনস্থির করে ফেললো, 'আমি যাচ্ছি, আমায় যেতেই হবে। রাগ করবেন না ডাক্তারবাবু।'

সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারও হাত গুটিয়ে নিলেন। গলায় তাঁর হুঁশিয়ারি, 'ঠিক আছে, যা ইচ্ছে করো। আমিও আব এ বিরক্তিকর পরিবেশে থাকতে পারছি না।'

ডাক্তারবাবু রেগেমেগে চলে গেলেন।

হোনোর কিছুক্ষণের জন্য বাইরে গিয়ে আবার ফিরে আসে, মায়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, 'তুমি একটু একা থাকো। আমি চট করে র‍্যাপেট বুড়িকে ডেকে আনছি।'

র‍্যাপেট এক বয়স্কা ধোপানী। কাপড় কাচা ছাড়া তার আরো একটা ভূমিকা ছিল—ঐ গ্রামসহ জিলার বহু পরিবারে মৃত বা মৃতকল্প জনের পরিচর্যা সে করতো উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বদলে। তারও অন্তঃকরণে ছিল যত রাজ্যের লোভ ও লালসা। তার আলোচ্য বিষয় ছিল একমাত্র মৃত্যু—আজীবন সে কত রকমের মরণ দেখেছে, খুব উৎসাহের সঙ্গে সে সব ব্যাখ্যা করতো।

হোনোর তার বাড়িতে ঢুকে দেখতে পায়, ধোপানী জলে নীল গোলাচ্ছে মেয়েদের রুমাল কাচবার জন্য

হোনোর বললো, 'আছো কেমন ব্যাপেট বুড়ি ?'

সে ঘুরে তাকালো, 'গতানুগতিক। তোমার খবর কি ?'

'নিজে তো বহালতবিয়ৎ। তবে মার অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়।'

'তোমার মা ?'

'হাঁ, আমার মা।'

'কি হয়েছে ?'

'এখন যায় তখন যায় অবস্থা।'

বুড়ি শুনেই নীল গোলা জল থেকে হাত তুলে নিলো ; তার আঙ্গুলের ডগা থেকে ফোঁটা ফোঁটা নীল জল গড়াতে থাকে। গলার স্বরেও হঠাৎ সহানুভূতির প্রলেপ, 'সত্যি এ রকম তাঁর অবস্থা ?'

'ডাক্তার তো রায় দিয়েছেন, আজকের বিকেলটাও নাকি পার হবে না।'

'তা হলে তো খুব খারাপ অবস্থা।'

হোনোর এবার আসল কথা পাড়তে দ্বিধা করে। কি ভাবে যে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করা যায়, এ সম্পর্কে অনেক রকম ভাবনা তার মগজে পাক খেতে থাকে। কিন্তু কোন কিছুই ঠিক না করতে পেরে আচমকাই বলে বসে, 'মা মারা না যাওয়া পর্যন্ত দেখাশুনা করতে কত নেবে তুমি ? জানোই তো, আমার অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল নয়। একজন চাকরকেও যা দেওয়া উচিত, তা দেবারও সামর্থ্য আমার নেই। আমার দারিদ্র্যের জন্যই মার আজ এই দুরবস্থা। বিরানব্বই বছর বয়সেও কী হাড়ভাঙ্গা খাঁটুনি না তাঁকে খাটতে হয়েছে—দশজন লোকের পরিশ্রম সে এই বয়সে একাই করেছে।'

লা ব্যাপেটের গম্ভীর গলা, 'আমি লোক বুঝে দু'ধরনের মজুরি নিয়ে থাকি। ধনীদের কাছে দাবী করি দিনপ্রতি চল্লিশ সাউচ্ ও রাতপ্রতি তিন ফ্রাঙ্ক হিসাবে। আর সাধারণ লোকদের কাছে আমার রেট হলো, দিনে কুড়ি সাউচ্ ও রাতে চল্লিশ সাউচ্। তোমার বেলায় এই দ্বিতীয় রেটটাই প্রযোজ্য হতে পারে।'

কিন্তু এই রেট চাষী লোকটার মনঃপূত হয় না। সে তার মাকে ভালোই জানে। জানে, তার মার জীবনীশক্তি কত বেশী—সহজে টেঁসে যাবার পাত্রী তিনি নন। ডাক্তার যাই বলুন, সপ্তাহখানেকের আগে চোখ তিনি বুজছেন না।

হোনোর তাই দৃঢ়স্বরে বলে 'না। আমি বরং চুক্তিবদ্ধ ভাবে তোমাকে

এককালীন কিছু থোক টাকা দিতে পারি, যার পরিবর্তে গোটা কাজটা তুমি করবে। ঝুঁকি এখানে দু'জনেরই। ডাক্তারের রায়, যে কোন মুহূর্তে রোগিণী মারা যেতে পারে। যদি তাই হয়, তুমি জিতবে এবং আমি হারবো। আর যদি মা কাল, পরশু বা আরো কয়েকদিন টিঁকে যায়, জিত হবে আমার, হার হবে তোমার।'

বুড়ি সেবিকা অবাক হয়ে চাষীটার দিকে চেয়ে থাকে। মানুষের মৃত্যু নিয়ে সে কখনো এ ভাবে জুয়া খেলেনি। মনে তার সংশয়। আবার হঠাৎ কিছু পেয়ে যাবার লোভটাও জেগে থাকে। তখন তার মনে হলো, লোকটা তো তাকে ঠকাবারও মতলব করতে পারে।

'তোমার মাকে না দেখা পর্যন্ত আমি কথা দিতে পারছি না।'

'বেশ, তা হলে চলো, তাকে দেখবে।'

ধোপানী হাত মুছে তার সঙ্গে রওনা দেয়। সারাটা পথ দু'জনের মুখে কোন কথা নেই। ধোপানীর হাঁটার গতি অতি দ্রুত। গুটি কয়েক গরু প্রচণ্ড দাবদাহে ক্লান্ত হ'য়ে মাটিতে শুয়ে ছিল। এদের পায়ের দপ্‌দপানিতে মাথা তুলে এমন ভাবে তাকায়, যেন তারা নতুন ঘাসের জন্য আর্জি পেশ করছে।

বাড়ির কাছাকাছি এসে হোনোর করুণ স্বরে বললো, 'বোধহয় এর মধ্যে সব শেষ হয়ে গেছে।'

তার অবচেতন মনের আশঙ্কা যেন ধ্বনিত হয় সেই স্বরে।

কিন্তু তার মা তখনো মৃত্যুর ধারে-কাছে পৌঁছাননি। পিঠ ঘুরিয়ে শুয়ে আছেন, অদ্ভুত শীর্ণ দুই হাত যেন কোন জন্তুর থাবার মতন দেখায়।

সেবিকা র‍্যাপেট পায়ে পায়ে বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, বুঝবার চেষ্টা করে রোগিণীর অবস্থাটা। সে তাঁর নাড়ি টেপে, বুক পরীক্ষা করে, শুনবার চেষ্টা করে হৃদ্‌পিণ্ডের ধুক্‌পুকানি। এক-আধটা কথা বলে ধরবার চেষ্টা করে, রোগিণীর কথা বলবার ক্ষমতা এখনো কতখানি। তারপর দীর্ঘক্ষণ রোগিণীর দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বাইরে চলে আসে। তার পিছন পিছন হোনোরও।

হোনোরের সন্দেহ হলো, বুড়ি মা বুঝি আজকের রাতেই টেঁসে যাবে।

সে জিজ্ঞেস করে, 'কেমন দেখলে?'

সেবিকা জবাব দেয়, 'হুম্, এখনো দু'দিন পরমায়ু, তিন দিনও হতে পারে। তুমি এককালীন ছয় ফ্রাঙ্ক দিলে বিবেচনা করতে পারি।'

হোনোর রীতিমত চেঁচিয়ে ওঠে: 'আরে বাস্। ছয় ফাঙ্ক! ছ-য় ফাঙ্ক! তোমার কি মাথা খারাপ? আমি বলছি, ও পাঁচ ছয় ঘণ্টার বেশী বাঁচবে না। বাঁচতে পারে না।'

চললো দু'জনের মধ্যে দর কষাকষি। দু'জনেই অনমনীয়। রফায় আসতে পারছে না।

'ঠিক আছে। শেষ মুহূর্তে হোনোরই যেন হার মানে, 'ছয় ফাঙ্কই দেবো, দেখাশোনা থেকে আরম্ভ ক'রে শবের জামা-কাপড় কাচা পর্যন্ত সব কিছুই করতে হবে।'

'করবো। ছয় ফাঙ্ক পারিশ্রমিক পেলে সবই করবো।'

হোনোর তাড়াতাড়ি তার জমিতে ফিরে যায়। ওখানে প্রচণ্ড রোদ্দুরে পেকে ঝুনো হ'য়ে যাচ্ছে তার ফসলগুলি।

সেবিকা এসে ঢোকে রোগিণীর ঘরে। সঙ্গে তার সেলাই করার জিনিস-পত্তরও রয়েছে। কারণ, যখনই সে কোন মৃত বা মৃতপ্রায়ের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে, তখন সে নিজের ও ঐ পরিবারের সকলের জন্যই অতিরিক্ত কিছু কাজ করে থাকে বাড়তি পয়সার বদলে।

হঠাৎ সে রোগিণীকে জিজ্ঞেস করে, 'মাদাম বনতেম্পস, আশা করি পুরোহিতকে আপনার কাছে আনা হয়েছিল?'

মাদাম বনতেম্পস মাথা নাড়লেন। ধর্মপ্রাণা ব্যাপেট সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে ওঠে: 'হা ভগবান। এমনও হয়। আমিই তবে যাই পাদরী ডাকতে।'

বলতে বলতে সে এক রকম ছুটতে থাকে বাজারের মধ্য দিয়ে। তার হাবভাব ও ঝড়ের গতি দেখে বাজারের লোকেরা ভাবে, নির্ঘাৎ কোথাও দুর্ঘটনা ঘটেছে।

•

পাদরীও দেরী না করে রওনা দিলেন। তাঁর পিছন পিছন গির্জার এক বালক-গায়ক ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে চলেছে, যেন সে গ্রামবাসীর কাছে ঈশ্বরের আগমন-বার্তা ঘোষণা করছে। অনেক দূরে যে সমস্ত লোকেরা কাজ করছিল, ঐ ঘণ্টা-ধ্বনি শুনে মাথার টুপি খুলে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দেখে,

পাদরীর সাদা দাড়ি ধীরে ধীরে একটি খামার বাড়ির আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে।

যে সব মেয়েরা ফসলের আঁটিগুলিকে জড়ো করছিল, তারা সোজা হয়ে দাঁড়ায় ও ক্রুশ আঁকে। একদল কালো মুরগি ভয় পেয়ে তাদের পরিচিত গর্তে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে। দড়িতে বাঁধা একটা বাচ্চা ঘোড়া আঁতকে উঠে বোঁ বোঁ চক্কর খেতে থাকে, শূন্যে-বাতাসে পা ছুঁড়তে থাকে। লাল ঘাগরা পরা গির্জার বালক-গায়ক চলেছে ছুটে ছুটে, আর পুরোহিতও একদিকে ঘাড় কাৎ ক'রে টুপি ঝুলিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় মন্ত্র পড়ছেন ও ছুটছেন। সবশেষে প্রার্থনার ভঙ্গীতে হাঁপাতে হাঁপাতে চলেছে র‍্যাপেট বুড়ি।

হোনোর ব্যবধানে থেকে সবই খেয়াল করেছে। একজনকে জিজ্ঞেস করে, 'ফাদার কোথায় যাচ্ছেন?'

জবাব আসে, 'তোমার মার অন্তিমকাল। তাই প্রার্থনা হবে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।'

হোনোর কিন্তু বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় না। বরং আপন মনেই ভাবে, 'ব্যাপারটা তবে বেশ জমেছে।' সে আবার মাঠের কাজে মন দেয়। মাদার বনতম্পেসের 'স্বীকারুক্তি'র পর পাদরী দলবল নিয়ে গির্জায় ফিরে যান। ঘরে তখন শুধু দুই বুড়ি।

র‍্যাপেট রোগিণীর সম্পর্কে নতুন ক'রে ভাবতে শুরু করে! আর কত সময় বেঁচে থাকবে ও?

দিন ফুরিয়ে রাত ঘনালো। ঝিরঝিরে মিষ্টি বাতাস বইতে থাকে। জানালার পর্দা, যা দিনের বেলায় ছিল সাদা, এখন দেখাচ্ছে হলুদ-হলুদ। বাতাসের আনাগোনায় ঐ পর্দা যেন এই রোগিণীর প্রাণবায়ুরই মতন মুক্তি-সন্ধানী।

তিনি শুয়ে আছেন, নিশ্চল, দুই চোখের পাতা খোলা, যেন পরম নির্বিকারে প্রতীক্ষা করছেন অনিবার্য অথচ, মন্থর মৃত্যুর জন্য। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর, গলার ভেতর থেকে ঠেলে আসছে শিসের মতন আওয়াজ। মনে তো হয়, কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যাবেন এবং এই পৃথিবী এমন একজন মহিলাকে হারাবে, যাঁর বিরুদ্ধে বলবার কিছুই থাকবে না।

রাতের বয়স বাড়ে। হোনোর ফিরে এলো। বিছানার কাছে গিয়ে দেখলো, তার মা তখনো বেঁচে আছেন। সে চিরাচরিত অভ্যাসবশতঃ

জিজ্ঞেসও করলো, 'কেমন আছো?' তারপর সে বুড়ি র‍্যাপেটকে বাড়ি পাঠাবার সময় স্মরণ করিয়ে দেয়, 'কাল আসবে—ঠিক সকাল পাঁচটায়।'

সত্যি, পরদিন দিনের শুরুতেই বুড়ি র‍্যাপেট এসে হাজির। হোনোর তখন নিজের হাতে তৈরি স্যুপ চাখছিলো। একটু পরেই আবার তাকে মাঠে যেতে হবে।

সেবিকা জিজ্ঞেস করে, 'মা এখনো বেঁচে আছেন?'

হোনোর মুচকি হাসে, 'অবস্থা একটু ভালোর দিকেই মনে হচ্ছে।' বলেই সে চলে গেল।

বুড়ি র‍্যাপেটকে হঠাৎ এক অস্বস্তিকর ভাবনায় পেয়ে বসে। সে ছুটে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে রোগিণীর মুখের ওপর। ঠিক তখনই প্রচণ্ড শ্বাসকষ্টের মধ্যে চোখ মেলে তাকান মুমূর্ষু মহিলা।

সেবিকার মনে হলো, এ দু'দিন বাঁচতে পারে, চারদিনও বেঁচে থাকতে পারে···এমন কি, আট দিনেরও পরমায়ু থাকা আশ্চর্যের নয়।···এবং ভয় এসে বিষণ্ণ মনকে জাপটে ধরে। ভীষণ ক্ষোভে সে কেঁপে ওঠে—হোনোর তাকে ঠকিয়েছে! খুব রাগ হয় ঐ বুড়ির ওপর—সহজে মরবার পাত্রী এ নয়!

তবু সে কাজ করে, প্রতীক্ষা করে মৃত্যুর সেই মাহেন্দ্রক্ষণের। তার দুই চোখ স্থির হ'য়ে আছে মাদার বনতেম্পসের অসংখ্য রেখাময় কোঁচকানো মুখের ওপর।

সকালে প্রাতঃরাশ সারতে আসে হোনোর। তাকে বেশ খুশী খুশী দেখাচ্ছে। খুব মজাদার অনুভূতি নিয়েই সে মাঠে যায়, কাজ করে,—তার ফসলগুলিকে সে যথেষ্ট ভালো অবস্থাতেই তুলতে পারছে।

বুড়ি র‍্যাপেট রাগে জ্বলে। পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে সময় বয়ে যায়, আর তার আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেয়। সে চাইছে, ভীষণ ভাবে চাইছে, এখনই ঐ বদ শক্তপ্রাণ বুড়িটার ঘাড়টা ধরে এক ঝাঁকানিতে খেল খতম ক'রে দিতে; এক ঝাঁকানিতেই অক্কা পেয়ে যাবে, সময় বাঁচবে, যন্ত্রণার লাঘব হবে, তারও আর্থিক লোকসান হবে না।

যতসব ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা র‍্যাপেটের মাথায় জটলা পাকাতে থাকে। বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, 'এই যে, শয়তানের দেখা এখনো পেয়েছেন?'

মাদার বনতেম্পস ক্ষীণ স্বরে উত্তর দেন: 'না।'

সেবিকা তখন এমন এক ভয়াল গল্প বলতে আরম্ভ করে, যা মুমূর্ষু মহিলার স্নায়ুর ওপর দারুণ চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। সে ব্যাখ্যা করে, মৃত্যুর প্রাক-মুহূর্তে মানুষ কি ভাবে শয়তানের দেখা পায়। শয়তানের এক হাতে থাকে ঝাঁটা, অন্য হাতে সস্‌প্যান। শয়তান এক বিচিত্র শব্দ তুলে এগিয়ে আসে। আপনি যদি তাকে কখনো দেখতে পান, তবে জানবেন ঐখানেই আপনার ইতি,—মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আপনার হৃদ্‌যন্ত্র অচল হ'য়ে যাবেই।

র‍্যাপেট বুড়ি শয়তান—দর্শনের গল্প বলতে গিয়ে অনেক মৃত মানুষের উপমাও টেনে আনে, ··যোসেফাইন লয়সেল, এউলেই রে'তার, সোফিয়া পঁগনান, সারফাইন গ্রসপিড ইত্যাদি প্রত্যেকেই মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তে পিশাচকে দেখতে পেয়েছিল।

বুড়ি র‍্যাপেটের গল্প শুনতে শুনতে মাদার বনতেম্পসের অসুস্থতা বেড়ে যায়। রোমাঞ্চিত তিনি বিছানা কুঁচকে দুই হাতে ভর দিয়ে উঠে দেখতে চাইলেন, এই ঘরের প্রত্যন্ত কোথাও পিশাচের আবির্ভাব ঘটেছে কিনা।

মওকা বুঝে র‍্যাপেট চকিতে ঘর ছেড়ে চলে যায়। আলমারি খুলে একখানা চাদর বের করে এবং তা দিয়ে নিজের সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখে। তারপর ঐ চাদরের নিচে জলসেদ্ধ করার একটা পাত্রকে এনে এমন ভাবে মাথা ও মুখে চেপে রাখে যে মনে হয়, বুঝি তার তিনটে শিং গজিয়েছে। তারপর ডান হাতে ঝাঁটা ধরে বাঁ হাতের জলের জাগটাকে সপাটে এমন ঝাঁপটা মারে যে উৎকট শব্দ তুলে জাগটা আছড়ে পড়ে মাটিতে।

সেই শব্দে ঘরের মেঝে অব্দি কেঁপে ওঠে। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারের ওপর পা দিয়ে রোগিণীর ঘরের ঝুলন্ত পর্দাটাকে টেনে নামায় র‍্যাপেট। মাথা ও মুখ আটকানো পাত্রে এক ধরনের বিচিত্র আওয়াজ করতে করতে সে এগিয়ে আসে রোগিণীর দিকে, ঠিক যেমন পুতুল-খেলায় শয়তানের মূর্তি নাচতে নাচতে এগিয়ে চলে।

অভাবনীয় আতঙ্কে মুমূর্ষু মহিলা বুঝি উন্মাদিনী। তাঁর ঠেলে বেরিয়ে আসা দুই চোখে বুনো দৃষ্টি। অমানুষিক দিশেহারা উত্তেজনায় তিনি উঠে বসেন ও পিশাচের হাত থেকে রেহাই পাবার প্রাণান্তকর চেষ্টা করেন। সেই ব্যর্থ প্রয়াসে তাঁর কাঁধ ও বুক বিছানার বাইরে ঝুলতে থাকে। তারপরই একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়েন। এবং সেটাই তাঁর অন্তিম নিঃশ্বাস।

বুড়ি র‍্যাপেট আবার সব জিনিস-পত্রাদি যথাস্থানে ঠিক-ঠাক করে রাখে। ঝাঁটাটা রাখে আলমারির এক কোণে, চাদরটা আলমারির ভেতরে, সেদ্ধ করবার প্যানটা স্টোভের ওপর, জলের জাগটা শেলফের ওপর এবং চেয়ারটা দেয়ালের বিপরীত দিকে। এরপর পেশাদারী নিপুনতায় সে মৃতার বিস্ফারিত চোখের দুই পাতা বুজিয়ে দেয়, পবিত্র পাত্র থেকে জল ঢেলে একটা ডিশ এনে রাখে বিছানার ওপর। সব শেষে প্রথাসিদ্ধ কায়দায় মৃতার আত্মার জন্য হাঁটু গেড়ে প্রার্থনায় বসে যায় সে।

রাতে ঘরে ঢুকেই হোনোর বুড়ি র‍্যাপেটকে ঐ ভাবে প্রার্থনা করতে দেখে। দেখে তার মনে প্রথমেই যে ভাবনা আসে, তা হলো—ইস্, বুড়িটা আমায় কুড়ি সাউ্চ্ ঠকালে। ও এখানে আছে মাত্র তিন দিন ও এক রাত, যার পারিশ্রমিক হওয়া উচিত পাঁচ ফ্রাঙ্ক, ছয় ফ্রাঙ্ক নয়।

হোরলা

[The Horla]

৮ই মে :

কী চমৎকার একটা দিন। সারাটাক্ষণ বাড়ির সামনে তৃণশয্যায় আমি শায়িত। মাথার ওপর অসংখ্য গাছ-গাছালির জমাট সমতল আচ্ছাদন, রয়েছি তাই ছায়াঘন নিরাপদ আশ্রয়ে।

এই জায়গাকে ভালোবাসি, এখানেই থাকতে ইচ্ছুক; কারণ, এই জমিতেই আমার যাবতীয় সত্তা, আত্মোপলব্ধি শিকড় গেড়ে আছে, কারণ, এখানেই আমার পূর্বপুরুষরা জন্মেছিলেন, মারাও গিয়েছিলেন—এর আকাশে বাতাসে তাঁদের স্মৃতি, তাঁদের প্রাত্যহিক দিনাতিপাত, কি ভাবে তাঁরা খেতেন, কি ভাবে চলাফেরা করতেন, স্থানীয় কোন বিশেষ ঢঙে তাঁরা বাক্যালাপ করতেন।

আমি আমার এই আবাসটিকে ভালোবাসি। আমি এখানেই জন্মে-ছিলাম। জানালা খুললেই দেখা যায়, আমাদের বাগানের গা ঘেঁষে, উঁচু

রাস্তার ওপিঠে, যেন প্রায় এ বাড়ির দরজা ছুঁয়ে প্রশান্ত হৃদয় নদী সীন, প্রবহমান রুয়েন থেকে হ্যাভরের দিকে, যে বহমান নদীর বুকে প্রতিনিয়ত চলমান মন্দাক্রান্তা নৌকাশ্রেণীও কম লক্ষণীয় নয়। বাঁ দিক ধরে অগ্রসর হলে বিশাল শহর রুয়েন, যেখানকার গথীক রীতির বহু ঘণ্টাঘরের মধুর ঘণ্টাধ্বনি প্রতিদিন সকালে আমার মনে আনন্দের স্বগত স্বাদ বয়ে আনে।

এই সকাল কী মনোরম!

বেলা এগারোটা নাগাদ মাছির মতন ছোট্ট বিন্দুপ্রায় একটা পিঠউঁচু বোট সাঁ সাঁ কষ্টকর প্রশ্বাসে ধোঁয়া উদ্গীরণ করতে করতে চলে গেল। ঐ বোটটারই পিছনে একটার পর একটা নৌকা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে যেন আমাদের দরজার পাশ দিয়ে স্রোতের অনুকূলে হারিয়ে যেতে থাকে। এরপর ভেসে আসে দুটি পালতোলা ইংরেজ নৌকা, যাদের রক্তাভ পতাকা বুঝি আকাশকে স্পর্শ করেছে; তারপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় ব্রাজিল থেকে আগত একটি 'থ্রি মাষ্টার' জাহাজের ওপর—শ্বেতবর্ণ অপূর্ব তার চাকচিক্য। ঐ জাহাজের দিকে চেয়ে মুগ্ধ না হ'য়ে পারি না। এবং কেন জানিনা, কোন আবেগ ও আনন্দের বশবর্তী হ'য়ে আমি সহসা সেই জাহাজকে অভিবাদন করে বসলুম!

১১ই মে :

গত কয়েকদিন যাবৎ জ্বর জ্বর ভাব। শরীর অসুস্থ। তার চেয়েও বড় কথা, মনের দিক থেকে অসুখী বোধ করছি।

জানিনা, কখন কোন রহস্যজনক শক্তি আমাদের মনকে আনন্দ থেকে টেনে নিয়ে যায় বিষণ্ণতার দিকে, আত্মবিশ্বাস থেকে হতাশার কোলে। মনে হয়, বুঝি অদৃশ্য বাতাসে রয়েছে সেই অজানা ক্ষমতা, যার নৈকট্য আমরা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি।

আমি আনন্দে জেগে উঠেছিলাম; আমার গলা থেকে বেরিয়ে আসছিল গানের সুর। কেন? আমি নেমে গিয়েছিলাম জলের কিনার অব্দি; এবং তারপর সামান্য পায়চারির পর ঘরে ফিরবার সময় এই দুর্বলতা আমাকে পেয়ে বসে— যেন কি এক ভয়াবহ ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে আমার জন্য।

কেন এমন হলো? কেন একটা হিমেল কম্পন আমার ত্বকের ওপর দিয়ে আলতো ভাবে বয়ে গেল, কেন স্নায়ুরা কেঁপে উঠলো এবং কেন আমার

উৎসাহ নিভে গেল অন্ধকারে? মেঘের আকৃতি, দিনের আলো, পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর নিয়ত পরিবর্তনশীল রঙের বাহার কি চোখের সামনে দিয়ে পার হ'য়ে যাবার সময় আমার ভেতর এই মানসিক বিপর্যয় ঘটিয়ে গেছে? কেউ কি ব্যাখ্যা করতে পারে এই রহস্যের কারণ? যে সব বস্তু আমাদের ঘিরে আছে, যাদের আমরা খোলা চোখে দেখতে পাই না, যারা আমাদের অজ্ঞাতে সঞ্চরণশীল, যাদের স্পর্শ আমরা সূক্ষ্ম অনুভূতিতে ধরতে পারি, আকস্মিক ভাবে যাদের প্রভাবে আমরা প্রভাবান্বিত—তারাই রয়েছে এই শরীরের প্রতিটি অংশে, ওদেরই মাধ্যমে চিন্তা-ভাবনা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত।

অদৃশ্য এই শক্তির রহস্যময়তা কী গভীর।

মানুষের দুর্বল স্নায়ু এমন গভীরতা পরিমাপ করতে পারে না। আমাদের চোখ খুব বড় বা খুব ছোট, বা অনেক দূরের, বা অনেক কাছের জিনিসকে সনাক্ত করতে পারে না। চিনতে পারে না নক্ষত্রের বাসীন্দাদের; দেখতে পায় না এক বিন্দু জলের মধ্যে বাস করছে যে সমস্ত জীবরা আমাদের কর্ণকুহর শুধু জানিয়ে দেয় বাতাসের অনুরণন, যা এক বিশেষ ধ্বনিময় রূপে প্রতিভাত। ঐ অনুরণিত ধ্বনিই প্রকৃতির সংগীত আমাদের ঘ্রাণশক্তি কুকুরের চেয়েও দুর্বল আর আমাদের স্বাদ বড়জোর মদের বয়স পরিমাপ করতে পারে।

তবু যদি আমাদের অন্যান্য অঙ্গগুলি এদেরই মতন কর্মক্ষম হতো, তবে হয়তো আমরা আবিষ্কার ক'রে ফেলতুম, কারা আমাদের ঘিরে রেখেছে।

১৬ই মে:

আমি নির্ঘাৎ অসুস্থ। গত মাসেও কত সুস্থ ছিলুম। জ্বর হয়েছে, ভয়াক্রান্ত জ্বর অথবা, বলা যায় এক ধরণের জ্বরাক্রান্ত বিহ্বলতা আমার মনকে ও দেহকে পীড়ন করছে। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে অজানা কোন বিপদের আশঙ্কা করছি—অসুস্থতার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুভয়ও অনিবার্যভাবে আমার রক্তে ও মাংসে বীজাণু ছড়িয়ে দিচ্ছে।

১৮ই মে:

ঘুম নেই। ডাক্তার ডেকেছিলুম। তিনি দেখলেন, নাড়ি চঞ্চল, চক্ষু বিস্ফারিত, স্নায়ু উত্তেজিত অথচ কোন বিশেষ রোগের লক্ষণ নাই। আমাকে 'ডুশ' নিতে হবে এবং স্নায়ু ঠাণ্ডা রাখার জন্য পটাশিয়াম জাতীয় ব্রোমাইড পান করতে হবে।

২৫শে মে :

কোন পরিবর্তন তো দেখছি না। আমার অসুখটা সত্যি অদ্ভুত! রাত ঘনাবার সঙ্গে সঙ্গে অদম্য এক অস্বস্তি আমাকে গ্রাস করে,—মনে হয়, রাত বুঝি কোন ভয়াবহ পরিণতি গোপন ক'রে রেখেছে আমার জন্য। আমি খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিই; তারপর আমি পড়বার চেষ্টা করি। কিন্তু কোন শব্দের অর্থ ই বুঝতে পারি না; শুধুমাত্র অর্থহীনভাবে কতগুলি অক্ষরকে চিনতে পারি মাত্র। সেই হেতু, বৈঠকখানায় আগু-পিছু পায়চারি করতে থাকি; মনের মধ্যে এমন এক বিচিত্র ভয়, যার হাত থেকে কোনক্রমেই রেহাই নাই। ঘুমিয়ে পড়তে ভয় পাই, বিছানা আমার কাছে এক আতঙ্ক।

ঘড়িতে যখন কাঁটায় কাঁটায় দশটা, আমি আমার ঘরে ঢুকি।

ঘরে ঢুকেই দরজায় দুটো তালা লাগাই, জানালাগুলি বন্ধ করি। আমি তখন ভয় পাচ্ছি…কিন্তু কাকে? আগে কখনো এত আতঙ্কগ্রস্ত হইনি… আলমারিটা খুলে দেখি… বিছানার নীচে উঁকি মারি, কান পেতে থাকি… শুনতে পাই…কি শুনতে পাই?

এ এমন এক বিচিত্র শরীরকে বিকল করা অসুস্থতা, এমন ভাবে স্নায়ুর ওপর চেপে বসা উত্তেজনা, এমন ভাবে শরীরের কোন কোন অংশে অস্বাভাবিক রক্তসঞ্চয়, যা পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষকেও বিষণ্ণ ক'রে তোলে, সবচেয়ে সাহসী লোকটিও পরিণত হয় ভীরুতে!

তখন আমি শুয়ে আছি, প্রতীক্ষা করছি মৃত্যুর মতন ঘুমের। অপেক্ষা করি, ভয় পাই। আমার বুক কাঁপে, পা কাঁপে। বিছানায় ঢাকা গোটা শরীর ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে। তারপর হঠাৎ এক সময় ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমিয়ে পড়ি গভীর ও নিশ্চল জলে ডুবন্ত মানুষের মতন। আমি কখনো অনুভব করতে পারিনি, এই বিশ্বাসঘাতক ঘুম এক সময় আমাকে অধিকার করবে, কাছাকাছি এসে ওৎ পেতে থাকবে, আমার ওপর নজর রাখবে, মাথাটাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলবে, চোখের পাতা বুজিয়ে দেবে, আমার শক্তি হরণ করবে!…

আমি ঘুমিয়ে থাকি—দীর্ঘ সময় ধরে—দু-তিন ঘণ্টা ধরে—তারপর এক স্বপ্ন—না,—এক দুঃস্বপ্ন আমার ওপর চেপে বসে। অনুভব করতে পারি, শুয়ে আছি ও ঘুমিয়ে আছি…এবং আমি এ-ও অনুভব করি, কে যেন আমার

ঘনিষ্ঠ হয়েছে, বিছানায় উঠে বসেছে, হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারছে আমার বুকে, দু'হাতে আমার ঘাড় পাকড়ে চাপ দিচ্ছে সমানে চাপ দিচ্ছে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে নিষ্পেষিত করছে আমাকে।

পাগলের মতন চেষ্টা করি নিজেকে মুক্ত করতে, এক ভয়ানক অসহায়তায় আমি অসাড়। চীৎকার করে উঠতে চাই—পারিনা, নড়াচড়ার চেষ্টা করি—সম্ভব হয় না, প্রচণ্ড আতঙ্কে সর্বশক্তি দিয়ে পাল্টা চাপ দিয়ে এই আক্রমণকারী জীবটাকে কাবু করে ফেলতে চাই—সক্ষম হই না।

তারপর সহসা আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়, আতঙ্কে ঘামে একেবারে জবজবে। একটা মোমবাতি ধরাই। আমি একা।

প্রতি রাত্রির অভিশাপ এ ভাবেই শেষ হয়। এরপর আমি গভীর ঘুমে ডুবে যাই এবং ভোর না হওয়া পর্যন্ত সেই ঘুম ভাঙ্গে না।

২রা জুন :

অবস্থা এখনো পূর্ববৎ। কি হয়েছে আমার? ব্রোমাইড সেবন বৃথা। 'ডুশ' নিয়ে কোন ফল পাইনি।

শারীরিক দিক থেকে প্রায় ভেঙে পড়া আমি কিছুক্ষণের জন্য বেড়াই পাবার জন্য রুমেয়ারের বনে প্রবেশ করি। প্রথমে ভেবেছিলাম, ঘাস ও বনের সতেজ সুবাসবাহী মুক্ত অমল মিষ্টি বাতাস আমার ধমনিতে নতুন রক্তের স্রোত বইয়ে দেবে, মনে আসবে নতুন বল। বনের মধ্যবর্তী অনেকটা ফাঁকা জায়গা সেই আশায় পার হয়ে আসি, তারপর হাঁটতে শুরু করি বভিলির দিকে। দুধারে ঘন সংবদ্ধ বিরাট বিরাট গাছ, তাদের সবুজ ও ঘোর কালো আচ্ছাদন যেন আমার ও আকাশের মধ্যে ব্যবধান রচনা ক'রে আছে।

হঠাৎ আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে,—হিমেল কম্পন নয়, তীব্র শারীরিক যন্ত্রণার সঙ্গে ভয়জনিত শিহরণ। এই বিশাল বনভূমিতে দাঁড়িয়ে কেঁপে উঠি অহেতুক ভয়ে। নিজের একাকীত্ব বড় প্রকট। সহসা মনে হলো, কে বুঝি খুব ঘনিষ্ঠ থেকে আমাকে অনুসরণ করছে, সে যেন এত কাছে যে, যে কোন মুহূর্তে আমাকে ছুঁয়ে দেবে।

চারিদিকে চোখ বোলাই। আমি একা। পিছনে অভাবনীয় শূন্যতা। যতদূর নজর যায়, সেই বিরাট শূন্যতা। আমি চোখ বুজি। কিন্তু কেন? চোখ বুজে গোড়ালির উপর ভর দিয়ে লাট্টুর মতন পাক খেতে থাকি। প্রায়

পড়ে গিয়েছিলাম আর কি। আবার চোখের পাতা খুলে তাকাই। গাছ-গাছালি নর্তনরত। আন্দোলিত পৃথিবী। আমি বাধ্য হলাম বসে পড়তে। তারপর—ওহ্। আমি যে খেয়ালই করিনি, এতক্ষণ কোন পথ ধরে হেঁটেছি। অদ্ভুত চিন্তা! আশ্চর্য! বিচিত্র ভাবনার গতি! এই মুহূর্তে কিছুই স্থির করতে পারছি না। ডান-হাত বরাবর চলতে শুরু করি এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আবিষ্কার করি, আমি আবার সেই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি, যেখান থেকে চলা শুরু করে বনের একেবারে মাঝখানে পৌঁছে গিয়েছিলাম।

৩রা জুন:

রাত ভয়াল।

কয়েক সপ্তাহের জন্য বাইরে চলে যাচ্ছি। এই সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ নিশ্চয় আমাকে স্বাভাবিক ক'রে তুলবে।

২রা জুলাই:

আবার ফিরে এসেছি নিজের আবাসে। আমি সুস্থ। বিরামের দিনগুলি ছিল আনন্দঘন। গিয়েছিলাম এক অচেনা জায়গায়—মণ্ট-সেণ্ট-মিচেল। গোধূলি লগ্নে ওখানে গেলে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়। শহরটা ঢালু জমির বুকে শুয়ে আছে। আমি প্রথমেই গিয়েছিলাম শহরের প্রান্তে এক বাগানে, যার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সবিস্ময়ে শব্দ ক'রে উঠেছিলাম।

সামনে বিশাল বিস্তৃত উপসাগর—দৃষ্টির বাইরে লীন হয়ে গেছে। সোনালী আকাশের নীচে এই সীমাহীন হলুদ বর্ণ সাগরের বুক চিরে মাথা উঁচিয়ে আছে এক অদ্ভুত পাহাড়, যার দেহ অন্ধকার এবং চূড়া যেন আকাশস্পর্শী। সবে সূর্য অস্ত গেছে, দিগন্ত জুড়ে এখনো স্বর্ণাভ আলোর রেশ। এ বড় আশ্চর্য মুহূর্ত!

দিনের শুরুতে ঐ ছোট ছোট ঢেউয়ে হিল্লোলিত সমুদ্রের ধারে গিয়েছিলাম। ওখানে যাবার পর দেখতে পেলাম, দূরে এক মস্ত উঁচু মঠ দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক ঘণ্টার পথ পাড়ি দিয়ে আমি সেই পাথুরে প্রাসাদের ওপরে গিয়ে দাঁড়ালাম। এই বিশাল গির্জা যেন এই ছোট্ট শহরটাকে পরিচালনা করে। সিঁড়ির পর সিঁড়ি ভাঙ্গতে থাকি। ঘুরতে থাকি গথিক রীতির বিচিত্র এক ঐশ্বরিক প্রাসাদে, আয়তনে যা বুঝি একটা শহরের সমান, অসংখ্য ঘর, থাক থাক উঠে গেছে বহু দীর্ঘ গ্যালারি। গ্রানাইট পাথরে তৈরি রত্ন-খচিত ফিতের মতন চকচকে সেই সব চত্বরে আমি ঘুরে বেড়াই; দিনের নীল

আকাশ ও রাতের কালো আকাশ যেন এখানকার স্তম্ভগুলির সঙ্গে যুক্ত, যে স্তম্ভগুলির নল-মুখে হরেক রকম প্রতিমূর্তি—কোনটা শয়তানের মুখ, কোনটা বা বিচিত্র-দর্শন পশুর।

গির্জার শীর্ষে দাঁড়িয়ে পাদরীকে বললাম, 'ফাদার, কী চমৎকার জায়গায় আপনি থাকেন!'

'এখানে সব সময়ই খুব হাওয়া'—তিনি জানালেন।

আমরা কথা বলছি। তখন সমুদ্র ছুটে এসে বালুবেলা ভিজিয়ে দিল, যেন বালিয়াড়ি ঢেকে গেল এক ষ্টিলের বর্মে। পাদরী এই জায়গার অনেক পুরনো গল্প শোনালেন, যেগুলি সর্বার্থেই লৌকিক উপাখ্যান। গল্পগুলির মধ্যে একটিকে বেশ আকর্ষণীয় মনে হয়। স্থানীয় উঁচু এলাকার বাসীন্দারা বলে থাকে, তারা নাকি রাত্রে ঐ বালুবেলা থেকে ভেসে আসা এক জোড়া ছাগলের ভ্যা ভ্যা ডাক শুনতে পায়! প্রথম ছাগলের ডাকটা বেশ জোরে, দ্বিতীয়টির স্বর কিছুটা ক্ষীণ। অবিশ্বাসীদের অভিমত, ঐ ডাক সামুদ্রিক পাখির, কখনো কখনো যাদের আওয়াজ ছাগলের চীৎকার বলে মনে হয়, কখনো বা মনে হয় মানুষের বিলাপ। কিন্তু রাত্রে মাছ মারতে যাওয়া জেলেরা গল্প করে, তারা নাকি বালিয়াড়িতে এক বৃদ্ধ পশুচারককে দেখেছে দুই স্রোতের মধ্যবর্তী এলাকা ধরে ছোট্ট শহরকে প্রদক্ষিণ করতে। তারা কেউ কোনদিন ওর মাথা দেখতে পায়নি, মাথাটা নাকি ঢাকা থাকে ঢিলে পোশাকে; পশুচারকের পিছন পিছন চলেছে দুটো অদ্ভুত ছাগল,—যাদের একটার মুখ মানুষের, অপরটার মানবীর; দুটোরই সর্বাঙ্গ ঢাকা সাদা লোমে; বিজাতীয় ভাষায় তারা দুটিতে কথা বলে; আচমকা আচমকা সজোরে ডেকে ওঠে!

'আপনি এই গল্প বিশ্বাস করেন?'

—আমি পাদরীকে জিজ্ঞেস করি।

ক্ষীণ স্বরে বলেন 'জানি না।'

'যদি তাই হয়', আমি বলতে থাকি, 'তা হলে পৃথিবীতে ঐ জাতীয় বিচিত্র জীবের অস্তিত্বও আমাদের মেনে নিতে হয়। অথচ, কেন তবে এতকাল আমরা তাদের সন্ধান পাইনি? আপনি নিজে কেন তাদের দেখেননি? কেন আমি নিজে আজ অব্দি তাদের আবিষ্কার করিনি?'

তিনি জবাব দিলেন. 'আপনি কি দুনিয়ার শত-শত হাজার-হাজার সব

বস্তুকেই চেনেন? ধরুন, এই বাতাসের কথাই,—প্রকৃতির সবচেয়ে বড় শক্তি এই বাতাস, যা মানুষকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে, বাড়ি-ঘর ভেঙ্গে তছ্‌নচ্‌ ক'রে দেয়, গাছগুলিকে মূলসমেত উপড়ে ফেলে, সমুদ্রকে ঠেলে তুলে দেয় পাহাড়ের ওপরে, পাহাড়কে গুঁড়িয়ে দেয়, বড় বড় জাহাজগুলিকে নিয়ে আছড়ে দেয় তীরভূমিতে—বাতাস, যা হত্যা করে, যা শিস দেয়, আর্তনাদ ছাড়ে, গর্জন করে—আপনি কি সেই পরম শক্তিমান বস্তুকে কখনো দেখেছেন, নিজের চোখে দেখতে পান? অথচ তার অস্তিত্ব বাস্তব।'

এই সরল যুক্তির সামনে আমি নীরব। এই মানুষটি হয় সত্যদ্রষ্টা নচেৎ, উন্মাদ। তাঁর কথায় খুব একটা নাড়া আমি খাইনি; আমি আমার মানসিক স্থৈর্যকে ধরে রেখেছি; কিন্তু এখন তাঁর কথা থেকে থেকে মনে আসছে।

৩রা জুলাই:

ঘুম গভীরই হলো।

কিন্তু কি আশ্চর্য—এ বাড়ির কোচোয়ানকেও আমার মতন জ্বর জ্বর অসুস্থতায় পেয়ে বসেছে! গতকাল এখানে এসেই আমি ওর অদ্ভুত পাণ্ডুরতা লক্ষ্য করেছি।

'কি হয়েছে তোমার?'—আমি জানতে চেয়েছি।

'এই ক'দিন আমি একদম শান্তি পাইনি, স্যার। দেখুন, আমি ঘরের দু'দিকেই মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখেছি। আপনি চলে যাবার পর আমি ঐ আলো সরিয়ে নিতে সাহস পাইনি।' আর সমস্ত চাকর বাকরা বহালতবিয়তেই রয়েছে। কিন্তু আবার আমাকে সেই আতঙ্ক এসে গ্রাস করছে।

৪ঠা জুলাই:

নিশ্চিতভাবেই আবার আক্রান্ত আমি। পুরনো দুঃস্বপ্নগুলি ফিরে আসছে। গত রাত্রিতে মনে হয়েছিল, কোন এক পাশবশক্তি বুকের ওপর চেপে বসেছে; আমার মুখ দিয়েই সে তার কাজ করছে। আমারই ঠোঁট দিয়ে জোঁকের মতন সে আমার জীবনীশক্তি, রক্ত শুষে নিচ্ছে। একসময় সে উঠে দাঁড়ায়, আমি নিজেকে পূর্ণভাবে ফিরে পাই। শরীরটা খণ্ড-খণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে গেছে, নড়তে চড়তে পারছি না। এমন অবস্থা যদি আরো কিছুদিন চলে, আবার পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আমার আর গত্যন্তর থাকবে না।

৫ই জুলাই :

আমি কি আমার বুদ্ধি বিবেচনা হারিয়ে ফেলেছি? গত রাত্রির বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা মনে করলে মাথা ঘোরে। প্রতি সন্ধ্যার মতন কালও আমি আমার ঘরের দরজা বন্ধ করেছিলাম; তারপর তেষ্টা পাওয়ায় এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেলাম। মনে আছে, স্ফটিক কাঁচের পাত্রে তখন অনেকখানি জলই বর্তমান ছিল। এরপর শোবার পর যথারীতি সেই ভয়ানক দুঃস্বপ্ন এবং ঘণ্টা দুয়েক সেই দুঃস্বপ্নের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রে কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসি, আমার তন্দ্রাচ্ছন্নতা কেটে যাচ্ছে। একবার কল্পনা করুন, একটি লোক ঘুমন্ত অবস্থায় খুন হচ্ছে এবং সে বিছানায় উঠে বসেছে বুকে আমূলবিদ্ধ ছুরি নিয়ে, গলায় মৃত্যুকালীন ঘড় ঘড় শব্দ, সর্বাঙ্গ রক্তাপ্লুত, শ্বাস নিতে অপারগ, মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত, বোধশক্তি নাই—ঠিক এমন এক অনুভূতি!

এই অবস্থার ঘোর কাটিয়ে উঠবার পরই আবার আমার পিপাসা জাগে। একটা মোমবাতি ধরিয়ে টেবিলের ওপর রাখা জলের পাত্রটার দিকে অগ্রসর হই। ওটা তুলে গেলাসের ওপর উবুড় করি; এক ফোটা জলও গেলাসে গড়িয়ে পড়ে না! এটা শূন্য। একেবারে শূন্য! প্রথমে আমার কিছুই মনে হয়নি; তারপরই চকিতে প্রচণ্ড আতঙ্কে এমন শিউরে উঠি যে বসে পড়তে বাধ্য হই; অথবা, বলতে পারি, আমি যেন একটা চেয়ারের ওপর পড়ে গেলাম। তারপর আবার উঠে দাঁড়াই, চারিদিকে দৃষ্টি বোলাতে থাকি। আবার বসে পড়ি, বিস্ময়ে আতঙ্কে ঐ জলের স্ফটিক পাত্রটার দিকে চেয়ে আমি যেন হারিয়ে যাচ্ছি। স্থির চোখে ওটার দিকে চেয়ে এই রহস্যের উত্তর খুঁজছি। হাত কাঁপছে। কেউ কি আমার জলটা খেয়ে গেছে? কে? আমি? নিশ্চয় আমি। আমি ছাড়া আর কে হবে? তাহলে আমি এক স্বপ্নচারী। কেউ জানে না, কী রহস্যময় দ্বৈত জীবন নিয়ে আমি বেঁচে আছি! তবে কি আমার সত্তাও দুটো? অথবা, এই অবচেতন মনকে অধিকার ক'রে নিয়েছে অন্য এক অদৃশ্য শক্তি, যার নির্দেশে এই দেহ স্বাভাবিক অবস্থার চেয়েও অনেক বেশী তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে! হায় রে, কে আর বুঝবে আমার এই ভয়ানক দুরবস্থার কথা? কে বুঝবে আমার মতন প্রকৃতিস্থ, সুশিক্ষিত যুক্তিবাদী মানুষ আতঙ্কে নীল হ'য়ে যাচ্ছে তার জলের পাত্রের দিকে চেয়ে, যে পাত্রের জল তার ঘুমিয়ে থাকার কালে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে?

আমি বিছানায় ফিরে যেতে ভয় পেলাম। দিনের আলো না ফোটা অব্দি ঠায় বসে রইলাম ঐ চেয়ারে।

৬ই জুলাই :

আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।

গত রাত্রে আবার আমার জলের পাত্র শূন্য। অথবা, আমিই ওটাকে শূন্য করেছি। কিন্তু সত্যি কি তাই? সত্যি কি আমি-ই করেছি? কে করতে পারে? কে? ওহ, ঈশ্বর! আমি সত্যি সত্যি পাগল হ'য়ে যাবো? কে আমায় বাঁচাবে?

১০ই জুলাই :

অদ্ভুতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। শুনুন।

৬ই জুলাই শুয়ে পড়বার আগে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রেখেছিলাম মদ, দুধ, জল, রুটি এবং কতগুলি স্ট্রবেরি ফল।

তারপর মাঝ রাত্তিরে কেউ একজন অথবা, আমার ভোগেই লেগেছে ঐ জল ও দুধ। মদ, রুটি বা স্ট্রবেরিগুলিতে এতটুকু ছোঁয়া লাগেনি।

৭ই জুলাই ঐ একই পরীক্ষা চালিয়ে এই প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছি।

৮ই জুলাই জল ও দুধ রাখিনি। অন্য কোন কিছুতেই সেদিন ছোঁয়া লাগেনি।

শেষে ৯ই জুলাই জল ও দুধ রেখে পাত্র দুটিকে সাদা মসলিনের টুকরোয় শক্ত করে বেঁধে ফেললাম। তারপর নিজের ঠোঁট ও দাঁড়িতে রঙ মাখালাম, হাতেও মাখলাম কাঠকয়লার কালি। এসব করে শুয়ে পড়ি বিছানায়। যথারীতি শক্তিমান ঘুম আমাকে হরণ করে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই উপস্থিত হয় সেই অনিবার্য ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন।…ঘুম ভাঙবার পর খেয়াল করি, আমার বিছানায় কোন ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন নাই, তেমনিই পরিপাটি ক'রে পাতা। ছুটে গেলাম টেবিলটার দিকে। ঠিক তেমনি ঢাকা রয়েছে জল ও দুধের পাত্র, সাদা কাপড়ে কোন দাগ নাই। আমি বাঁধনটা খুলে ফেলি এবং সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ আতঙ্ক। সবটুকু জল, সবটুকু দুধ নিঃশেষ। হা ভগবান!

আমি এখনই চলে যাচ্ছি প্যারিসে।

১৩ই জুলাই :

প্যারিস!

গত কয়েকদিনের ধকলে আমার চিন্তাশক্তি বিকল। নিশ্চয় আমি এলোপাথাড়ি কল্পনার শিকার হ'য়ে গেছি; আমি সত্যিই স্বপ্নে চলাফেরা

করি অথবা প্রায়শ্চিত্তের অতীত কোন মারাত্মক মানসিক অসুস্থতা গ্রাস ক'রে ফেলেছে আমাকে।

যাই হোক, বদ্ধ পাগল হ'তে বেশী দেরী ছিল না। এখন প্যারিসে একা দিন কাটাবার পর মানসিক স্থৈর্য অনেকটা ফিরে পেয়েছি।

গত সন্ধ্যায় ইতি-উতি ঘুরবার পর 'থিয়েটার ফ্রান্সাইসে' গিয়েছিলাম ছোট ডুমার লেখা একটি নাটক দেখতে। নাটকের বুদ্ধিদীপ্ত বলিষ্ঠ বক্তব্য আমার যুক্তি ও ভাবনাকে আবার সতেজ ও শানিত করে। সন্দেহ নেই একাকীত্ব যে কোন কর্মক্ষম মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক। আমরা আমাদের চারপাশে মানুষেরই সঙ্গ চাই—যে মানুষরা চিন্তা করে ও কথা বলে। দীর্ঘকাল নিঃসঙ্গ থাকবার ফলেই মনের ওপর ভৌতিক প্রতীতি জাল বিছাবার সুযোগ পায়। দু'পাশে সারি সারি গাছের মধ্য দিয়ে প্রশস্ত রাস্তা বেয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। সদা তৎপর মানুষের ভিড়ে দাঁড়িয়ে নিজের ভয়ের কথা ভাবতে বেশ মজাই লাগছিল। সত্যি, আমাদের মস্তিষ্ক ও স্নায়ু কত সহজেই পরিবেশের চাপে বেসামাল হ'য়ে পড়ে!…

১৪ই জুলাই :

আজ জাতীয় মুক্তি দিবস।

আমি চলেছি রাস্তা দিয়ে। উৎসব মুখর জনতার বাজি পোড়ানো ও পতাকা নাড়ানো আমার ভেতর শিশুসুলভ উল্লাসের সঞ্চার করে। জনতার মানসিকতা বড় বিচিত্র—তারা কখনো অহেতুক সংযত, কখনো বা হিংস্র বিপ্লবী। আপনি ওদের বুঝিয়ে বলুন : আনন্দ করো। ওরা উল্লাসে ফেটে পড়বে।

আপনি তাদের উত্তেজিত করুন : প্রতিবেশীকে আক্রমণ করো। ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে প্রতিবেশীর ওপর।

আপনি তাদের রাজি করান : রাজাকে ভোট দাও। তারা রাজাকেই ভোট দেবে।

আবার উল্টোটি বোঝান : রিপাব্লিককে ভোট দাও। ওরা নির্ঘাৎ রিপাব্লিককে সমর্থন জানাবে।

জনতার শাসকরা প্রায়শই মত্তপ, পশুবৎ ; তারা মানুষকে মানার চেয়ে মানে কতগুলি নীতিকে—যে নীতি বহুলাংশে ভুল ও ভাঁওতা। এই দুনিয়ায়

কিছুই যখন স্থির ও নিশ্চিত নয়, এমন কি আলো ও শব্দও যখন মায়া, তখন তথাকথিত প্রশংসিত ও প্রতিষ্ঠিত নীতির কি মূল্য থাকতে পারে ?

১৬ই জুলাই :

গতকাল আমার জীবনে এক অভাবনীয় অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে, যার প্রভাবে আমি এখনো বিভ্রান্ত। কাল ডিনার সারতে গিয়েছিলাম খুড়তুতো বোন মঁ সেলবের বাড়িতে। সেলবের স্বামী লিমোজ ৭৬তম 'লাইট হর্স' বাহিনীর সেনাপতি।

ঐ বাড়িতেই দু'জন যুবতীকেও দেখতে পেলাম। তাদের একজনের স্বামী ডঃ পেরেণ্ট, যিনি চিকিৎসা ও গবেষণা করছেন স্নায়ুর রোগ ও সংবেশন সংক্রান্ত সাম্প্রতিক আশ্চর্য আবিষ্কারের ওপর। ভদ্রলোক এ ব্যাপারে ইংরেজ বিজ্ঞানী ও নান্‌কি স্কুলের ডাক্তারদের বিচিত্র সমস্ত গল্প শোনাচ্ছিলেন।

গল্পগুলি আকর্ষণীয় নিঃসন্দেহে; আমি আমার নিজের উপলব্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্য খোঁজার চেষ্টা করছিলাম।

"আমরা এখন" তিনি ঘোষণা করলেন, 'প্রকৃতির গূঢ়তম রহস্য আবিষ্কার করতে চলেছি। এটাকে এই পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রহস্যও বলা চলে। যতদিন থেকে মানুষ ভাবতে শিখেছে, মনের ভাব ব্যক্ত করতে পারছে, ততদিন থেকেই সে এক অতি সূক্ষ্ম রহস্যের সন্ধান পেয়েছে, যাকে যথার্থভাবে অনুধাবন করতে সে আজো ব্যর্থ। মানুষ তার শারীরিক অক্ষমতা পূরণ করার চেষ্টা করে বুদ্ধি দিয়ে। কিন্তু যতদিন এই বুদ্ধিও প্রাথমিক স্তরে রয়েছে, ঐ অজানা রহস্য তাকে দারুণ ভয় দেখাবে। এভাবেই ভৌতিক ব্যাপার-ট্যাপার, পরী-টরীর গল্পগুলি লোক সমাজে এত প্রাধান্য পেয়ে আসছে। আমি আরো বলছি, এই যে আমাদের ঈশ্বর-বিশ্বাস, এটাও আমাদের দুর্বল মানসিকতা, অপরিপক্ক বুদ্ধি ও ভয়াচ্ছন্ন-অসহায়তার ফলশ্রুতি! এ ব্যাপারে ভলতেয়ারই হক কথা বলে গেছেন: ঈশ্বর তাঁর নিজের মূর্তিতে মানুষকে গড়েছেন; আবার মানুষও এর প্রত্যুত্তর দিচ্ছে ঈশ্বরকে নিজেদের ইচ্ছামতন রূপ দিয়ে।"

"কিন্তু গত এক শতাব্দীরও কিছু বেশী কাল যাবৎ আমাদের সামনে নতুন জ্ঞানের এক ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্ছে। বিশেষতঃ চার-পাঁচ বছরের মধ্যে এই গবেষণায় অনেক আশ্চর্য ফল আমরা পেয়েছি।"

ডাক্তারের কথায় আমার মতন আমার খুড়তুতো বোনেরও বিশ্বাস নেই।

সে মুচকি মুচকি হাসছে। ডঃ পেরেণ্ট তার দিকে চেয়ে বলেন, 'কি মাদাম, দেবো নাকি আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে?"

'দেখুন চেষ্টা করে।'

বোন উঠে গিয়ে একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে, ডাক্তার এক দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে তাকিয়ে সম্মোহিত করার চেষ্টা করছেন। হঠাৎ কেমন এক অস্বস্তিবোধ আমাকে পেয়ে বসে; বুক কাঁপে, গলা শুকিয়ে যায়! চোখের সামনে ম' সেলবের দ্রুত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করছি—তার চোখের পাতা ক্রমশ ভারী ও মুখের ভেতর থেকে হেঁচকি উঠছে এবং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর।

দশ মিনিটের মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

'আপনি ওর পিছনে গিয়ে বসুন।'

—ডাক্তার আমাকে বললেন।

আমি সম্মোহিত নারীর পিছনে গিয়ে বসি।

ডাক্তার ওর হাতে পিস্‌বোর্ডের একখানা ভিজিটিং কার্ড গুঁজে দিয়ে বলেন, 'আপনার হাতে আমি একখানা আয়না দিলুম। এর মধ্য দিয়েই আপনি সব দেখতে পাবেন। বলুন তো, এখন কি দেখতে পাচ্ছেন?' ঘুমন্ত জবাব দেয়, 'আমি আমার দাদাকে দেখতে পাচ্ছি।'

'কি করছেন তিনি?'

'গোঁফে তা দিচ্ছেন।'

'এখন?'

'পকেট থেকে একখানা ফটো বের করেছেন।'

'কার ফটো?'

'তাঁর নিজের।'

ঠিক ঠিক বলে যাচ্ছে সে। এই ফটোখানা আজই সকালে আমি পেয়েছি!

আবার ডাক্তারের প্রশ্ন, 'ফটোতে উনি কি করছেন?'

'টুপি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন।'

সামান্য একখণ্ড পিস্‌বোর্ড কি আয়না হ'য়ে গেল! আশ্চর্য! যা বলছে, হুবহু সত্যি!

অন্য দুই যুবতী ইতিমধ্যেই যথেষ্ট ভয় পেয়েছে, তারা সমস্বরে বাধা দেয়, 'বন্ধ করুন, এ খেলা বন্ধ করুন!'

কিন্তু ডাক্তারের ভ্রূক্ষেপ নাই, অবিচল তাঁর নির্দেশ উচ্চারিত হয়, 'কাল সকাল আটটায় আপনার একবার ঘুম ভাঙবে। তখন আপনি আপনার দাদার হোটেলে গিয়ে তাঁর কাছে পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক ধার চাইবেন। টাকাটা আপনার স্বামীর খুব দরকার।'

এরপর ডাক্তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলেন।

হোটেলে ফিরবার সময় ঘটনাটাকে মনে মনে পর্যালোচনা করে দেখি। একবার মনে হলো, ব্যাপারটা চালাকি। যদিও আমি আমার বোনকে ছোটবেলা থেকে চিনি, মনে হয়, ডাক্তারের সঙ্গে চুক্তি ক'রে সে আমাকে বেওকুফ বানাবার তালে আছে। ডাক্তার ঐ ভিজিটিং কার্ডটা দেবার সময় হয়তো একখণ্ড আয়নাও সেলবের হাতে গুঁজে দিয়েছিলেন এবং তাতেই বাজি মাৎ। পেশাদার যাদুকররা যা করে, আপাতভাবে সবই তো অদ্ভুত মনে হয়!

হোটেলে ফিরে বিছানা নিলুম।

পরদিন সকাল সাড়ে আটটায় হোটেলের লোক আমাকে ডেকে তোলে।

'স্যর, মঁ সেলব নামক এক মহিলা আপনার সাথে এখনই দেখা করতে চান।'

আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসি। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে সেলবের সঙ্গে দেখা করি। তার চোখে মুখে উদ্বেগ-উত্তেজনা, দৃষ্টি আনত; অবগুণ্ঠন না তুলে বলে, 'তোমার কাছে খুব জরুরী দরকারে এলাম।'

'কি দরকার?'

'তুমি ছাড়া আর কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারবে না। দরকার—খুব দরকার, পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক আমাকে ধার দাও।'

'তোমার দরকার?'

'হাঁ; আমার অথবা, আমার স্বামীর। উনিই তো এই টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন।'

বিস্ময়ে ও সংশয়ে আমি বিভ্রান্ত। ডঃ পেরেণ্ট আর আমার খুড়তুতো বোন নিখুঁত অভিনয় ক'রে আমাকে বোকা বানাচ্ছে না তো?

কিন্তু ওকে আরো গভীর দৃষ্টিতে দেখবার পর আমার মন থেকে সংশয় দূর হয়। পরিষ্কার বুঝতে পারি, ওর এই দুশ্চিন্তা ও আকুলতা অকৃত্রিম।

অথচ, সেলব যথেষ্ট স্বচ্ছল পরিবারের গৃহিণী! বললাম 'কি বলছো!

তোমার স্বামী মাত্র পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক জোগাড় করতে পারলেন না? ভালোভাবে চিন্তা ক'রে দেখো—সত্যি কি তিনি ধার চেয়েছেন?'

কয়েক মুহূর্তের জন্য তার ভেতর দ্বিধা ও সংশয় দোলা দিয়ে যায়, সে যেন প্রচণ্ড চেষ্টা করছে তার স্মৃতিকে ফিরে পাবার জন্য; তারপর বলে, 'হাঁ-হাঁ…আমি নিশ্চিত।'

'তিনি কি তোমাকে লিখে পাঠিয়েছেন?'

আবার তার দ্বিধা। আমি দেখেছি, দারুণ মানসিক কষ্ট হচ্ছে যেন তার। সে যথার্থই কিছু মনে করতে পারছে না। সে শুধু জানে, তাকে তার স্বামীর জন্য পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক ধার করতেই হবে!

শেষে মরীয়া হ'য়ে মিথ্যাই বলে বসে, 'হাঁ, তাঁর চিঠি আমি পেয়েছি।'

'কিন্তু কখন? তুমি তো কাল এ সম্পর্কে কিছু বলোনি।'

'আজ সকালেই চিঠি পেলাম।'

'আমাকে দেখাতে পারো?'

'না-না-না;…এটা খুবই গোপনীয়…একান্ত ব্যক্তিগত…আমি…আমি ঐ চিঠি পুড়িয়ে ফেলেছি।'

'তা হলে তোমার স্বামী নিশ্চয় বাজারে ধার দেনা করে ফেলেছেন।'

'আমি জানি না।'

হঠাৎ আমি কঠিন গলায় বলে উঠি, 'এই মুহূর্তে তোমাকে আমি পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক ধার দিতে পারছি না।'

আমার কথায় অস্থির বিলাপে ককিয়ে ওঠে সে, 'ও, দোহাই তোমার, টাকাটা যে করে হোক আমাকে দিতেই হবে।'

উত্তেজনায় কাঁপছে, করুণ আর্তিতে দুই হাত তুলে যেন ভিক্ষা চাইছে সে।

আমার দয়া হয়।

'আচ্ছা আমি দেবো, কথা দিচ্ছি।'

'কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো তোমায়,' দারুণ স্বস্তিতে চীৎকার ক'রে ওঠে সে, 'কত দয়া তোমার।'

'তুমি কি মনে করতে পারছো,' আমি বলি, 'গত সন্ধ্যায় তোমার বাড়িতে কি ঘটেছিল?'

'হাঁ।'

'তোমার কি মনে আছে, ডঃ পেরেণ্ট তোমাকে ঘুম পাড়িয়েছিলেন ?'

'হঁ্যা।'

'বেশ। তবে শোনো, ঐ ডাক্তারই তোমাকে হুকুম করেছিলেন, আজ সকালে আমার কাছে এসে পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক ধার চাইতে। এবং এখন তুমি সেই নির্দেশই পালন করতে এসেছো।'

সে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে বলে, 'ওসব বুঝি না। আসল কারণ হলো, টাকাটা আমার স্বামীর দরকার।'

এক ঘণ্টা ধরে তাকে আমি বোঝাবার চেষ্টা করি ; পারি না।

সে চলে যাবার পরই আমি সোজা ডাক্তারের বাড়িতে গিয়ে হাজির হই।

তিনি সেইমাত্র বাইরে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, আমার কথা শুনে মৃদু হাসলেন।

বললেন, 'এখন নিশ্চয় বিশ্বাস করছেন ?'

'অবিশ্বাসের উপায় নাই।'

'চলুন, আপনার বোনকে দেখে আসি।'

দু'জনে গিয়ে দেখি ম'সেলব গভীর ঘুমে ডুবে আছে। সারা শরীরে তার ক্লান্তি।

ডাক্তার ওর নাড়ির গতি দেখলেন, কিছুক্ষণ মুখের দিকে চেয়ে থেকে সম্মোহন-শঙ্কিত চোখের পাতা এক হাতে মেলে ধরে ঘুমন্ত যুবতীকেই বলতে থাকেন, 'শুনুন, আপনার স্বামীর আর পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্কের প্রয়োজন নেই। আপনি ভুলে যান যে, আপনার দাদার কাছে টাকাটা ধার চেয়েছিলেন। এ সম্পর্কে উনি যদি কোন কথা বলেন, আপনি ঘটনাটা মনেই করতে পারবেন না।'

এরপর ডাক্তার ম'সেলবের ঘুম ভাঙ্গালেন।

আমি আমার পকেট থেকে একটা নোট-বুক বের ক'রে ওকে বলি 'দেখো, আজ সকালে তুমি আমাকে কি সব বলে এসেছো।'

সেলব এমন অবাক হ'য়ে যায় যে আমি নিজে অপ্রতিভ বোধ করি আমি অবশ্য ওর স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ও দারুণ ভাবে অস্বীকার করলো ঘটনাটা। ভাবলো, আমি বুঝি ওর সঙ্গে ইয়ার্কি মারছি। শেষ অব্দি রেগে গিয়েছিল পর্যন্ত।

হোটেলে ফিরে এসেছি এরপর।

গোটা ব্যাপারটা আমার মনে এমন ঝড় তুললো যে, আমি দুপুরের খাবার পর্যন্ত খেতে পারিনি।

১৯শে জুলাই :

বহু লোককে আমি এই অদ্ভুত গল্প শুনিয়েছি। তাঁরা আমার বিহ্বলতাকে উপহাস করেছেন। জানিনা, এ সম্পর্কে আর কি ভাববার আছে। বিজ্ঞ মানুষ রায় দেবেন : হতেও পারে !

২১শে জুলাই :

বুগিভেলে ডিনার সেরেছি। স্থানীয় এক ক্লাবে সন্ধ্যাটা কাটালুম। সব কিছুই স্থান ও ব্যক্তিনির্ভর। গ্রেনৌলির দ্বীপে বসে ভূতে বিশ্বাস করা বিরাট মূর্খতার সামিল।...কিন্তু মন্ট-সেন্ট-মিচেলের চূড়ায় বসে ?...অথবা, ইণ্ডিসের দ্বীপমালায় ? পারিপার্শ্বিক পরিবেশ আমাদের ভয়ানকভাবে প্রভাবিত করে।

সামনের সপ্তাহে বাড়ি ফিরে যাবো।

৩০শে জুলাই :

বাড়ি ফিরেছি গতকাল। সব কিছুই যথাযথ।

২রা আগস্ট :

কিছুই অবিস্মৃত নয়। চমৎকার আবহাওয়া। সারাটা দিন বহমান নদী সীনের দিকে চেয়ে আছি।

৪ঠা আগস্ট :

বাড়ির চাকর-বাকরদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধেছে। কে নাকি রাত্রে আলমারিতে রাখা গ্লাসগুলিকে ভেঙেছে। আমার নিজস্ব পরিচারক দোষ দিচ্ছে বাবুর্চিকে ; বাবুর্চি দুষছে ঝিকে ; আর ঝি অপরাধের বোঝা চাপাচ্ছে অপর দু'জনের ঘাড়ে। অপরাধী কে ? খুব শক্তিশালী বুদ্ধিমান লোকের পক্ষেই সেই অপরাধীকে খুঁজে বের করা সম্ভব !

৬ই আগস্ট :

এবার কিন্তু আমি প্রকৃতিস্থ।

কিন্তু আমি দেখেছি...আমি দেখেছি দেখেছি...আর কোন সন্দেহ নেই ...আমি দেখেছি...এখনো আমার হাড়গুলি হিম হ'য়ে আছে—এখনো মজ্জায় মজ্জায় ভীতি...আমি দেখেছি !...

দুপুর দুটোর সময় গোলাপ-বাগানের পরিচর্যা করছিলুম। চারিদিকে ঝক্‌ঝকে দিনের আলো।...শারদীয় আমেজে গোলাপগুলি সদ্য প্রস্ফুটিত। বিশেষতঃ তিনটে পাশাপাশি অপূর্ব ফুটন্ত গোলাপ সহজেই নজর কাড়ে। আমি ওদের দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। সহসা পরিষ্কার দেখতে পেলাম, ঐ গোলাপ তিনটের একটার ডাঁট ধরে কোন এক অদৃশ্য হাত নাড়াচ্ছে। পরক্ষণে ফুলটি বৃন্তচ্যুত। এর পরের দৃশ্য আরো অবিশ্বাস্য। গোলাপটি শূন্যে দুলতে দুলতে যেন কোন অদৃশ্য মুখগহ্বরের দিকে এগিয়ে চলেছে। মৃদু বাতাসে হেলছে-দুলছে ফুলটি, অথচ এটি বৃন্তচ্যুত,—আমার কাছ থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরত্বে এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য !

হঠাৎ আমার বুকের মধ্যে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল, রক্তে মরীয়া ভাব, হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে আমি প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ি শূন্যে দোদুল্যমান ফুলটাকে লক্ষ্য করে। অথচ, কোন কিছুর সঙ্গেই আমার ছোঁয়া লাগলো না। ফুলটা অদৃশ্য।

ঠিক এই মুহূর্তে আতঙ্কের বদলে নিজেরই ওপর রাগে জ্বলে উঠি। নিজেরই ওপর প্রতিশোধ নিতে চাই। কোন যুক্তিবাদী মানুষের কখনো এ রকম মতিভ্রম হয় না।

কিন্তু এটা কি সত্যিই মতিভ্রম ?

চকিতে ঘুরে আবার ফুল-বনের দিকে তাকাই। বিস্ময়ের অন্ত নেই। বৃন্তচ্যুত গোলাপটি আর দুটি গোলাপ-চারার পাশে ঝোঁপের ওপর পড়ে আছে।

তখন আপন মনে বিড় বিড় করতে করতে ঘরে ফিরে আসি ; ঠিক বুঝতে পারছি, কিবা দিন, কিবা রাত—আমার পাশে পাশে এক অদৃশ্য জীব চলেছে। সে দুধ ও জল খেয়ে বেঁচে থাকে, সে যে কোন বস্তুকে স্পর্শ করতে পারে এবং একস্থান থেকে অন্য স্থানে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

৭ই আগস্ট :

নির্বিঘ্নে ঘুমিয়েছি। সে আমার পাত্র থেকে জল পান করেছে, কিন্তু ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়নি। ভাবছি, সত্যি কি পাগল হয়ে গেলাম ?

কখনো কখনো খোলামেলা ফুটফুটে দিনের আলোয় ইতস্তত পায়চারি করতে করতে নিজের মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে গভীর সংশয় জাগে।

জীবনে রকমারি পাগল দেখেছি। দেখেছি, অনেক বুদ্ধিমান, স্বচ্ছ

ধারণার মানুষ, যাদের আপাতভাবে স্বাভাবিক মনে হলেও, কোন কোন ব্যাপারে তাদের অস্বাভাবিকতা প্রকট হয়ে ওঠে। তারা স্বাভাবিক ও সতেজ স্বরে কথা বলতে বলতে অকস্মাৎ খেই হারিয়ে ফেলে, মানসিক অসুস্থতার কঠিন স্তরের দিকে ধেয়ে যায়; তাদের মগজ তখন এলোমেলো বাতাসে বিক্ষুব্ধ সমুদ্র যেন, কুয়াশাচ্ছন্ন অস্পষ্টতায় তাদের বোধশক্তি আর্তনাদ করে—যে অবস্থাকে আমরা এক কথায় বলি 'পাগলামি।'

যদি আমি আমার এই সাম্প্রতিক মানসিক বিপর্যয় সম্পর্কে সচেতন না থাকতুম, তা হলে আমাকেও ঐ পাগলদেরই পর্যায়ভুক্ত করা যেত। নিজের মন ও ভাবনাকে এই যে যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করছি, এটাই তো প্রমাণ করে—আমি এখনো উন্মাদ হইনি।

কিন্তু মস্তিষ্কে নির্ঘাৎ কোন অজানা অস্বাভাবিকতা এসে ভর করেছে, যে সম্পর্কে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা এখনো কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। এই অস্বাভাবিকতা আমার মনের যুক্তিনিষ্ঠ-ভাবনায় এক শূন্যতার সৃষ্টি করেছে।...আমার মগজ-নিয়ন্ত্রণকারী কোন স্নায়ু কি হঠাৎ বিকল হয়ে গেল?—

কখনো কখনো দুর্ঘটনার পর মানুষের স্মৃতিভ্রংশ ঘটে। আমার বেলায় সে রকম তো কিছু ঘটেনি। তবে কেন এই মানসিক বৈকল্য?

নদীর ধারে হাঁটতে হাঁটতে ইত্যক ভাবনায় ভাবিত। সূর্যের পর্যাপ্ত আলোতে নদীর জল ঝিকিমিকি; পৃথিবী এখন বড় সুন্দর: পৃথিবীর সৌন্দর্য জীবনের প্রতি আমার ভালোবাসাকে গভীরতর করছে। যেদিকেই তাকাই, সেই আনন্দের উৎস...নদী-তীরবর্তী তৃণভূমির শন্ শন্ শব্দ আমার কানে শ্রুতিমধুর লাগে।

কিন্তু এই স্বস্তি ক্ষণিকের।

কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পাই, উত্তেজনা বাড়ছে, অস্বস্তি ও বিকার ফেনিয়ে উঠছে,—সেই গূঢ় শক্তি বিকল করে দিচ্ছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, নিশ্চল পদযুগল।...

এখন আমি বড় অসুখী,...যেন কোন প্রিয়জনকে অসুস্থ অবস্থায় একলা ঘরে ফেলে রেখে এসেছি এবং সেই অসুস্থতা ক্রমশই খারাপের দিকে।

সুতরাং নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ফিরে চলি ঘরের দিকে। আশঙ্কা, ওখানে হয়তো অশুভ বার্তাবাহী কোন চিঠি বা তারবার্তা দেখতে পাবো।

বাস্তবে অবশ্য সে রকম কিছুই হলো না। এই মুহূর্তে অত্যাশ্চর্য কিছু না ঘটলেও আমার বিস্ময় ও বিভ্রান্তি বেড়েই চলে!

৮ই আগস্ট:

গত রাতটিও ছিল শঙ্কাপূর্ণ।

যদিও 'সে' আত্মপ্রকাশ করেনি, তার নৈকট্য অনুভব করেছি। টের পেয়েছি, সে আমাকে গুপ্তচরের মতন অনুসরণ করছে, আমার মনে অনুপ্রবেশ ক'রে খুশিমতো আমাকে পরিচালনা করতে চাইছে। নিজেকে লুকিয়ে রেখে এই অলৌকিক প্রভাব বিস্তার কী ভয়ঙ্কর!

যাই হোক, ঘুম হয়েছিল।

৯ই আগস্ট:

ঘটনা কিছুই ঘটেনি। তবু ভয়ের হাত থেকে রেহাই নেই।

১০ই আগস্ট:

কিছু হয়নি। কালকের দিনটা কেমন যাবে?

১১ই আগস্ট:

এখনো কোন ব্যাপার ঘটেনি। কিন্তু এত ভয় আর দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে এই বাড়িতে বসে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি চলে যাবো।

১২ই আগস্ট:

রাত দশটা।

সারাটা দিন কেবল ভেবেছি—চলে যাবো, চলে যাবো। অথচ, যেতে পারিনি। মুক্তি পাবার এই সহজ উপায়ে পালিয়ে যাবার অদম্য ইচ্ছা আমার ছিল! অথচ, তা বাস্তবায়িত করতে পারিনি। কেন?

১৩ই আগস্ট:

এ রকম মানসিক ও শারীরিক অবসাদে যে কোন মানুষের শরীর ভেঙ্গে পড়বে, উৎসাহ নিভে যাবে, পেশী শিথিল হ'য়ে পড়বে, হাড়গুলি নরম হতে হতে মাংসে পরিণত হবে এবং মাংস গলতে গলতে জল হ'য়ে যাবে।

আর আমার এখন ঐ রকমই বিপর্যয়কর অবস্থা। আমার আর শক্তি নাই, সাহস নাই, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ নাই—এমন কি, স্ব-ইচ্ছারও মৃত্যু ঘটেছে। নিজের নয়, অপরের ইচ্ছাতেই কাজ করে যাচ্ছি।

১৪ই আগস্ট:

আমি শেষ হয়ে গেছি।

আমার আত্মা দখল ক'রে নিয়েছে অন্য কেউ একজন এবং আমি তার আজ্ঞাবাহী দাস মাত্র। আমার যাবতীয় কাজ-কর্ম, চলা-ফেরা, চিন্তা-ভাবনা নিয়ন্ত্রণ করছে সে। আমিত্ব হারিয়ে নিছক দর্শকে পরিণত হয়েছি। নিজেরই কাজ দেখে শিউরে উঠি। ইচ্ছে হয়, বাইরে যাই। পারি না। কারণ, 'সে' তা চায় না। এবং আমি বুঝি তারই নির্দেশে হাতল-ওয়ালা এক চেয়ারে বসে ঠক ঠক ক'রে কাঁপছি।

আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবার চেষ্টা করি, উঠে দাঁড়াতে চাই। কিন্তু পারি না। এমন ভাবে নিথর হ'য়ে বসে থাকি, যেন দুনিয়ার কোন শক্তিই আমাকে ধরতে পারে না।

তারপর হঠাৎই, যেন আমাকে যেতেই হবে, এমন এক উদগ্র তাগিদে বাগানে ছুটে যাই এবং কতগুলি স্ট্রবেরি ফল তুলে খেতে শুরু করি। হা ঈশ্বর! ঈশ্বর! কোথায় তুমি ঠাকুর! সত্যি কি তুমি আছো? যদি থেকে থাকো, আমাকে সাহস দাও, আমাকে রক্ষা করো, আমাকে সাহায্য করো! ক্ষমা করো। দয়া করো। করুণা করো।

কী দারুণ কষ্ট পাচ্ছি। আমার ওপর কী অত্যাচার চলেছে। কী ভয়াবহ!

১৫ই আগস্ট:

ভাবুন, আমার খুড়তুতো বোন কেমন অপরের ইচ্ছার খপ্পড়ে পড়েছিল, যখন সে আমার কাছে ছুটে এসেছিল পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক ধার চাইতে। সে তখন অপরের ইচ্ছা, অপরের অভ্যাস ও অপরের আত্মার কাছে সমর্পিতা। পৃথিবীর আয়ু কি এ ভাবেই ফুরিয়ে আসছে?

কিন্তু আমি এখন কোন অদৃশ্য শক্তির দাস? এই অজানা জীব, এই আগন্তুক এসেছে নিশ্চয় কোন অতিপ্রাকৃত সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে।

তার অর্থ, অদৃশ্য জীবরা বর্তমান। কিন্তু তাই যদি হয়, সৃষ্টির প্রথম থেকেই তারা কেন নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি, যেমন আজ পারছে তাদের একজন আমাকে কব্জা ক'রে ফেলতে?

এ বাড়ির ছাদের নীচে যা সব ঘটছে, আমি কোনদিন কোন বইতে তার হদিশ পাইনি! একমাত্র যদি এই আবাস ত্যাগ করি, বহুদূরে কোথাও পালিয়ে যাই এবং কোনদিন ফিরে না আসি, তবেই রেহাই পেতে পারি। কিন্তু আমি তা পারছি না।

১৬ই আগস্ট :

আজ ঘণ্টা দুয়েকের জন্ম মহার্ঘ মুক্তির স্বাদ অনুভব করেছি। আমার তখন এমন অবস্থা, যেন কোন বন্দী হঠাৎ কয়েদখানার দরজা খোলা পেয়ে পালিয়ে এসেছে। সহসাপ্রাপ্ত এই সৌভাগ্য অতুলনীয়। নিরন্ত্র অসহায়তা অতিক্রম ক'রে এখন আমি নিজেকে খুঁজে পাচ্ছি!

সহিসকে হুকুম করি : গাড়ির সাথে ঘোড়া যুতে দাও। আমি রুয়েন যাবো।

আহা। দুঃখের কুম্ভীপাক থেকে মুক্ত আমি পূর্বতন মেজাজে হুকুম করতে পারছি : রুয়েন চলো। আরো উল্লাস, আমার হুকুম সঙ্গে সঙ্গে তামিল হলো।

গাড়ি উড়িয়ে হাজির হলাম রুয়েনে। রুয়েনের পাঠাগারে ঢুকে ডঃ হারমেন হেরেস্টাসের অদৃশ্য জীবের ওপর লিখিত গবেষণামূলক বইখানা সংগ্রহ করি।

তারপর গাড়িতে উঠে আমি নিজস্ব মেজাজেই বলতে গেলুম : চলো স্টেশান।

কিন্তু সেই হুকুমের বদলে আমার বুকের কন্দরে এক অসহায় আর্তনাদ কেঁপে কেঁপে ওঠে, আমি কঁকিয়ে উঠি : বাড়ি চলো।

সেই মুহূর্তে আমি আবার ভূতাবিষ্ট। গভীর হতাশার সঙ্গে টের পাই, আবার সেই অমোঘ অদৃশ্য শক্তি আমাকে দখল ক'রে নিচ্ছে।

১৭ই আগস্ট :

আহ, কী নিঃঝুম বিচিত্র রাত।...রাত একটা পর্যন্ত পড়ে উঠলাম। দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের গবেষক ডঃ হারমেন হেরেস্টাস্ অদৃশ্য এমন সব জীবের কথা এই বইতে লিপিবদ্ধ করেছেন, যারা মানুষের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে অথবা, বেঁচে আছে মানুষেরই মনে। হারমেন এদের উৎপত্তি, অবস্থান ও ক্ষমতার বর্ণনা দিয়েছেন।

কিন্তু এদের কেউই আমার ওপর চেপে বসা অদৃশ্য জীবটার মতন নয়। এই বিশেষ জীবটি মানুষের চেয়েও শক্তিমান এবং মানুষকে হটিয়ে তারাই এই পৃথিবীতে রাজত্ব কায়েম করবে। যেহেতু তাকে দেখা যায় না, সুতরাং সে একের পর এক ভয়াবহ কাণ্ড-কারখানা ঘটিয়ে মানুষের আত্মরক্ষার শক্তিকে নিঃশেষ ক'রে দেবে।

হাঁ, যা বলছিলাম—রাত একটা অব্দি চললো আমার পড়াশুনা। তারপর খোলা জানালার সামনে বসে থাকি নিজের উত্তপ্ত মস্তিষ্ক ও চিন্তাকে শীতল করবার জন্য।

মনোরম উষ্ণ পরিবেশ। অন্যদিন হলে এমন একটি রাতের জন্য আমার আবেগ উজাড় ক'রে দিতুম।

চাঁদ নাই। ছায়াবগুণ্ঠিত কালো আকাশের বুকে তারার দল কাঁপে ও ঝিকিমিকি করে। কারা থাকে ঐ তারাদের জগতে? ঐ সব সজীব গ্রহ-পিণ্ডের ভেতর জৈব-অজৈব বিবর্তন সম্ভব? ওখানে কি জীবন্ত প্রাণীদের অস্তিত্ব আছে? গাছ-পালা জন্মায়? ওদের জ্ঞানের পরিধি কতদূর?

হয়তো এমন একদিন আসবে, যখন কোন নক্ষত্রের অভিনব বাসীন্দারা মহাকাশ পাড়ি দিয়ে হাজির হবে পৃথিবীকে জয় করতে, যেমন দূর অতীতে নর্মানরা সমুদ্র অতিক্রম ক'রে দুর্বল দেশগুলিকে অধিকার ক'রে নিতো।

এই রকমই ভাবতে ভাবতে গরমে-ঠাণ্ডায় মেশা রাত্রির মনোরম বাতাসে মাথা পেতে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম হলো প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে। তারপর হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গে, চোখ মেলে আমি নিশ্চল। ভাবছি, এই চল্লিশ মিনিটের মধ্যে কোন কি অদ্ভুত ঘটনা এ ঘরে ঘটে গেছে?

প্রথমে কিছুই নজরে আসে না।

তারপর হঠাৎ খেয়াল হলো,—টেবিলের ওপর রাখা বইখানার পাতা আপনা থেকেই ওল্টানো রয়েছে। জানালা থেকে আসা বাতাসের পক্ষে ঐ ভাবে পাতা উল্টে রাখা আদৌ সম্ভব নয়। বিস্মিত বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকি, আরো কিছু প্রত্যক্ষ করবার প্রত্যাশা করি।

প্রায় চার মিনিট পর দেখলাম, আমি দেখলাম, হাঁ, আমি স্বচোক্ষে দেখলাম, বইটার আর একটি পাতা এমন ভাবে ওল্টানো হলো যেন কোন অদৃশ্য আঙুল পাতাটাকে এখনো ধরে আছে।

টেবিলের সামনে চেয়ারটা শূন্য, কেউ বসে নেই।

কিন্তু আমি বিলক্ষণ টের পাই, 'সে' ওখানে রয়েছে, বসে আছে আমার জায়গায় ও বইখানা পড়ছে।

ঠিক তখনই আমার ভেতর স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক হিংস্র বন্য পশু জেগে ওঠে, বেপরোয়া আমি দুই হাত বাড়িয়ে ধেয়ে যাই ঐ টেবিল-চেয়ারের দিকে। অদৃশ্য 'তাকে' আমি চেপে ধরবো নখর আঙুলে, খতম করবো, খুন করবো।

কিন্তু আমি ওখানে পৌঁছে যাবার আগেই চেয়ারটা ডান দিকে সামান্য নড়ে ওঠে ; অর্থাৎ সে পালিয়ে যাচ্ছে। দপ্ করে নিভে গেল মোমবাতিটা, দুম ক'রে বন্ধ হ'য়ে গেল জানালার কপাট। পালিয়েছে। এই অন্ধকারের সুযোগে শয়তানটা নির্ঘাৎ পালিয়ে গেল।

সে ভয় পেয়েছে। ভয় পেয়েছে আমাকে। হাঁ, আমাকেই।

তা হলে…তা হলে…আগামীকাল…অথবা, তার পরদিন…অথবা, যে-কোন একদিন আমি তাকে ঠিকই পাকড়াতে পারবো, আছড়ে মারবো মাটিতে।

সময় সময় কুকুর কি তার প্রভুকেও কামড়ায় না এবং তখন ভয়ে প্রভু কি পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন না ?

১৮ই আগস্ট ঃ

সারাটা দিন ধরে ভেবেছি।

হাঁ, আমি তাকে মেনে চলবো, তার ইচ্ছা ও বাসনা অনুযায়ী কাজ করবো, নিজেকে আরো অসহায় ও সমর্পিত ক'রে তুলবো। সে অধিকতর বলশালী। কিন্তু—তারপর এমন একটা সময় ও সুযোগ আসবে·

১৯শে আগস্ট ঃ

বুঝেছি…এতদিন যা ছিল অনায়ত্ত, তাকে এনেছি আয়ত্তে…সব জেনেছি।

সদ্য 'রিভ্যু দ্যা মণ্ড সান্টিফিক্' পত্রিকায় খবরটা পড়লাম ঃ

"রিও-ডি-জেনিরো থেকে অদ্ভূত এক সংবাদ আমাদের দপ্তরে এসে পৌঁছেছে। এক ধরনের উন্মাদ রোগের মড়ক লেগেছে ব্রাজিলের স্যান পোলো জিলায় ভীত ত্রস্ত নর-নারীরা, আক্রান্তজনরা দলে দলে পালিয়ে যাচ্ছে তাদের এতদিনকার ক্ষেত-খামার, গ্রাম, বাড়ি-ঘর ইত্যাদি ছেড়ে।

আক্রান্তরা কবুল করছে, কি এক অদৃশ্য জীব এসে নাকি চড়াও হচ্ছে তাদের ওপর ; অধিকার করছে মন ও শরীর—দুই-ই। অদৃশ্য শক্তির ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে রোগীরা। তারা যখন ঘুমিয়ে পড়ে, অদৃশ্য জীবরা তখন মানুষের শরীর থেকেই নিজেদের খাদ্য সংগ্রহ করে। দুধ ও জলের প্রতি এই জীবদের একমাত্র আসক্তি, অন্য কোন ধরনের খাবার তারা স্পর্শও করে না।

"প্রফেসর ডন পেড্রো হেনরিকুইজ কয়েকজন চিকিৎসক-সহকারী সহ স্যানা-পোলোর উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন রোগের রহস্য উদ্ধার করতে…"

বটে। এই ব্যাপার।

হাঁ, আমার মনে পড়েছে,—গত মে মাসের আট তারিখে আমার বাড়ির পাশ দিয়ে সীন্ নদী বেয়ে একখানা অপূর্ব ব্রাজেলিয়ান থ্রি-মাষ্টার্স সাদা রঙের জাহাজকে পাড়ি জমাতে দেখেছিলাম। আমি ঐ জাহাজের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ না হ'য়ে পারিনি। কিন্তু তখন নিশ্চয় এই অদৃশ্য দুশমনটা দাঁড়িয়ে-ছিল থি-মাষ্টার্সের পাটাতনে। সেও আমাকে দেখেছিল; দেখেছিল ঐ জাহাজেরই মতন মনোরম সাদা রঙের আমার বাড়িখানাকে। দেখে ওর লোভ হয়েছিল এবং চক্ষের নিমেষে জাহাজ ছেড়ে লাফিয়ে পড়েছে মাটিতে, হিংস্র উল্লাসে এগিয়ে এসেছে আমার দিকে।

হা ঈশ্বর।

এখন আমি বুঝেছি। রত্ন-সমুজ্জ্বল মানুষের রাজত্বকাল শেষ হয়ে এলো।

আমাদের আজ ঘোর বিপদ। সর্বনাশ উপস্থিত মানব জাতির। জীবিত মানুষের আত্মা হরণ করবে অন্যজন, অন্য এক অজানা অদেখা জীব। …সে এখানে। ..এই বাড়িতে।—আমার শরীরের আশ্রয়ে…কি নাম? ‥ মনে হলো, সে যেন আমার কাছে চীৎকার ক'রে উঠলো, শুনতে পেলাম না‥ হাঁ…সে আবার চীৎকার করছে…আমি শুনতে পাচ্ছি…বুঝতে পারছি না… আবার সে আমাকে বললো…এবার স্পষ্ট ‥হোরলা…আমি শুনতে পেয়েছি, অনুধাবন করতে পারছি ‥নাম তার হোরলা…এই সে…ভয়ঙ্কর হোরলা—সে এখানে।

এ হে! পৃথিবী জুড়ে হিংস্রতা ও বন্যতার অন্তর্মুখী স্রোত বয়ে চলেছে। শকুন মেরে খায় পায়রাকে, চিতা শিকার করে ভেড়াকে, সিংহ খাদ্য বানায় তীক্ষ্ণ শিং মোষকে; মানুষ তীর-ধনুক, শাবল এবং বন্দুকের সাহায্যে খতম করে সেই সিংহকে; আর হোরলা সেই অমিত বুদ্ধিদীপ্ত মানুষকে পোষ মানাবে গৃহপালিত ঘোড়া ও গরুর মতন। প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে মানুষকে সে করবে তার দাস, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, তার খাদ্য…বড় দুর্দিন আমাদের!

কিন্তু কখনো কখনো পশুরাও বিদ্রোহী হয় এবং তাদের পালককে হত্যা করে···আমিও তাই চাই—আমাকে সে রকমই কিছু একটা করতে হবে। কিন্তু তার আগে আমাকে জানতে হবে, 'সে' কে? তাকে আমার স্পর্শ করতে হবে, একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। বিজ্ঞানীরা বলেন, পশুদের চোখ ও দৃষ্টিশক্তি আমাদের মতন নয়—এবং আমার চোখ এই অত্যাচারী আগন্তুককে সনাক্ত করতে পারছে না।

কেন?

মনে পড়ছে মণ্ট-সেণ্ট-মিচেলের পুরোহিতের কথা:— 'আপনি কি দুনিয়ার শত শত হাজার হাজার সব বস্তুকেই চেনেন? ধরুন, এই বাতাসের কথাই, প্রকৃতির সবচেয়ে বড় শক্তি এই বাতাস, যা মানুষকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে, বাড়ি-ঘর ভেঙ্গে তছ্‌নছ্‌ করে দেয়, গাছগুলিকে মূল সমেত উপড়ে ফেলে, সমুদ্রকে ঠেলে তুলে দেয় পাহাড়ের ওপারে, পাহাড়কে গুঁড়িয়ে দেয়, বড় বড় জাহাজগুলিকে নিয়ে আছড়ে দেয় তীরভূমিতে,—বাতাস, যা হত্যা করে, শিঁস দেয়, আর্তনাদ ছাড়ে, গর্জন করে,—আপনি কি সেই পরম শক্তিমান বস্তুকে কখনো দেখেছেন, নিজের চোখে দেখতে পান? অথচ, তার অস্তিত্ব বাস্তব।'

অতএব এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাচ্ছি—আমার চোখ দুর্বল, দৃষ্টি অস্বচ্ছ, বহু বস্তুকেই দেখতে পাই না। দুনিয়ার গহনে সাঁতরাতে সাঁতরাতে আপাত অদৃশ্য কত কি যে আমাদের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে, ইয়ত্তা নাই।

এটি একটি নতুন ধরনের জীব। নিজেদের প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠায় তারা নিশ্চয় আরো সক্রিয় হয়ে উঠবে। কেন আমরাই পৃথিবীর শেষ অধিবাসী হবো? আমাদের চেয়ে শক্তিমান যারা, তাদেরই যুগ এবার শুরু হবে।

কেন এই জীব আমাদের চোখে ধরা পড়ছে না? কারণ, তার শারীরিক গঠন অনেক সূক্ষ্ম। আর আমাদের নার্ভগুলি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কার্যতঃ দুর্বল, বিভ্রান্ত, যান্ত্রিক। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির ক্ষমতা সীমিত। বাতাস ছাড়া আমাদের প্রাণশক্তি টিকে থাকতে পারে না, খাদ্যের অভাবে অকেজো হয়ে পড়ে, প্রায়শঃই ভঙ্গুর, যে কোন মুহূর্তে যে কোন ধরণের আঘাতে টেঁসে যেতে পারে—মানুষের শারীরিক গঠন অতি পলকা। সহজেই রোগ, বিকলতা ও কু-বাসনার কাছে আত্মসমর্পণ করে। শুধুমাত্র কিছুটা মগজের জোরেই মানুষ এতকাল নিজেদের প্রাধান্য বজায় রেখেছে।

সেই প্রাধান্যের কালও আজ সমাপ্তির পথে। তার সম্প্রসারিত চৈতন্য অর্থহীন প্রতিপন্ন হতে চলেছে। কারণ, পৃথিবীর বুকে ক্রমশঃ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হচ্ছে অধিকতর বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী জীবরা।

কেনই বা হবে না? এটাই তো বিবর্তনগত ইতিহাস। কেন নতুন ধরনের ফলে-ফুলে সজ্জিত বৃক্ষশ্রেণী শোভিত হবে না পৃথিবীতে? আগুন, বাতাস, মাটি ও জল ছাড়া আরো অন্য ধরণের উপাদানও কেন দেখা যাবে না পৃথিবীতে? আমরা তো মোটে এই চারটি উৎসকেই চিনি—আগুন, বাতাস, মাটি ও জল। আরো চল্লিশ বা চারশ' বা, চার হাজার রকম উৎসও তো থাকতে পারে। আমাদের বিভ্রান্তিনিমগ্ন জ্ঞান তাদের সনাক্ত করতে পারেনি।

ব্যাপারখানা কি আমার?

এই তো সে—হোরলা—বুকের ওপর চেপে বসেছে এবং আমার মগজে চালান দিচ্ছে ইত্যাকার আবোল-তাবোল ভাবনা। সে আমারই মধ্যে, আমারই আত্মায় তার অধিবাস। আমি তাকে খুন করবো।

১৯শে আগষ্ট :—

আমি তাকে হত্যা করবো। তার দেখা পেয়েছি!

লেখার উদ্দেশ্যে গত রাতে টেবিলের সামনে ঘাড় গুঁজে বসে ছিলাম। ঠিক লেখা নয়, লেখার ভান করা; কারণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সে আসবে এবং চারদিকে ঘুর ঘুর করতে করতে এক সময় আমার খুব ঘনিষ্ঠও হবে; সম্ভব হলে আমি তখন তাকে স্পর্শও করতে পারবো। আর তারপর তারপর তো আমার ভেতর জেগে উঠবে এক প্রচণ্ড হননস্পৃহা। আমি আমার হাত, হাঁটু, দাত দিয়ে তার ওপর আক্রমণ শানাবো, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলবো!

খুব সতর্ক থেকে আমি তার প্রতীক্ষায় বসে ছিলাম।

দুটো বাতি ও আটটা মোমবাতি জ্বলছিল ঘরে। এতো আলোয় তাকে আবিষ্কার করা আমার পক্ষে সহজতর হবে।

সামনে ওক গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি পালঙ্ক; ডান দিকে অগ্নি-আধার; বাঁ দিকে সাবধানে বন্ধ করা কপাট; বহুক্ষণ ঐ দরজা খুলে রেখেছিলাম তাকে প্রবেশ করতে উৎসাহ দেবার জন্য। আমার পিছনে আয়না বসানো

একটি বৃহৎ আলমারি। ঐ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রায়শই দাড়ি কামাই অথবা, পোশাক বদলাই। এবং যতবারই ঐ আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াই নিজের পূর্ণাবয়বের মুখোমুখি হই।

হুঁ, আমি লিখবার ভান ক'রে তাকে ঠকাবার চেষ্টা করছিলাম। কারণ, জানি, সে আমার ওপর নজর ঠিকই রেখেছে।

হঠাৎ টের পেলাম, সে এসেছে—আমার পিছনে দাঁড়িয়ে লেখা পড়বার চেষ্টা করছে, এমন কি তার নিঃশ্বাস এসে লাগছে আমার কানে।

চকিতে উঠে দাঁড়িয়ে হাত দুটোকে পিছনে এনে এমন ঘোরাবার চেষ্টা করি যে নিজেই আর একটু হলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতাম।

ঘরে দিনের মতো আলো।

অথচ আয়নায় নিজের প্রতিরূপ দেখতে পাচ্ছিনে। কাঁচে কোন ছায়াপাতও ঘটে নাই, শূন্য, আলোয় ঝক্‌ঝক্ করছে। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে ওটার দিকে চেয়ে থাকি। আর এক পাও এগিয়ে যেতে সাহস হচ্ছিলো না। নড়াচড়ায় সাহসী নই। বিলক্ষণ টের পাচ্ছি, সে এখানেই রয়েছে এবং তার বস্তু-নিরপেক্ষ শরীর আমার প্রতিচ্ছবিকে ঢেকে রেখেছে, যে কারণে আয়নার কাঁচে নিজেকে খুঁজে পাচ্ছি না।

কী মর্মান্তিক আতঙ্ক তখন আমার!

এক মুহূর্ত পরে আয়নার বুকে ধীরে ধীরে ভেসে উঠতে থাকে আমার প্রতিচ্ছবি। যেন কোন প্রবহমান জলের বুকে দেখতে পাচ্ছি নিজেকে। এই জল যেন সরে যাচ্ছে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে এবং ক্রমশই স্পষ্ট হ'য়ে উঠছি কাঁচের মধ্যে।

অবশেষে রোজ যেমনটি দেখে থাকি, নিজের আপাদমস্তক দেখতে পেলাম আয়নায়।

এই ভাবেই আমি তার আবার প্রমাণ পেলাম।

ভয় বহুক্ষণ আচ্ছন্ন করে রেখেছে আমায়। মুক্তি নাই।

২০শে আগষ্ট :

খুনের পরিকল্পনা রয়েছে, অথচ উপায়টা জানা নাই। যতদিন না আমি তাকে স্পর্শ করতে পারছি, তার কোন ক্ষতি করা আমার সাধ্যাতীত। বিষ খাইয়ে মারবো? কিন্তু সে তো আমাকে জলে বিষ মেশাতে দেখে ফেলবে।

তা ছাড়া ঐ বিষ কি তার অশরীরী কাঠামোয় কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে সক্ষম ? না না, কখনোই করবে না তা হলে কি ভাবে ? কি উপায়ে ?

২১শে আগষ্ট :

রুয়েন থেকে একজন তালা-চাবি প্রস্তুতকারককে ডেকে আনতে লোক পাঠিয়েছি। প্যারিসের ভুটিকয়েক হোটেলের কায়দায় আমারও দরজায় বিশেষ ধরণের তালা লাগাতে হবে। সকলেই ভাবছে, লোকটা মহা ভীতু ! ভাবুক, ও নিয়ে মাথা ঘামালে আমার চলবে না।

১০ই সেপ্টেম্বর :

দরজায় লাগানো হয়েছে নতুন ধরনের তালা।

মধ্য রাত অবধি সেই দরজা খোলা রেখেছি, যদিও অবারিত বাতাসের আনাগোনায় ঘরের ভেতরকার সব কিছু হিম বরফ।

বহুক্ষণ বাইরের বিষাদঘন তমসার দিকে চেয়ে তার প্রতীক্ষায় থাকার পর সহসা তার উপস্থিতি টের পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে মত্ত উল্লাসে আমার মন রোমাঞ্চিত। জড়জঙ্গমতা কাটিয়ে ধীরে ধীরে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াই, মনের গুঞ্জন ভাবে প্রকাশ করি না।

দীর্ঘ সময় ধরে অনন্ত প্রশান্তিতে এমন পায়চারি করতে থাকি, যেন কেউ আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ না পায়। ঐ নিরালম্ব গতিময়তার মধ্যেই একসময় টুক করে পায়ের বুটজোড়া খুলে তাচ্ছিল্যভরে সরিয়ে রাখি এবং একজোড়া স্যাণ্ডেল পায়ে গলাই।

তারপর যেন প্রাত্যহিক অপরাভূত নিস্পৃহতায় দরজায় নতুন কায়দায় তালাটি এঁটে দিই। দরজার পর জানালাটাতেও তালা লাগানো হলো। চাবি রইলো আমার পকেটে।

এরপর মায়াতরঙ্গে বিচিত্র অনুরণন। মনে হলো, অশরীরী জীবটা সত্বার নিশ্চলতা কাটিয়ে এখন ভীষণ উদ্বিগ্ন, এই পার্থিব ব্যবস্থায় নিজের সমূহ বিপদ টের পেয়ে আমার পিছন পিছন ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ক্রমশ আমার মনের দিকে হাত বাড়ায় সে, আবার আমার মনে বিষাদক্লিষ্ট বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা করছে সে, উপলব্ধির রন্ধ্রে রন্ধ্রে একই ঝঙ্কার—দরজা খুলে দাও, দরজা খুলে দাও !

এই চাপের সামনে নিজের অস্তিত্বকে বজায় রাখা দুরূহ, নিজের সত্তা যেন সহস্র ত্রুটিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায়। তবু এইবার আমি ভেঙ্গে পড়িনি,

...নয়ের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষের মানসিকতায় নিজেকে ঋজু ও স্থির রেখেছি।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! কুণ্ডলী পাকানো আধো আলো-আধো অন্ধকারের ফাঁদে আমি তাকে পাকড়েছি। যেন আবহমানকালের কোন প্রতিশোধ-স্পৃহা আজ তৃপ্ত হবে।

ছুটে গেলাম এই ঘর সংলগ্ন বৈঠকখানায়। পাশবিক দৃঢ়তায় ওখান থেকে তুলে আনি দুটো জ্বলন্ত ল্যাম্প। হৃদয়হীন কঠোরতায় আমি সেই ল্যাম্প দুটো থেকে তেল ছড়াতে থাকি কার্পেটের ওপর। কার্পেট ভিজিয়ে শ্বাসরোধী হিংস্রতায় তেল ঢালতে থাকি ফার্নিচারগুলির ওপর, তারপর বিছানায় চাদরে, দরজায়-জানালায়, সর্বত্র!

তেল ঢালা শেষ হলে পরে আগুনের সঙ্গে চুক্তি হলো যেন। আমি নির্মম হাতে আলেয়া-চমকানো দ্রুততায় কার্পেটের এক কোনে আগুন ধরিয়ে দিলাম। তারপর আরো চকিতে বিশেষ কায়দার দরজা বিশেষ কায়দায় খুলে লাফ মেরে চলে আসি বাইরে, বাইরে থেকে সপাটে বন্ধও করে দিই।

তখন বেমালুম ছুট-ছুট,—কয়েক লাফে এ বাড়ির বাগানে। একটা ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে জ্বল জ্বল চোখে চেয়ে থাকি নিজের ঘরের দিকে। বড় নিঃসঙ্গ নির্মম সেই প্রতীক্ষা—কতক্ষণে আগুন-সম্পাতে এই চরাচর ঝলসে যাবে। বাতাস বয় না, বিশাল আকাশে একটিও নক্ষত্র নাই, পাহাড়প্রমাণ মেঘবাষ্পোজ্জ্বল স্তম্ভগুলি পৃথিবীর অনেক কাছাকাছি, গাছের পাতায় পাতায়, ঘাসের ডগায় ডগায় অন্তর্মুখি শব্দহীনতা। রুদ্ধশ্বাস রুদ্ধবাক আমি সামনের দিকে চেয়ে আছি। বলি হৃদপিণ্ডের ঘড়ি চলছে কাঁটায় কাঁটায়। কতক্ষণে এই নিরন্ধ্র তিমির ভেদ করে দেখবো আগুনের শিখা?

কতক্ষণ ইন্দ্রিয়গুলির এই অন্তরঙ্গ বাসনা চাপা থাকবে?

ভাবলাম, হয়তো 'সে' স্বয়ং ঐ আগুন নিভিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে আমি নির্ঘাৎ দুর্ভাগ্যের বলি।

না, না, ঐ তো আগুন! দাউ দাউ লেলিহান শিখা মুহূর্তে ঘূর্ণমান ঝড়ের সংকেত বয়ে আনে।

আমার ঘরের একটা জানালা ভেদ করে রক্তাভ ও গাঢ় হলুদ দাউ দাউ আগুন হাজারটা মুখ বের করে ধেয়ে আসছে। মুহূর্তে বহ্নিমান ব্যাপ্তিতে ধরা দিতে থাকে সকলেই। আগুনের প্রদীপ্ত দাপটে সাদা দেওয়ালের রং

বদলে যায়, শিখাগুলি বাড়তে বাড়তে ঐ বাড়ির ছাদেও পৌঁছে যায়। আগুনের সহবাসে দর্প চূর্ণ হয়, আত্মমুখী বিষণ্ণতায় সকলেই ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে।

গাছ-পালা, প্রবেশ-পথ, সিঁড়ি-ঘর, খামার সর্বত্র ভয়াবহ আগুনের মেলা। আতঙ্কে কারা যেন দাপাদাপি করছে। পাখিরা জেগে উঠে বিলাপ শুরু করে। কুকুরটা একটানা ডেকে চলে। বুঝতে পারছি, যে কোন মুহূর্তে গোটা বাড়িটাই ধ্বসে পড়তে পারে।

কিছুক্ষণ পর অন্যসব জানালার মধ্য দিয়েও আগুনরা উঁকি-ঝুঁকি মারতে থাকে। আমার বাড়ির নীচতলাটা এখন প্রকৃতই অগ্নিকুণ্ড। কাদের যেন চীৎকার শুনতে পেলাম। কোন স্ত্রীলোকেরও আর্তনাদ ভেসে এলো!...হায়! আমি—আমি একদম ভুলে গিয়েছি বাড়ির চাকর-বাকরদের কথা। ওরা জীবন্ত পুড়ে মরছে! আমি যেন তাদের অর্ধদগ্ধ শরীর ও যন্ত্রণায় ক্ষিপ্ত হাতগুলিকে ভেসে বেড়াতে দেখছি।

তখনই আমি উঠে দাঁড়িয়ে স্থানীয় গ্রামের দিকে ছুটতে শুরু করি। আমার চীৎকারে ঘুমন্ত রাত কেঁপে কেঁপে ওঠে: বাঁচাও। বাঁচাও। আগুন। আগুন!

পথেই আগুয়ান গ্রামবাসীদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাদের সঙ্গেই ফিরে আসতে থাকি। ততক্ষণে আমার অপূর্ব শুভ্র প্রাসাদের কোন অস্তিত্বই নাই। তার বদলে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল ও কুৎসিৎ এক অর্ধদগ্ধ চিতা। ঐ চিতা কার? ঐ চিতা 'তার'—সেই নতুন জীব, নতুন প্রভু, হোরলা!!

গোটা ছাদটাই বিকট আওয়াজে ফেটে চৌচির হয়ে গেল। যেন একটা বিরাট আগ্নেয়গিরির বিপুল অগ্ন্যুৎপাত, ঐ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল। পোড়া জানালাগুলির মধ্য দিয়ে আমার সন্ধানী দৃষ্টি ঘুরতে থাকে। নিশ্চয় সে খতম হয়ে গেছে। নিশ্চয়।

কিন্তু—কিন্তু সত্যি কি সে মারা গেছে?

সম্ভবত।

কোথায় তার শরীর? হয়তো সেও আমাদেরই মতন আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।...

কিন্তু যদি এমন হয়,—আগুন তাকে মারতে পারে না? হয়তো একমাত্র

সময়ই তার মৃত্যু ঘটাতে পারে। কিন্তু কিছু নয়। হয়তো তার অকালমৃত্যু ঘটাবার মতন শক্তি অন্য কিছুর নাই।

অকাল মৃত্যু? মানুষের কোন আয়ুধই কি তবে তার ওপর কার্যকর হবে না? কারণ, মানুষের পরে আসছে হোরলা। মানুষের আয়ু ভঙ্গুর, যে কোন সময়ে সে মারা যেতে পারে, যে কোন ঘটনায় বা দুর্ঘটনায়। কিন্তু হোরলা মারা যাবে নির্দিষ্ট দিন ক্ষণে, যার আগে কেউ তার মৃত্যু ঘটাতে পারবে না।

না, না আমি জানি, আমি জানি সে মরে নাই তাই, তাই এবার আমি নিজেকেই খুন করবো, এখনই।

কোকো

[Coco]

এ তল্লাটে সকলের কাছেই লুকাসের জোতের জমির একটা বিশেষ নাম আছে—'মেতারি'। এ রকম একটা নামকরণের রহস্যটা অবশ্য কেউ বলতে পারে না; তবে মনে হয়, 'মেতারি' বলতে স্থানীয় চাষীরা বোঝাতে চায়, লুকাসের ফার্মের বিশালতা ও সমৃদ্ধি। সত্যি বলতে কি, তামাম জিলায় অতবড় সুপরিচালিত সমৃদ্ধ জোতের জমি আর দ্বিতীয়টি নেই।

বিশাল খামারের চারিদিকে পাঁচ সারি মস্ত মস্ত গাছ; এই পাঁচ সারি বেষ্টনির মধ্যে লালিত হচ্ছে ছোট ছোট নয়ন-শোভন আপেল গাছ, রক্ষা পাচ্ছে তারা ঝড়ের দাপট থেকে। লাল টালির ছাদওয়ালা লম্বা একটি ঘরও দৃষ্টি এড়ায় না। ঐ ঘরে মজুত থাকে পাকা ফসল, শুকনো খড়। গোয়াল ঘরে জাবর কাটে গরুরা; আস্তাবলে লেজ ছুঁড়ছে ঘোড়ারা। গোয়াল ঘর ও আস্তাবল পেরিয়ে খামারবাসীদের বিরাম-ঘর—লাল ইঁটের তৈরি ছিম ছাম চমৎকার একখানা ছোট্ট বাড়ি।

গোবরগুলি স্তূপাকৃত। শিকারী কুকুররা ওৎ পেতে আছে তাদের আস্তানায়, মোরগ-মুরগীর দল ছোটাছুটি করে উঁচু ঘাসের বনে।

প্রতিদিন দুপুরে লালবাড়ির রান্না ঘরে লম্বা টেবিলের সামনে খেতে বসে পনেরো জন লোক,—ফার্মের মালিক, তার পরিজন, পরিচারক-পরিচারিকারা।

খামারের পশুগুলি ঘোড়ারা, গরুরদল, শূকরের পাল, ভেড়ার পাল হৃষ্টপুষ্ট, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সযত্নে লালিত। দীর্ঘদেহী বিপুল উদর লুকাস দিনের মধ্যে তিনবার তার খামারকে ঘুরে ঘুরে দেখে যায়, সব কিছুর তদারকি করে, প্রত্যেকের সুখ-সুবিধার জন্য তার অনেক ভাবনা।

আস্তাবলের বাইরে একফালি ফাঁকা জায়গায় একটা বুড়ো ঘোড়াকে রোজই বাধা অবস্থায় দেখা যায়। লুকাসের বউ ঘোড়াটার প্রতি বিশেষ দয়ালু—যতদিন ওর স্বাভাবিক মৃত্যু না ঘটে, যত্ন-আত্তির যেন কোন ত্রুটি না হয়। ঐ বুড়ো ঘোড়া এই বর্ধিষ্ণু খামারের বহু অতীত স্মৃতির প্রাচীন সাক্ষী।

বছর পনেরোর একটি ছেলেকেও রাখা হয়েছে ঐ অবসরপ্রাপ্ত পশুটাকে দেখাশুনা করবার জন্য। ছোকরার নাম ইসিডোর দ্যুভাল, লোকে সংক্ষেপে ডাকে—জিডোর। শীতের মরশুমে ঘোড়াকে সে খেতে দেয় জই, খড়-বিচালি এবং গ্রীষ্মে দিনের মধ্যে চারবার চার জায়গায় ওকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবুজ ঘাস খাইয়ে আনে।

বুড়ো ঘোড়া বয়সের ভারে, অথব, চলাফেরায় আর পারঙ্গম নয়, অতিকষ্টে পা তুলে তুলে চলে। গায়ে চাপানো কাপড়টাকে মনে হয় সাদা লোমের আস্তরণ। লোমশ চোখের পাতায় ঢাকা তার ভেজা দৃষ্টি করুণ।

বয়সের মন্থরতা ও ক্লান্তিতে বুড়ো ঘোড়া স্বাভাবিক ভাবে হাটতে পারে না; তাই ঘাসজমিতে নিয়ে যাবার সময় জিডোর ওর দড়ি ধরে সবেগে টানতে থাকে। তবু মাঝে মাঝে থামাতে হয়, অথব পশুর অসহায়তা দেখে করুণার বদলে জিডোর মাথায় রাগ চড়ে, লাঠি দিয়ে খোঁচাতে থাকে। ঘোড়াটার ওপর তার যেন জাতক্রোধ।

খামারের আর সকলে কিন্তু জিডোর এই ক্ষোভ নিয়ে হাসাহাসি করে; তারা সুযোগ পেলেই ওর কানের কাছে গিয়ে বুড়ো ঘোড়ার গল্প জুড়ে দেয়। ফলতঃ ছোকরার মাথায় খুন চাপবার উপক্রম। রাগে তার সর্বাঙ্গ রি রি করে।

জিডোর বন্ধুরাও এ নিয়ে বিদ্রূপ-মস্করা কম করে না। এই এলাকায় তার নামই হয়ে গেল কোকো-জিডোর।

জিডোর ক্ষোভে দুঃখে তেতে আগুন। ভেতরে তার প্রচণ্ড প্রতিহিংসা দিনের পর দিন পুঞ্জীভূত হতে থাকে। চেহারায় সে রুগ্ন, লম্বা সরু সরু হাত-

পা, খুব নোংরা, লালচে ঘন এলোমেলো চুল একফালি কাপড়ে বাঁধা। আচরণে বোকা বোকা, কথা বলতে গেলেই তোতলামিতে পেয়ে বসে, অসম্ভব শারীরিক পরিশ্রমে মগজে দেখা দিয়েছে বিশেষ ঘাটতি, সব সময় মেজাজ খিচ্‌ ধরে আছে।

তার বিস্ময় ও রাগ হয় এখনো ঐ বুড়ো ঘোড়া কোকোটাকে বহাল-তবিয়তে বাঁচিয়ে রাখার জন্য! কত খাবার নষ্ট হচ্ছে এই অকেজো জন্তুটার জন্য। যেদিন থেকে ঘোড়াটা তার কর্মক্ষমতা হারিয়েছে, সেদিন থেকে নিশ্চয় ওর বেঁচে থাকবার কোন অধিকার নেই। অথচ, ওকে দেয়া হচ্ছে মহার্ঘ খড়-বিচালি, জই, টাটকা ঘাস, আরো কত কি।

অনেক সময় সে তাই লুকাসের নির্দেশ অমান্য ক'রে কোকোকে পেট ভরে খেতে দেয় না। বরাদ্দ খাবারের অর্ধেকটা মাত্র দেয়। মূক প্রাণীটার ওপর তার মনোভাব আদিম ও হিংস্র। দুর্দমনীয় প্রতিহিংসায় সে জ্বলছে।

গ্রীষ্ম আসে।

এ সময় তাকে ঘোড়া নিয়ে এক ময়দান থেকে অন্য ময়দানে ঘুরে বেড়াতে হয় ঘাসের সন্ধানে। ময়দানগুলি খামার থেকে অনেক দূরত্বে। প্রতিটি দিনের শুরুতে তার মন বিষিয়ে থাকে। কোকোর দড়ি টানতে টানতে সে সুফলা সবুজ জমিগুলি পার হয়। মাঠে কর্মরত লোকেরা সকৌতুকে তার উদ্দেশ্যে চীৎকার করে : এই যে। জিডোর। তোমার কোকোকে আমাদের সশ্রদ্ধ সেলাম দিও।

জিডোর কখনো ওদের কথার জবাব দেয় না। কিন্তু যাবার পথে নিরালায় জঙ্গল থেকে একটা লাঠি ভেঙ্গে আনে। তারপর নতুন কোন ঘাসজমিতে কোকো আহারে মন দেবার পূর্বমুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকের মতন সেই ভারী লাঠি হাতে তেড়ে আসে জিডোর, পশুটার পায়ে জোড়ে জোড়ে সপাং সপাং মারতে থাকে।

পশুটা চেষ্টা করে আত্মরক্ষার, চেষ্টা করে নাগালের বাইরে সরে যেতে, পারে না; দড়িতে বাঁধা অবস্থায় সার্কাসের রিং এ ঘুরন্ত ঘোড়ার মতন ছুটতে থাকে মাত্র। বন্য উল্লাসে ছেলেটাও ওর পিছন পিছন তাড়া করে, দাঁতে দাঁত ঘষণ করে, সপাং সপাং চাবুক চালায়।

তারপর একসময় জিডোর নিজেরই ক্লান্তি আসে। হাতের লাঠি ছুঁড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে চলে যায়। পিছনপানে ফিরেও চায় না। ঘোড়াটা তার প্রাচীন চোখে ওকে মিলিয়ে যেতে দেখে। যতক্ষণ না জিডোর দৃষ্টিসীমার বাইরে হারিয়ে যাচ্ছে, কোকো ঘাসের দিকে তার সাদা ঘাড় ও গলা নামায় না।

গরমের রাতগুলিতে কোকোকে আস্তাবলের ভিড় থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। উপত্যকার প্রান্তে, গাছ-পালার পিছনে জিডোর তখন কোকোকে নিয়ে যায়। তখন সেই রাতে জিডোর ভেতর আবার হিংস্র প্রতিশোধস্পৃহা জ্বলে ওঠে; সে উল্লাসে পাথর ছুঁড়তে থাকে ওকে লক্ষ্য করে। বুড়ো ঘোড়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখ বুজে মার খায়, স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার শত্রুর দিকে, এবং জিডোর চলে না যাওয়া পর্যন্ত ঘাসে সে মুখ নামায় না।

ছেলেটার মনে একটাই তিক্ত ব্যাধিসম জিজ্ঞাসা : এই অথর্ব ঘোড়াটাকে কেন খেতে দেওয়া হবে? অপরের আহার, করুণাময় ঈশ্বরের সীমিত দানের এমন অপব্যবহার কে সহ্য করতে পারে? জিডোর স্বয়ং নিজের পেটের সংস্থান করার জন্য উদয়াস্ত নিদারুণ পরিশ্রম করছে না।

ক্রমশ সে কোকোকে নিয়ে নিত্য-নতুন ঘাসজমিতে যাওয়া বন্ধ করে দিল। পুরনো মরা ঘাসের এলাকাতেই বেঁধে রাখে ক্ষুধার্ত বুড়োটাকে।

খাদ্যের অভাবে কোকোর শরীর আরও ভেঙ্গে পড়ে, বুকের হাড়গুলি জিল জিল করছে। দড়ি ছিঁড়বার শক্তি তার নাই। অথচ, মাত্র কয়েক হাত ব্যবধানে টাটকা সবুজ ঘাসের হিল্লোল। সে ঘাড় নামিয়ে জিভ বের ক'রে বৃথাই চেষ্টা করে ঐ ঘাসগুলিকে নাগালের মধ্যে পেতে।

তারপর আর এক সকালে জিডোর মাথায় নতুন এক পরিকল্পনা এসে স্থান পায়। ঠিক করলো, কোকোকে নিয়ে সে আর ঘুরবেনা। অনেক ঘোরা হয়েছে এতকাল ওটার জন্য।...

প্রতিশোধের চাপা বাসনা নিয়ে সে এসে দাঁড়ায় বুড়ো জন্তুটার সামনে। শঙ্কিত কোকো তাকে দেখে যেন কেঁপে ওঠে।...জিডোর কিন্তু সেদিন ওটার ওপর লাঠি চালায় না। পকেটে হাত ঢুকিয়ে কোকোর চারপাশে ঘুরপাক খেতে থাকে। এক সময় এমনও ভাব দেখায়, বুঝি সে কোকোকে নিয়ে নতুন কোন ময়দানের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। আসলে কিন্তু পুরনো গর্তেই খুঁটোটা

আরো শক্ত করে পুঁতে মনের আনন্দে আপন পরিকল্পনাকে তারিফ জানাতে জানাতে ফিরে যায়। বুড়ো ঘোড়া বিস্মিত বেদনায় লক্ষ্য করে, তার নাগালের মধ্যে কোন ঘাসের অস্তিত্ব না রেখেই এই উপত্যকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে জিডোর।

কোকো নিজের হাঁটু মুড়ে ঘাড় নাড়ে, প্রাণপনে চেষ্টা করে এগিয়ে যাবার, তার জিভ লক্ লক্ করতে থাকে অদূরের ঘাসগুলিকে গ্রাসের মধ্যে পাবার আশায়। কিন্তু সেটা কখনোই সম্ভব হয় না।

সারাটা দিন ধরে চললো অসহায় মূক পশুর সেই প্রাণান্ত সংগ্রাম। ক্ষুধা তাকে পাগল ক'রে তোলে। চোখের সামনে অঢেল-অঢেল সবুজ খাদ্যভাণ্ডার অথচ, সে তাদের স্পর্শ করতে পারছে না। ক্ষুধার যন্ত্রণা দ্বিগুণ হয়। সে সাধ্যাতীত নানারকম প্রয়াসে দ্রুত নিজের প্রাণশক্তি ক্ষয় করতে থাকে।

সেদিন আর ছোকরাটি এলো না। সারাটা দিন বনের মধ্যে পাখির বাসা ভেঙ্গে বেড়ালো। এলো তার পরদিন। কোকো তখন নির্জিব ভঙ্গীতে শুয়ে আছে, গভীর অবসাদে ঘন ঘন দম নেয়। তবু জিডোরকে দেখে অনেক প্রত্যাশায় সে উঠে দাঁড়ায়, ভাবে, হয়তো এবার তাকে ঘাসের কাছে পৌঁছে দেবে।

কিন্তু জিডোর ওর দড়িটা ছুঁয়েও দেখে না। একদলা মাটি ছুঁড়ে মারে কোকোর সাদা শরীরে। তারপর শিস দিতে দিতে চলে যায়।

যতক্ষণ ওকে দেখা যায় এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে বুড়ো ঘোড়াটা। তারপর সে বুঝতে পারে, নতুন ঘাসের স্বাদ সে আর এ জীবনে পাবে না। সে আবার শুয়ে পড়ে, চোখ দুটো বুজে আসে।

পরের দিন জিডোর একটিবারের জন্যও এলো না।

তার পরদিন এসে সে দেখে, কোকো তখনো মাটিতে শুয়ে আছে। শুধু শুয়ে থাকা নয়, বুড়োটা মারাও গেছে!

খুশি খুশি দৃষ্টিতে সে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে ঐ স্পন্দনহীন প্রাচীন দেহটার দিকে। একটু যেন অবাকও হয়,—কত তাড়াতাড়ি খতম হ'য়ে গেল জীবটা!

সে নিজের পা দিয়ে ওর একটা পা তুলে দেখে। কিছুক্ষণ ওর নিথর দেহের পাশে বসে থাকে; ভাবলেশহীন চোখে চেয়ে থাকে, অদূরে হিল্লোলিত সবুজে সবুজ ঘাসগুলির দিকে।

সে ফিরে আসে খামারে। কিন্তু তখনই কোকোর মৃত্যু-সংবাদ সে ঘোষণা করেনা।···পরদিন আবার সেই উপত্যকায় গিয়ে দেখে, কাকেরা ইতিমধ্যেই ভোজ বসিয়েছে কোকোর পচনশীল দেহে, অসংখ্য মাছি উড়ছে ভন্‌ভনিয়ে।

তখন সে ফিরে এসে ঘোষণা করলো কোকোর মৃত্যু-সংবাদ। জন্তুটা এত বুড়ো হয়েছিল যে কেউই এতে অবাক হলো না। খামারের মালিক তাঁর দু' জন কর্মচারীকে ডেকে বললেন, 'দেখো, ঘোড়াটা যেখানে মরেছে সেখানেই ওকে কবর দেবার ব্যবস্থা করো।' ঠিক যেখানে বুড়ো ঘোড়াটা ক্ষিধের জ্বালায় মারা গিয়েছে, সেখানেই প্রস্তুত হলো তার কবর। ক্রমে কোকোর শরীর ঐ জমিতে সৃষ্টি করলো চমৎকার সার এবং সেই নতুন প্রাণ-শক্তিতে ঐ জমিতে গজিয়ে উঠতে থাকে অঢেল সতেজ সবুজ প্রাণবন্ত ঘাস আর ঘাস।

গহ্বর

[Hole]

'এলোপাথাড়ি ঘুঁষি ও আঘাতই মৃত্যুর কারণ।'

—আদালতে আসবাবপত্রের সরবরাহকারী মাষ্টার লিও পোল্ড রেনার্ডের বিরুদ্ধে এই ভাষাতেই অভিযোগ আনা হয়েছে।

শমন পেয়ে আদালতে উপস্থিত রেনার্ড। উপস্থিত প্রধান সাক্ষীরা—কাঠ ব্যবসায়ী লুইস্ লেডুর, নিহতের বিধবা স্ত্রী লেডি ফ্লেমেচ্ এবং লোহার মিস্ত্রী জাঁ ডুরডেণ্ট।

বিবাদীর কাছাকাছি বসে আছে তার স্ত্রী; পরনে কালো পোশাক, কুরূপা, মনে হয় যেন মেয়েমানুষের বেশে এক বানরী বসে রয়েছে।

এবং রেনার্ড লিও পোল্ড গোটা নাটকীয় ঘটনাটাকে এই ভাবে বলে চলে :

"হুজুর, আপনাদের কাছে কবুল করছি, এটা একটা দুর্ঘটনা, যার দায় বহন করতে হচ্ছে আমাকে, যদিও এতে আমার সামান্যতম অপরাধও নেই।

ধর্মাবতার, গোটা ঘটনাটা শুনলেই আপনি বুঝতে পারবেন, আমি

নির্দোষ। মানুষ হিসেবে আমি চমৎকার, খুব পরিশ্রমী। ষোল বছর ধরে আসবাবপত্রের কারবার ক'রে আসছি। সকলেই আমাকে চেনে, পছন্দ করে, মান্য করে, সম্মান করে। অকাজে থাকি না। মিতব্যয়ী। ভদ্র সজ্জন লোকদের সঙ্গে মেলামেশা পছন্দ করি এবং নির্দোষ আনন্দই উপভোগ করে থাকি। আর এই অভ্যাসগুলিই শেষ পর্যন্ত হলো কিনা আমার দুর্ভাগ্য ও পতনের কারণ! যেহেতু অপরাধ করিনি, এখনো তাই নিজেকে আমি সম্মান করি।

গত পাঁচ বৎসর যাবৎ আমি ও আমার স্ত্রী মিলি পঁয়েজিতে যাই রবিবার দিনটা কাটাতে। এটা আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল। পঁয়েজিতে অঢেল খোলামেলা বাতাস। উপরন্তু, ওখানে দারুণ আগ্রহে নদীতে মাছও ধরি আমরা। এই মাছ ধরার নেশা আমাদের মাতাল করে দেয়। মিলিই আমাকে এই নেশার সন্ধান দিয়েছিল এবং এ ব্যাপারে তার উৎসাহ ও তৎপরতা আমার চেয়েও বেশি। শুধু তাই নয়, যে অঘটনের জন্য আজ আমি কাঠগড়ায় এসে দাঁড়িয়েছি, তারও মূলে ঐ মিলি। আমি শুধু একটা বোকা জন্তুর মতন ওর ইচ্ছার দাস হয়েছি মাত্র। এক মিনিট ধৈর্য ধরুন, আমি সব বলছি।

আমি বলবান ও ভদ্র। আমার ভেতর ছিটে ফোঁটাও শয়তানি নাই। কিন্তু আমার স্ত্রীর দিকে চেয়ে দেখুন,—কেমন দুধের মতন নরম, শীর্ণা; আদতে কিন্তু খাটাশের মতন ভয়ঙ্কর! অবশ্য একথা বলছি না যে, মিলির কোন গুন নাই। ওর এমন কতগুলি গুণ আছে, যা ব্যবসায়ের পক্ষে সহায়ক। কিন্তু সর্বনাশা তার মেজাজ! প্রতিবেশীদের জিজ্ঞেস করুন, এমনকি ফরিয়াদীকেও জিজ্ঞেস করুন—তারা আমার বক্তব্যকে সমর্থন করবে। আমার নির্বিরোধ শান্ত স্বভাব মিলির কাছে অসহ্য। প্রায় প্রতিদিনই এর জন্য তার তর্জন-গর্জন, 'এরকম স্বভাব আমি সহ্য করতে পারি না। সহ্য হয় না।'

ধর্মাবতার, আমি যদি এতকাল এই স্ত্রীর কথায় নাচতাম, তা হলে মাসের মধ্যে অন্ততঃ তিনবার আমাকে লড়াইতে নামতে হতো।"

মাদাম রেনার্ড এবার তার স্বামীর কথায় বাধা দিয়ে বললো, 'বলে যাচ্ছো, বলে যাও। সব ভাল যার শেষ ভাল।'

রেনার্ড স্ত্রীর দিকে ফিরে চড়া গলায় বলে, 'আলবাৎ। আমি তোমায় রেহাই দিয়ে গেলাম। না হলে এই বিচার হতো তোমার!'

তারপর, আবার বিচারকের দিকে ফিরে বলতে থাকে:

"তা হলে আমার যা বলবার, বলে যাই। প্রতি শনিবার রাতেই আমরা দু' জনে পৌঁছে যেতাম পঁয়েজিতে। উদ্দেশ্য—যাতে রবিবার দিন খুব সকালেই মাছ ধরতে বসে যেতে পারি। লোকেরা যেমন বলে থাকে, 'অভ্যাসই মানুষের দ্বিতীয় স্বভাব', আমার বেলাতে তা-ই হয়েছে।

বছর তিনেক আগে মাছ ধরবার জন্য পঁয়েজিতে নদীর ধারে আমি একটা বিশেষ জায়গা আবিষ্কার করেছিলাম। হাঁ, জায়গার মতন জায়গাই বটে!

আপনার একবার সেই জায়গাটা দেখে আসা উচিত। কী চমৎকার ছায়া, কম-সে-কম আট ফিট গভীর জল, দশ ফিটও হতে পারে, নদীর পাড় ঘেঁষে অপূর্ব এক গহ্বর, যেখানে মাছের ঝাঁক ছুটে ছুটে আসে, আশ্রয় নেয় এবং মৎস্য শিকারীদের জন্য গড়ে তোলে এক স্বর্গভূমি।

মিঃ প্রেসিডেন্ট, আমি ঐ গহ্বরটাকে আবিষ্কার করার জন্য নিজেকে ক্রিষ্টোফার কলম্বস বলে মনে করি। এই জিলার প্রত্যেকে এটা জানে এবং এবং ঐ খাঁড়িতে মাছ ধরবার আমার একচেটিয়া অধিকারকে তারা স্বীকারও করে নিয়েছে। তারা তো এক কথাতেই বলে দেয়, 'ও জায়গাটা রেনার্ডের।'

অন্য কেউ সেখানে নাক গলাতে আসেনি; এমন কি, অপরের জমির দিকে হাত বাড়ানো যার স্বভাব, সেই মঁ প্লুমিউও জায়গাটার ওপর আমার অধিকার নিয়ে কখনো মাথা ঘামায়নি।

নিজের অধিকার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থেকেই সদর্পে সেখানে মাছ-শিকারে যেতাম।...সেই শনিবার পঁয়েজিতে পৌঁছেই 'ডালিলা'য় চেপে আমি ও আমার স্ত্রী নদীপথে অনেকটা পাড়ি জমালুম। 'ডালিলা' আমার নিজস্ব বোট, যেমন হালকা, তেমনি নিরাপদ। কখনো কখনো ঐ বোটে চেপে আমি বঁড়শিতে টোপ গাঁথতুম। আমি জানি, আমার মতন টোপ গাঁথতে আর কেউ জানে না। যদিও টোপ গাঁথার সঙ্গে এই দুর্ঘটনার কোন সম্পর্ক নাই, তবু যদি আপনি জানতে চান, আমি কি দিয়ে ঐ টোপ গেঁথে থাকি, আমি কিছুতেই বলবো না। কারণ ওটা আমার একান্ত রহস্য। আবিষ্কারও বলতে পারেন। আজ অব্দি কম-সে-কম শ' দুই লোক তেল দিয়েছে ঐ টোপের রহস্য জানবার জন্য। তারা আমায় মদ খাইয়েছে, মাছ ভাজা খাইয়েছে; আমার সঙ্গে হাজারো বাত্ জুড়ে দিয়েছে শুধু ঐ টোপের মাল-

মশলাগুলি জানবার জন্য। কিন্তু এ শর্মা বলবার পাত্র নয়। একমাত্র স্ত্রী জানতো ঐ টোপের রহস্য···এবং সেও প্রাণ গেলেও ঐ কথা ফাঁস করবে না। কি মিলি, মিথ্যা বলছি?"

বিচারক বাধা দিলেন: 'বাজে কথা ছেড়ে আসল কথায় আসুন।'

আসামী আবার বলে চলে:

"হাঁ, হুজুর, বলছি। ৮ই জুলাই, শনিবার বিকেল পাঁচটা পঁচিশের ট্রেনে আমরা তো রওনা দিলুম পঁয়েজির উদ্দেশ্যে। এবং সেখানে পৌঁছে ডিনার খাবার আগেই যথারীতি চলে গেলুম আমাদের নির্দিষ্ট জায়গায় সেই বিশেষ ধরনের 'চার' করে আসতে। শনিবার 'চার' ক'রে এসে রবিবার সেখানে ছিপ ফেলি। ঐ 'চার'ই হলো আমার আশ্চর্য 'টোপ', যার গন্ধে যত রাজ্যের মাছেরা এসে গহ্বরে আশ্রয় নেয়।

আবহাওয়া মনোরম হবে বলেই মনে হচ্ছিলো।

মিলিকে বললুম, 'কালকের দিনটা ভালোই যাবে মনে হচ্ছে।'

সেও সায় দেয়, 'মনে তো তাই হয়।'

আর কোন কথা তখন হয়নি আমাদের দু'জনের মধ্যে।

তারপর আমরা ফিরে এলাম, ডিনার খেলাম। নিজেকে বেশ তরতাজা মনে হচ্ছিলো, পান করার বাসনাও জাগছিল মনে। আর, স্যর,.এই বাসনাটাই কিন্তু অনেক অনর্থের মূল।

আমি মিলিকে বললুম, 'মিলি, এখন এক বোতল 'নাইট-লাইট' পেলে মন্দ হয় না। মেজাজ আসতো।'

'নাইট-লাইট' এক ধরনের পাতলা সাদা মদ, যা অল্প পান করলে ক্ষতি নেই; কিন্তু বেশি টানলেই নানা উপসর্গ—রাতে ঘুমের বারোটা বাজবে।

মিলি জবাব দিলো, 'ইচ্ছে হলে খেতে পারো। তবে অসুস্থ হ'য়ে পড়বে, কাল সকালে উঠতেই পারবে না।'

মাইরি, মিলি যা বলেছিল, একেবারে বেদবাক্য! আমার স্ত্রীর যে দূরদৃষ্টি আছে, একথা স্বীকার করতেই হবে। তবু, নিজের রসনাকে সামলাতে পারলুম না। পুরো এক বোতল 'নাইট-লাইট' উড়িয়ে দিলুম। ফলে যা হবার, তাই হলো। সারারাত ঘুম নাই, মগজের ভেতর যতসব উদ্ভট যন্ত্রণার দাপাদাপি।

ঘুম আর আসে না। রাত দুটো অব্দি ভগবান আমাকে জাগিয়ে রাখলেন। আর তারপরই ছুম্ ক'রে ঘুমিয়ে পড়লুম। সে ঘুম যে কী

ভয়ানক! টেরই পেলুম না, কখন দেবদূত তাঁর বিচারের শেষ রায় দিয়ে গেছেন!

সংক্ষেপেই বলছি হুজুর।

সকাল ছ'টায় স্ত্রী আমাকে ডেকে তুললো। তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠি; তড়িঘড়ি প্যাণ্ট গেঞ্জি পরে নিই। ঝাঁপিয়ে উঠে বসি আমার 'ডেলিলা'য়।

ততক্ষণে অনেক দেরী হ'য়ে গেছে।

নির্দিষ্ট খাঁড়ির কাছে এসে অবাক হ'য়ে দেখছি, কে একজন আমার জায়গায় জাঁকিয়ে বসে আছে ছিপ্ ফেলে।

ধর্মাবতার, এমন ঘটনা এর আগে কখনো ঘটেনি! গত তিন বছরের মধ্যে কখনো ঘটেনি। মনে হলো, যেন নিজের নাকের গোড়াতেই কে বুঝি আমার পকেটটা কেটে নিলো!

বললাম: যাচ্ছেতাই! একেবারে যাচ্ছেতাই!

জ্বলে উঠলো আমার স্ত্রী: 'আরো মাল টানো। 'নাইট লাইট' 'নাইট লাইট' ক'রে একেবারে তো পাগল হ'য়ে গিয়েছিলে। মাতাল, লম্পট কোথাকার! তুমি একটি আস্ত গর্দভ। এখন খুশি হয়েছো তো?'

আমার বলার কিছুই ছিল না। মিলিতো আর মিথ্যা বলছে না।

ব্যাপার যাই হোক, আমি ঐ গহ্বরের কাছাকাছিই ছিপ ফেলতে মনস্থ করি। যদি এক আধটা মাছ ছিটকে আসে তো নির্ঘাৎ আমার টোপ গিলবে! হয়তো আমার জায়গায় বসে থাকা লোকটার কপাল আজ নাও খুলতে পারে এবং তখন সে নিশ্চয় ঐ জায়গা ছেড়ে সরে যাবে।

লোকটা মাথায় মস্ত খড়ের টুপি চাপিয়ে ঘাড় নিচু ক'রে বসে আছে। ছোটখাটো দেহ, হাড়সর্বস্ব শরীর। ওরও সঙ্গে নিজের স্ত্রী রয়েছে। স্ত্রীটি আবার বিশালকায়, চর্বিবহুল, স্বামীর পিছনে বসে সেলাই করছে।

মেয়েমানুষটা খেয়াল করে, আমরা ঐ গহ্বরের কাছাকাছিই ছিপ ফেলবার তোড়জোর করছি। সে তিক্ত স্বরে বলে ওঠে, 'নদীতে কি মাছ ধরবার আর কোন জায়গা নেই?'

আমার স্ত্রীও ক্ষিপ্ত হ'য়ে জবাব দেয়, 'হাঁ, সুবিধাভোগীরা অপরের সম্পত্তিতে হাতও দেবে, আবার পোদ্দারিও করবে!'

যেহেতু আমি ঝগড়া-ঝাটি পছন্দ করি না, মিলিকে বললুম, 'চুপ করো মিলি' বসতে দাও ওদের। আমরাও দেখি, কি হয়।'

উইলো গাছের ছায়ায় 'ডেলিলা'কে রেখে মাটিতে নেমে এলাম আমরা। বসে পড়লুম ছিপ্ হাতে ওদের থেকে কিছুটা দূরত্বে, কিন্তু একই রেখা বরাবর।

হুজুর, এবার একটু বিস্তৃত ভাবেই আমাকে সব বলতে হবে। বোধহয় পাঁচ মিনিটও কাটেনি, এমন সময় আমাদের প্রতিবেশীর 'ফতনা' দু'বার তিনবার নড়ে ওঠে। তারপরই সে গেঁথে তুললো আমার উরুর মাপের বিশাল একটা রুই মাছ। হয়তো যতটা বড় বলছি, ততটা নয়; তবে মাছটার আকৃতি বেশ দশাসই ছিল।

আমার বুকের রক্ত ছলাৎ করে ওঠে, সারা শরীরে ঘাম দেখা দেয়।

মিলি দাঁতে দাঁত ঘষে, 'দেখো—দেখো, হাঁদারাম, দেখতে পাচ্ছো তো ব্যাপারখানা?'

ঠিক সেই সময় পঁয়েজির মুদী ব্যবসায়ী ম'সিয়ে ক্রু নৌকায় ক'রে নদী পার হচ্ছিলেন। আমার উদ্দেশ্যে হাঁক দিয়ে বললেন, 'ম'সিয়ে বার্নেড, আপনার এতদিনকার জায়গা কি অপরে দখল ক'রে নিলো?'

'হাঁ, ম'সিয়ে ক্রু'; আমিও চড়া গলায় জবাব দিলুম, 'পৃথিবীতে অনেক ইতরজনও তো আছে, যারা কোনটা কার সে খবর রাখে না, অপরের জিনিসে ভাগ বসায়।'

বললুম বটে। কিন্তু ঐ মাছ-শিকারীর কানে ঢুকেছে বলে মনে হলো না। গরুর মতন মুটকী বৌটাও নির্বিকার, কান পেতেছে বলে তো মনে হয় না।"

আর একবার বাধা দিলেন বিচারক, 'সংযত হয়ে কথা বলুন। বিধবা মাদাম ফ্লেমেচ্ স্বয়ং এখানে উপস্থিত আছেন। আর আপনি তাঁকে অপমান-সূচক কথা বলছেন।'

সঙ্গে সঙ্গে অপ্রতিভ রেনার্ড ক্ষমা চেয়ে নেয়, "আমাকে মাপ করবেন স্যর। অত্যধিক উত্তেজনায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম!

প্রথম মাছটা মারবার পর পনেরো মিনিটও পার হয়নি, ক্ষুদে লোকটা আবার তার বঁড়শিতে গেঁথে তুললে পেল্লাই চেহারার এক রুই—তারপর, কি আর বলবো, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আর একটা! তারপর আর একটা...

আমি চোখের জল আটকে রাখতে পারছি না। আমার স্ত্রী তো রাগে

ফুটছে টগ্‌ বগ্‌ করে; থেকে থেকে সে তেড়ে আসছে আমার দিকে, প্রচণ্ড অভিমানে খিস্তি দিচ্ছে, 'বোকারাম, দেখো, ঐ লোকটা তোমার সব মাছ চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছো? তোমার শরীরে কি মানুষের চামড়া? আজ কপালে কিচ্ছু জুটবে না, একটা ব্যাঙও পাবে না। ইস্‌, রাগে আমার আঙুল চুলকাচ্ছে।'

তখনো আমি তাকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করছি, 'দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করো। তখন চোরটা লাঞ্চ খেতে গেলে আমরা আমাদের জায়গায় উঠে যাবো।' ধর্মাবতার, আমি আমাদের মাছ মারার জায়গাতে বসেই লাঞ্চ করতাম। ডেলিলায় খাবার দাবার মজুত থাকতো। অপর কোন মৎস্য-শিকারীর এই অভ্যাসটি দেখিনি। তাই নিশ্চিন্ত ছিলুম, ওরা নিশ্চয় যথাসময়ে লাঞ্চ খেতে উঠে যাবে।

কিন্তু কী ভয়ানক!

ঘড়িতে বারোটা বাজলো।

আর ঐ বদমাইশটা আমাদের দেখাদেখি কাগজের মোড়ক খুলে তাদের লাঞ্চের খাবার বের করে—একটি আস্ত পাখির মাংস। খেতে খেতেই আবার বঁড়শিতে একটা কাতলা গাঁথলে সে। দিব্যি গেঁথে তুললে!

মিলি আর আমি তখন সবে লাঞ্চ করতে বসেছি। ঐ দৃশ্য দেখে আমাদের আর খাবার স্পৃহা থাকে না।

আমি তখন খাবার হজম করার জন্য খবরের কাগজ পড়তে আরম্ভ করি। প্রতি রবিবার নদীর ধারে ছায়ায় বসে ঐ সময় আমি 'গিলব্লাস' পত্রিকাখানা পাঠ করে থাকি। কারণ, একমাত্র এই রবিবারেই গিলব্লাসে লেখিকা কলমবাইন লিখে থাকেন। প্রায়ই আমার স্ত্রীকে রাগিয়ে দেই এই বলে যে, আমি কলমবাইনকে চিনি। আসলে এটা সত্যি নয়। ঐ লেখিকাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি না, কোনদিন তাঁকে চাক্ষুষও দেখিনি; কিন্তু তিনি জানেন, কি ক'রে লিখতে হয়; বিশেষতঃ মেয়েদের কথা ভারী জমিয়ে লিখতে পারেন। তাঁর লেখা আমার ভালো লাগে, তাঁর মতন লেখা খুব কম লেখক-লেখিকাই লিখতে পারেন।

যাই হোক, আমার স্ত্রী রেগেই ছিল; এবার রাগের মাত্রাটা আরো বাড়লো।

ঠিক এই সময় দুইজন সাক্ষী নদীর অপর ধারে এসে উপস্থিত হলেন—

তাঁদের একজন মঁসিয়ে লুইস্ লেডুর, অপরজন মঁসিয়ে জাঁ ডুরডেণ্ট। আমি তাঁদের এখানে অনায়াসে সনাক্ত করতে পারি।

বেটে লোকটি আবার মাছ-শিকারে মন দেয়। খুব কম সময়ের মধ্যেই প্রচুর মাছ সে তুলতে থাকে এবং প্রতিবারই আমার ভেতরটা কেঁপে কেঁপে ওঠে।

মিলি কানের কাছে বলতে থাকে, 'আমাদের জায়গা। রোজ আসছি, মাছ ধরছি। অথচ···কল্পনা করা যায় না।···'

আমার শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে যেন একটা হিমেল স্রোত নামতে থাকে। মিলির একটানা গঞ্জনা, 'তুমি মানুষ নও। মানুষ কখনো এরকম হয় না। একটা মুরগীর কলিজাতেও এর চেয়ে বেশি সাহস থাকে।'

'দেখো,' আমি বলে উঠি, 'বরং চলো, এখান থেকে উঠে যাই।'

আমার কথা শুনে সে ফোঁস ক'রে ওঠে, 'ছিঃ ছিঃ! পুরুষ নামেরও তুমি অযোগ্য। অপরের হাতে নিজের জায়গা ছেড়ে দিয়ে পালাতে চাইছো? তা হলে যাও, কাপুরুষের মতন লেজ গুটিয়ে পালাও!'

মিলি একেবারে আমাকে চেপে ধরেছে! সমানে শানাচ্ছে তার আক্রমণ। অবশ্য তখনো আমি যথাসাধ্য সংযত, নির্বিকার।

কিন্তু ঠিক তখনই, হায়, ঠিক তখনই ঐ নচ্ছার লোকটা আর একটা মাছকে তার বঁড়শিতে গেঁথে তুললে। আহা! ঐ রকম বিশাল লোভনীয় মাছ আমি জীবনে দেখিনি। কখনো দেখিনি।

আমার স্ত্রীও ঘুরে তাকিয়ে আর স্থির থাকতে পারে না। সে তার গলা সপ্তমে তুলে দেয়। ওদের শুনিয়ে শুনিয়েই হল্লা করে, 'আমাদের মাছ চুরি করে পালাচ্ছে। চোর। 'চার' ফেললাম আমরা, আর মাছ পাকড়াচ্ছে ওরা। ওদের অন্তত আমাদের চারের পয়সা দিয়ে দেওয়া উচিত।'

মিলির চীৎকার শুনে বেটে খাটো শিকারীর দশাসই স্ত্রীও সোচ্চার হয়ে ওঠে, 'মাদাম কি আমাদের বলছেন?'

'আমি বলছি মাছ-চোরদের। জায়গাটায় চার ফেললাম আমরা আর আমাদের মাছ মারছে অন্যরা।'

'আপনি কি আমাদের মাছ-চোর বলছেন?'

এবং শুরু হলো তাদের যুক্তি, তারপর তর্কাতর্কি, তারপর গালিগালাজ। ঈশ্বর, তারা যে কী অশ্রাব্য ভাষায় খিস্তি-খেউর শুরু করলে! ওদের এই

খিস্তি শুনে বেশ আমোদ পাচ্ছিলেন আজকের মামলার দুই সাক্ষী ; রগড় করে বলেওছিলেন তাঁরা, 'আপনারা একটু চুপ করুন। মাছরা যে সব পালিয়ে যাচ্ছে।'

অথচ ঘটনা এই যে, আমি ও সেই ছোট শিকারী তখনো চুপচাপ জলের দিকে মাছের আশায় চেয়ে আছি। এমন ভাব দেখাচ্ছি যেন আমরা ঐ দুই মহিলার ঝগড়া-ঝাটি শুনতেই পাচ্ছি না।

কিন্তু ঈশ্বরের বিধানে শেষ রক্ষা হলো না। ওরা সমানে চীৎকার করছে।

'তুই মিথ্যাবাদী।'

'তুই নষ্ট মাগী।'

'তুই বেশ্যা।'

'তুই কুকুরী।'

চললো,—চললো এমন অশ্রাব্য বাদানুবাদ।

তারপর হঠাৎ এক তীক্ষ্ণ শব্দে আমি চমকে উঠে ঘুরে তাকাই। দেখতে পেলাম, মুটকী মেয়েছেলেটা ছাতা হাতে আমার স্ত্রীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আঘাত করছে। দু'জনই দু'জনকে আঘাত করছে। মিলির হাতিয়াড় তার দুই ধারালো চটপটে হাত, যা দিয়ে সে প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছে। সে এক হাতে ওর চুল ধরে অন্য হাতে সমানে চড় কষাচ্ছে। আঁচড়ে খামচে নাকাল করে দিচ্ছে। বুলেটের মতন এসে পড়ছে তার হাতের চড়গুলি।

আমি কিন্তু সত্যি ঐ মারামারিতে সক্রিয় অংশ নিতুম না। মেয়েদের লড়াইয়ের ফয়সলা মেয়েরাই করবে। আমরা পুরুষমানুষরা কেন তার সামিল হবো?

কিন্তু ঐ বেটে লোকটার মাথায় কী যে শয়তান এসে ভর করলো। সে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে তেড়ে এলো আমার স্ত্রীর দিকে। 'না, না, বন্ধু এ অত্যন্ত অন্যায়।' আমি আর নিষ্ক্রিয় থাকতে পারি না। লোকটার একটা হাত চেপে ধরি এবং অন্য হাতে পর পর দুটো ঘুঁষি। প্রথমটা লাগলো তার নাকে, দ্বিতীয়টা বেরিয়ে গেল বাতাস কেটে। ওর শরীরটা ঝাঁকানি খায়, পা দুটো টলমলিয়ে ওঠে এবং সে টলে পড়ে যায় নদীতে—একেবারে সেই গহ্বরে।

হুজুর আমি তাকে জলে ফেলে দিতে চাইনি। যত নষ্টের গোড়া দুই

রণচণ্ডী মেয়েমানুষ। আমি তখন ওদের ছাড়াতে চেষ্টা করছি। ভাবতেও পারিনি, লোকটা পড়ে গিয়েই ভক ভক ক'রে জল গিলবে আর তলিয়ে যাবে। বরং আমি নিজেকেই বোঝালুম: লোকটা একটু ঠাণ্ডা হোক।

আর ঐ দুই মেয়েমানুষকে আলগা করা যে কী দুঃসাধ্য কাজ। কী ভয়ানক মেয়েমানুষ তারা!

যাক্, আমার গল্প প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আরো সংক্ষেপে শেষটুকু বলছি। পাঁচ থেকে দশ মিনিট লেগেছিল মেয়েছেলে দুটোকে পৃথক করতে।

ফিরে তাকালাম। জলে কিন্তু কোন চাঞ্চল্য নেই। হিম নিথর। নদীর অপরপার থেকে লোকেরা চীৎকার করে বলে: জল থেকে ওকে তোলো। ডুবে গেল যে লোকটা!

কিন্তু ঐ গহ্বর থেকে তাকে তুলে আনা আমার সাধ্যাতীত।

অবশেষে, মিনিট পনেরো বাদে 'লক-কিপার' এলো, তার সঙ্গে এলেন আরো দু'জন ভদ্রলোক লোহার আঁকড়া নিয়ে। তারা ওকে উদ্ধার করলেন সেই আট ফিট গভীর জলের তলা থেকে।

হুজুর, অকপটে জানালুম—এই হলো ঘটনা। আমি নিরপরাধ।

সাক্ষীরা আসামীর কথা সমর্থন করলেন! বিচারে রেনার্ড নিরপরাধ সাব্যস্ত হলো।

ইঙ্গিত

[The Sign]

ছোট্ট চেহারার যুবতী মারকিউস্ ত্ত রেনিডন এখনো ঘুমিয়ে আছে। শোবার ঘরটি গরম, সুবাসিত; নীচু পালঙ্কের ওপর বিস্তৃত ছিমছাম নরম বিছানা। এতবড় বিছানায় সে একা। আসলে বিবাহ বিচ্ছেদের পর নিরুদ্বেগে দীর্ঘ ও গভীর ঘুমের অতলান্তে ডুবে যেতে পারছে মারকিউস্।

এ ঘর সংলগ্ন নাতিদীর্ঘ নীলাভ বৈঠকখানায় কে যেন তীক্ষ্মস্বরে কথা বলছে। ঘুম ভেঙ্গে যায় মারকিউসের। আওয়াজ শুনে সে বুঝতে পারে, কথা বলছে তার প্রিয়তমা বান্ধবী বেরোনেস ত্ত গ্রাঞ্জারি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে

পরিচারিকাকে বোঝাবার চেষ্টা করছে, তার এখনই মারকিউসের সঙ্গে দেখা করা দরকার।

মারকিউস্ চট করে উঠে বসে। এগিয়ে গিয়ে দরজার খিল খোলে। দু'হাতে পর্দা সরায় এবং বাইরের লোকের দৃষ্টির সামনে প্রথমেই ভেসে ওঠে তার সুন্দর ছোট্ট মাথা, অজস্র মেঘের মতন চুল ফুলে ফেঁপে আছে।

'কি ব্যাপার এই সাত সকালে?' মারকিউস্ বলে, 'এখনো তো ন'টা বাজেনি।'

বেরোনেসের মুখের রং ফ্যাকাশে, কেমন যেন ভয়াক্রান্ত বিবর্ণ।

'খুব জরুরি কথা। তোকে বলতেই তো এলাম। আমার খুব বিপদ রে।'

'ভেতরে আয়।'

বেরোনেস্ ঘরের মধ্যে ঢোকে। তারা পরস্পরকে চুমু খায়। মারকিউস্ আবার খাটের ওপর উঠে বসে। বাড়ির ঝি জানালাগুলি খুলতে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে বাতাস এবং আলো একযোগে লুটিয়ে পরে ঘরের সর্বত্র।

ঝি চলে যাবার পর মারকিউস্ বান্ধবীকে বলে, 'বল এবার, কি ব্যাপার।'

মাদাম দ্যঁ গ্রাঞ্জারি কাঁদছে। স্ফটিকের মতন অশ্রুর বিন্দুতে তার রমণী-মুখ আরো রমণীয়। চোখ না মুছেই সে বলে, 'বন্ধু, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমার ভীষণ ক্ষতি হয়েছে।···সারাটা রাত ঘুমাইনি, এক মিনিটও দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি। সব বলছি। আগে আমার বুকে হাত রেখে দেখ, হৃদ্‌পিণ্ডটা ধক্ ধক্ করছে।'

বলেই বেরোনেস্ মারকিউসের একখানা হাত এনে তার বুকের ওপর চেপে ধরে। যুবতীর সুরক্ষিত পুরুষ্টু পরিপূর্ণ বুক, যা অধিকাংশ পুরুষ শুধু কামনাই করে থাকে, একবার ভাবেও না—ঐ বুকের তলায় কি লুকিয়ে আছে। বেরোনেসের হৃদ্‌পিণ্ড সত্যি চঞ্চল, অতি দ্রুত ওঠা-নামা করছে।

সে বলতে থাকে:

ঘটনাটা ঘটেছিল গতকাল দিনের বেলায়···তখন চারটে হবে···অথবা সাড়ে চারটে। নির্ভুলভাবে সময়টা বলতে পারছি না। তুই তো আমার ফ্ল্যাট-বাড়িটা দেখেছিস, আমাদের ছোট্ট ড্রয়িংরুমটার কথা নিশ্চয় মনে আছে। আমি ঐ ঘরের জানালার ধারে বসে রোজ চলমান জনতাকে দেখি।

স্টেশান বরাবর ঐ পথে সর্বদাই একটা প্রাণচাঞ্চল্য, অতি-ব্যস্ততা এবং লোকে লোকারণ্য। আমার এসব দেখতে ভালো লাগে।

হাঁ, যা বলছিলাম, গতকাল জানালার ধারে একটা নীচু চেয়ারে বসে ছিলাম। জানালাটা খোলা, মন চিন্তাশূন্য; মুক্ত বায়ু সেবন করছিলাম। তুই নিশ্চয় মনে করতে পারছিস, কালকের দিনটা কী চমৎকার ছিল।

হঠাৎ আমার নজরে এলো, রাস্তার অপর ধারের একটা বাড়ির জানালার সামনেও একটি মেয়ে বসে আছে, পরণে তার লাল পোশাক; আমিও সেই সময় পরে ছিলাম ফিকে লাল রঙের একটা ফ্রক। তুই হয়তো সেই ফ্রকটা দেখিসনি।

আমি মেয়েটাকে চিনি না। হয়তো কোন নতুন ভাড়াটে এসেছে মাস খানেকের মধ্যে। এবং যে কারণেই হোক, গত এক মাসের মধ্যে একবারও তাকে আবিষ্কার করতে পারিনি।

কিন্তু এখন কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলুম, মেয়েটা সুবিধের নয়। প্রথম দর্শনেই আমি বেশ বিরক্ত হয়েছিলুম—ও ঠিক আমারই ভঙ্গীতে জানালার ধারে বসে আছে। তারপর, ক্রমশঃ কৌতুক বেড়েছে ওর কাণ্ড-কারখানা দেখে। সে কনুইতে ভর দিয়ে নীচু হয়ে আছে এবং রাস্তায় চলমান কোন কোন মানুষের দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে; প্রায় অধিকাংশ লোকই সঙ্গে সঙ্গে দিচ্ছে তার প্রত্যুত্তর। অনেকেই ঐ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে, এমন ভাবে মেয়েটার দিকে তাকায় যেন কোন কুকুর খাবারের ঘ্রাণ নিচ্ছে। বাত্‌চিৎও হয় চোখের আভাসে ইঙ্গিতে।

মেয়েটা আহ্বান জানায়: হবে নাকি?

তাদের তরফ থেকে জবাব আসে, 'সময় নেই' অথবা, 'আর একদিন হবে' অথবা, 'পয়সার টানাটানি' অথবা 'সরে যা অসভ্য মেয়ে।' এই শেষের কথাটা প্রায়শই বয়স্ক সংসারী কর্তাদের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে।

'তুই কল্পনাও করতে পারবি না, কী বিশ্রী লাগে ওকে ঐভাবে নোংরা ব্যবসা চালাতে দেখে।

কখনো কখনো তাকে দেখা যায় জানালার কপাটগুলি বন্ধ করে দিতে। নিবিষ্ট কৌতুকে চেয়ে দেখি, কোন একজন লোক ধীরে ধীরে তার ঘরের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকছে! দক্ষ মৎস্য-শিকারী যেমন চকিতে বঁড়শিতে মাছ গেঁথে তোলে, সেও ঠিক তেমনি নিপুণ তৎপরতায় ঐ লোকটাকে যেন নিজের

শরীরের সঙ্গে গেঁথে ফেলে। সেই মুহূর্তে স্বাভাবিক লজ্জায় আমি চোখের পাতা বন্ধ করি। অপর পক্ষের জানালাও বন্ধ হয়ে যায়। দশ অথবা বিশ মিনিট ধরে চলে তাদের কাজ-কারবার, এর বেশি কখনো নয়।

সত্যি বলছি, এই স্ত্রী মাকড়সার নিপুণতা দেখে আমার ভেতর ক্রমশঃ ঘৃণার চেয়ে মুগ্ধতা বাড়ে। ও কত চটপটে, আদৌ অপটু গ্রাম্য যুবতী নয়!

আমার অবাক জিজ্ঞাসা: কি করে এত চকিতে সে তার আবেদন রাস্তার লোকদের কাছে পৌঁছে দেয়? সে কি তার মাথা নাচিয়ে বিশেষ ইঙ্গিত জানায়? অথবা, লোকেরা তার দিকে তাকানো মাত্র কি সে হাতছানি দেয়?

উদগ্র কৌতূহলে চোখে একটা ছোট্ট দূরবীণ লাগিয়ে ওর সূক্ষ্ম কায়দাগুলি লক্ষ্য করি। বাহ, ব্যাপারটা তো বেশ সহজ: প্রথমে কটাক্ষ, তারপর মুচকি হাসি, তারপর মাথা হেলিয়ে যেন ইঙ্গিতে বলা, 'উপরে আসবে?'

কিন্তু গোটা কাজটাই অতি সূক্ষ্ম, চমকপ্রদ এবং আপাতভাবে স্বাভাবিক। সত্যি এর জন্য বিশেষ দক্ষতা ও অনুশীলনের দরকার।

আমার মনে আরো একটা জিজ্ঞাসা প্রবল হয়ে ওঠে: আচ্ছা, আমি কি পারি ওর মতন নিপুণতায় ইঙ্গিত করতে, রাস্তার লোকদের আকর্ষণ করতে? ব্যাপারটাতে সত্যি শিল্পসম্মত সৌন্দর্য আছে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করি। বান্ধবী, কি বলবো, ঐ মেয়েটার চেয়েও অনেক বেশী দক্ষতায় পারলুম। আমার অঙ্গ-ভঙ্গী যেন আরো সূক্ষ্ম ও কার্যকরী। বেশ ফুর্তি হলো; তাড়াতাড়ি ফিরে যাই জানালার ধারে নিজের আসনে।

তার তখন কোন খদ্দের নেই, সময় খারাপ—কেউ আসছে না। পরিস্থিতিটা ওর পক্ষে নিশ্চয় খুব বিপজ্জনক; কারণ, খদ্দের না আসা মানেই তার রুজি-রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া। তা ছাড়া, যারা আনন্দ লুটতে আসে, তারা কিন্তু সকলেই খারাপ নয়; কিছু কিছু ভালো মানুষও গণিকাদের সংস্পর্শে এসে থাকে।

ইতিমধ্যে দৃশ্যপটের আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষণীয়। লোকেরা আর তার বাড়ির সামনে সঞ্চরণশীল নয়। তারা হেঁটে পার হচ্ছে আমাদের বাড়ির নীচ দিয়ে। সূর্য ক্রমশঃ পশ্চিমে। একের পর এক অপরিচিত মানুষ আসে-

যায়। কেউ যুবা, কেউ বা বৃদ্ধ ; কুৎসিৎ লোকও আছে, আবার সুপুরুষরাও নজর কাড়ে। কারুর চুল ধূসর, কারুর বা মাথা একেবারে সাদা।

চলমান জন-স্রোতে এমন কয়েকজনকে দেখলাম, যাদের চেহারা অপলকে চেয়ে দেখার মতন। সত্যি, সুন্দর পুরুষ। আমার স্বামী বা তোর প্রাক্তন স্বামী ওদের পাশে দাঁড়াতেই পারবে না! এই সব রূপবানদের একজনের ওপর তো আমার পরীক্ষা চালাতে পারি!

আমার স্বগত-ভাষণ শুরু হয়: আমি একজন আদর্শ নারী। কিন্তু যদি নিছক মজা করবার জন্যই ওদের কাউকে ঐ গণিকাটির মতোই ইঙ্গিত করি, তবে কি লোকটা আমার ইঙ্গিতের তাৎপর্য বুঝতে পারবে? আমি কি সত্যি ঐ ধরণের ছলা-কলা প্রয়োগ করতে সমর্থ?…এই কথাগুলি ভাববার সঙ্গে সঙ্গে আমার মানসিক জগতে যেন এক বিরাট বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা ঘনিয়ে এলো। প্রচণ্ড এক বাসনার তাগিদে অস্থির হয়ে উঠি। এমন এক ধরণের গোপন ইচ্ছা যে চকিতে এত বিরাট ও ব্যাপক হয়ে উঠতে পারে, কোনদিন কল্পনা করিনি। এই অস্থিরতার সঙ্গে একমাত্র সন্তানাকাঙ্ক্ষী নারীরই তুলনা করা চলে।…

ভেতরে কামনার, কৌতুকের, জিজ্ঞাসার অনুরণন ; নিজেকে সংযত রাখা দুরুহ! তুই কি আমাকে খুব নির্বোধ ভাবছিস? আসলে আমরা, মেয়েরাই এমন নির্বোধ। আমার ধারণা, প্রতিটি মেয়ের অন্তঃস্থলে এক-একটি বানর লুকিয়ে আছে। আমি শুনেছি [একজন ডাক্তার আমাকে বলেছিলেন] আমাদের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে নাকি বানরদের মানসিকতার অনেক সাদৃশ্য আছে। আমরা বানরদেরই মতন চিন্তা করি, সেই ঢঙে কথা বলি, বা বলতে চাই। কী যাচ্ছেতাই ব্যাপার।

আমি তখন নিজের এক্তিয়ারের বাইরে। অদমনীয় কৌতুকের শিকার!

আবার নিজেকেই নিজে যুক্তি-জালে আবদ্ধ রাখবার প্রয়াসে বলি: ওদের যে কোন একজনের ওপর নিজের অধিগত বিদ্যা প্রয়োগ করে দেখবো। কেবলমাত্র একজনের ওপর। শুধু দেখবো, প্রতিক্রিয়াটা কি দাঁড়ায়! কি আর হবে আমার? কিছুই হবে না। দু'জন দু'জনের দিকে চেয়ে একটুখানি হাসবো মাত্র। ব্যস্, আর কিছু নয়। তারপর আর কোন দিন তার দিকে আমি ভ্রূক্ষেপও করবো না। আমি তাকে চিনতেই পারবো

না। আর সে যদি আমাকে চিনতে পারে, আমি অস্বীকার করবো। চুকে যাবে ব্যাপারটা।

সুতরাং শুরু হলো বাছাইপর্ব! স্বভাবতই আমি বেছে নিতে চাই, কোন সুদর্শন যুবককে। হঠাৎই দৃষ্টি আটকে গেল একজনের ওপর—জনৈক দীর্ঘকায় সুপুরুষ রাস্তা পার হচ্ছে। ভারী সুন্দর যুবা। তুই হয়তো জানিস না, সুন্দর লোকদের প্রতি বরাবরই আমার একটা দুর্বলতা আছে।

কাছাকাছি আসতেই চোখাচোখি হলো। আমি সরাসরি তাকাই। সেও তাকায়। আমি ঠোঁট টিপে হাসি। সেও হাসে। আমি ইঙ্গিত করলাম—হাঁ—চকিতে ইঙ্গিতটুকু জানালাম। আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে সেও ইঙ্গিতে জানায়: যাচ্ছি।

তারপর—তারপর—কি মনে হয় তোর?

সে আসছে, বিশ্বাস কর, সে এই বাড়ির দিকে আসতে থাকে। পায়ে পায়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়।

নিশ্চয় সেই মুহূর্তে আমার মনের অবস্থাটা কল্পনা করতে পারছিস। মনে হলো, এখনই কোথাও লুকিয়ে পড়ি। ইস, কী যে আতঙ্ক তখন আমার! ভেবে দেখ, সে নিশ্চয় আমার স্বামীর বিশ্বস্ত চাকর যোশেফের সঙ্গে কথা বলবে। আর যোশেফ ভাববে, লোকটার সঙ্গে নিশ্চয় আমার অনেক দিনের পরিচয়।

কি করবো? কি বলবো? কি করতে পারি?

আর কয়েক মুহূর্ত বাদেই সে এই ঘরের বেল টিপবে। আমার তখন কি করার বা বলার থাকতে পারে?

ভাবলাম, ছুটে গিয়ে তাকে বলবো: দেখুন, আপনি ভুল করছেন, দয়া ক'রে চলে যান। সে নিশ্চয় একজন অসহায়া নারীকে রেহাই দেবে।

এই রকম ভেবেই ত্রস্তে দরজার কাছে দাঁড়াই এবং কাঁপা হাতে দরজা খুলি। এবং দরজা খুলতেই ভীষণ চমক—সে এসে দাঁড়িয়েছে, বেল টিপতে উদ্যত।

ভয়ানক আতঙ্কে বিড় বিড় করতে থাকি: স্যর, চলে যান, আপনার ভুল হয়েছে। আমি বিবাহিতা, স্বামী নিয়ে ঘর করি। আমারই খুব বড় ভুল হয়ে গেছে। দূর থেকে চিনতে পারিনি; আপনাকে দেখতে অনেকটা আমার এক পরিচিত জনের মতন। ক্ষমা করবেন…

আমি তো একটানা বলে গেলাম। কিন্তু তারপর? তারপর কি হলো বলতে পারিস?

সে হো হো করে হেসে উঠলো, শাণিত গলায় বললো, 'সুন্দরী, আমার সেলাম নাও। তোমার বক্তব্য আমার জানা। আমি তোমার সব জানি। জানি তুমি বিবাহিতা এবং এখন থেকে একটি লুইস্ স্বামীর বদলে দুটি লুইসকে স্বামী হিসেবে পাবে। দু'জনকেই পাবে গো। দাও, এবার ভেতরে ঢুকবার পথ দাও।'

বলতে বলতে সে আমায় ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢোকে। নিজের হাতে কপাট বন্ধ করে। আমি তার সামনে ভয়ে থরথরিয়ে কাঁপছি।

সে আমায় জাপটে ধরে চুমু খায়; আমার ঘাড় ও বুক সম্পূর্ণভাবে আঁকড়ে রেখে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে ড্রয়িংরুমের দিকে। ড্রয়িংরুমের দরজা খোলা।

তারপর সে ঐ অবস্থাতেই ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নেয়, যেন এই ঘরটার মূল্যায়ন করে, বলে, 'তুমি তো বেশ ভালো জায়গাতেই আছো হে। তবে কেন 'জানালার-খেলা' খেলে যাচ্ছো, রূপসী?'

আমি আবার তাকে যথাসাধ্য অনুনয়-বিনয় করতে থাকি, 'সত্যি, আমি সংসারী, দেহ নিয়ে ব্যবসা আমি করি না। দয়া করে আমাকে রেহাই দিন। চলে যান। আমার স্বামী চলে আসবেন। যে কোন মুহূর্তে চলে আসতে পারেন। তার আসার সময় হ'য়ে এলো। আমি শপথ ক'রে বলছি, আপনার ভুল হয়েছে।'

সে নির্বিকার গলায় মজা করে, 'আসতে দাও, ঘাবড়াবার কি আছে। এলে তার হাতে পাঁচটা ফ্রাঙ্ক দিয়ে পাঠাবো রাস্তার ওপাশে মাল খেয়ে আসতে।'

অগ্নিকুণ্ডের উপরিস্থিত কারুকাজ করা তাকের ওপর রাখা আমার স্বামীর ছবিটার দিকে চেয়ে সে বলে, 'কার ফটো?...তোমার স্বামীর?'

'হাঁ, তাঁর।'

'বিলকুল বোকা বোকা চেহারা। আর ওটি কার ছবি? তোমার কোন বান্ধবীর বুঝি?'

ঐ ছবিটা ছিল মাইরি তোর।—সান্ধ্য পোশাকে দাঁড়িয়ে আছিস। আমি ভাঙা গলায় বললাম, 'হাঁ, আমার এক বান্ধবী।'

'চেহারায় চটক আছে। নিশ্চয় আমার সঙ্গে মুলাকাৎ করিয়ে দেবে?'

ঘড়িতে তখন প্রায় পাঁচটা বাজতে চলেছে। বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করছে, যদি এই লোকটা বিদায় নেবার আগেই স্বামী চলে আসেন! তা হলে…তা হলে…আমার সর্বনাশ হবে…আমার মাথা কাটা যাবে…চোখে সর্ষেফুল দেখছি…ঐ অবস্থাতেই ভাবতে থাকি…মরিয়া হয়ে উপায় উদ্ভাবন করছি…সবচেয়ে ভালো হয় যদি…যদি…যদি লোকটার হাত থেকে তাড়াতাড়ি রেহাই পাওয়া যায়…এবং রেহাই পাবার জন্য এখনই ঐ বস্তুটা আমাকে দিতেই হবে…নিশ্চয় বুঝতে পারছিস, আমি কি বলছি—আমাকে আজ ও না নিয়ে তো ছাড়বে না—কাজেই কালহরণ না করে যত তাড়াতাড়ি দেয়া যায়, ততই নিরাপদ—সুতরাং, আমি তখন লোকটাকে নিয়ে স্বেচ্ছায় ড্রয়িংরুমে ঢুকলাম, নিজের হাতে দরজা বন্ধ করলাম—এবং সেখানেই যা হবার, হলো।

মারকিউস্ হাসতে থাকে, হাসি থামতেই চায় না; হাসির দমকে তার ছোট্ট শরীর কাঁপে, মাথাটা নুয়ে পড়ে বালিশের ওপর। হাসির বেগ একটু কমলে বলে:

'তারপর?—সে তো নিশ্চয় এক বিশাল সুপুরুষ?'

'তা ঠিক!'

'তাহলে, সুখ তো ঠিকই পেয়েছিস?'

'কিন্তু—আসল ব্যাপারটা যে অনেক ভয়ানক—লোকটা যাবার সময় কি বলে গেল জানিস? বললো, 'আসছে কাল আবার আসছি, ঠিক এই সময়—' আমার—আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে—তুই কল্পনাও করতে পারবি না, লোকটা কি রকম নাছোড়বান্দা—দেহের মতনই মজবুত তার মনটাও।—আমি কি করবো?—অথবা, কি বলবো?—আমি এখন কি করতে পারি, বল?'

মারকিউস্ উঠে বসে, চিন্তা করে। তারপর সিদ্ধান্ত দেয়:

'ওকে পুলিশে ধরিয়ে দে।'

বেরোনেস্ যেন ঝড়ের মুখে কেঁপে ওঠে, 'কি বলছিস তুই! পুলিশে ধরিয়ে দেবো? কোন অভিযোগে?'

'এর জন্য আবার এত ভাবতে হয়! সোজা পুলিশের কাছে গিয়ে বলবি, একটা লোক তিন মাস ধরে তোর পিছু লেগেছে; গতকাল সে জোর করে

তোর ঘরে ঢুকতে চেষ্টা করেছিল; আবার আজ আসবে বলে শাসিয়েও গেছে। এই অবস্থায় আইনের সাহায্য ভিক্ষা করা ছাড়া তোর যেন আর গত্যন্তর নেই। দেখবি, তারা নিশ্চয় তোর সঙ্গে দু'জন অফিসারকে দিয়ে দেবে। ঐ অফিসার দু'জনই সেই লোকটাকে গ্রেপ্তার করবে।'

'কিন্তু সে যদি তখন সব বলে দেয়—'

'ধ্যাৎ বোকা। কে আর বিশ্বাস করবে ওর কথা? তুই একটা মেয়েমানুষ, আর এ সব ক্ষেত্রে মেয়েদের এজাহারেরই মূল্য বেশি।'

'আমার কখনই এত সাহস হবে না।'

'এছাড়া বাঁচবার দ্বিতীয় পথ নাই। হয় এটা করবি, না হলে মরবি।'

'কিন্তু সে তো ধরা পড়বার সময় আমাকে বিদ্রূপ করবে। আমার পক্ষে সহ্য করা কঠিন।'

'বটে। তা হলে একটা কথাই বলতে হয়।'

'কি কথা?'

'এক-আধজন লোককে সাক্ষী রেখে তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করবি।'

'ক্ষতিপূরণ! তাও সাক্ষী-সাবুদ রেখে।···আমার স্বামী আমাকে ছেড়ে চলে যাবেন···তোর কথা শুনে আমার সেই 'দু'জন লুইস'-এর কথাই মনে আসছে, আমার স্বামীর ছবি দেখে লোকটা যা বলেছিল।'

'দু'জন লুইস?'

'হাঁ।'

'দু'জনের বেশি জোটেনি?'

'না।'

'তা হলে আর কি করলি। আমি হলে অপমানিত বোধ করতুম। ভালো।'

'কি ভালো? আমি যদি এভাবে ক্ষতিপূরণের টাকা আদায়ও করি, তা হলেও সেই টাকা নিয়ে আমি কি করবো?'

মারকিউস্ মুহূর্তমাত্র দ্বিধা করে গম্ভীরস্বরে বলে, 'টাকাটা দিয়ে তোর স্বামীকে কিছু একটা উপহার দিবি। এর চেয়ে চমৎকার সমাধান আর হয় না।'

কাপুরুষ

[A Coward]

সম্ভ্রান্ত মহলে তার পরিচিতি ছিল "সদাশয় সিগনলস্" নামে, যদিও তার সম্পূর্ণ নাম ভাইকাউন্ট গোনত্রান-যোশেফ দ্যঁ সিগনলস্। তার মা-বাবা বেঁচে নেই, পর্যাপ্ত আয়। লোকে বলে সে নাকি খুব চালাক-চতুর ও সাহসী।

চেহারাখানা চমৎকার। সুন্দর একখানা গাড়ি আছে। রসিয়ে রসিয়ে গল্প বলার সময় তার আভিজাত্য ও অহঙ্কার ফুটে ওঠে। তার বিশাল গোঁফ ও ইঙ্গিতময় চোখ স্বাভাবিক কারণেই মেয়েদের কাছে আকর্ষণীয়।

লোকের ধারণা, তার নিশ্চয় যুবকসুলভ প্রেম-ভালবাসার একাধিক অভিজ্ঞতা আছে। সুদেহ ও মুক্ত মানসিকতা নিয়ে সিগনলসের প্রাত্যহিক সুখী উদ্দাম জীবনযাত্রা। সকলেরই ধারণা, সে তলোয়ার চালাতে নিপুণ এবং নিপুণতর পিস্তলের সাহায্যে লক্ষ্যভেদ করতে।

ডুয়েল লড়ার সময়, সে বলে থাকে, 'আমি পিস্তলকেই বেছে নিতে চাই। কারণ, পিস্তলের সাহায্যে আমি অনেক সহজে প্রতিপক্ষকে খতম ক'রে ফেলি।'

এক সন্ধ্যায় সে তার দুই বান্ধবী সহ থিয়েটার দেখতে গেল। সঙ্গে বান্ধবীদের স্বামীরাও ছিলেন। থিয়েটার শেষ হবার পর সে ওদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে যায় টরটনির কাফেতে। কিছুক্ষণ ঐ কাফেতে বসে থাকবার পর একটা দৃশ্য তাকে সচেতন করে তোলে। সে দেখে, একটি লোক খানিকটা ব্যবধানে বসে তার এক বান্ধবীর দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে; সেই দৃষ্টি একগুঁয়ে ও অভব্য। বান্ধবীটি ঐ দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে মাথা নিচু করে, তার স্বামীকে চাপা গলায় বলে, 'দেখো, ঐ লোকটা কী বিশ্রীভাবে আমার দিকে চেয়ে আছে। আমি চিনিনা। তুমি চেনো নাকি?'

স্বামীটি অবশ্য কিছুই দেখতে পেলেন না; তবু, চোখ তুলে বললেন, 'না, চিনিনা তো!'

মুখের রেখায় কিছুটা হাসি বজায় রেখেই রাগতঃ স্বরে বান্ধবী মন্তব্য করে, 'রাগে গা জ্বলে যায়। আমার সরবৎ খাবার মেজাজটাই নষ্ট করে দিলো।'

তার স্বামী কাঁধ ঝাঁকিয়ে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করেন, 'পাত্তা দিওনা, তাকিও না। ওসব নোংরা লোকের সঙ্গে ঝামেলা করতে গেলে ব্যাপারটা অনেকদূর গড়াতে পারে।'

কিন্তু ঠিক তখনই হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো ভাইকাউন্ট। তার চোয়াল কঠিন, —বেয়াদপের বেয়াদপি আর যে-ই সহ্য করুক, সে করবে না। পার্টিটাকে এ ভাবে নষ্ট হতে সে দিতে পারে না। তার মনে হলো, অপমানটা তার গায়েই লাগছে ; যেহেতু সে-ই আমন্ত্রণ করে এনেছে এই দুই মহিলা ও তাদের স্বামীকে। এ ব্যাপারে একটা হেস্তনেস্ত করার দায়িত্ব তারই, আর কারুর নয়।

পায়ে পায়ে সে লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, বলে, 'দেখুন, মশাই, ঐ মহিলাদের দিকে আপনার দৃষ্টিকে একটু সংযত রাখুন। ব্যাপারটা অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করছি এবং আমার পক্ষে সত্যি হজম করা কষ্টকর হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। চুপচাপ নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকুন।'

'থামুন।'

লোকটাও সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁজিয়ে ওঠে।

'সাবধান,' দাঁতে দাঁত চেপে ভাইকাউন্ট হুঁশিয়ার করে দেয়, 'আমাকে ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করতে উত্তেজিত করবেন না। পরিণামটা সুখকর হবে না।'

লোকটি এর জবাবে এমন একটি অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করে, যা কোন রুচিশীল মানুষ সহ্য করতে পারবে না। আর সেই শব্দটা কাফের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অনুরণন তোলে এবং এর অশালীন প্রভাবে সকলেই স্তম্ভিত কম্পিত।

যারা তাদের দিকে পিঠ দিয়ে ছিল, ঘুরে তাকায়, মাথা তুলে দেখে ঐ রকম একটা অভব্য মন্তব্যের উৎসকে।

তিনজন ওয়েটার যেতে যেতে ঐ খিস্তি শুনে লাট্টুর মতন পাক খায় ও ঘুরে তাকায়। কাউন্টারের পিছনে বসে থাকা দু'জন মহিলা শিউরে ওঠেন এবং স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতন তাদের শরীরের উর্দ্ধাংশ কিছুক্ষণ দুলতে থাকে।

মুহূর্তের জন্য অখণ্ড নীরবতা।

তারপরই বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয় একটা তীব্র আওয়াজ।

ভাইকাউন্ট প্রচণ্ড জোরে ঘুঁষি কষিয়েছে লোকটার কানে।—মারামারি থামাতে সকলেই ছুটে আসে। ভবিষ্যতের এক 'ডুয়েল' লড়াইয়ের সম্ভাবনা জন্ম নেয়। তারা দু'জনই পরস্পরের নাম-ঠিকানাসহ পরিচয়পত্র বিনিময় করে। ভবিষ্যতে উপযুক্ত সময়ে মুলাকাৎ হবে।

ঘরে ফিরে স্নায়ু-জর্জর ভাইকাউন্ট কয়েক মিনিট উপর-নীচ কেবল পায়চারি করে বেড়ায়। রীতিমত উত্তেজনায় তার ভাবনার পরিধি কেবল একটিমাত্র বিন্দুতে কেন্দ্রিভূত: 'ডুয়েল লড়তে হবে। ডুয়েল—'

নিজের স্বপক্ষে সে যেন শক্তি খুঁজে বেড়ায়। তার ভুলটা কোথায়? তার মতন লোক ঐটুকু সাহস দেখাবেই। লোকেরা এই নিয়ে বলাবলি করবে, তার প্রতি সমর্থন জানাবে, অভিনন্দিত করবে!

মানসিক রোগীর মতন চড়া গলায় আচমকা সে বলে ওঠে:

'শালা শিকারী কুকুর।'

কথাটা বলার পর সে বসে পড়ে এবং ঘটনাগুলিকে আবার মনে মনে পর্যালোচনার প্রয়াস পায়। আগামী সকালে সে নিশ্চয় সম্ভাব্য দ্বন্দ্বযুদ্ধের সাহায্যকারীদের নির্বাচিত করবে। কিন্তু কাদের ওপর নির্ভর করা উচিত? 'ডুয়েলে' সাহায্যকারী হিসেবে সবচেয়ে নির্ভরশীল ও খ্যাতিমানদের নাম সে একে একে মনে করতে থাকে। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর দুটো নাম তার পছন্দ হয়,—মারকিউস্ দ লা তুর-নোর এবং কর্ণেল বুঁরদিন। প্রথমজন অভিজাত পরিবারের লোক, দ্বিতীয়জন সৈনিক। এ কাজে তাঁদের দক্ষতা প্রশ্নাতীত। তাঁদের নামগুলি কাগজে দেখলে লোকেরাও নিশ্চিন্ত বোধ করবে।

ভাইকাউন্টের তেষ্টা পায়। পর পর তিন গেলাস জল সে পান করে। তারপর আবার উপর-নীচ পায়চারি। অসীম উৎসাহে বুক ভরে উঠেছে। যদি সে এই সাহসিকতার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারে, যদি সে তার মনকে স্থির-নিবিষ্ট রাখতে পারে, যদি সবচেয়ে ভয়াবহ ও কঠিন ডুয়েল লড়ার সময়ও এই মানসিক স্থৈর্যটুকু বজায় থাকে, তবে তার সাফল্য অনিবার্য এবং তার সুনাম আরো সুদূর বিস্তৃত হবে।

লোকটার দেওয়া পরিচিতি-পত্রখানা সে তার পকেট থেকে বের করে টেবিলের ওপর রাখে। ঝুঁকে সেই নাম ও ঠিকানার ওপর চোখ বুলিয়ে নেয়। কাফেতে দাঁড়িয়েই এক ঝলক দেখে নিয়েছিল, বাড়িতে ফিরবার পথে

গাড়িতে বসে গ্যাসের আলোতে দ্বিতীয়বার পড়েছিল, এখন দেখছে তৃতীয়-বার তার নিজের ঘরে দাঁড়িয়ে।—

'জর্জ লা মিল, ৫১ রু মনসি।'

আর কিছু লেখা নেই।

সে ঐ ভাগ ভাগ করা অক্ষরগুলি পরীক্ষা করে। প্রতিটি অক্ষরের পিছনে বুঝি কোন রহস্য লুকিয়ে আছে। লুকিয়ে আছে যেন কোন অর্থবহ ইঙ্গিত।

জর্জ লা মিল?

কে এই লোক? কি সে করে? কেন সে ঐ মহিলার দিকে অমন দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল? কোন অজানা অচেনা লোক কি কখনো কোন ভদ্রমহিলাকে কখনো ঐভাবে চোখ মারে? ভাবনাটা বুকের মধ্যে কুরে কুরে খায়। আবার ভাইকাউন্ট চীৎকার করে ওঠে:

'শালা শিকারী কুকুর।'

আওয়াজ তুলেই তার যাবতীয় সক্রিয়তা পাথরের মতন কঠিন রূপ নেয়। মগজে শূন্যতা, দৃষ্টি নিবিদ্ধ কার্ডখানার ওপর। ক্রমশ তার স্নায়ুর ভাঁজে ভাঁজে এক প্রচণ্ড অস্বস্তির স্রোত বইতে থাকে। চিন্তাশক্তি একান্তই ভোঁতা। অদূরে পড়ে থাকা একটা খোলা ছুরি সে তুলে নেয় এবং অভাবনীয় হিংস্রতায় প্রতিপক্ষের পরিচিতি পত্রখানাকে সেই ছুরিতে বিদ্ধ করে।

অর্থাৎ, লড়াই হবেই।

কি সে বেছে নেবে—তলোয়ার না, পিস্তল? কারণ, সে মনে করে, অপমানিত পক্ষ হিসেবে আয়ুধ বেছে নেবার হক তার আছে। তলোয়ারের লড়াইয়ে ঝুঁকি কম; কিন্তু পিস্তল বেছে নিলে হয়তো তার প্রতিপক্ষ ঘাবড়ে গিয়ে পিছিয়ে যাবে। তলোয়ার হাতে লড়াই হলে সাধারণতঃ মৃত্যু-ভয় বড় একটা থাকে না। অপর ধারে পিস্তল হাতে ডুয়েল লড়া মানেই নিশ্চিত মৃত্যুর ঝুঁকি নেওয়া।

কিন্তু এই মুহূর্তে সে পিস্তলকেই বেছে নিচ্ছে। তার এই সাহসিক সিদ্ধান্ত তাকে বিপুল সম্মান এনে দেবে; অথচ প্রতিপক্ষ হয়তো ভয়ে লড়াইয়ের সামিলই হতে চাইবে না।

'আমার এই সিদ্ধান্তের নড়চড় হবে না,' সে উচ্চারণ করে, 'লোকটা ভয় পাবে।'

নিজের কণ্ঠস্বরেই কেমন যেন আঁতকে ওঠে সিগনলস্, তার গোটা শরীর বারেকের জন্য কেঁপে ওঠে, চারিদিকে বড় বড় চোখ মেলে তাকায়। স্নায়ুর ওপর অস্বাভাবিক চাপ অনুভব করে। আর এক গ্লাস জল খায়। বিছানায় শুয়ে পড়বার আগে শরীর থেকে পোশাকগুলি খুলতে থাকে। বিছানায় শুয়েই বাতি নিভিয়ে দেয় এবং চোখ বন্ধ করে।

'কালকের গোটা দিনটাই আমি পাবো', শুয়ে শুয়ে সে চিন্তা করে, 'তখন সবকিছু ঠিক করা যাবে। এখন আমার ঘুমের দরকার। ঘুম ছাড়া এই উত্তেজনার হাত থেকে রেহাই নেই।'

গরম কম্বলের তলায় শায়িত সে; অথচ, ঘুম আসে না। কেবল এ-পাশ ও-পাশ করছে। পাঁচ মিনিট চিৎ হয়ে থাকবার পর বা কাতে শুয়েছে, তারপর ডানদিকে।

তখনো তার তৃষ্ণা মেটেনি। বিছানা ছেড়ে উঠে যায় জলের খোঁজে। কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না। নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে:

আমি কি ভয় পেয়ে গেলাম?

কেন এই ঘরের প্রতিটি পরিচিত শব্দে তার হৃদস্পন্দন কয়েক গুণ বেড়ে যায়? ঘড়িতে শব্দ হওয়া মাত্র সে এমন আঁতকে ওঠে যে কিছুক্ষণ তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসই বন্ধ হয়ে যায়। এই অকল্পনীয় অসহায়তাকে সে যুক্তি দিয়ে অনুধাবনের প্রয়াস পায়:

'আমি কি ভয় পাবো?'

না, ভয় সে পাবে না। যেহেতু এই লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত তাকেই নিতে হয়েছে এবং ডুয়েল লড়তে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সে লড়বে, ভয়ে কাঁপবে না। কিন্তু যত রাজ্যের বিহ্বলতা এসে চাপছে তার ওপর। আবার সে ভাবে:

'ইচ্ছার বিরুদ্ধেই একজন মানুষ কি এভাবে ভয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করে?'

সন্দেহ অস্বস্তি ও ভয় সমবেতভাবে তার ওপর আক্রমণ শানাচ্ছে। মনে হচ্ছে, যেন কোন বিশাল শক্তি তার ওপর কর্তৃত্ব করছে। সে নিজে অসহায়। কি করতে পারে? অবশ্যই লড়াইয়ের ময়দানে যাবে। কিন্তু তখনও যদি এমন কম্পন না থামে? যদি সে অজ্ঞান হয়ে যায়?

সে একবার ঐ দৃশ্যের কথা ভাবছে, আর একবার ভাবছে তার এতদিনের সুনাম ও প্রতিষ্ঠার কথা।

বিচিত্র আচ্ছন্নতায় ধুঁকতে ধুঁকতে সে গিয়ে দাঁড়ায় আয়নার সামনে। মোমবাতি ধরায়। আয়নার দিকে চেয়ে আছে। আশ্চর্য! কাঁচের বুকে প্রতিবিম্বিত নিজেকে যেন সনাক্ত করতে কষ্ট হচ্ছে তার। মনে হচ্ছে, ও বুঝি কোন অজানা লোকের প্রতিচ্ছবি।

উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সে নিজের প্রতিরূপ দেখছে। চোখ-মুখ ক্যাকাসে, অত্যন্ত পাণ্ডুর। আয়নার সামনে বহুক্ষণ নিথর হ'য়ে দাঁড়িয়েই থাকে। গলা চিরে কোন আওয়াজ বের হয় না। হঠাৎ বুলেটের মতন একটা চিন্তা ছুটে এসে তাকে আঘাত করে!

'কাল, ঠিক এই সময়, হয়তো আমি বেঁচে থাকবো না।

ভীষণ ভাবে তার বুক কাঁপতে থাকে।

'কাল, ঠিক এই সময়, হয়তো আমি বেঁচে থাকবো না। এই যে লোকটি আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, আয়নার ভেতর দিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে, আগামীকাল চিরদিনের মতন হারিয়ে যাবে।

কেন আমি এখন এখানে দাঁড়িয়ে আছি? কেন নিজের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছি? কারণ, আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমার প্রাণশূন্য দেহটা ঐ বিছানার ওপর লুটিয়ে থাকবে, চোখের পাতা নিশ্চল, সমস্ত শরীর হবে হিম ও কঠিন।

ইস্তক ভাবনায় দুলতে দুলতে ভয়াল দৃষ্টিতে সে তার বিছানার দিকে তাকায়। সেখানে যেন দিব্যদৃষ্টিতে নিজের প্রাণহীন দেহটাকে পড়ে থাকতে দেখে। অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় তার মুখ ঝুলে পড়ে, হাত দুটো আলগা আলগা,—যেন এই হাত দিয়ে কোনদিন কোন কাজ সে আর করতে পারবে না।

তখন সে তার বিছানাকে ভয় করতে শুরু করেছে। বিছানার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নেয়। ত্রস্তে এ ঘর ছেড়ে অন্য এক ঘরে ঢোকে। সেখানে গিয়ে একটা সিগ্রেট ধরায়। পায়চারি করে। শীত শীত অনুভূতি। একবার ভাবে, বেল বাজিয়ে তার খানসামাকে ডেকে তুলবে। কিন্তু বেল বাজাতে গিয়েই নিরস্ত হয়—'না, থাক, জেগে উঠবে সে, দেখবে, আমি কত ভীরু।'

ফায়ার-প্লেসের সামনে বসে কিছুক্ষণ তার হাত গরম করে। কোন কিছু স্পর্শ করলেই মাথার ভেতরটা এলোমেলো হয়ে যায়। নিজেকে মনে হয়, মাতাল-মাতাল, যদিও সে এখন নেশা করেনি।

বার বার একই দুশ্চিন্তা মনকে ভারাক্রান্ত করে রাখে :

'আমি কি করবো ? আমার কি হবে ?'

টলতে টলতে সে জানালার কাছে গিয়ে পর্দাগুলি সরিয়ে দেয়।

তখন উষা-লগ্ন। রক্তাভ আকাশ ছুঁয়ে আছে শহরকে, শহরের প্রতিটি বাড়ির ছাদ ও প্রাচীরকে। সূর্যের সেই ক্রমঃপ্রস্ফুটিত কিরণ-আভা ঘুম ভাঙাচ্ছে পৃথিবীর।

প্রথম বেলার সেই অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে ভাইকাউন্ট। সে অনুভব করে, তার বুক কানায় কানায় ভরে উঠছে সাহস ও প্রত্যয়ে। অথচ, একটু আগে তার ভেতর অমন পাগলামি প্রশ্রয় পাচ্ছিলো কেন। কোন কিছু স্থির করার আগেই, জর্জ লেলিম আদৌ লড়তে রাজি আছে কিনা জানবার আগেই, সে এমন ভেঙ্গে পড়েছিল কেন ?

ভাইকাউন্ট মুখ-হাত ধুয়ে জামা-কাপড়ে ফিটফাট হ'য়ে দৃপ্ত পদক্ষেপে বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে। তখন সে হাঁটতে হাঁটতে নিজেকেই বলে : 'আমাকে সাহসী হতে হবে, উৎসাহী হতে হবে। প্রমাণ করতে হবে, ভীরু আমি নই।'

ডুয়েল লড়ার দুই সাহায্যকারী মারকিউস্ এবং কর্ণেলের সঙ্গে দেখা করলো সে, ডুয়েল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনাও হলো। কোন কোন শর্তের ওপর এই লড়াই হবে, সে সম্পর্কে ভাইকাউন্টের অভিমত তাঁরা সংগ্রহ করেন।

কর্ণেল জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি এমন একটা ভয়াবহ ডুয়েলে আগ্রহী ?'

ভাইকাউন্ট জবাব দেন, 'নিশ্চয়, খুবই আগ্রহী।'

মারকিউস বলেন, 'পিস্তলকেই বেছে নিলেন ?'

'হাঁ।'

'অন্য কি সব শর্ত রয়েছে ?'

শুকনো কাঁপা গলায় ভাইকাউন্ট ব্যাখ্যা করে, 'দু'জনের মধ্যে ব্যবধান থাকবে কুড়ি পা। হাত তুলে সিগন্যাল দেওয়া হবে এবং হাত নামানো চলবে না। যে কোন একজন গুরুতর ভাবে আহত না হওয়া পর্যন্ত গুলি বিনিময় চলবে।'

'নিখুঁত নিয়ম,' প্রশান্ত গলায় কর্ণেল মন্তব্য করেন, 'এই লড়াইতে আপনার জয়ের সম্ভাবনা অনেক বেশি। কারণ, গুলি চালাতে আপনার

পটুত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠে না।'

তাঁরা দু'জন চলে গেলেন।

ভাইকাউণ্ট বাড়ি ফিরে তাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

এই সময় ধীরে ধীরে আবার তাকে বিহ্বলতা পেয়ে বসে। সে এক অদ্ভুত অবিরাম কম্পন অনুভব করে তার হাতে, পায়ে, বুকে। কোন জায়গাতেই সে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকতে পারছে না।...

প্রাতঃরাশের ইচ্ছা সত্ত্বেও সে কিছু খেতে পারে না। তখন সে মনে মনে পরিকল্পনা আঁটছে, মদ খেলে হয়তো সে তার সাহস খুঁজে পাবে। সেইমত এক ডিকেণ্টার রাম আনিয়ে নেয়। এক গেলাস, দু' গেলাস করে সে দু' গেলাস রাম খেয়ে ফেলে। এ্যালকহলের প্রভাবে তখন দ্রুত তার শরীরে উত্তেজনার সঞ্চার, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যেন আগুনের স্রোত নামতে থাকে, অকস্মাৎ উৎসাহের ঘূর্ণিতে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

'এখন জানি, আমার কী করনীয়,' সে চিন্তা করে, 'আমার আর কোন দুর্বলতা নেই।' কিন্তু এই উৎসাহের পরমায়ু মাত্র এক ঘণ্টা। এক ঘণ্টা পর ডিকেণ্টারটা শূন্য, আবার সেই অসহনীয় ভয় ও অস্থিরতা। সে কিন্তু বুঝতে পারছে, এ সময় তার কতখানি বন্য সাহসিক মানসিকতা দরকার। কিন্তু কিছুতেই সেই দৃঢ়তাকে সে ধরে রাখতে পারছে না। কিছুতেই নয়।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনায়।

এমন সময় বাইরে বেল বেজে উঠলো। সেই শব্দে দারুণ চমকে ওঠে ভাইকাউণ্ট। চমকের সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্ক—কিছুক্ষণ তো সে স্থাণুবৎ বসেই থাকে, উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেবার শক্তিও যেন তার নেই।..

এসেছেন তার দুই সাহায্যকারী—মারকিউস্ ও কর্ণেল।

ভাইকাউণ্টের বিহ্বল দৃষ্টি তাঁদের মুখের ওপর। সৌজন্যসূচক 'শুভ সন্ধ্যা' সম্ভাষণটুকু জানাতেও সে যেন অপারগ।

'আপনার শর্তানুযায়ী সব ঠিক করে এলাম,' কর্ণেল বললেন, 'প্রথমে আপনার প্রতিপক্ষ নিজেকে 'অপমানিত পক্ষ' হিসেবে দাবী করেছিল। অবশ্য পরক্ষণেই আমাদের যুক্তি সে মেনে নেয়। আপনার প্রতিটি শর্ত সে মেনে নিয়েছে। তার সাহায্যকারী হবেন দু'জন সামরিক বিভাগের লোক।'

'আপনাদের ধন্যবাদ।'—ভাইকাউণ্ট উচ্চারণ করে।

'মাপ করবেন,' মারকিউস বলতে শুরু করেন, 'আমরা শুধু এলাম

ব্যাপারটা দেখে চলে গেলাম—তা করলে তো চলবে না। আরো অনেক কিছু করার আছে। যেমন ধরুন, আমাদের একজন খুব ভালো ডাক্তারকে নিয়ে যেতে হবে। কারণ, পিস্তলের বুলেট তো আর হাসির বস্তু নয়, যে কোন একজন গুরুতর আহত হবেনই।

দ্বিতীয়তঃ, লড়াইয়ের ময়দানের কাছাকাছি যেন কোন বাড়ি থাকে। আমরা যেন চট করে আহত লোকটিকে ঐ বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি।

আরো টুকিটাকি অনেক কিছু দেখার ও করার আছে। ঐ সব সারতে দু'তিন ঘণ্টা সময় তো লাগবেই।'

'আপনাকে ধন্যবাদ।'

—ভাইকাউণ্ট দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করে।

'আপনি ঠিক আছেন তো?' কর্ণেল জিজ্ঞেস করেন, 'কোন অস্থিরতা নেই তো?'

'ভালোই আছি। ধন্যবাদ।'

তাঁরা দু'জন বিদায় নেন।

আবার একাকীত্ব। সে তার সুস্থতা হারাচ্ছে। বাড়ির চাকর বাতি ধরিয়ে দিয়ে গেছে। টেবিলের সামনে বসে ভাইকাউণ্ট চিঠি লিখতে বসে। দু'চার বার কলমটা নাড়া-চাড়া করার পর কাগজ খণ্ডের মাথায় আঁতকা লিখে ফেলে:

'এই আমার দলিল।'

অক্ষর ক'টা লিখবার পরই স্নায়ুর চাপে তার সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। সরে আসে অনেকটা দূরত্বে। সে কিছুতেই তার দুশ্চিন্তাকে বাগে আনতে পারছে না। নিতে পারছে না কোন প্রত্যয়সিদ্ধ সিদ্ধান্ত।

সুতরাং ডুয়েল লড়তেই সে চলেছে। এই সম্ভাবনাকে এড়িয়ে যাবার কোন উপায় তার হাতে নেই।...আসলে তার ইচ্ছেটা কি? লোকেরা তো বলবে, সে লড়তেই চেয়েছিল; কারণ, ভাইকাউণ্টই প্রতিপক্ষকে দ্বন্দ্বে আহ্বান জানিয়েছে, এমন কি, লড়াইয়ের শর্তগুলিও সে স্থির করেছে। এখন তো কোন রকম মানসিক ভারসাম্য হারালে চলবে না। সে ডুয়েলের ছবিটাকে মনে মনে আঁকবার চেষ্টা করে, ভাববার চেষ্টা করে, তার প্রতিপক্ষ কি ভাবে আক্রমণ শানাতে পারে?

যত চিন্তা করে, ততই অস্থিরতা বাড়ে। দাঁতে দাঁত ঘর্ষণের শব্দ হয়।

এরপর সে চেতুভিলাডে'র ডুয়েল সম্পর্কীয় গাইড বুকখানার পাতা ওল্টাতে থাকে।

হঠাৎ তার মনে প্রশ্ন জাগে: আমার প্রতিপক্ষ কি নিয়মিত শ্যুটিং-গ্যালারিতে যায়?

সে কি বেশ পরিচিত লক্ষ্যবিদ? আমি কি ওর নামটা খুঁজে দেখবো?

কথাটা মনে আসা মাত্র সে ব্যারণ ভ্যাক্সের বইখানার কথা স্মরণ করে। কিন্তু ঐ বইটার প্রতিটি পাতা ঘাঁটিয়েও জর্জ লেমিলের নাম খুঁজে পেল না। কিন্তু লোকটা যদি যথেষ্ট দক্ষ পিস্তলচালক না হতো, তবে এই ডুয়েলে কখনোই রাজি হতো না।

বইটা বন্ধ করে ভাইকাউন্ট একটি পিস্তল তুলে নেয়। দৈবের বিচিত্র বিধানে অথবা তার অন্যমনস্কতায় পিস্তলটাতে গুলি লোড করা রয়েছে। সে ঐ পিস্তলটা তুলে লক্ষ্যভেদের নানারকম মস্কো করে। কিন্তু তার শরীর কাঁপছে, হাত কাঁপছে, পা কাঁপছে…। বিরক্তি ও ভয়ের সঙ্গে সে বলে:

'না, এ অবস্থায় ডুয়েল লড়া যায় না।'

সে পিস্তলের নলের মধ্য দিয়ে তাকায়—সংকীর্ণ ও গভীর পথ, যা মৃত্যুর সংকেত জানায়।…সে ঐ নলের মধ্য দিয়ে চেয়ে আছে, চেয়েই আছে। শরীর রোমাঞ্চিত, কি এক ধরণের বন্য উল্লাসে মন নাচে।…

মগজ যদি ঠাণ্ডা না থাকে, ডুয়েল লড়া যায় না। যতই অভিজ্ঞতা থাকুক, দক্ষতা থাকুক, সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হলো মানসিক স্থৈর্য। এবং সে সেই স্থৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। সে এটা জানে। বুঝতে পারছে; অথচ, উপায় নাই। তারই প্রস্তাবে ডুয়েল। লোকচোক্ষে সে বীর, যেহেতু…।

পিস্তলটা নিয়ে নাড়া-চাড়া করছে সে। বিজাতীয় হিংস্রতায় সে মুখব্যাদান করে এবং ব্যারেলের ওপর চোখ রেখেই অকস্মাৎ ট্রিগারে আঙুলের চাপ দেয়।

আওয়াজ শুনে খানসামা ছুটে আসে। তার দৃষ্টির সামনে উবুড় হয়ে আছে ভাইকাউন্টের প্রাণহীন দেহটা। রক্তের ধারা বইছে একখণ্ড সাদা কাগজের ওপর, যেখানে লেখা রয়েছে:

"এই আমার দলিল।'

একটি সত্যি কাহিনী

[A true Story]

মাঝামাঝি রকমের ঝড় কপাটে ধাক্কা দিয়ে বয়ে গেল। শারদীয় বাতাস বিলাপ করে, বাড়ির চারপাশে তা নর্তনরত। গাছের শেষ পাতাগুলিও ঝরছে এবং দমকা বাতাস সেই ঝরাপাতাগুলিকে ঠেলে নিয়ে যায় মেঘের দিকে।

শিকারীর দল তাঁদের ডিনার প্রায় শেষ করে এনেছেন। তখনো তাঁরা তাঁদের রঙদার মেজাজ নিয়ে প্রাণবন্ত, আনন্দে উত্তেজিত।

ওঁরা জাতিতে নর্মান; জমিদার ও জোতদারের মাঝামাঝি সম্প্রদায়ের লোক; গাঁয়ে মোড়লিও করেন, চাষবাসও করেন; আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল, দেহে বলও যথেষ্ট—প্রতিযোগিতায় নেমে ষাঁড়ের শিং ভাঙ্গতে পারেন।

সারাটা দিন ধরে তাঁরা এপারভিলার মেয়র মেঁত্রি ব্লন্দেলের জমিতে গুলি ছুঁড়েছেন! এখন আমন্ত্রণকারী মেয়রের খামার বাড়িতে খাবার টেবিলকে ঘিরে বসে আছেন।

সাধারণ লোকের মতনই চড়া গলায় তাঁরা কথা বলছেন; তাঁদের হাসি বন্যজন্তুর গর্জনের মতন; মাল টেনে টেনে এক একজন তাঁর পেটটাকে চৌবাচ্চা বানিয়ে ফেলেছেন। টেবিল-ক্লথের ওপর কনুই ভর দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছেন। আলোতে চক চক করছে তাঁদের চোখ। বিশাল অগ্নিকুণ্ড গরম রাখছে তাঁদের শরীর এবং ঐ অগ্নিকুণ্ডের রক্তাভ আভা ঘরের ছাদ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ যাবৎ তাঁদের গল্পের বিষয়বস্তু হলো লক্ষ্যভেদ ও কুকুর। কিন্তু তাঁরা বর্তমানে এমন একটা স্তরে পৌঁছে গেছেন, যখন অন্য আরো অনেক ভাবনা তাঁদের অর্ধ মাতাল মগজে এসে ঘুরপাক খাচ্ছে। তাঁদের প্রত্যেকেরই দৃষ্টি এখন এসে পড়ছে মস্ত থালা হাতে পরিবেশনরত স্বাস্থ্যবতী মসৃণগণ্ড যুবতী পরিচারিকাটির ওপর।

হঠাৎ পশুর ডাক্তার সমর্থদেহী সেঁজুর, যিনি একসময় ধর্ম সম্পর্কে পড়াশুনা করেছিলেন, উঠে দাঁড়ান এবং বলেন:

'হা ভগবান! ব্লন্দেলের মালটি তো খাসা! মনে হচ্ছে, ঐ চঞ্চলা বালিকার ওপর এখনো কোন মধুমক্ষিকা বসেনি।'

সেঁজুরের মন্তব্যে সকলে অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন। সেই হট্টরোলের মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষিত হয় একজন বৃদ্ধ সম্রান্ত লোকের দিকে। নাম—ম'সিয়ে দ্য ভারনেটট। মদ্য পান না করা হেতু তিনি এখন অন্য সকলের থেকে পৃথক। সকল আওয়াজকে স্তিমিত ক'রে তাঁর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়:

'এক সময় আমি ঐ রকম একটি মেয়ের সঙ্গে বিচিত্রভাবে জড়িয়ে পড়েছিলাম। গল্পটা আজ তোমাদের অবশ্যই বলবো। সে কথা ভাবলে প্রথমেই মনে পড়ে যায় আমার পোষা মাদিকুকুর মির্জা'র কথা। মির্জাকে আমি বেচে দিয়েছিলাম কমট দ্য ইংসোনেলের কাছে। প্রতিদিন চেন খোলা পেলেই সে ছুটে চলে আসতো আমার কাছে। আমাকে ছেড়ে থাকা তার পক্ষে খুব কষ্টকর ছিল। শেষ পর্যন্ত আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলি। ইংসোনেলকে বললাম, সব সময় কুকুরটাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে। তার পরিণামটা কি হলো, জানেন? দুঃখে মারা গেল কুকুরটা।

কিন্তু আমার আসল গল্প এটি নয়। আসল গল্প হলো আমার যুবতী ঝিকে নিয়ে।

তখন আমার বয়স বছর পঁচিশ। অবিবাহিত জীবন কাটাচ্ছি আমাদের জমিদারী সম্পত্তি ভিলিবনে। তোমরা নিশ্চয় বোঝ,—যে যুবকের পয়সা আছে এবং একা থাকে, প্রতি রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর সে কেমন বিষণ্ণ বোধ করে। তার চোখ স্বভাবতই চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়।

কিছুদিনের মধ্যেই আবিষ্কার ক'রে ফেললাম, ক্যানভিলির দেবুালতর বাড়িতে একটি কমবয়সী ঝি কাজ করছে। ব্রন্দেল, তুমি নিশ্চয় দেবুালতকে চেনো, তাই নয়?…আসল কথা, মেয়েটিকে আমার বেশ পছন্দ হয়ে গেল। একদিন ওর মনিবের সঙ্গে দেখা করে নিজের বাসনার কথা জানালাম। তিনি রাজি হলেন, কিন্তু শর্ত সাপেক্ষে। শর্তানুযায়ী তিনি তাঁর পরিচারিকাটিকে পাঠিয়ে দিলেন আমার বাড়িতে, আর গত দু'বছর ধরে দেবুালতের লোভ ছিল যে প্রাণীটির ওপর, আমার সেই কালো ঘোটকীটাকে তাঁর কাছে বেচে দিলাম তিনশ'টি ক্রাউনের বদলে।

প্রথম প্রথম খুবই মজাতে ছিলুম। কেউ কিছু সন্দেহই করতে পারেনি। শুধু একটা কথা,…রোজের সোহাগ জানানোটা সময় সময় মাত্রা ছাড়িয়ে যেত। আমি জানি, ও ঠিক নীচু ঘরের সাধারণ মেয়ে ছিল না। ওর মার সঙ্গে কোন এক সম্রান্ত মনিবের অবৈধ মেলামেশার ফলশ্রুতি সে।

মোদ্দা কথা রোজ তখন আমাতে খুব মজেছে, একেবারে চোখে হারায়। সে আমাকে আদোর করে, খোশামোদ করে, এবং সময় সময় ভাবাবেগে উথলে এমন সব কাণ্ড করে যেন আমি তার ছোট্ট পোষা কুকুরটি। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত অনেকদূর গড়াতে পারে ভেবে প্রায়ই আমার ভয় হতো।

নিজেকেই নিজে বলি, 'এভাবে বেশিদিন চলতে থাকলে নির্ঘাৎ ফাঁদে জড়িয়ে পড়বো!' কিন্তু সহজে জড়িয়ে পড়ার পাত্র আমি কোনদিনই নই। গোটাকতক চুমু খেয়ে নিজের ভবিষ্যৎকে রসাতলে ঠেলবো, এমন মূর্খ আমি নই। আসলে সে যতই ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করুক না কেন, আমার দৃষ্টি সব সময় সজাগ।

ডুম্ দাম্ শব্দ ক'রে সে আসে। তখন আমার মনে হয়, কে বুঝি আমার বুক লক্ষ্য ক'রে পর পর গুলি বর্ষণ করে চলেছে। এবং সে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে চুমু খেতে থাকে; সে খিল খিল করে হাসছে, নাচছে, উল্লাসে সুন্দর মাথা দোলাতে থাকে। এমনটিই সে করে থাকে প্রতিদিন।

রাতে আমি ভাবি, 'ওর সঙ্গ আমাকে আনন্দ দেয়। কিন্তু চূড়ান্ত খারাপ কিছু হবার আগেই আমি অবশ্যই তাকে এড়িয়ে যাবো। এবং সেই এড়িয়ে যাবার এই তো উপযুক্ত সময়।'

আমার বাবা ও মা তখন বাস করছেন বার্ণেভিলিতে, আমার বোন তাঁর স্বামীসহ বাস করছে রোলিবিতে; আমি ওঁদের কাছে এভাবে ছোট হতে পারি না।

কিন্তু কিভাবে আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারি? যদি সে আমার ঘর ছেড়ে চলে যায়, লোকের মনে সন্দেহ দানা বাঁধবে এবং তারা আমার সম্পর্কে নানা রকম মুখরোচক আলোচনাও করবে। আর যদি আমি তাকে এই বাড়িতেই ধরে রাখি, তবে একদিন ঝোলা থেকে বিড়াল লাফিয়ে পড়বে। অথচ এভাবেও তো তাকে চলতে দিতে পারি না।

আমি আমার কাকা ব্যারণ দ্য ক্লিটুইলের সঙ্গে দেখা ক'রে এই ব্যাপারে তাঁর উপদেশ প্রার্থনা করলাম। কাকা অভিজ্ঞ লোক, জীবনে এই জাতীয় একাধিক সমস্যা তিনি অনায়াসে অতিক্রম করে এসেছেন।

আমার কথা শুনে নির্বিকার গলায় বললেন:

'ঝিটাকে বিয়ে দিয়ে দাও।'

আমি লাফিয়ে উঠি।

'বিয়ে দেবো, কাকা! কিন্তু কার সঙ্গে?'

কাকা কিন্তু নিশ্চিন্তে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'যাকে তোমার ইচ্ছে। সেটা তো তোমার ব্যাপার, আমার নয়। যদি তুমি বোকা না হও, খুঁজে একজনকে পাবেই।'

আমি সপ্তাহখানেক ধরে তাঁর উপদেশ নিয়ে ভাবলাম। তারপর আপন মনেই বলে উঠি: 'কাকা ঠিকই বলেছেন!'

সুতরাং, শুরু হলো আমার পাত্রের সন্ধান। সন্ধান দিলেন স্থানীয় এক বিচারক। মাদার পাওমেলির ছেলেই হতে পারে সেই পাত্র। বদ ছেলে, টাকার জন্য যে কোন ঝুঁকি নিতে রাজি।

মাদার পাওমেলিও ধূর্ত ও লোভী বৃদ্ধা। একটি ক্রাউনের জন্য সে নিজের আত্মাকেও বিক্রি করতে পারে। এখন ছেলের বিয়ের সুবাদে মোটা কিছু কামিয়ে নেবার তালে আছে।

আমি তার সঙ্গে দেখা ক'রে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে সবকিছু বললাম এবং প্রস্তাবটিও রাখলাম।

আমার কথা শেষে হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করে:

'তা মেয়েটাকে বিয়ের সময় দেবেটা কি?'

খুব সেয়ানা বুড়ি। কিন্তু আমিও তো বোকা নই। প্রস্তুত হয়েই এসেছিলাম।

আমার তখনকার আবাস থেকে অনেকটা দূরত্বে ছয় একর জমির তিনটি প্লট ছিল: চাষীরা আগে ঐ জমির দূরত্বের জন্য অভিযোগ করতো। সম্প্রতি আমি সেখানে ছোট্ট একটি ঘর তৈরি করেছি খামার বানাবো বলে। এখন বিপাকে পড়ে স্থির করলাম, যৌতুক হিসেবে রোজকে আমি খামারটা দিয়ে দেবো।

বুড়ি কিন্তু খুশি হলো না। যেন যৌতুক হিসেবে খামারটা যথেষ্ট নয়। কিন্তু আমিও এর চেয়ে বেশি কিছু দিতে রাজি নই। এবং কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পেরে সেই রাত্রির মতন আমি বিদায় নিলাম।

তার পরদিন খুব ভোরে ছোকরাটি স্বয়ং এসে হাজির। আমার ঠিক মনে নেই, তাকে তখন কেমন দেখাচ্ছিলো। তাকে দেখেই বুঝলাম, মন গলেছে। চাষীর মতনই চেহারা। কিন্তু স্বভাবটা খুব নোংরা।

সে গোটা ব্যাপারটাকেই ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখছে। প্রথমেই এমন একটা

ভাব দেখালো, যেন সে গরু কিনতে এসেছে!

আমার সম্পত্তি দেখতে চাইলো। আমি তাকে জমি দেখাতে নিয়ে গেলাম। হারামজাদাটা আমাকে সেখানে পুরো তিনটে ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখলো; পকেট থেকে ফিতে বের করে গোটা জমিটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মাপলো।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'ফার্নিচার কি দেবেন? দিচ্ছেন নিশ্চয়।'

'মোটেই নয়' আমি প্রতিবাদ জানাই, 'এই ফার্মটা যে দিচ্ছি তাই যথেষ্ট।'

'যথেষ্ট নয়'; তার স্বর বিদ্রূপে শানিত, 'শুধু তো ফার্ম দিচ্ছেন না, হয়তো মেয়ের পেটে একটা বাচ্চাও দিচ্ছেন।'

লজ্জায় আমি লাল হয়ে উঠি। কিন্তু নিরুত্তর থাকি।

'শুনুন'; সে বলতে থাকে, 'আপনাকে দিতে হবে বিছানা-পত্তর, একটা টেবিল, একটা ড্রেসিং টেবিল, তিনটে চেয়ার, আর বাসন-কোসন।'

রাজি হয়ে গেলাম।

ফেরার পথে আর একটি বারও সে পাত্রী সম্পর্কে কিছু বললো না। কিন্তু হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা ধরুন, পাত্রী মারা গেল। তখন ঐ সম্পত্তি কে পাবে?'

'কেন, তুমি পাবে'—আমি জবাব দেই।

এটাই হয়তো সে এতক্ষণ ধরে জানতে চাইছিলো। এই মুহূর্তে নিশ্চিন্ত হয়ে খুশিতে হাত বাড়িয়ে সে আমার সঙ্গে করমর্দন করে। আমরা এখন একমত।

কিন্তু হায়! রোজকে ঐ বিয়েতে মত করানো যে কি ঝকমারি ব্যাপার! সে আমার পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে, বার বার করুণ স্বরে বলে, 'তুমি এ কথা বলছো! তুমি!'

এক সপ্তাহ ধরে সে শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো। বিয়ে সে করবে না। আমি তাকে বোঝাবার কম চেষ্টা করিনি। (মেয়েরা বড় বিচিত্র জীব! একবার মগজে প্রেম ঢুকলে, দুনিয়ার আর কিছুই তারা ভাবতে পারে না। সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানও হারিয়ে ফেলে। সব কিছুর আগে প্রেম অথবা, প্রেমের জন্যই সব।)

শেষ পর্যন্ত আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে এবং তাকে বাড়ির বাইরে বের ক'রে দেবো বলে শাসাই। শেষ পর্যন্ত সে রাজি হলো বটে, কিন্তু শর্ত দিলো— বিয়ের পর সুযোগ পেলেই সে যেন আমার কাছে আসতে পারে। এ বাড়ির দরজা তার জন্য খোলা রাখতেই হবে!

আমি নিজে তাকে গির্জায় নিয়ে গেলাম। বিয়ের খরচ আমিই বহন করলাম, বিয়ের পর ভোজও হলো আমার পয়সায়। সমস্ত কিছুই হলো প্রথানুযায়ী। তারপর সেই কথা: বিদায়, বাছারা! সুখী হও!

রোজকে বিয়ে দিয়েই দু'টি মাসের জন্য আমি ঐ বাড়িতে ছিলুম না। ছোট ভাইয়ের সঙ্গে অন্যত্র ছিলুম।

তারপর দু'মাস বাদে ফিরে এসে শুনছি, রোজ নাকি, প্রাত রবিবার এই বাড়িতে এসেছে এবং আকুল হ'য়ে আমার কথা জানতে চেয়েছে।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সে এলো। তার কোলে একটি রুগ্ন বাচ্চা। তোমরা বিশ্বাস করো বা, না করো, ঐ শিশুটিকে দেখেই আমার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। এবং শিশুটিকে আমি 'সেই বিশ্বাস ও মমত্বে' চুম্বন করলাম।

মা হবার পর রোজের চেহারা একেবারে ভেঙে পড়েছে—হাড়সর্বস্ব শরীর, আগের জলুস নেই, এখন সে একটা ছায়া মাত্র।। বিবাহিত জীবনে সে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি।

'তুমি সুখী?'—যান্ত্রিক গলায় আমি জিজ্ঞেস করি।

এই কথায় সে ঝর্ণা-স্রোতের মতন কেঁদে ওঠে। 'আমি মারা যাবো! আর পারছি না।'

চীৎকার তুলে পরিবেশটাকে সে ঘোরালো করে তুললো। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম তাকে শান্ত করতে। তারপর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলাম।

দেখলাম, তার স্বামী তাকে নিয়মিত প্রহার করে থাকে এবং বুড়ি শাশুড়ি জীবনটাকে আরো দুর্বিসহ ক'রে তুলেছে।

দু'দিন পর আবার সে এলো। আমাকে জড়িয়ে ধরে প্রায় মাটিতে শুইয়ে দেয়, চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে তোলে কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'আমাকে মেরে ফেলো! মেরে ফেলো! আমি আর ওখানে যাবো না!'

আমি তার ঐ করুণ বিলাপের মধ্যে যেন আমার কুকুর মির্জার আর্তি শুনতে পেলাম।

ঘাবড়ে গিয়ে আরো দু'মাসের জন্য ডুব দিলাম। তারপর যখন ফিরে এলাম— ততক্ষণে সব শেষ। আমি আসবার তিন সপ্তাহ আগে সে মারা গেছে। মারা যাবার আগে প্রতি রবিবার সে আমার শূন্য বাড়িতে একবার করে আসতো আমাকে দেখতে পাবার আশায়।…ঠিক মির্জার মতো।…সে মারা যাবার আটদিনের মাথায় তার বাচ্চাটিও মারা গেছে।

আর তার বদমাইশ স্বামীটি যথারীতি সমস্ত সম্পত্তিটাই গ্রাস করেছে। তবে, হাঁ, সে কিন্তু ঐ ফার্মটাকে কাজে লাগিয়েছে, তার অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে এবং আমার ঐ দানকে কাজে লাগিয়েই আজ সে একজন গণ্যমান্য পৌরসদস্য। এইটুকুই আমার পুরস্কার।'

গল্প শেষ হতে মেয়র হেসে উঠলেন, 'সে যাই হোক, ওর এই বর্তমান সৌভাগ্যের মূলে আমারও অবদান আছে।'

এবং পশুর ডাক্তার সেঁজুর ব্রাণ্ডির গেলাসে চুমুক দিয়ে গম্ভীর গলায় উপসংহার টানলেন, 'যে যা খুশি বলতে পারো ; আদতে এই পৃথিবীতে ঐ ধরণের মেয়েমানুষের কোন স্থান নেই!'

জনক

[The father]

শিক্ষামন্ত্রকের চাকুরে ফ্রানসোয়া তেঁসার প্রতিদিন সকালে বেটিগনোলেস্ থেকে বাসে চেপে অফিস করতে যেত। যাবার পথে প্রতিদিনই সে একটি যুবতীকে দেখতে পায় এবং কয়েকদিনের মধ্যেই সে ঐ যুবতীর প্রেমে পড়ে যায়।

মেয়েটিও প্রতিদিন ঐ সময় একই বাসে চেপে একটি দোকানে কাজ করতে রওনা দেয়। তার ছোট-খাটো শরীর, রং কালো ; চোখের মণি দুটো এমন কালো যে মনে হয়-বুঝি দুটো পিচের বল সেখানে বসানো রয়েছে। রাস্তার এক কিনারে সে দাঁড়িয়ে থাকে। বাস আসার সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট পা ফেলে সে ছুটে যায়, শূন্য আসন পেলে বসে পড়ে এবং চার-

দিকে আলতো দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়। ফ্রানসোস্ মুগ্ধ দৃষ্টিতে সব লক্ষ্য করে। সে প্রথম দর্শনেই ওর প্রেমে মজেছিল। এক একটা মেয়ের শরীরে এমন মাদকতা থাকে যে, দেখলেই মনে হয় জড়িয়ে ধরি। এই মেয়েটির শরীরে সেই হাতছানি, সেই স্বপ্নঘন আবেদন।

নিজেকে সংযত রাখবার চেষ্টা করেও ফ্রানসোস্ ওর দিকে না তাকিয়ে পারে না। তার দৃষ্টির তীব্রতায় মেয়েটি লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। ফ্রানসোস্ চেষ্টা করে, চোখ তুলে নিতে। পারে না।

কিছুদিনের মধ্যেই তারা আর পরস্পরের কাছে অপরিচিত থাকে না। অবশ্য কোন রকম বাক্যালাপ তখনো হয়নি তাদের মধ্যে। যখন অস্বাভাবিক ভিড়ের জন্য মেয়েটি বাসে বসবার সিট পায় না, ফ্রানসোস্ নিজের আসন তাকে ছেড়ে দিয়ে ভিড়ের চাপ সহ্য করে। যুবতী স্মিত হেসে কৃতজ্ঞতা জানায়। ফ্রানসোসের দৃষ্টির তীব্রতায় সে লজ্জা পায়, কিন্তু বিরক্ত হয় না।

অবশেষে তাদের বাক্যালাপ শুরু হয়। প্রতিদিন আধঘণ্টার ঘনিষ্ঠতায়, ভাবের আদান-প্রদানে বন্ধুত্ব তাদের রীতিমত প্রগাঢ়। সেই আধঘণ্টা দিনের মধ্যে সবচেয়ে সুখকর সময়। বাকি সারাটা দিন সে শুধু ঐ সুন্দরীর কথাই ভাবে, অফিসে কাজের চাপের মধ্যেও সে তার অনুপম সৌন্দর্য ও সাহচর্যের স্মৃতিকে বুকে জড়িয়ে রাখে। সে মনে করে, ঐ মেয়েটিকে লাভ করলে, সে এক অপার্থিব সুখের জগতে প্রবেশ করবে।

যুবতী যখন প্রতিদিন করমর্দন করে, তার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে; সেই স্পর্শসুখটুকু সারাটা দিন তাকে যেন সম্মোহিত করে রাখে। সে কল্পনা করে, সুন্দরীর ছোট ছোট আঙুলগুলির ছাপ যেন এখনো তার চামড়ায় আঁকা রয়েছে। বাসে উঠবার মুহূর্তটির জন্য তার ব্যাকুল প্রতীক্ষা। তাই ছুটির দিন রবিবার তার কাছে অসহ্য মনে হয়।

মেয়েটিও নিশ্চয় তার প্রেমে পড়েছে। কারণ, এক শনিবার সে কথা দিল, পরের দিন ফ্রানসোসের সঙ্গে সে ডিনার খেতে যাবে 'ম্যাসনস্-লাফিতি'তে।

তার পরদিন, রবিবার, ফ্রানসোস্ স্টেশনে পৌঁছে দেখে মেয়েটি তার আগেই সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছে। সে অবাক হয়।

কিন্তু মেয়েটি বলে, 'দেখুন, যাবার আগে আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই! আমাদের হাতে কুড়ি মিনিট সময় আছে। কম নয়।'

বলতে গিয়ে মেয়েটি কেঁপে ওঠে, তার হাত দোলে, দৃষ্টি নত এবং চিবুক লাল।

'আপনি কিন্তু আমাকে ভুল বুঝবেন না,' সে বলতে থাকে, 'আমি নষ্ট চরিত্রের মেয়ে নই। আগে কথা দিন, আপনি আমাকে এমন কিছু করবেন না, যাতে আমি বিব্রত বোধ করতে পারি। যদি কথা দেন, তবেই যাবো।'

কথাটা বলেই সে নীরব। ফ্রানসোস্ ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না, এই মুহূর্তে তার কি জবাব দেওয়া উচিত। সে খুশি বোধ করছে, আবার হতাশও হচ্ছে। এমনটিই তো আশা করা যায়!··· কিন্তু সেই সঙ্গে দুরন্ত স্বপ্নভঙ্গের হতাশা।·· এ কথা তো ঠিক, মেয়েটি সহজলভ্যা নয় বলেই এত আকর্ষণীয়া। অথচ, তার মনের নিভৃতে প্রতিপালিত হচ্ছে সেই সমস্ত কামনা, যা প্রেমের সুযোগে পুরুষরা আদায় করে নেবার জন্য আকুল হয়ে ওঠে।

ফ্রানসোস্‌কে নিশ্চপ দেখে যুবতীর ভয় হয়, ছলছল চোখে আবেগে সে বলে, 'আপনি যদি আমার সম্মান রক্ষার প্রতিশ্রুতি না দেন, আমাকে তবে ফিরে যেতে হবে।'

ফ্রানসোস্ সস্নেহে তার হাত ধরে, 'আমি কথা দিচ্ছি। আপনার অমত থাকবে এমন কিছুই আমি করবো না।'

সে যেন নিশ্চিন্ত হয়, মৃদু হেসে বলে, 'ঠিক তো?'

ফ্রানসোস্ তার চোখের গভীরে ডুব দিয়ে বলে, 'প্রতিজ্ঞা করছি।'

'তা হলে চলুন, টিকিট কাটা যাক।'

ট্রেনের কামরায় লোক জনে ঠাসা। সেখানে তাদের বিশেষ কোন কথাবার্তা হয় না। ম্যাসনস্ লাফিতিতে পৌঁছে তারা হাটতে থাকে সেন নদীর তীর বরাবর। নদীর ধার এখন নির্জন। উষ্ণ বাতাস তাদের ভাবনা ও স্নায়ুকে শান্ত করে। সূর্যের পরিপূর্ণ আলো নদীর জলে বিচ্ছুরিত। চার-পাশে সবুজের হাট। সবুজ পাতা, সবুজ ঘাস, আনন্দের হাজারো প্রাকৃতিক সম্পদ তাদের দেহ ও মনকে দ্রুত সতেজ করে। হাতে হাত ধরাধরি করে নদীর তীর ধরে তারা অনেক দূর হেঁটে গেল। এখন একে অপরের নৈকট্য বিশেষভাবে অনুভব করে। স্বচ্ছ জলের তলায় সঞ্চরণশীল মাছ ও বড় বড় ঝিনুক তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অমল আনন্দে গভীর তৃপ্তিতে তারা আপ্লুত। তারা অহরহ্ পায়চারিরত।

এক সময় যুবতীটি বলে ওঠে, 'আপনি নিশ্চয় ভাবছেন, মেয়েটার মাথায় গণ্ডগোল আছে।'

'কেন ?'

'আমি আপনার সঙ্গে এভাবে নির্জনে ঘুরে বেড়াচ্ছি বলে। এটা কি এক ধরণের পাগলামির লক্ষণ নয় ?'

'কেন ? এটা তো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

'না, না। স্বাভাবিক নয়—আমার পক্ষে এ রকম কিছু করাটা স্বাভাবিক নয়—আমি কখনো এমন বোকামি করতে চাইনি। অথচ, তাই করতে হলো। আসল কারণটা হয়তো আপনি অনুমান করতে পারেন। বড় নির্মম একঘেয়ে প্রাত্যহিক জীবন আমার। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একই বাঁধাধরা নিয়মে চক্রবৎ ঘুরছি তো ঘুরছিই।··· আমি আমার মার সঙ্গে একা থাকি। আমার মা সারাটা জীবন নানা রকম দুঃখ-কষ্ট পেয়েছেন। তাই তাঁর মেজাজটাও খিটখিটে। আর আমি আমার পক্ষে যা সম্ভব, তাই করছি। আমি চাকরি করছি। হাসিখুশি থাকার চেষ্টা করি, কিন্তু সব সময় পারি না। তা সত্বেও আমার এখানে আসাটা ভুল হয়েছে। কিন্তু আপনি অন্তত এর জন্য আমাকে দায়ী করবেন না! কি আমি কি দায়ী ?'

এই প্রশ্নের জবাব মুখের কথায় না দিয়ে ফ্রানসোস্ আচমকা ওর কানের লতিতে চুমু খেয়ে বসে! সঙ্গে সঙ্গে সে আঁতকে সরে যায়, ফোঁস করে ওঠে, 'ম্‌সিয়ে ফ্রানসোস্! এটাই কি আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষার নমুনা ?'

এরপর বিরস বদনে ওরা ফিরে আসে ম্যাসন্স লাফিত্তিতে। সেখানে নদীর ধারে চারটি বড় বড় গাছের নীচে অপূর্ব নাতিদীর্ঘ কাফে পেটিট-হ্যাভরেতে তারা খাবার খেতে বসে। তাজা উষ্ণ বাতাস, পাতলা সাদা মদ, এবং পরস্পরের শারীরিক নৈকট্য তাদের দু'জনকেই আড়ষ্ট, বিব্রত ও লজ্জিত করে রেখেছে। খেতে বসে একটা কথাও হয় না। কিন্তু কফি পান করার পর দু'জনের মধ্যেই হঠাৎ এক পরিবর্তনের জোয়ার নেমে আসে। দেহ ও মনে দেখা দেয় একটা চনমনে ভাব, আনন্দ ও উৎসাহের হিল্লোলে তারা দুলে ওঠে।

প্রকৃতি আবার তাদের হাতছানি দেয়।

কাফে থেকে বেরিয়ে আবার তারা নদীর তীর বরাবর হাঁটতে হাঁটতে

এগিয়ে চলে লা ক্রেতি গ্রামের দিকে।

এই সময় ফ্রানসোস্ সঙ্গিনীকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনার নামটা কি?'

'লুসি।'

'লুসি!'—নামটা আপন মনে দু'বার উচ্চারণ করে ফ্রানসোস্। আর কোন কথা হয় না। মাথার ওপর নীল আকাশ, পায়ের তলায় ঘাসের মখমল, পাশে নদী, সামনে বাকমুখে সাদা সাদা বাড়ির সারি যাদের ছায়া নদীর বুকে দোলে। লুসি গুচ্ছ গুচ্ছ তারা ফুল তুলতে থাকে, ফুলগুলি সাজিয়ে একটা মস্ত তোড়া বানায়। ফ্রানসোস্ গলা ছেড়ে গান গাইতে শুরু করে।

বা দিকে নদীর বাঁক মুখে অপূর্ব দ্রাক্ষাকুঞ্জ। থোকা থোকা আঙুর ঝুলছে। হঠাৎ ফ্রানসোস্ দাঁড়িয়ে পড়ে এবং সবিস্ময়ে আঙুল তুলে দেখায়, 'আহ্। দেখুন'

দু'জনে পূর্ণ দৃষ্টি মেলে দেখে, দ্রাক্ষাকুঞ্জের যেখানে শেষ, সেখানেই শুরু লিলাক ফুলের মেলা—গোটা পাহাড়ী অঞ্চলটাই ঐ ফুলে সজ্জিত। লতানো বন, সবুজ গালিচা পাতা রয়েছে পৃথিবীর বুকে—এমন দৃশ্য দু-তিন কিলোমিটার জুড়ে, তারপর গ্রাম।

লুসিরও দুই চোখে বিস্ময় ও পুলক।

কী সুন্দর! কী অপূর্ব—সে গুঞ্জন করে ওঠে।

তারা দ্রুত পায়ে ঐ পুষ্পশোভিত টিলাটার দিকে ছুটতে থাকে। একটা সরু পথ ঝোঁপের মধ্য দিয়ে চলে গেছে। তারা ঐ পথ ধরে অনেকটা এগিয়ে যায়। এক সময় সবুজ আচ্ছাদনের নীচে বসে পড়ে।

মাথার ওপর মৌমাছির গুন্‌গুনানি। সুধা মৌ মৌ বন। কী অপূর্ব মাদকতা, কী বিচিত্র অনুরণন। বাতাস নেই। তেজী সূর্যের প্রভাব বনভূমির মাথার ওপর। রং বদলায়, সাত রঙের আনাগোনা।

অনেক দূরে কোন গির্জায় ঘণ্টা বেজে চলেছে।

এই সময় তাদের মধ্যে কি যে হলো। তারা জাগতিক বাধা নিষেধ, সংস্কার ভুলে যাচ্ছে। ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হতে হতে এক সময় ওরা একে অপরকে স্পর্শ করে, তারপরই আলিঙ্গন···সেই বাঁধন ক্রমেই নিবিড় হয়, দৃঢ় হয়, দুটি দেহ সমান্তরাল হয়ে ঘাসের বুকে আশ্রয় নেয়, ঠোঁটের মধ্যে ঠোঁট ডুবিয়ে অজস্র চুম্বন···আর কিছু চিন্তা করবার শক্তিও তাদের নাই। এখন

সমর্পণের অপ্রতিরোধ্য স্পৃহা। লুসি নিজেই ফ্রানসোস্‌কে বুকের ওপর টেনে এনেছে, তার অনাবৃত বুকের মধু স্বাদ মেলে ধরেছে। কোথায় উবে গেল লুসির সেই ভয়, যুক্তি ও সতর্কতা। উত্তপ্ত কামনার দাবদাহে জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে সে। ফ্রানসোস্‌ তাকে নিঃশেষে উপভোগ করছে। সেই চরম উত্তেজক মুহূর্তে লুসি ভাবতেও পারছে না, তার কি হতে চলেছে। অসহ্য সুখে সে স্বয়ং সক্রিয়, বাধা দেওয়া দূরের কথা।

চূড়ান্ত ঘটনাটি ঘটে যাবার পর ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হয় লুসি। তখন ক্ষোভে, লজ্জায়, বিষণ্ণতায় তার বুক ভেঙে যায়। সে কাঁদতে শুরু করে। দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে সে।

ফ্রানসোস্‌ তাকে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু এখন আর সেই আশ্বাসবাক্য শুনবার মতন পরিস্থিতি নয় লুসির। সে বিধ্বস্ত, কোন রকমে রেহাই পেতে চায়—এখনই বাড়ি ফিরে যেতে পারলে বাঁচে। উঠে এক-রকম ছুটতে আরম্ভ করে, উঁচু নীচু পথে এলোমেলো পদক্ষেপ এবং প্রতিটি ক্ষণে একই হাহাশ্বাসের পুনরাবৃত্তি :

"হা ঈশ্বর! হা ঈশ্বর!"

"লুসি," ফ্রানসোস্‌ পিছন থেকে অনুনয় করে, "লুসি, শোনো, দাঁড়াও একটিবার।"

গালে গাল ঘর্ষণে তখনো লুসির মুখের চামড়া জ্বলছে, চোখ কোটরগত।

প্যারিস স্টেশনে পৌঁছেই লুসি ফ্রানসোস্‌কে ছেড়ে চলে যায়; এমন কি যাবার সময় সৌজন্যমূলক 'বিদায়-বাণী' ও উচ্চারণ করে না।

পরদিন আবার বাসে লুসির দেখা পেল ফ্রানসোস্‌। একদিনেই অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে মেয়েটার। ওকে অনেক শুকনো ও রোগা দেখাচ্ছে।

"তোমার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে," লুসি ফ্রানসোস্‌কে বলে, "সদর রাস্তায় অপেক্ষা করো।"

সদর প্রশস্ত রাস্তার ফুটপাথে তারা দু'জনে হাঁটতে থাকে। লুসি দৃঢ়তার সঙ্গে বলে, "আমাদের আর কখনোই দেখা হওয়াটা উচিত নয়। যা ঘটে গেছে এরপর আর আমার পক্ষে সম্ভব নয় তোমার সঙ্গে দেখা করা।"

"কিন্তু কেন?"—ফ্রানসোস্‌ বিস্ময় প্রকাশ করে।

"কারণ, আমি আর তা পারবো না। আমাকে বিরাট ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। এরপর আর দ্বিতীয়বার সেই সর্বনাশা ফাঁদে পা দিতে

আমি রাজি নই !"

ফ্রানসোসের বাসনা কিন্তু তখন আরো তুঙ্গে। আরো—আরো—অনেকবার পেতে চায় সে লুসিকে ! লুসিকে সে অনেকক্ষণ ধরে বোঝাবার চেষ্টা করে, অনুনয় করে সম্পর্ক বজায় রাখবার জন্য।

কিন্তু লুসির তিক্ত স্বরে সেই একই প্রতিবাদ, "না, আমি পারবো না। যা হবার হয়ে গেছে। সম্পর্ক আমাদের এখানেই ইতি।"

উত্তেজনায় উদ্বেল ফ্রানসোস্ তাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব পর্যন্ত দেয়।

কিন্তু এবারও লুসির জবাব, "না। আমি রাজি নই।"

লুসি ফ্রানসোস্‌কে ছেড়ে চলে যায়।

এরপর আটদিন ফ্রানসোস্ লুসির কোন পাত্তা পায়নি। লুসির সঙ্গে মুলাকাৎ করবার কোন সুযোগই সে পাচ্ছে না ; কারণ, সে লুসির ঠিকানাটাও জানে না। এক সময় ফ্রানসোস্ গভীর বিষণ্ণতায় অনুধাবন করে, লুসি হারিয়ে গেছে, সে আর কোনদিন তার জীবনে ফিরে আসবে না।

কিন্তু নবম দিনে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। তার ঘরের দরজার বেল বেজে উঠলো। সে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় এবং কপাট খুলতেই প্রচণ্ড বিস্ময় ও উল্লাস—দাঁড়িয়ে আছে সে। লুসি !

লুসি প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লো ফ্রানসোসের দুই প্রসারিত বাহুর বন্ধনে। সম্পূর্ণ সমর্পণে কোন বাধা দেয় না।···চললো এমন তিনটি মাস ধরে। তারপর একদিন লুসি জানালো, সে মা হতে চলেছে। শুনে বিবর্ণ হয়ে ওঠে ফ্রানসোস্, এক ধরণের মানসিক যন্ত্রণা ও অস্থিরতা তাকে গ্রাস করে। ইতিমধ্যে লুসির বহু-ব্যবহৃত দেহটাকেও বিস্বাদ লাগছে। ফ্রানসোস্ ঐ অনাগত শিশু সমেত লুসিকে যেন সহ্য করতে পারছে না। অথচ, লুসিকে এ কথা সরাসরি বলবার সাহসও নেই তার। এক রাতে ফ্রানসোস্ বাড়ির বাইরে চলে গেল এবং আর ফিরে এলো না।

আঘাতটা এত মর্মান্তিক হয়ে বুকে বাজলো যে অভিমানে লুসি ফ্রানসোস্‌কে খুঁজে বের করবারও চেষ্টা করলো না। সে তার মার হাঁটু জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে, নিজের দুর্দশা ও সর্বনাশের কথা জানায়।

কয়েক মাস পর লুসির একটি ছেলে হলো।

সময়ের স্রোত প্রবাহিত। অনেকগুলি বৎসর অতিক্রান্ত। ফ্রানসোস্ এখন বৃদ্ধ। অবশ্য, তার জীবন-যাপনের ধরণ ধারণে কোন পরিবর্তন হয়নি। আশা ও প্রত্যাশাশূন্য এক আমলার মতনই দিন কাটাচ্ছে সে। প্রতিদিন সে ঠিক একই সময়ে বিছানা ছেড়ে উঠে বসে, একই রাস্তায় পায়চারি করে, একই দরজার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে, একই অফিসে একই সময়ে যায়, একই চেয়ারে বসে একই ধরণের কাজ মুখ বুজে করে চলে। এই বিশাল পৃথিবীতে সে একা। নিস্পৃহ সহকর্মীদের কাছ থেকে কোন আন্তরিকতা পায় না। ঘরে ফিরে সঙ্গিনাহীন মস্ত বিছানায় শুয়ে বিকট শূন্যতায় সে প্রতি রাতে ডুবে যায়। শেষ বয়সের জন্য প্রতি মাসে সে একশ'টি করে ফ্রাঙ্ক সঞ্চয় করে রাখে।

প্রতি রবিবার ফ্রানসোস্ চ্যাম্পস্-ইলিসিসের পার্কে বেড়াতে যায়। সেখানে বসে বসে চলমান দুনিয়ার কেতা-দুরস্ত নর-নারীদের দেখতে পায়। দেখে, ধাবমান গাড়ি ও সুন্দরী মহিলাদের।

আর এক রবিবার সে ঐ পার্ক ছাড়িয়ে নতুন এক পথ ধরে হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে পার্ক মনসি উতে উপস্থিত হয়। উজ্জ্বল রবিবারের সকাল। পার্কের সবুজ ময়দানে শিশুরা খেলা করছে। আর তাদের মা ও আয়ারা মাঠের ধারে বসে তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখছে।

সহসা ফ্রানসোস্ তেঁসার কেঁপে ওঠে। একজন স্ত্রীলোক তার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে দুটি বাচ্চা। একটি ছেলে—বয়স বছর দশেক, অন্যটি মেয়ে—বয়স বছর চারেক। মহিলাটি আর কেউ নয়—সে! লুসি!

ফ্রানসোস্ প্রায় একশ' গজের মতন ছুটে যায়। দারুণ উত্তেজনায় তার হাঁপ ধরে যায়, হাত-পা কাঁপতে থাকে, একটা খালি আসনে বসে পড়ে। লুসি তাকে চিনতে পারেনি। ফ্রানসোস্ আবার উঠে দাঁড়ায়, ইতি উতি খুঁজতে থাকে লুসিকে।

হাঁ, ঐ তো সে বসে রয়েছে। ছেলেটি তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। ভারী সুন্দর দেখতে ছেলেটাকে। মেয়েটি মার পাশে বসে বসে খেলা করছে। হাঁ, লুসিই। নিশ্চয় ও লুসি। আজ ওকে দেখলে মনে হয়, বয়স্কা গম্ভীর-স্বভাবের এক মহিলা। পোশাক-পরিচ্ছদ সাধারণ, কিন্তু মর্যাদাসূচক।

কিছুটা দূরত্বে দাঁড়িয়ে লুসিকে দেখছে ফ্রানসোস্; কিন্তু এগিয়ে আসতে সাহস পাচ্ছে না। ছেলেটি মাথা তুলতেই তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল।

ফ্রানসোসের বুকের ভেতর যেন চকিতে ঝড় বয়ে যায়। ঐটি তার ছেলে! সন্দেহ নেই, ঐ তার ঔরসজাত সন্তান। সে তার দিকে চেয়ে থাকে। যেন কোন পুরনো ছবিতে নিজের বাল্যকালের চেহারা দেখছে।

সে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে। লুসি যখন এখান থেকে যাবে, তখন সে তাকে অনুসরণ করে তার আবাস চিনে আসবে।···

সেই রাতে তার চোখে ঘুম নেই। থেকে থেকে শুধু তার ছেলের কথা মনে পড়ছে। তার ছেলে। ইস্।···

সে লুসির বর্তমান আবাস দেখে এসেছে। খোঁজ-খবর নিয়ে জেনেও এসেছে এনেক কিছু। এক সৎ ও দৃঢ়চেতা মানুষ তার স্বামী। লুসির দুর্দশা দেখে তাঁর করুণা হয়েছিল। এমন কি ফ্রানসোস্ তেঁসারের ঔরসজাত সন্তানকে নিজের ছেলে হিসেবেও স্বীকৃতি দিয়েছেন।

গভীর শূন্যতায় ফ্রানসোসের বুক যেন ভেঙ্গে পড়ছে। এই বুড়ো বয়সে সে মর্মান্তিকভাবে নিঃসঙ্গ। তার কোন স্নেহের পাত্র নাই। অথচ, পুত্র-ক্ষুধা অহরহ তাকে যন্ত্রণা দেয়। সে কাতর হয়ে পড়ে, ঈর্ষা বোধ করে। প্রতি রবিবার সে পার্ক মনসিউতে যায়, দু' চোখ ভরে দেখে তার ছেলেকে। ইচ্ছা হয়, ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরতে, চুমোয় চুমোয় ছোট্ট মুখখানা ভরে তুলতে। ইচ্ছা হয়, ওকে জোর করে টেনে আনতে, চুরি করে পালাতে।

শেষ অব্দি সে মরিয়া হয়ে ওঠে। সোজা গিয়ে দাঁড়ায় লুসির সামনে। বিবর্ণ মুখ ও পাণ্ডুর কাঁপা ঠোঁটে কোন রকমে উচ্চারণ করে: "তুমি আমাকে চিনতে পারছো?"

লুসি চোখ তুলে তাকায়, কিছুক্ষণ বিহ্বল হয়ে চেয়ে থাকে; তারপর ভয়ে ও আতঙ্কে অস্ফুট শব্দ করে ওঠে, দুটি সন্তানকে এক রকম টানতে টানতে প্রায় দৌড়ে পালায়।

ফ্রানসোস্ ঘরে ফিরে এসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

কয়েকটা মাস অতীত হয়। ফ্রানসোস্ আর তাদের দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু ফ্রানসোসের যন্ত্রণা এতটুকু কমেনি। পিতৃত্বের বুভুক্ষায় সে জ্বলছে।

ঐ ছেলেটিকে একটিবার কোলে করবার জন্য সে যে কোন মূল্য দিতে রাজি আছে। সে এর জন্য আত্মহত্যা করতে পারে, খুন করতে পারে, যে কোন ভয়ানক ও সাহসিক কাজের ঝুঁকি সে নিতে পারে।

ফ্রানসোস্ লুসিকে চিঠির পর চিঠি লেখে। কোন জবাব আসে না।

এ রকম কুড়িখানা নিষ্ফল চিঠি লিখবার পর সে বুঝতে পারে, লুসি আর কোনদিনই তার কোন আবেদনে কর্ণপাত করবে না। তখন সে আরো ঝুঁকিবহুল এক সিদ্ধান্ত নেয়; বুকের কাছে পিস্তল রেখে [ব্যর্থ হলে আত্মহত্যা করবে] লুসির স্বামীর কাছে লেখে:

"সবিনয় নিবেদন—

আমার নাম নিশ্চয় আপনার কাছে ঘৃণ্য। কিন্তু বর্তমানে আমি এমন আহত ও দুঃখ-ক্লান্ত যে, একমাত্র আপনিই পারেন আমাকে শান্তি দিতে।

মাত্র দশ মিনিটের জন্য আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাই।

ইতি—অনুগত…।"

পরদিনই জবাব এলো:

"মাননীয় মহাশয়—

বুধবার বিকেল পাঁচটায় আপনার জন্য বাড়িতে অপেক্ষা করবো।"

বুধবার দুরু দুরু বুকে ফ্রানসোস্ লুসির স্বামীর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। এক একটা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে, আর তার বুকে যেন ভূমিকম্প হয়। শ্বাস নিতেও দারুণ কষ্ট, সিঁড়ির রেলিং ধরে ধরে উঠছে, যে কোন মুহূর্তে টলে পড়তে পারে সে। একেবারে চারতলায় উঠে সে নির্দিষ্ট ঘরের সামনে দাঁড়ায়। কলিংবেল টেপে। বাড়ির চাকর দরজা খুলে দেয়।

"মসিয়ে ক্লেমেল রয়েছেন?"—ফ্রানসোস্ জিজ্ঞেস করে।

"হাঁ। ভেতরে আসবেন?"

ফ্রানসোস্ প্রবেশ করে। মধ্যবিত্ত পরিবারের মোটামুটি সাজানো-গুছানো ড্রয়িং রুম। সে কিছুক্ষণ একাকী বুক কাঁপা মানসিকতা নিয়ে ঐ ঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে।

ভেতর দিকের দরজা খুলে একজন ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন। তিনি দীর্ঘকায়, গম্ভীর এবং বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী; পরণে কালো রংয়ের ফ্রক-কোট। তিনি ফ্রানসোস্‌কে বসতে ইঙ্গিত করেন।

ফ্রানসোস্ একটা চেয়ারে বসে পড়ে। তারপর শ্বাসহীন স্বরে বলে, "মঁসিয়ে…মসিয়ে…আমি জানিনা, আপনি আমার নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কিনা…যদি জানেন…"

মঁসিয়ে ক্লেমেল তাকে মধ্যপথেই থামিয়ে দেন।

"আপনাকে অত কষ্ট করে বলতে হবে না। আমি আমার স্ত্রীর মুখ থেকেই সব শুনেছি।"

একজন দয়ালু লোকের ক্রমশঃ নিষ্ঠুর হবার ভঙ্গী ফুটে উঠতে থাকে তাঁর মুখে। তবু তিনি নরম স্বভাবের মানুষ, সুশিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাগরিক।

"মঁসিয়ে, আসল ব্যাপার হলো" ফ্রানসোস্ বলতে থাকে, "আমি লজ্জায়, গ্লানিতে ও দৈন্যে মারা যাচ্ছি। আমি আপনার কাছে চাইছি মাত্র একটা জিনিস—ছেলেটিকে মাত্র একবারই একটি চুম্বন দেবার সুযোগ।"

মঁসিয়ে ফ্লেমেল উঠে দাঁড়িয়ে অগ্নি আধারের সামনে গিয়ে বেল বাজান। পরিচারিকা আসে।

"লুইসকে নিয়ে এসো।"

পরিচারিকা চলে যায়। তাঁরা একে অপরের মুখোমুখি। নিঃশব্দ। যেন আর বলার বা শোনার কিছুই নেই তাঁদের।

হঠাৎ বছর দশেকের ফুটফুটে ছেলেটি ছুটে এ ঘরে ঢোকে এবং এতকাল সে যাকে বাবা হিসেবে জানে, তাকে চুমু খাবার উদ্দেশ্যে ছুটে যায়। কিন্তু যেতে যেতে সে থমকে দাঁড়ায়—তার বিস্ময় এই আগন্তুক লোকটিকে দেখে।

মঁসিয়ে ফ্লেমেল ছেলেটির কপালে চুমু খেয়ে বললেন :

"এই ভদ্রলোকটি তোমার জন্য বসে আছেন। ওঁকে একটিবার চুমু খেয়ে এসো।"

ছেলেটি কথার বাধ্য, ধীরে ধীরে ফ্রানসোসের দিকে এগিয়ে যায়। দৃষ্টি তার আগন্তুকের মুখের ওপর।

ফ্রানসোস্ তেঁসার উঠে দাঁড়ায় ; তার মাথা থেকে টুপিটা খসে পড়ে ; মনে হয়, সে বুঝি নিজেও পড়ে যাবে।

মঁসিয়ে ফ্লেমেল কায়দা করে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। জানালার ভেতর দিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে আছেন তিনি।

ছেলেটি দারুণ বিস্ময়ে অপেক্ষা করছে। এক সময় সে টুপিটি মাটি থেকে কুড়িয়ে নেয় এবং অচেনা লোকটির মাথায় বসিয়ে দেয়। তখনই ফ্রানসোস্ হাত বাড়িয়ে ছেলেটিকে বুকের কাছে টেনে আনে এবং উন্মত্তের মতন চুমু খেতে শুরু করে—বৃষ্টির ধারার মতন নেমে আসছে তার চুম্বন, মুখে, চোখে, গালে, চিবুকে, মুখের ভেতর, চুলের ভেতর…

এই চুম্বনের ঝড়ে ভীত বিব্রত হয়ে ওঠে ছেলেটি। সে চেষ্টা করে

আত্মরক্ষার, মুখ সরিয়ে নেয়, মাথা সরিয়ে নেয়, নিজেকে মুক্ত করবার আপ্রাণ প্রয়াসে তার ছোট ছোট দুটি হাত দিয়ে আঘাত ক'রে ফ্রানসোসের ব্যগ্র ঠোঁটের ওপর।

সেই আঘাতে সম্বিৎ ফিরে পায় ফ্রানসোস্। আচমকা চীৎকার করে ওঠে, "বিদায়। আমি চলে যাচ্ছি।"

সে এক পলায়নপর চোরের মতন এ বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।

ভয়

[Fear]

ছায়া ছায়া অন্ধকার চিরে ছুটে চলেছে ট্রেনটা।

এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মুখোমুখি বসে আছি। তিনি ধাবমান ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছেন। এই পি-এল-এম্ কামরায় জীবাণু-নাশক ওষুধের তীব্র গন্ধ। ট্রেনটা নিশ্চয় মার্সাই থেকে আসছে।

আকাশে চাঁদ নাই, বাতাসের দাপট নাই, অথচ জ্বলন্ত রাত্রি। নক্ষত্ররাও নজরে আসে না; ট্রেনের গতিময়তায় বাতাস সরাসরি আমাদের মুখের ওপর ঝাপটা মেরে চলেছে। তিন ঘণ্টা আগে আমরা প্যারিস ছেড়ে এসেছি এবং এখন প্রবেশ করছি ফ্রান্সের হৃদপিণ্ডে। যাত্রাপথে কিছুই প্রায় আমরা দেখবার চেষ্টা করিনি।

হঠাৎ এক অদ্ভুত ভীতিসঞ্চারক দৃশ্য দেখতে পেলাম। বনে দাউ দাউ আগুন জ্বালিয়ে দুটি লোক সেই অগ্নিকুণ্ডকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। চকিতের জন্য দেখতে পেলাম: ভবঘুরের মতন কম্বল গায়ে তারা ঘুরছে, আগুনের আভায় রক্তাভ তাদের অবয়ব, শ্মশ্রুবহুল মুখ নিয়ে তারা আমাদের দিকে ঘুরে তাকায় এবং তাদের চারিদিকে আপনা থেকে গজিয়ে উঠছে চকচকে সবুজ সব গাছপালা।

পরমুহূর্তে আগুন হারিয়ে গেল। আবার অন্ধকার।

ভারী অদ্ভুত তো! ঐ দুই ভবঘুরে কি করছিল বনে? কেন এই গুমোট রাতে ঐ আগুনের ব্যবস্থা?

আমার সহযাত্রী তাঁর ঘড়ি বের করে দেখলেন এবং বললেন, "এখন ঠিক মধ্যরাত্রি; আমরা একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম।"

আমিও একমত। আমরা ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিই। কল্পনা করবার চেষ্টা করি, লোকগুলি ওখানে কি করছিল। ওরা কি ওখানে ওদের কোন পাপের সাক্ষীকে নষ্ট করছিল অথবা, প্রস্তুত করছিল কোন কামোদ্দীপক ওষুধ? তুমি নিশ্চয় মধ্যরাতে বনে আগুন ধরাতে যাবে না অথবা, এই দারুণ গরমের রাতে ওখানে ঝোল জ্বাল দেবে না। তা হলে কি করছিল তারা? এর কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না।

সহযাত্রী কথা বলতে শুরু করেছেন। বৃদ্ধ লোকটির পেশা অনুমান করা সম্ভব নয়। তবে নিশ্চয় সুশিক্ষিত এবং ঈষৎ পাগলাটে ভাবও রয়েছে।

কিন্তু এই দুনিয়ায় কি কাকে বুদ্ধিমান বা বোকা রূপে চিহ্নিত করা সব সময় সম্ভব? বিশেষতঃ যুক্তি যেখানে অনেকক্ষেত্রেই মার খায়।

তিনি বললেন, "আমি দৃশ্যটি দেখে সুখী হয়েছি। মুহূর্তের জন্য আমি আমার ভুলে যাওয়া এক অনুভূতিকে লাভ করলাম যেন।

ভাবুন তো, অতীত এই পৃথিবী কী বিস্ময়কর ছিল।

রহস্যের এক একটি অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হয়েছে, আর মানুষের কল্পনা-প্রবণতা আহত হয়েছে। এই রাত আর এই অন্ধকারকে সাধারণ মনে করবেন না, যদিও তাদের রহস্যময়তা অপহৃত হয়েছে।

আমাদের অতীন্দ্রিয় কল্পনার আর অবকাশ নেই, লোকে বলে থাকে, আর কোন বিস্ময় নেই। সমস্ত কিছুই আমাদের বুদ্ধির নাগালের মধ্যে। আধিভৌতিক বিশ্বাস জমা হয়েছিল যে হ্রদ, যুক্তির প্রবহমান খাল তাকে প্রায় শূন্য ক'রে এনেছে। দিনের পর দিন বিজ্ঞান মানুষের বিস্ময়ের পরিধিকে সীমিত করে ফেলছে।

আমি কিন্তু মশাই পুরনো জাতের লোক। আমাদের মতন মানুষের চিরন্তন প্রতীতি এখনো লোপ পায়নি। আমরা বিশ্বাস করতে ভালোবাসি। আমাদের ঠকানো চিরদিনই সহজ, কারণ অনুসন্ধান বা, যুক্তির রাজ্যে না গিয়ে রহস্যময়তায় ডুবে থাকতে, বিশ্বাস করতে বিচিত্র আনন্দ উপভোগ করি। সহজ ও নিষ্ঠুর সত্য থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখার এই এক অভ্যাস।

হাঁ, মশাই, অদৃশ্য বস্তুদের ক্রমশই যুক্তি ও বুদ্ধির নাগালের মধ্যে এনে আমরা আমাদের কল্পনাকে হত্যা করেছি। আমি এখন এই বিশ্বকে নিরেট বস্তুপিণ্ড রূপে দেখছি; কবিত্বের আর কোন স্থান নেই।

রাত্রিকালে কবরের পাশ দিয়ে যাবার সময় বৃদ্ধা মহিলারা যে ভাবে ক্রশ

করেন, আমরা আর কি ভাবে তাকে মেনে নিতে পারি? কি ভাবে আর স্বীকৃতি দিতে পারি—অন্ধকারে একাকী অবস্থানকালে মাঝে মাঝে ভয়ংকর কোন বস্তু আমাদের অবচেতন মনে দোলা দিয়ে যায়?

দূর অতীতে রাত্রির অন্ধকার ভয় ও বিস্ময় ডেকে আনতো। মানুষের অজ্ঞতার সুযোগে অদৃশ্য শক্তিরা সক্রিয় হয়ে উঠতো, সময় সময় আকার নিতো এবং প্রতিটি মানুষ সেই অদৃশ্য বস্তুর সপ্রতিরোধ্য আবির্ভাবকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য ছিল।

এই সমস্ত আধিভৌতিক প্রতীতি যখন রইলো না, প্রকৃত ভয়ও বলতে তখন কিছু রইলো না। কারণ, আমরা তো তাকেই ভয় পাই, যাকে বুঝি না। চর্মচক্ষুতে পরিদৃশ্যমান বিপদ চলাফেরা করতে পারে, বিরক্ত করে এবং ভয় দেখায়। কিন্তু সেই আতঙ্কের সাথে আর কিসের তুলনা করা চলে, যখন আপনি কোন ভূতের মুখোমুখি হবার আশঙ্কা করেন? অথবা, আচমকা কোন শবকে জড়িয়ে ধরেন?...যুক্তির যুগে অন্ধকারই আমাদের কাছে আলো, আমাদের আর আধিদৈবিক ব্যাপারে আতঙ্কিত হবার কারণ নাই।

ধরুন আমরা দু'জনই যদি ঐ নির্জন বনে আগুন ধরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতুম, তবে আমাদের দেখেও অন্যরা এই রকম ভাবতেন। আদতে ভয়ের কিছুই থাকতো না।

"আমরা তাকেই ভয় পাই," বৃদ্ধ ভদ্রলোক আবার বললেন, "যার সম্পর্কে আমাদের কোন স্বচ্ছ ধারণা নাই।"

এই রকম আলোচনা চলাকালে হঠাৎ আমার মনে এক স্মৃতি উদিত হয়। গত রবিবার গুস্তভ ফ্লেবার্টয়ের বাড়িতে বসে তুর্গেনিভ গল্প করেছিলেন। জানিনা, গল্পটি তিনি তাঁর কোন বইতে স্থান দিয়েছেন কিনা।

এই মহান রুশ ঔপন্যাসিক তাঁর বিরল দক্ষতায় গল্পের নিপুন বুনোটে আমাদের কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন—আমরা এই অজানা, অনিশ্চিত, আশঙ্কাজনক দুনিয়ায় অনুপ্রবেশ করেছিলাম যেন।

তুর্গেনিভের বইতে আমরা এই সমস্ত অতীন্দ্রিয় শক্তিদের সন্ধান পাই। অদৃশ্য বস্তুর প্রভাব সম্পর্কে আমাদের মনে তিনি বিচিত্র ভয়ের সঞ্চার করেন। দেয়াল, দরজা, মুক্ত বহির্বিশ্বের আড়ালে এই সমস্ত অজানা অদৃশ্য শক্তিরা নাকি বর্তমান, সুযোগ পেলেই ভয় দেখায়।

তুর্গেনিভের গল্প আমাদের হঠাৎ নিয়ে গেল এক অবছা আলোময় অজানা ভুবনে, যেখানকার পরিবেশ আমাদের অন্তঃকরণে ভয়ের উদ্রেক করার পক্ষে যথেষ্ট।...অদৃশ্য এক শক্তি সম্পর্কে তিনি আমাদের কল্পনাপ্রবণ করে তুললেন, আমরা এমন এক স্বপ্নময় জগতে বিচরণ করতে থাকি, যার অস্তিত্ব সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা ওয়াকিবহাল ছিলুম না।

তুর্গেনিভ কিন্তু এডগার পো বা হফম্যানের মতন সাহসিক গতিতে আধিভৌতিক জগতে প্রবেশ করেননি তিনি শুধু নির্বিকারে আমাদের এমন সমস্ত গল্প শুনিয়েছেন, যা খুব ধীরে ধীরে আমাদের মানসিক স্তরে অস্বস্তি ও অনিশ্চয়তা জাগিয়ে তুলেছে।

ঐদিন তিনিও আমাদের বলেছিলেন, "আমরা যা বুঝিনা, একমাত্র তাকেই ভয় পাই।"

তিনি তখন আর্মচেয়ারে বসে ছিলেন, হাত দুটি ঝুলছে, পা দুটো ছড়িয়ে দিয়েছেন আয়াসে, এক মাথা সাদা চুল এবং এক মুখ সাদা দাড়ি চাকচিক্যময়, তাঁকে মনে হচ্ছিলো কোন স্বর্গীয় পুরুষ বা, ওভিড নদী থেকে উত্থিত এক জলের দেবতা!

তিনি কথা বলছিলেন ধীরে ধীরে। আলস্যে উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ নির্বাচিত ও শ্রুতিমধুর; গল্প বলবার সময় এমন এক ধরণের সংকোচ ও মননশীলতা তাঁর ভেতর লক্ষণীয়, যা তাঁর বক্তব্যকে অনেক বেশী তাৎপর্যময় করে তুলছে। তাঁর বিশাল ঈষৎ রক্তাভ চোখে শিশুসুলভ দৃষ্টি, মনের ভাবাবেগ প্রতিফলিত। গল্পটি তাঁর নিম্নরূপ:

তখন তিনি যুবক। শিকারের সন্ধানে ঘুরছেন রাশিয়ার এক বনাঞ্চলে। সারাটা দিন বনে বনে চক্কর লাগাবার পর পড়ন্ত বেলায় উপস্থিত হলেন এক শান্ত নদীর ধারে।

নদীটি প্রবাহিত গাছ-পালার মধ্য দিয়ে, গাছ-গাছালি ও ঘাস জড়িয়ে, জল গভীর, হিম ও টলটলে।

শিকারীর বাসনা, ঐ কাকচক্ষু জলে তিনি স্নান করবেন। ভাবা মাত্র জামা-কাপড় খুলে বিবস্ত্র হয়ে তিনি নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দীর্ঘদেহী,

প্রখ্যাত রুশ ঔপন্যাসিক তুর্গেনিভের সঙ্গে মপাসাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল অনুবাদক।

সমর্থ ও চমৎকার সাঁতারু স্রোতের টানে আপন শরীর ভাসিয়ে দিলেন। নদীর তল থেকে উত্থিত ঘাস ও শিকড়গুলি তাঁর চামড়ার ওপর আলতো স্পর্শ বুলিয়ে যায়, তিনি রোমাঞ্চিত হন।

হঠাৎ একখানা হাত তাঁর কাঁধের ওপর এসে পড়ে।

চমকে তিনি ঘুরে তাকান এবং দেখতে পান, একটা ভয়ঙ্কর জীব হিংস্র ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আছে। আকারে স্ত্রীলোক বা অনেকটা বানরের মতন। বিরাট বিকটদর্শন মুখ সামান্য হেসেও ওঠে! ছুটো অজানা জন্তু ওর মুখের চারপাশে চক্কর কাটছে, ওর রোদে-পোড়া চুলের মধ্যে ঢুকে পড়ছে, ওর পিঠের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ছে।

তুর্গেনিভ আধিভৌতিক ঐ দৃশ্যের মুখোমুখি হয়ে ভয়ে-বিস্ময়ে নিশ্চল। কোন কিছু না করে বা, না ভেবে তিনি আপ্রাণ সাঁতার কাটতে থাকেন তীরে পৌছে যাবার জন্য। কিন্তু ঐ দৈত্যাকার বিচিত্র জন্তুটার গতি আরো বেশি। সে যেন বেশ মজা করেই কখনো তুর্গেনিভের ঘাড়ে হাত দিচ্ছে, পিঠে আঙুল বোলাচ্ছে, পায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

আতঙ্কে দিশাহারা শিকারী তবু এক সময় তীরে পৌছে গেলেন। জল থেকে উঠেই সাঁ সাঁ ছুটতে থাকেন বনের দিকে। তিনি তখন উলঙ্গ। নদীর তীরে খুলে রাখা পোশাক ও বন্দুকটার কথা তিনি যেন বিলকুল ভুলেই গেছেন।

কিন্তু ঐ ভয়ঙ্কর জন্তুটাও জল থেকে উঠে তাঁকে অনুসরণ করে চলেছে, যত দ্রুততায় সম্ভব ছুটছে। মুখ দিয়ে একটা গোঁ গোঁ আওয়াজও করছে।

ভয়ে-বিস্ময়ে ক্লান্ত তুর্গেনিভ ছুটতে ছুটতে এক সময় তাঁর শক্তি হারিয়ে ফেললেন। তিনি তখন আর একটু হলেই মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়তেন; কিন্তু ঠিক তখনই ছাগল চড়াচ্ছিলো এমন একটি ছেলে, লাঠি হাতে তেড়ে আসে! জন্তুটা গোঁ গোঁ করতে করতে মহিলা-গরিলার মতন ঘন বনের আড়ালে হারিয়ে গেল।

জানা গেল, ধেয়ে আসা ঐ জীব জন্তু নয়, এক পাগলী—ত্রিশ বছর যাবৎ মেষপালকদের দয়ার ওপর নির্ভর করে এই বনে বাস করছে, দিনের অর্ধেক সময়ই কাটায় নদীতে সাঁতার কেটে।

মহান রুশ লেখক বললেন, "জীবনে কখনো আমি অত ভয় পাইনি। ধারণাই করতে পারিনি, জীবটা কি হতে পারে!"

আমি আমার ট্রেন-যাত্রীকে এই গল্পটা শোনালাম। তিনি বললেন, "তা হলে দেখুন, আমরা যাকে চিনি না, তাকেই সাধারণতঃ ভয় পাই।...জীবনে এমন ভয় পাবার অভিজ্ঞতা আমারও আছে। অথচ, ব্যাপারটা এত সাধারণ এবং আমি এমন বোকা বনে গিয়েছিলাম যে, এখন আপনার কাছে সেই গল্প বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে।

আমি সে সময় ব্রিটানিতে পায়ে হেঁটে একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছি। হাঁটতে হাঁটতে পার হলাম বন্ধুর প্রস্তরময় ফিনিস্তি এলা গ। এর আগের সন্ধ্যায় দুই সাগরের সঙ্গমস্থল র‍্যাজে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। অতি পুরনো জায়গা, আমার মন অধিকার করে আছে তাই অতীতের সব গাথা-কাহিনী এবং কিছু কুসংস্কারমণ্ডিত গ্রাম্য প্রবাদ।

রাতে আমি পায়ে হেঁটে পাড়ি জমিয়েছি অনেকটা পথ-- পেনমার্চ থেকে পন্ট-ল'া এ্যাবি অব্দি। পেনমার্চে কখনো গেছেন? কী ঢালু তীরভূমি—যেন সমুদ্রতল থেকেও নীচু! যখনই তাকাবেন, দেখবেন হিংস্র জন্তুর মতন ধেয়ে আসা সমুদ্র। প্রায়শই ধূসর বর্ণ, সাদা ফেনা তুলে শিলাস্তরের ওপর আছড়ে পড়ে বার বার।

এক জেলের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার সোজা পথে আমার যাত্রা শুরু হয়। তখন রাত ঘনিয়েছে, ঘন অন্ধকার।

সময় সময় অতীতে কেল্ট পুরোহিতদের দ্বারা পূজিত বড় বড় পাথর খণ্ডগুলি ভূতুড়ে ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। আমার মনে হয়, ওরা যেন চোখ মেলে আমাকে দেখছে। ভয় পাই। অথচ, ভয়টা যে কিসের, বুঝতে পারি না। অনেক নির্জন সন্ধ্যায় হঠাৎ মুখের ওপর বুলিয়ে যাওয়া বাতাসে আমাদের ভেতরটা কি অজানা ভয়ে কেঁপে ওঠে না? কিন্তু কেন?

পথটা আমার কাছে অতি দীর্ঘ মনে হচ্ছিলো। শুধু দীর্ঘ নয়, শূন্যও বটে।

সেখানে সমুদ্র-গর্জন ছাড়া আর কোন শব্দ নাই। এবং সেই গর্জন ভেসে আসছে নীচ থেকে, আমার পিছন থেকে। কখনো কখনো সেই একঘেয়ে শব্দ আমার এত কাছাকাছি এসে যায় যে মনে হয়, ঢেউগুলি বুঝি আমার পায়ের নীচে এখনই ভেঙ্গে পড়বে এবং ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তখন ছুটে পালিয়ে যাবার জন্য একটা বন্য তাগিদ অনুভব করি আমি।

বাতাসে কার যেন শিস বাজে। সেই শিস আমার চারপাশে নর্তনরত।

খুব তাড়াতাড়ি পথটুকু পার হবার চেষ্টা করলেও আমার হাত-পা ক্রমশ হিম হয়ে আসছে, ভয়ে বিকল হচ্ছে মন।

ইস্! কতক্ষণে যে এই পথে কোন লোকের সঙ্গে দেখা হবে।

অন্ধকার এত গভীরতর যে আমি পথ চিনতে পারছি না।

হঠাৎ গড়িয়ে গড়িয়ে আসা কোন ঘরঘর শব্দ আমি শুনতে পেলাম। শব্দটা আসছে আমার অনেকটা সামনে থেকে। ভাবলাম, 'বোধহয় কোন গাড়ি আসছে!' কিন্তু আর কোন শব্দ নাই।

এক মুহূর্ত পর আবার সেই শব্দ; এবার আরো কাছে।

আমি কোন আলো দেখছি না। তাই ভাবলাম: ওদের কাছে কোন লণ্ঠন নেই। এই বুনো দেশে এটা আশ্চর্যের কিছুই নয়।

শব্দটা একবার বন্ধ হয়, আবার শোনা যায়। এখন মনে হচ্ছে শব্দটা যেন কোন ওয়াগনের, অশ্বখুরের নয়। আশ্চর্য!

শব্দটা কিসের হতে পারে? নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করি।

শব্দ এগিয়ে আসছে, দ্রুত, দ্রুততর। অশ্বখুর বা পদধ্বনি নয়, শুধু একটা চাকা গড়িয়ে আসার শব্দ। বস্তুটা কি?

অবশেষে এটা আমার খুবই কাছাকাছি চলে এলো। আমি চকিতে একটা গর্তে লুকিয়ে পড়ি এবং আমার পাশ দিয়ে এক চাকার একটা হাত-গাড়ি গড়াতে গড়াতে বেরিয়ে গেল—হ্যাঁ, একটা হাত-গাড়ি, অথচ কোন মানুষ হাত দিয়ে ওটাকে ঠেলছে না!

আমার বুক আতঙ্কে এমন কাঁপতে থাকে যে, ঘাসের ওপর অসহায়ভাবে শুয়ে পড়ি। কানে এসে বাজছে ঘুরন্ত চাকার ঝমঝমানি,—শব্দ ক্রমশই দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের দিকে। আমি না পারছি উঠে বসতে, না পারছি দাঁড়াতে, হাত ও পা অসাড়। কারণ, উঠে দাঁড়ালে হয়তো ওটা আবার তেড়ে আসবে এবং আমার পিছনে ছুটতে থাকবে; তখন ভয়ে আমি নির্ঘাৎ মারা যাবো!

দীর্ঘ—দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হবার পর আমি নিজেকে কিছুটা সুস্থ বোধ করি। কিন্তু ঐ বাকি পথটুকু পার হবার সময় বুক আমার দুর দুর করছিল, সামান্য কোন শব্দে আঁতকে উঠেছি, দম বন্ধ হয়ে এসেছে।

নিশ্চয় আমার এই ভয়কে বোকামি ভাবছেন? কিন্তু সেই মুহূর্তগুলি অসম্ভব আতঙ্কজনক! পরে ব্যাপারটা চিন্তা করবার পর রহস্যটা বুঝতে

পেরেছি। নিশ্চয় কোন খালি পা বালক ঐ চাকাটাকে ঠেলছিল এবং তখন ঐ অবস্থায় আমার প্রত্যাশা ছিল, কোন সাধারণ উচ্চতার লোককে আমি দেখতে পাবো।

ঘটনাটা আপনি বুঝতে পারছেন···আতঙ্কটা আমার মনে আগে থেকেই জাঁকিয়ে বসেছিল! দেখলাম, একটা হাত-গাড়ি স্বয়ংক্রিয় ভাবে গড়াতে গড়াতে চলে যাচ্ছে। কী ভয়, কী ভয়!"

এই পর্যন্ত বলে এক মুহূর্তের জন্য তিনি থামলেন। তারপর বললেন:

"আর দেখুন, আমরা এখানে বসে টের পাচ্ছি একটা আশ্চর্য ও ভয়ঙ্কর ব্যাপার—কলেরা রোগের আক্রমণ।

আপনি নিশ্চয় বাতাসে সেই ওষুধের গন্ধ পাচ্ছেন। এর অর্থ, এই গাড়িতে কলেরা রোগী রয়েছে।

তুঁলোতে যান, সেখানেও এর প্রাদুর্ভাব অনুভব করবেন। শুধু মাত্র রোগের ভয়ে ঐ শহরের লোকেরা এতটা বিভ্রান্ত নয়। আসল কারণ, কলেরার বীজাণুকে মানুষ এখনো দেখেনি, এটা একটা অদৃশ্য ভয়ঙ্কর শক্তি-রূপে কাজ করছে।

ডাক্তারদের প্রয়াস দেখে হাসি পায়। পূর্বদিক থেকে আগত কলেরা এক অপ্রতিরোধ্য বিধ্বংসী শক্তি।

তুঁলোর রাস্তা ধরে চলুন। দেখবেন, নাচতে নাচতে মানুষের দল ছুটছে। কেন এই মৃত্যুময় দিনগুলিতে মানুষরা নর্তনরত? তারা আগুন জ্বালিয়ে নাচছে, গাইছে। কিসের জন্য এই উন্মাদনা? কারণ, 'সর্বশক্তিমান তিনি' উপস্থিত রয়েছেন।

ধ্বংসের দেবতাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য মানুষ আগুন জ্বালিয়ে এমন ওয়ালেচ নাচ নেচে চলেছে। কলেরাই তাদের কাছে সেই দেবতা।

সেই অদৃশ্য ভয়ঙ্কর 'অতীতের শয়তান' জমা হচ্ছে এখানে-সেখানে, ডেকে আনছে অসহায় মানুষের মৃত্যু। ভীত মানুষ পুরাকালীন অভ্যাসকে ফিরে পাচ্ছে, ডাক্তারদের বদলে পুরোহিতদের দিয়ে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করছে কলেরা নামক অদৃশ্য দেবতাকে।'

অনুতাপ

[Repentance]

টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি ঝরা শরতের এক বিমর্ষ দিন, গাছ-গাছালির পাতা চুঁইয়ে জল ঝরছে টুপ-টাপ টুপ-টাপ। এই এক ধরণের অলস মন্থর জল ঝরার গান, প্রকৃতির মৃদু জবানবন্দী।

মঁসিয়ে সেভেল ঠিক তখনই ঘুম থেকে উঠে বসলেন, বিষণ্ণ ও খুঁতখুঁতে মুখ-চোখ। ভারাক্রান্ত মন, মুখে কুলুপ, কিন্তু চোখ বেয়ে টস টস করে জল গড়াচ্ছে। বিছানায় এলিয়ে পড়বার আগে পর্যন্ত তিনি ক্লান্তিতে ও ব্যর্থতায় অস্থির ভাবে পায়চারি করছিলেন—একবার আগুনের কাছে, আর একবার জানালায়। আলো ও অন্ধকার নিয়েই তো মানুষের জীবন। কিন্তু তাঁর জীবনে সবটাই অমাবশ্যা, আলোর ঝলকানি এখানে কখনো নেই। বাষট্টি বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি যেন কোন পৌরাণিক পুরুষ। স্থানীয় সকলে তাঁকে ডাকে 'ফাদার সেভেল' বলে, যদিও তিনি অবিবাহিত; এমন কোন আপনজন নেই, যার কাছে মনের রাশ আলগা ক'রে দিতে পারেন। দ্যুতিহীন চোখের কোণে কালি দিনের পর দিন গভীর হয়। আহ! এমন নিঃসঙ্গ অবস্থায় মৃত্যু কত না মর্মান্তিক। এই একাকীত্বের অন্তিম পরিণতির কথা ভাবতে গেলে সমস্ত মানসিকবৃত্তি অচল হ'য়ে যায়। অথচ মন স্নেহকাতর, দয়া ও মায়ার মহিমান্বিত সমন্বয়—এমন স্পর্শকাতর মানুষটার কী করুণ পরিণতি।

নিজের মরুপ্রায় নিস্ফল অতীত জীবনের কথা ভাবছিলেন সেভেল। কোন দিনই স্বার্থকেন্দ্রিক নন। অথচ কোন মধুময় স্মৃতি তাঁর পাথেয় হয়ে নেই। মনে পড়ছে নেহাৎ প্রথম বয়সের ছবিগুলি, সেই মা-বাবার ঘরে দিন-রাত্তির কাটানো, তারপর যৌবন এলো, এলো কলেজ জীবন, এক-আধটা ভুল-চুকও হলো জীবনে, প্যারিসে শিক্ষালাভ, তারপর একদিন বাবার অসুখ বাড়লো এবং মারাও গেলেন। বাবার মৃত্যুর পর এলেন মায়ের আশ্রয়ে। সংসারে তখন মোটে দু'টি প্রাণী, একজন বৃদ্ধা, অন্যজন তরুণ। নিস্তরঙ্গ অনাড়ম্বর জীবন। একদিন মারও জীবনীশক্তি স্তিমিত

হয়ে এলো, তিনি মারা গেলেন। গোটা পৃথিবীর সতেজ রঙটাই মুছে গেল, বিগড়ে গেল ছন্দ, এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই দুঃসাধ্য। এরপর সারাটা জীবন তিনি একলা পথিক, কেউ নেই তাঁর পাশে। ঠিক এভাবেই একদিন সমাপ্তি টানবেন সেভেল। দুনিয়ার লোক ভুলে যাবে, সেভেল নামক একটি লোক একদিন বেঁচে ছিল। কী মর্মান্তিক নিষ্ঠুর সত্যি। প্রত্যাশায় যতই আবেগসিক্ত হওয়া যাক না কেন, এ পরিণতি অনিবার্য। সকলেই বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে, সুখে হাসবে, প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় আনন্দে মশগুল হ'য়ে উঠবে; ব্যতিক্রম কেবল সেভেল, যাঁর অবস্থিতির কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যাবে না। কী বিচিত্র! মানুষ তো জানে, মৃত্যুর চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নয়। তবু পার্থিব সুখে তারা উল্লসীত হয়, পার্থিব বেদনায় তারা জর্জরিত হয়ে পড়ে। মৃত্যুর সম্ভাবনা যদি বিন্দুমাত্রও অনিশ্চিত হতো, মানুষের এই সুখ-দুঃখের তবু একটা বনিয়াদ খুঁজে পাওয়া যেত। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। দিনের পর যেমন রাত আসে, মৃত্যুও তেমনি অবশ্যম্ভাবী। স্বাদহীন বর্ণহীন শুধু কতগুলি সময়ের সমষ্টি ছাড়া তাঁর জীবনকালে কি বা আর উল্লেখযোগ্য ব্যাপার আছে? প্রীতিকর বা, অপ্রীতিকর কিছু একটাও যদি তিনি করে উঠতে পারতেন। কোন দুঃসাহসের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা তাঁর নেই, কোন রূঢ় প্রত্যক্ষ প্রত্যাঘাতের সক্ষমতাও তিনি কখনো অর্জন করেননি, উল্লেখযোগ্য কোন সাফল্যের দুয়ারে কখনো তাঁর পদার্পণ ঘটেনি, ফললাভের প্রত্যাশায় তাঁকে কখনো উদ্বিগ্ন অস্থির হতে দেখা যায়নি। শুধু এক অদ্ভুত ক্লান্তির সুরে ভরা নিস্তরঙ্গ জীবন। তিনি যেন একটা নিরেট ধাতবখণ্ড, একই স্থানে বহুকাল অনড়। এক ধরণের রুটিন মাপা জীবন, প্রকৃতার্থে যার মধ্যে ভারসাম্যহীনতাই খুঁজে পাওয়া যায়। দুনিয়ার আর পাঁচজনের মতো তিনি বিয়েটা অব্দি করে উঠতে পারেননি। কিন্তু কেন? কি এমন প্যাঁচে পড়েছিলেন যার জন্য সারাটা জীবন নারী-হীন ভাবে কাটাতে হলো তাঁকে? অবস্থা তো খারাপ ছিল না। পয়সা ছড়ালে ফরমাশ মতো কি না পাওয়া যায়? তবে কি বলতে হবে, বিয়ের আসনে বসবার মতো ফুরসৎ তাঁর হয়নি? হতেও পারে বা। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। মানুষ সাধারণত নিজের চেষ্টাতেই সুযোগ করে নেয়। না, কোন দেমাকের কথা নয়, এটাই সত্যি। আসলে তিনি বরাবরই খুব উদাসী। নির্বিকারত্বই তার চরিত্রের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা।

এর জন্তই তাঁর জীবন এত শূন্তাময়, এর জন্তই তিনি সমীহ আদায় করতে পারেননি। বিচিত্র মেজাজী মানুষ। বিছানা ছেড়ে ঘর ছেড়ে ইতি-উতি ঘুরে বেড়ানো তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ, কারুর সঙ্গে যেচে আলাপ করতে তাঁর রুচিতে বেঁধেছে, পরিচিতজনের সঙ্গে একটিও অপ্রয়োজনীয় কথা তিনি বলতে চাননি, কোন সমস্যা নিয়ে কখনো মাথা ঘামাননি,—এমন ধরণেরই মানুষ তিনি।

সেভেলের অভিজ্ঞতায় প্রেমের কোন ভূমিকা নেই। নারীর ভালোবাসার আবেগ, আবেশ ও জটিলতা তাঁর অজ্ঞাত। ব্যগ্র মিলন প্রতীক্ষায় যে মধুর ক্রোধ ও অস্থিরতা সঞ্চারিত হয়, সেভেল কোনদিন তা অনুভব করেননি। এ ব্যাপারে যে মানসিক বিকলতা ও পারিপার্শ্বিক ঝঞ্ঝাট দেখা দেয়, সেভেল তাদের কখনো মুখোমুখি হননি। পুরুষ ও নারী উভয় উভয়কে শারীরিক ভাবে নিষ্পেষিত করতে করতে যে অপূর্ব পুলক অনুভূত হয়, অত্যাবধি তা অনাস্বাদিত। নারীকে জয় করায় যে আনন্দ, তিনি তা থেকে বঞ্চিত। চুম্বনের রসাস্বাদন থেকে তিনি বহু দূরত্বে। এইসব বৈচিত্র্যের ভুবন থেকে নির্বাসিত থেকে বুঝি তাঁর আজ হাঁপ ধরে গেছে।

উষ্ণ ফেণ্ডারের উপর পা রেখে বসলেন ম'সিয়ে সেভেল। পরনে সাধারণ পোশাক, আগুনের সান্নিধ্যে তাপিত শরীর। কোন রকম হেঁয়ালি না করেই বলা যায়, তাঁর গোটা জীবনটাই ব্যর্থ। তবু—তবু, জীবনে তাঁর একদা ভালোবাসা এসেছিল। কিন্তু সেই ভালোবাসা ছিল অতি সংগোপনে, বিশ্রীভাবে যন্ত্রণাদায়ক, উদাসীন। কুলকিনারা ভেবে সংযমী থাকবার তাঁর যে স্বভাব, তাই শেষঅব্দি অঘটন কিছু ঘটতে দেয়নি। তিনি প্রেমে পড়েছিলেন তাঁর সঙ্গী সাভারের স্ত্রী মাদাম সাভারের। হাঁ; এ রকমই নীরব মতিভ্রম ঘটেছিল তাঁর। আক্ষেপ হয়, কিশোর বয়স থেকে কেন ঐ মহিলার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ তিনি পাননি। জীবনের অনেকটা পথ সফর করে আসবার পর ওর সঙ্গে তাঁর প্রথম মুলাকাৎ। তখন সে এক বিবাহিতা নারী। যদি উপায় থাকতো, সেভেল নিশ্চয় তাঁর পানিপ্রার্থী হতেন।

যদিও অশোভন ও অবৈধ, সেভেলের প্রেম ছিল অত্যন্ত গভীর। প্রথম দর্শনেই প্রেম এবং সেই অমুচ্চার প্রেম দীর্ঘকাল তাঁর সহচরী। আজ মোহ আবেগমুক্ত অবস্থাতেও তিনি সবকিছু স্পষ্ট স্মরণ করতে পারছেন।

যতবার ভদ্রমহিলার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে, ততবারই বিদায়-লগ্নে অব্যক্ত যন্ত্রণায় তাঁর বুক ভরে গেছে। বহু বিনিদ্র রাতে সেই রমণীর কথাই তিনি শুধু চিন্তা করেছেন। আবার রাত যখন ভোর হয়, তাঁর ক্লান্ত মন বাস্তবকে মেনে নেয়, তিনি নিজেকে সংযমী রাখেন।

মাদাম সাডারের স্বর্ণাভ রঙ, অটুট স্বাস্থ্য বাহান্ন বছর বয়সেও, দেখেই মনে হয় সে খুব সুখী। ইস্, ও কি কোনদিন সেভেলের মনের ভাব বুঝতে পারেনি? অনুভব করেনি, এই পুরুষটি তারই ভালোবাসা পাবার জন্য পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেল? আচ্ছা, সেভেল যদি কখনো তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করে ফেলতেন, তবে কি ভাবে ব্যাপারটা গ্রহণ করতো সে?

নিজেকে এরকম অজস্র প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে সদুত্তর খোঁজেন সেভেল। ফেলে আসা দিনগুলির যাবতীয় ছবি তাঁর চোখের সামনে ভাসছে। মাদাম সাডার যখন পরিপূর্ণ যুবতী, তখন কত সময় না তাঁর ব্যয়িত হয়েছে ওর সঙ্গে কথা বলার আনন্দ পেতে। মাদাম সাডারের সুরেলা গলা ও উজ্জ্বল হাসি হয়তো অনেক ইঙ্গিতপূর্ণ ছিল, সেভেলই যথালগ্নে সাড়া দিতে পারেননি।

সাডার এক ডেপুটি কলেক্টরের অফিসে কাজ করতেন। প্রতি রবিবার সেভেল ঐ পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে বের হতেন। মনে আছে, সেন নদীর তীরে সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। আশ্চর্য একটি বিকেল; মাদাম সাডারের খুব ঘনিষ্ঠ হবার সেদিন সুযোগ পেয়েছিলেন সেভেল। তাঁরা তিনজনে এসে পড়েছিলেন প্রথম বেলাতেই। পিকনিকের যাবতীয় সরঞ্জাম বয়ে এনেছিলেন। বাতাসে তখন বিচিত্র সুবাস, সর্বত্র এক আনন্দময় পরিবেশ। পাখিরা ডানা ঝাপটায়, গান গায়। সূর্যের অকৃপণ আলোতে নদীর জল ঝিকি মিকি ঝিকি মিকি। এমন প্রাকৃতিক প্রভাবে মন স্বভাবতই অস্থির।

নদীর ধারে উইলো গাছের নীচে তাঁরা পিকনিক করেছিলেন। খেতে খেতে ভর দুপুর, মৃদুমন্দ বাতাস পরশ বুলিয়ে যায়। মদ তাঁরা একটু বেশীই পান করে ফেলেছিলেন। ফলে স্নায়ু আরো উত্তেজিত ও উন্মুখ।

খাওয়া-দাওয়ার পর সাডার তাঁর বিশাল পিঠ বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুম, অত আরামপ্রদ দিবানিদ্রা তাঁর নাকি আর কখনো হয়নি।

তখন এঁরা দু'জনে—সেভেল এবং মাদাম সাডার—সেন নদীর তীর

বরাবর হেঁটে চলেছেন। কখন যেন তাঁরা একে অপরের হাত আঁকড়ে ধরেছেন : মাদাম ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে সেভেলের। এক সময় সে নিজের দেহভারই সঁপে দিয়েছে সেভেলের ওপর, আবেশে খিল খিল করে হেসে ওঠে, 'আমি বিলকুল মাতাল হয়ে গেছি বন্ধু,—আমি এখন একেবারে নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে!'

মাদামের প্রত্যাশাঘন চকচকে চোখের দিকে তাকিয়ে, উষ্ণ শরীরের নিবিড় সান্নিধ্য পেয়ে সেভেল দিশেহারা, অবিবেচক শরীরে জ্বালা, হৃৎপিণ্ডটা অসম্ভব চঞ্চল।

তবু সময়টাকে বৃথাই হারালেন সেভেল। তাঁর হাত কাঁপলো, তালু ঘামলো, চোখ তুলে তাকাতে পারলেন না,—অপ্রতিরোধ্য সংস্কারে ও নীতিবোধের চাপে বিবর্ণ পাণ্ডুর হ'য়ে গেলেন তিনি।

মাদাম সাডার তখনো সুযোগ দিচ্ছে। ছুটে গিয়ে মাথায় গুঁজলো বুনোফুল ও পদ্ম ; তারপর সেভেলের দিকে ঘুরে মিষ্টি হেসে অর্থপূর্ণ গলায় বললো, 'দেখতো, এখন আমায় তোমার ভালো লাগে কি না!'

কোন জবাব দিতে পারেননি সেভেল।

কোন যুৎসই শব্দ সেই মুহূর্তে তিনি খুঁজে পেলেন না। মনে হচ্ছিলো, প্রচণ্ড বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়াই ক'রে তিনি শেষ হয়ে যাচ্ছেন, এখনই হয়তো পা দুমড়ে বসে পড়বেন।

মাদাম হেসে উঠলো। অতৃপ্তির শানিত হাসি, 'বোকা রাজা, এমন করছো কেন? অন্ততঃ মুখে তো কিছু বলতে পারো।'

সেভেলের বুক ফেটে যাচ্ছে, কান্না ঠেলে উঠছে গলা বেয়ে, তবু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলেন না।

সব মনে আছে। যেন এই সেদিনের কথা। আচ্ছা, সেদিন মাদাম সাডার কি বলতে চেয়েছিল? কিসের ইঙ্গিত জানিয়েছিল? দু'জনে এত ঘনিষ্ঠ অবস্থায় ছিলেন যে, একে অপরের উত্তাপ টের পাচ্ছিলেন। মাদামের কান তাঁর গাল স্পর্শ করেছিল বেশ কয়েকবার। সেভেল প্রতিবারই সংকোচ ও ভয়ে মুখ সরিয়ে নিচ্ছিলেন। শেষে এক সময় বলে উঠেছিলেন 'আমাদের কি এখন ফেরা উচিত নয়?'

মাদাম কটাক্ষ করলেন, তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'নিশ্চয়।'

সেভেল সেই মুহূর্তে কিছু ভেবে উঠতে পারেননি। আজ সবটাই জলের

মতো পরিষ্কার।

মনে আছে, সে তখনো বলেছিল, 'আমি আজ তোমারই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে ছিলাম। এখন তোমার যদি ক্লান্তি এসে থাকে, তবে ফিরে চলো।'

সেভেল বলেছিলেন, 'না, আমি ক্লান্ত নই। তবে এতক্ষণে হয়তো সাভার ঘুম থেকে উঠে পড়েছে।'

'ও! তুমি আমার স্বামীর ঘুম ভেঙ্গে যাবার ভয় করছো? বেশ, তবে চলো।'

ফিরবার পথে মাদাম আর তাঁর ঘনিষ্ঠ হয়নি। এমন কি, সারাটা পথ নিঃশব্দ, একটা কথাও বলেনি! কেন? তখন এই প্রশ্ন তাঁর মাথায় ঘুরপাক খায়নি। কিন্তু আজ সেই রহস্য সমাধানে তিনি সমর্থ। কি হতে পারতো সেদিন সেই বিরল নির্জনতায়?

ভাবতে গিয়ে উত্তেজিত হন সেভেল। তাঁর মুখ রক্তাভ হয়ে ওঠে এক লাফে তিনি উঠে পড়লেন। দেহ-মনে তিনি যেন এখন মাত্র ত্রিশ বছরের যুবক। এখন বুঝতে পারছেন, সেদিন তাঁর উচিত ছিল মাদাম সাভারকে সরাসরি প্রস্তাব রাখা, 'আমি তোমার প্রেমে পড়েছি।'

কিন্তু ব্যাপারটা কি সত্যিই সে রকম ছিল? আবার এক পাল্টা সন্দেহে তিনি পুড়তে থাকেন। তাঁর তো কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই, সবটাই অনুমান। আহ! অভিজ্ঞতা না থাকলেও তিনি যদি সুযোগটা নিয়ে কিঞ্চিৎ সক্রিয় হতেন!

আপন মনে উচ্চারণ করেন সেভেল: আমি এই রহস্যের জবাব চাই আমাকে আজ জানতেই হবে! তাড়াতাড়ি জামা-প্যান্ট পরে তৈরি হয়ে নিলেন তিনি। ভাবলেন: আমি তো আজ বাষট্টি বছরের বৃদ্ধ, আর সেদিনের সেই রূপসী আজ আটান্ন বছরের প্রৌঢ়া। এখন আমরা অকপটে সব জানাতে পারি, জানতে পারি।

পথে নেমে চলতে শুরু করলেন সেভেল। হাঁটতে হাঁটতে সাভারের বাড়ি। কমবয়সী ঝি দরজা খুলে দিলো।

'মঁসিয়ে সেভেল, আপনি এখন? কোন বিপদ হয়নি তো?'

'না, তেমন কিছু নয়। আমি শুধু একটা দরকারী কথা বলার জন্য তোমার কর্তামার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

'মুশকিল তো। তিনি যে এখন রান্নাঘরে নাসপাতির জেলি তৈরি করছেন। পোশাক যা পরেছেন, তা নিয়ে কোন ভদ্রলোকের সামনে বের হওয়া যায় না।

'ঠিক আছে। তুমি গিয়ে বলো আমার কথা। ঠিকই বের হতে পারবেন।'

ঝিটি বিদায় নেবার পর সেভেল অস্থির ভাবে পায়চারি করতে থাকেন। মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছেন।···দরজা খুলে মাদাম ঢুকলেন ঘরে। কপালের চামড়ায় ঈষৎ কুঞ্চন, দারুণ স্বাস্থ্য এবং হাসি হাসি মুখ—দেখলেই মনে হয় জীবনে তার সুখের অন্ত নেই। হাত দুটো থেকে টপ টপ করে জেলির রস গড়াচ্ছে।

'ব্যাপার কিগো, শরীর-টরির খারাপ নাকি?'

'না বান্ধবী। তবে আজ তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। উত্তরটা পাবার জন্য আমি আজ খুব অস্থির। জবাবটা কিন্তু সত্যি ও স্পষ্ট দেবে।'

মাদাম বললো, 'কথা আমি সব সময়ই স্পষ্ট করে বলে থাকি।'

'উত্তম। প্রথম দর্শনেই আমি তোমার প্রেমে পড়েছিলাম। তুমি কি সেটা টের পেয়েছিলে?'

প্রথম বয়সী যুবতীর মতো খিল খিলিয়ে হেসে উঠলো মাদাম, 'এতো দিনে মাথায় পোকাটা জেগে উঠলো বুঝি? তবে জেনে রেখো, আমার প্রতি তোমার দুর্বলতা সম্পর্কে আমি প্রথম থেকেই ওয়াকিবহাল ছিলুম।'

সেভেল কেঁপে ওঠেন, তোতলাতে থাকেন, 'তুমি জানতে! তবে···'

'তবে কি?'

'তুমি তো কখনো প্রকাশ করোনি।'

আবার মাদামের খিল খিল হাসি, 'আমি বলবো কেন? তুমিই তো কোনদিন আমাকে জানালে না।'

সেভেল ওর দিকে দু'পা এগিয়ে আসেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো, 'এবার বলো—বলো, সেই দিনটার কথা—সেই সেন নদীর পাড়ে নির্জন দুপুর—সাভার ঘুমিয়ে পড়েছে—আর আমরা দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর চলে এসেছি। মনে আছে?—'

মাদাম সাভার হাসি চেপে বললো, 'মনে আছে বৈকি।'

কাঁপতে কাঁপতে সেভেল বললেন, 'সেদিন—সেদিন যদি আমি দুঃসাহসী হয়ে তোমাকে লুঠ করতে চাইতুম?'

বিচিত্র সুখের হাসি হাসতে লাগলো মাদাম সাভার। তারপর স্বরে ঈষৎ বিদ্রূপ মিশিয়ে বললো, 'আমি বিনা বাধায় নিজেকে তোমার কাছে সঁপে দিতুম।'

—বলেই রান্নাঘরের দিকে চলে গেল মাদাম সাভার।

মাথা হেঁট সেভেল ছিটকে বেরিয়ে এলেন পথে। তিনি যেন কোন বিরাট বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত। বাইরে শুরু হয়ে গেছে বৃষ্টি। ভিজতে ভিজতেই ছুটছেন সেভেল। সোজা এসে দাঁড়ালেন সেই নদীর ধারে। হাঁটতে হাঁটতে উপস্থিত হলেন স্মৃতি বিজড়িত সেই বিশেষ স্থানটিতে, যেখানে একদা তিনি ও মাদাম সাভার অনেকটা ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। বুকের ভেতর যন্ত্রণা। বিরলপত্র উইলো গাছটার নীচে বসে বুকফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন সেভেল।

আলেকজাঁদ্র

[Aleczard]

প্রাত্যহিক নিয়ম মেনে সেদিনও ঠিক চারটের সময় আলেকজাঁদ্র তিন চাকার গাড়িটি ঠেলতে ঠেলতে এনে লাগালো মেরাম্বেলের ছোট-খাটো বাড়িটার সামনে। ডাক্তারের বিধান অনুযায়ী তার এই কর্তব্য—প্রতিদিন সে তার পঙ্গু অষ্টবক্র বৃদ্ধা প্রভুপত্নীকে ঐ ঠেলায় চাপিয়ে বেড়াতে নিয়ে যাবে এবং ঘুরবে সন্ধ্যা ছ'টা অব্দি।

হালকা গাড়ি, এমনভাবে এনে রাখা হয়েছে যাতে বিশালবপু পঙ্গু রমণীকে সহজেই ওর ওপর তোলা যায়। বাড়িতে ঢুকতেই কানে এলো, বৃদ্ধ প্রভু প্রাক্তন সৈনিক সুগঠিত চোয়াল গৃহকর্তার গালিগালাজ, হম্বিতম্বি। কর্তা পদাতিক বাহিনীর এক অবসরপ্রাপ্ত সেনাপতি; মঁসিয়ে মেরাম্বেলর শুধু গলার আওয়াজ নয়, সেই সঙ্গে কপাটে-কপাটে ঠোকাঠুকির দড়াম-দড়াম শব্দ, চেয়ার-টেবিল উল্টে পড়ার কর্কশ ধ্বনি-তরঙ্গ, ধুপধাপ পা ফেলার

শাব্দিক মহড়া, যা শুনলে যে কোন নতুন লোকের আত্মভ্রান্তি ঘটতে পারে। ছইছত্রাকারে অগোছালো করা হচ্ছে গোটা বাড়িটাকেই যেন। তারপর হঠাৎ সব নিঝুম। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবার পর আলেকজাঁদ্র ঘরের ভেতর প্রবেশ করে এবং নিয়মের অনুবর্তী নিপুণতায় মেরাম্বেলের স্ত্রীকে দুই হাতে তুলে নিয়ে একটার পর একটা সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে। অথচ, এই পথটুকু পার হতে হাঁপ ধরলো আলেকজাঁদ্রের নয়, তার প্রভুপত্নীর। গাড়িতে উঠতে গিয়ে ক্লান্তিতে প্রায় ভেঙে পড়লেন মহিলা। আলেকজাঁদ্র গাড়ির হাতল ধরে ঠেলতে শুরু করে। শুরু হয় তাদের পরিভ্রমণ।

এই একই পথ ধরে প্রতিদিন তারা ছোট্ট শহরটিকে পরিক্রমণ করে; পথের দু'ধারে দেখা হয় যত লোকের সঙ্গে, প্রত্যেকেই সসম্মানে অভিনন্দন জানায়। যেন কোন মঞ্চে দাঁড়ানো যাদুকর তাঁর বুজরুগি ও ভেল্কি দেখিয়ে সকলের অভিনন্দন কুড়াচ্ছেন। সেই অভিনন্দনের অংশ পাচ্ছে আলেকজাঁদ্র নিজেও। আসলে এই বৃদ্ধা শহরের সকলেরই সম্মান ও ভালোবাসার পাত্রী। তাঁর সৎ প্রবৃত্তি এদের কাছে আদর্শ। আর এই প্রাক্তন অশ্বারোহী সৈনিক আলেকজাঁদ্র প্রত্যেকের কাছে আদর্শ একনিষ্ঠ পরিচারক। তার সমস্ত মুখমণ্ডল জুড়ে রয়েছে ক্যাকটাস ও অর্কিডের মতো থোকা থোকা সাদা দাড়ি, যা তার বয়স ও ঐতিহ্যকে সমান ভাবে প্রকাশ করে।

জুলাই মাসে সূর্যের অসম্ভব ঔজ্জ্বল্য ও দাবদাহে পথঘাট তেতে আছে, ঘরবাড়িগুলি ঝিমিয়ে পড়েছে। নেই কোন চাঞ্চল্য, প্রাণস্পন্দন বা উচ্ছল বালখিল্যতা। দেয়াল সংলগ্ন ছায়ায় শরীরটাকে গাঢ় ভাঁজে কুণ্ডলী পাকিয়ে কুকুরের দল ঝিমুচ্ছে। দৃশ্যত ও অদৃশ্যত এই প্রতিকূলতায় বেদম হয়ে পড়ছে আলেকজাঁদ্র, হাঁ করে দম নিতে হচ্ছে তাকে। লালিত্যময় ছায়া পাবার আশায় সে যত দ্রুত সম্ভব ঠেলাটা ঠেলতে থাকে নদীর দিকে, যেখানে একাধিক তরুবীথির সমাবেশে পরিবেশ মনোরম। পরিশ্রান্ত আলেকজাঁদ্রের প্রাচীন পেশীগুলি ফুলে ফুলে উঠছে এবং তখন শ্বেতবর্ণ আচ্ছাদনের নীচে মাদাম মেরাম্বেলের দুই চোখ ঘুমে ঢুলু ঢুলু। ঠেলাগাড়ির রোখাচোখা গতি, মাদামের ছাতার প্রান্তভাগ দুলছে আলেকজাঁদ্রের মুখের ওপর, মাদাম ঘুমের আবেশে, পারিপার্শ্বিকতার আর কোন চৈতন্য নেই।

নদী তীরে গাছের ছায়ায় পৌঁছেই মাদামের আরাম ও স্বস্তি বৃদ্ধি পেলো

নরম গলায় বললেন, 'অত জোরে চালিও না। গরমে যে মারা যাবার যোগাড়।'

যদিও তাঁর স্বর নরম ও সিক্ত, এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, মাদাম আলেকজাঁদ্রের পরিশ্রম দেখে করুণা করছেন; বরং, এমন গাছ গাছালির জমায়েতে মৌতাতটুকু উপভোগ করবার স্বার্থপরতায় তিনি পরিচারককে ধীরগতিতে গাড়ি ঠেলতে বললেন।

ঝাকড়া ঝাকড়া লেবুগাছের ছায়ায় এখানে চন্দ্রাতপ, উইলো ঝোপ গুটিকে দুলিয়ে দুলিয়ে চঞ্চল নদী নাভেৎ বয়ে চলেছে যেন উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে। নদীর জল পাক খেতে খেতে ছলকে উঠে আছড়ে পড়ে পাথরের গায়ে। জায়গায় জায়গায় হঠাৎ বাঁক একটানা প্রবাহকে ভঙ্গুর ক'রে দেয়। নদীর কলতান তথা সিক্ততা বাতাসের হাত ধরে ভেসে আসে, ভ্রমণের এই চমৎকার স্থানটিকে সম্যক মনোরম করে তোলে।

পরিবেশের রমণীয়তায় উৎফুল্ল মাদাম মেরাম্বেল মন্তব্য করলেন, 'খুব ভালো লাগছে তো এখানটা। কিন্তু আজ একটা ব্যাপার ঘটেছে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই উনি খাটের উল্টোদিক দিয়ে নামলেন।'

আলেকজাঁদ্র বিস্ময় প্রকাশ করলো, 'তাই নাকি মাদাম!'

গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আলেকজাঁদ্র এই পরিবারটির সেবা করে এসেছে নিজের বিপদ আপদ বা ওঁদের রুচি তথা খাদ্যাখাদ্যের ব্যাপারে বাছবিচার তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি। প্রথম জীবনে ছিল সেনাপতি মেরাম্বেলের অধীনস্থ একজন কর্মচারী, পরে পরিণত হয় তাঁর বাড়ির খানসামায়। এই পরিবারটিকে ছেড়ে দিতে কখনোই আলেকজাঁদ্র রাজী নয়, দারুণ মায়ায় আবদ্ধ সে, এঁদের সুখ সুবিধার প্রতি তার সতর্ক উজ্জ্বল দৃষ্টি। প্রভুপত্নী শারীরিক দিক থেকে বিকল হয়ে পড়বার পর, গত দু'বছরে তার কাজের বহর আরো বেড়েছে—রোজ বিকেল থেকে সন্ধ্যা অব্দি এই পঙ্গু রমণীকে ঠেলায় বসিয়ে চক্কর কাটা। দীর্ঘদিনের আনুগত্যে ও নিরলস সেবায় বৃদ্ধ ভৃত্যের সঙ্গে প্রভুপত্নীর এক প্রীতিকর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এমন আত্মবিস্মৃত সেবা দুনিয়ায় বিরল। স্বভাবতই প্রভুপত্নী এই ভৃত্যের প্রতি মমত্ব অনুভব করেন।

নির্জনে, যেখানে নাগরিক জীবনের হাঙ্গামা হুজ্জুত অনুপস্থিত, তারা সাংসারিক বিষয়গুলি নিয়ে এমন ভাবে আলোচনা করে যে মনে হয় বুঝি

পদমর্যাদায় তারা সমান-সমান। কখনো গভীর, কখনো কৌতুকোজ্জ্বল নির্ভীক আলোচনা। তবে বেশির ভাগ সময়ই তারা আলোচনা করে কাপ্তেনের মানসিকতা নিয়ে—দিনে দিনে মানুষটা বড় বদরাগী ও খিটখিটে মেজাজের হ'য়ে উঠছেন। এক বিরাট হতাশার বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছেন কাপ্তেন ; বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে তিনি তাঁর জীবন শুরু করেছিলেন, কিন্তু চাকুরি জীবনে যথেষ্ট দক্ষতা দেখানো সত্ত্বেও যথাযথ পদোন্নতি ও সম্মান তিনি পেলেন না। সামগ্রিক ভাবে এই পৃথিবীর প্রতিই তাঁর তাই ঘৃণা ও বিদ্বেষ।

মাদাম মেরাম্বেল তাঁর আগের কথার জের টেনেই বললেন, 'সকালে ঘুম থেকে উঠেই উনি খাটের উল্টোদিক দিয়ে নামলেন।'

'তাই নাকি!'

'হাঁ, অবসর নেবার পর থেকে এ রকম প্রায়ই তাঁর হয়। মনে হয়, গভীর বিতৃষ্ণায় তাঁর সচেতনতা লোপ পেয়ে যাচ্ছে!'

আলেকজাঁদ্র দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলে, 'ঠিক তা নয় মাদাম। এ ভুল তাঁর আরো পুরনো, কাজ ছাড়বার অনেক আগে থেকেই তাঁর এমন ভুল-ভ্রান্তি হতে শুরু করেছিল।'

'ঠিকই বলছো। ভাগ্য বরাবর তাঁকে ঠকিয়েছে। তখন তো মাত্র কুড়ি বছর বয়স, অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়ে পুরস্কার পেলেন। তাঁর আপাদমস্তকে তখন সৌভাগ্যের দ্যুতি, গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গেই আশা করেছিলেন—অবসর নেবার আগে অন্ততঃ কর্ণেল হতে পারবেন। কিন্তু বিভাগীয় একদেশদর্শিতা তাঁর গুণগুলিকে রেয়াত করলো না। কুড়ি বছরের যুবক পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধ হয়ে গেলেন, তবু কাপ্তেনের ওপর আর উঠতে পারলেন না।'

নিরীহ আলেকজাঁদ্র কঠিন মন্তব্য করলো, 'কিন্তু এই ব্যর্থতার জন্য তিনিই দায়ী, তাঁর স্বভাব দায়ী। অত রোখাচোখা লোককে উপরওয়ালারা কখনো পছন্দ করেন না। তাঁরা চান, অধস্তন কর্মচারীরা হবে ঘোড়ার চাবুকের মতো অনুগত ও সত্তাহীন ; স্পষ্টবাদী ও আত্মসম্মান সচেতন মেজাজী মানুষ কখনো উপরওয়ালার অনুগ্রহ পায় না।'

মাদাম মেরাম্বেলের মুখে অন্যমনস্কতার ছাপ। বিষণ্ণ দুশ্চিন্তায় ডুবে যাচ্ছেন তিনি। বছরের পর বছর স্বামীর নির্মম ব্যবহার প্রত্যক্ষ করে আসছেন তিনি। সে কতকাল আগের কথা—তিনি এই মানুষটিকে বিয়ে

করেছিলেন। তখন এক তরুণ সুদর্শন ভালো চাকুরে, দেখলেই ঝটিতি মুগ্ধ হতে হয়। সকলেই এক বাক্যে সায় দিয়েছিল—এ ছেলের ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। অথচ, ঐ বিয়েটাই প্রমাণিত হলো কত বড় অনর্থ, কী বিরাট ভুল! মেজাজ ও স্বভাবের দৌলতে সব নষ্ট হয়ে গেল।

মাদাম মেরাম্বেল নরম স্বরে বললেন, 'একটুখানি থামো না আলেকজাঁদ্র। তুমিও একটু বিশ্রাম করে নাও।'

বসে পড়ে আলেকজাঁদ্র অযৌক্তিক গর্বে ধবধবে মোলায়েম দাড়িতে হাত বোলাতে থাকে। মুঠো করে দাড়ি পাকিয়ে পেট অব্দি টেনে নামায় এক একবার, যেন তার দাড়ির দৈর্ঘ্য মাপছে।

মাদাম মেরাম্বেল আবার সেই পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন, 'আমি না হয় ওঁকে বিয়ে করে সারাটা জীবন অত্যাচার ভোগ করে আসছি। কিন্তু তুমি কেন তা বছরের পর বছর সহ্য ক'রে যাচ্ছো আলেকজাঁদ্র?'

গ্লানিহীন তৎপরতায় মাথা ঝাঁকিয়ে আলেকজাঁদ্র বললো, 'আমার কথা বাদ দিন মাদাম। আমাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনবেন না।'

'সত্যি বলছি, ব্যাপারটা আমার কাছে বিস্ময়কর। আমাদের যখন বিয়ে হয়, তখন তুমি ওঁর আর্দালি ছিলে। কানুন অনুযায়ী ওঁকে তখন তুমি মানতে বাধ্য ছিলে। কিন্তু আমাদের পারিবারিক জীবনেও নিজেকে গেঁথে রাখলে কেন? কত সামান্য মাইনে পাও, কুৎসিৎ ব্যবহার, তবু তুমি মুখ বুজে নিশ্চল থেকে গেলে? তোমারও তো জীবনে সাধ-আহ্লাদ থাকতে পারে, আর সকলের মতো তুমিও তো বিয়ে-থা করে ছেলে-পুলে নিয়ে সংসারী হতে পারতে।'

আলেকজাঁদ্র আবার বললো, 'আমার কথা বাদ দিন মাদাম। আমি এ সব নিয়মের মধ্যে পড়িনা।'

কথাটা বলেই কেমন যেন সে অস্থির হয়ে ওঠে, নিজের লম্বা দাড়ি ধরে জোরে জোরে টানতে থাকে, তার বুকের কোন যন্ত্রণাঘন স্থানে যেন সে হাতুড়ি পিটছে। সে যেন চাইছে, এই মুহূর্তে নিজের হাতে দাড়িগুলিকে উপড়ে ফেলতে। ক্রমশঃ তার দৃষ্টি ব্যথিত, বিব্রত, সজল।

মাদাম মেরাম্বেল আপন মনেই বলে চলেছেন, 'তুমি তো নেহাৎ অশিক্ষিত গ্রাম্য নও, তুমি একজন লেখাপড়া জানা লোক—'

আলেকজাঁদ্র হঠাৎ সগর্বে বলে ওঠে, 'আমি আমিনের কাজ জানি।'

'অথচ, আমাদের কাছে থেকে জীবনটাকেই বরবাদ করে দিলে ; কেন ?'

সে তোতলাতে শুরু করে, 'এ-এ-আর কি বলবো ! কেন—এটা আমার স্বভাবের দোষ বলতে পারেন, মাদাম।'

'স্বভাবের দোষ ! সে আবার কি ?'

'মানে যদি কারও প্রতি অনুরক্ত হই, তবে সেই অনুরাগ চিরদিন অটুট থাকে। ব্যস, ঠিক এই কারণেই।'

মাদাম অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন,—মেরাম্বেলের দয়া আর সৌজন্যে মুগ্ধ হয়ে সারাটা জীবন তাঁর কাছে রয়ে গেলে, আমাকে কি এটাই বিশ্বাস করতে বলছো ?'

আলেকজাঁদ্র এবার দারুণ বিভ্রান্ত ও বিচলিত বোধ করে। ভাঙা আসনটির ওপর তার শরীরটা নড়ে চড়ে ওঠে। কোন রকমে বিড়বিড়িয়ে ওঠে, 'আমি তাঁর জন্য নই, আমি আপনার জন্যই –'

মাদামের সুন্দর মুখে চমকের ছায়া। বিস্মিত বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে তিনি তাঁর ভৃত্যকে দেখতে থাকেন। তাঁর মাথার তুষারশুভ্র কেশদাম রাজহংসের ডানার মতো শোভিত।

'আমার জন্য ? হায় ভাগ্য ! তুমি এ কি বলছো আলেকজাঁদ্র ?'

স্বল্পভাষী লাজুক লোকটির অবস্থা এখন অবর্ণনীয়, গোপন কথা বলে ফেলে সে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে, দৃষ্টি নামায় এবং ডাইনে-বাঁয়ে সুদূর প্রকৃতির রাজ্যে কি যেন সে খুঁজে বেড়ায়। তারপর এক সময় মরিয়া হয়ে বলে ওঠে, 'আমি যখন প্রথম লেফটেন্যান্টের একটি চিঠি নিয়ে আপনার কাছে গিয়েছিলাম, আপনি আমার দিকে চেয়ে একটু হেসেছিলেন এবং এক ফ্রাঁ পুরস্কার দিয়েছিলেন। সেই মুহূর্তেই যা হবার হয়ে গেল।'

মাদাম ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়ে গেল ?'

ভয়ে বিবশ আলেকজাঁদ্র বলতে থাকে, 'তখন থেকেই আমি আমার প্রভুপত্নীর প্রতি আকৃষ্ট। তখন থেকেই।'

মাদাম নিরুত্তর। ওর দিকে তাকাচ্ছেন না। দয়া ও সহানুভূতিসম্পন্ন তিনি ভেবে দেখছেন গোটা ঘটনাটা। তিনি অনুভব করতে পারছেন, এই হতভাগ্য লোকটির প্রেমে কী গভীর নিষ্ঠা ! সারাটা জীবন নিজের যন্ত্রণাকে গোপন রেখেছে সে।

কোন রকম বিদ্বেষ না রেখেই তিনি বললেন, 'চলো, ফেরা যাক।'

আবার তারা ফিরে চললো। পথে ক্যাপ্তেনের সঙ্গে দেখা। মারমুখী ক্যাপ্তেনের প্রথম জিজ্ঞাসাই হলো, 'আজ রাতে খাওয়াটা কি হবে?'

'মুরগী আর ফ্লেজোলেতস্।'

খেঁকিয়ে উঠলেন কর্তা, 'শুধু মুরগী আর মুরগী! চুলোয় যাক তোমার এই মুরগীপ্রীতি! তুমি কি আমাকে এই সব অখাদ্য খাইয়ে মারবে নাকি?'

মাদামের হতাশ স্বর, 'ডাক্তারের যে তাই নির্দেশ, লক্ষীটি!'

ক্রুদ্ধ ক্যাপ্তেন যেন প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন আলেকজাঁদ্রের ওপর, 'আমার অসুস্থতার জন্য এই হারামজাদাই দায়ী! পঁয়ত্রিশ বছর ধরে কুৎসিৎ সব রান্না খাইয়ে আমার পেটের বারোটা বাজিয়েছে।'

মাদাম চকিতে মুখ তুলে তাকালেন বৃদ্ধ ভৃত্যের দিকে। চার চক্ষুর মিলন হলো। উভয়ের দৃষ্টিতে অকৃপণ, অকৃত্রিম সহানুভূতি ও সান্ত্বনা।

গুপ্তজ্ঞান

[Concealed Conception]

প্রাক্ বিবাহিত জীবনে প্রেমের যে রীতি, তারা তখন যেন ছিল সৌর জগতে ভাসমান দুটি আত্মা, সম্পূর্ণ শুচিতা বজায় রেখে উভয়ের বিচরণ।

সমুদ্রের ধারে প্রথম তাদের সাক্ষাৎ। ঘটনাটা পূর্বরাগের সমার্থসূচক। কিশোরীর হাতে ঘোরতর ঘূর্ণয়মান রঙিন ছাতা এবং পরনে ঝকমকে পোশাক, ব্যক্তিত্ব প্রকাশের অনুকৃতিতে যুবকটির সে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। রূপের বাহারে সে যেন সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ।

সামনে ঐ বিশাল সমুদ্রের পটভূমি, স্বভাবতই যুবক আন্তরিক ভাবে পুলকিত হয়েছিল নবোদ্ভিন্ন যৌবনের এমন বাহার দেখে। সামুদ্রিক বাতাসের অনর্গল ঝাপটায় সুন্দরীর সোনালী চুল নর্তনরত, গাত্রবর্ণও স্বর্ণাভ, চমৎকৃত না হয়ে উপায় কি? বাতাসে লবণাক্ত স্বাদ, রৌদ্রের তরঙ্গায়িত হিল্লোল,—এমন পরিবেশে প্রেমের সংকল্প অবধারিত। তার ঈষৎ শিথিল শিরা-উপশিরাও চনমনে হয়ে ওঠে, সে ওর ভালোবাসা পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

মেয়েটির পক্ষেও প্রেমের সামিল হওয়া অনিবার্য, যেহেতু সে লক্ষ্য করেছিল, যুবকটি তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়। তদুপরি, এর বয়স কম, পারিবারিক সুনাম ও স্বচ্ছলতা পর্যাপ্ত, রুচিবানদের মতো নিখুঁত আচার-ব্যবহার; সর্বোপরি, মেয়ে-ভুলানো মিষ্টি স্বরে সে কথা বলে থাকে। এই জাতের পুরুষ যে কোন অবস্থায় যে কোন মেয়েকে বশে আনতে পারে।

তারপর গুণে গুণে তিনটি মাস ধরে তারা পাঠ নিলো প্রেমের বর্ণপরিচয়ের, চোখে চোখ, হাতে হাত অতি সরলমতি যুবক-যুবতী যেন, প্রায়শঃই দেখা যায় ইতি-উতি চক্কর কাটছে, যেন আকাশে যৌথ বলাকার বিহার। স্বভাবতই সিদ্ধান্ত নেওয়া চলে, ভালোবাসার বেসাতিতে এরা বুজরুক নয়, এক ধরণের সাবেকি নিষ্ঠা লক্ষণীয়। প্রতিদিন স্নানের আগে এমত প্রেম-লীলার উদ্যোগপর্ব, তারা তখন উভয় উভয়কে শুভেচ্ছা জানায় নতুন দিনটির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে; আর তারা যখন পরস্পরকে বিদায় জানায়, তখন রাত্রির উষ্ণ হৃদয় প্রসারিত। যদিও পাত্র-পাত্রী হিসেবে তারা অতি উত্তম রাজযোটক, কিন্তু প্রাকবিবাহিত কালে তাদের সংযম বড় কঠিন, তারা কখনো অধরে অধর মেলায়নি; তারকা খচিত আকাশের নীচে, বালুময় ভূমির ওপর আচ্ছন্ন অবস্থায় তারা বহুক্ষণ পায়চারিরত, তাদের মৃদু কণ্ঠস্বরই সপ্রেম চুম্বনের স্বাদ বহন করে যেত বা। বিরাগ থেকে শত যোজন দূরত্বে অনুরাগে টইটম্বুর ওরা দু'জন পরস্পরকে শুধু মনে নয়, দেহেও কামনা করে, স্বপ্নে উত্তেজিত হয়, জাগরণে আচ্ছন্ন থাকে, আর পাঁচজন প্রেম-মুগ্ধ নর-নারীর ব্যতিক্রম নয় তারা। সেই কারণে বেশ কিছুকাল সংযমী মুহূর্ত কাটাবার পর যখনই তারা বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করলো, তখন অসহনীয় নিরুত্তপ্ত বাঁধ ভেঙ্গে কামনার জোয়ার এলো যেন, নিষ্ঠার বর্মগুলি একে একে খুলে রেখে চূড়ান্ত ইন্দ্রিয়সুখে তারা বার বার মগ্ন হয়, তখন এই অসহ্য সুখকর দৈহিক মিলনকেই তারা মনে করে প্রেমের পরম ফলশ্রুতি, কিছুই আর গোপনীয় নেই, দুর্নিরীক্ষ্য সূক্ষ্ম রসবোধটুকুও মুছে যায় স্থূল দেহজ কামনায়। ক্রমে তাদের কাছে জান-খুশ্ ব্যাপার বলতে একটা জিনিসই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, —সেটা হলো দৈহিক মিলনের নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করা। পঞ্চ ম'কারের সবচেয়ে উত্তেজক 'ম' নিয়ে রাতে তারা মেতে থাকে। এমনকি দিনের বেলাতেও তারা এমন সব ইঙ্গিত করে, যা কেবলমাত্র কামনাজ্ঞাপক। কামের দুনিয়ায় তারা দুই জবরদস্ত মেহমান।

কিন্তু এমন উত্তেজনা কোথাও কস্মিনকালেও যেমন স্থায়ী হয় না, এদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। কিছুদিনের মধ্যেই জমাট ক্লান্তি এসে গ্রাস করে, কামপূর্ণ নেকনজরে আর আগের মতো চাকচিক্য নেই; অবিশ্যি কথা-বার্তায় তারা দু'জনেই এই স্বতঃসিদ্ধ ক্লান্তি প্রকাশে কুণ্ঠিত, কিছুতেই বলতে চায় না—আমাদের স্বয়ংভু ছলা-কলাগুলি আর আগের মতো সাড়া জাগায় না। এর অর্থ অবিশ্যি এই নয় যে, তাদের মনোরঞ্জনী প্রেমে কোন খাঁদ ছিল। আসল কথা হলো, যতই চিত্তহারিণী হোক না কেন, সব কিছুরই একটা সীমা আছে! এই মুহূর্তে যৌথ জীবন আকর্ষণহীন, পুরনো মরচে ধরা, নারীর কাছে পুরুষটি আর ইস্পাত নয় এবং পুরুষটির কাছে এই নারীও আর বিদ্যুল্লেখা নয়। প্রেমযুক্ত কথাকে মনে হয় বস্তাপচা কপচানো বুলি, নতুন কিছু চাওয়ার নেই যেন।

এই ভাবেই অতিদ্রুত তাদের প্রেম আগাপাস্তলা বিবর্ণ, দেদার কসরতেও সে তার বিগত জলুস ফিরে পাবে বলে মনে হয় না, যদিচ উদয়াস্ত তারা দুটিতে প্রেম-পুলক সঞ্চারের অভিনব পন্থা আবিষ্কারে ব্যস্ত, জটিল সব ছলা-কলায় এক ধরণের হামাগুড়ি দেওয়া আর কি!

এখন আর মজা আসে না; বরং, কখনো কখনো মনে হয়, এ ধরণের উন্মত্ততা অসমীচীন। সদ্য বিবাহিতের সেই উল্লাস ক্রমশঃই কথঞ্চিৎ, শিরায় শিরায় আদৌ আর আগুনের দাপাদাপি নেই। এক ধরণের শিথিলতা ও অনুত্তেজক হাবিজাবি ভাবনা।

দেহের চাহিদা মেটাতে এখনো অবশ্য তারা প্রায়শই সঙ্গমরত, কিন্তু সেই প্রাণবন্ত মুহূর্তগুলির আয়ু অতি সীমিত, একটু পরেই নিশ্চল নিষ্কম্প ক্লান্তি নামে, নির্ঝরিণী আকর্ষণের পরিবর্তে বিতৃষ্ণাই প্রবলতর হয়ে ওঠে।

দৈনন্দিন জীবনে নেমে আসা এই অনভিপ্রেত বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে তারা নানা রকম ফন্দি আঁটে, দিগ্বলয়ে বৈচিত্র্যের সন্ধান করে। চাঁদনি রাতে পাতাঘন গাছের নীচে দাঁড়িয়ে তারা মৌতাতের প্রতীক্ষা করে, কুয়াশাঢাকা পাহাড়ের দিকে চেয়ে অযাচিত কাব্যরসে নিজেদের আপ্লুত করতে চায়, আবার কখনো বা সামাজিক জমায়েতে খানিকটা হৈ চৈ করে আত্মপ্রসাদের সন্ধান করে।

ইত্যাকার ব্যর্থ উচাটন-নৃত্যে সুখ খুঁজবার কালে মাদাম আঁরিয়েত্তের

মাথায় আচমকা একটা পরিকল্পনা এসে দানা বাঁধে ; পলকে ডেকে সে বলে, চলো না গো, কোন হোটেলে। আমাকে তুমি খাওয়াবে।'

'বেশ তো, যাওয়া যাবে।'

'খুব নামী হোটেল হবে তো?'

'আলবাৎ।'

এক লহমায় পল বুঝলো, স্ত্রীর মনে নিশ্চয় কোন গোপন রহস্য রয়েছে, নচেৎ হঠাৎ হোটেলে খানাপিনার বায়না ধরবে কেন?

অাঁরিয়েত একটু খুলেই বলে, 'হোটেল মানে আমি বোঝাতে চাইছি—কি যে বলি—মানে সেই রকম একটা রেঁস্তরা, যেখানে পুরুষরা তাদের বান্ধবীদের নিয়ে ফুরসৎ মতো এসে হাজির হয়, খানাপিনার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ—এইসব আর কি!'

পল হাসে, 'বুঝেছি। বড় বড় কাফেতে এ রকম ঘর পাওয়া যায়, যেখানে ঢুকলে প্রেমিক-প্রেমিকার রক্তে রিণিরিণি বেজে ওঠে।'

'ঠিকই বুঝতে পেরেছো তুমি, পল। কিন্তু সেই অভিজাত কাফে, যেখানে সদাচার সুন্দরীদের সমাবেশ ঘটে, তোমার যেন পূর্ব পরিচিত হয়। অর্থাৎ ওখানে তুমি এর আগেও দুপুরে—না, রাত্রে খানাপিনা করেছো এবং তোমার চিত্তরাজ্যে—না, থাক, আমি বলতে সাহস পাচ্ছি না।'

'ধ্যাৎ, বলেই ফেলো না প্রিয়া! আমার কাছে খুলে বলতে লজ্জায় এমন বে-এক্তেয়ার হয়ে যাচ্ছো কেন? আমাদের মধ্যে তো লুকোচুরির কোন ব্যাপারই নেই।'

'সাহস পাচ্ছি না।'

'আহা! একটিবার আমার কাছে সরে এসে নির্ভয়ে বলো। আমার পৌরুষসত্তা আদৌ আহত হবে না। বলো।'

'বলছি। বলছিলাম—আমি ওখানে তোমার প্রেমিকাটি সেজে যাবো, এবং তুমি ব্যবহার করবে মোহাতুর যুবকের মতো। কাফের লোকজনেরা, যারা অষ্টপ্রহর অমন ঝাঁঝালো ব্যাপার দেখছে, বুঝতেই পারবে না, আমরা স্বামী-স্ত্রী। আমরা গিয়ে বসবো সেই জায়গাতেই, যেখানকার সম্পর্কে তোমার কিছু পূর্ব-অভিজ্ঞতা আছে। মন চাইছে, ওখানে গিয়ে আমরা কুকর্ম করবো, যেন আমি তোমাকে প্রতারণা করছি।···না, না আর বলতে পারছি না। বড্ড লজ্জা করছে। ও রকম করে চেয়ে থেকো না,—দেখছো না, আমি

কেমন পিয়নিফুলের মতো রাঙা হয়ে উঠছি।'

মজার স্বাদ পেয়ে পল হো হো ক'রে হেসে ওঠে, বলে, 'বহুৎ আচ্ছা। বান্ধবীকে নিয়ে পার্টিপরব সারবার অমন একটি জায়গা আমার জানা আছে বটে। আজ সন্ধ্যাতেই তোমাকে নিয়ে সেখানে আসর জমাবো।'

বাগান ঘেরা উঁচু কাতারের এমন এক রেস্তরায় সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ওদের দেখা গেল তরতরিয়ে সিঁড়ি ভাঙ্গতে, ইতি-উতি যুবক-যুবতীর চাপা প্রেমালাপ, অনুচ্চ হাসি ও সরস টিপ্পনী। পলের মুখে গর্বিত হাসি, কিন্তু তার সুন্দরী গরবিনী স্ত্রী সেই মুহূর্তে ঈষৎ জড়সড়, মুখে লজ্জারুণ হাসি, সুডৌল ঘাড় ঘুরিয়ে পরিবেশের তাৎপর্য যাচাই করছে।

অপেক্ষাকৃত একটি ছোট ঘর ভাড়া নিয়েছে তারা। এটা ঠিক সেই ঘরগুলিরই একটি, যেখানে বহুবার বহুধরণের দৃষ্টিকটু দৃশ্য অভিনীত হয়ে গেছে। এই নাতিদীর্ঘ পরিশরে চার-চারটে ইজিচেয়ার, মস্ত একটা সোফা, আগাগোড়া যা অনিন্দ্যসুন্দর রক্তাভ ভেলভেটে মোড়া। আসবাবপত্র বলতে এইগুলিই, সামঞ্জস্য ভাবে সাজানো।

ওরা ঢুকতেই কালো উর্দিপরা স্টুয়ার্ড মেনু-লিস্ট নিয়ে হাজির হয়। পল ও তার স্ত্রী পাশাপাশি এমন ভাবে বসেছে যেন এখনই তারা একে অপরের সঙ্গসুখ পাবার জন্য উন্মুখ।

পল মেনু-লিস্টটা স্ত্রীর দিকে এগিয়ে দেয়, 'বলো, কি খাবে?'

'আমি জানি না। এখানকার সেরা জিনিস কি?'

পল ওভারকোটটা খুলে ঝুলিয়ে রাখে। তারপর লিস্টের কেন্দ্রভূমির দিকে চোখ রেখে বেয়ারাকে বললো, 'আমাদের জন্য এই সব খাবারগুলি আনো: বিস্ক সুপ, ডেভিল চিকেন, সবজির স্যালাড, ফল এবং মিষ্টি! এ সব খাওয়ার পর আমরা শ্যাম্পেন চাখবো।'

বেয়ারা তেরচা চোখে পলের সঙ্গিনীকে দেখে ও মুচকি হাসে; মেনুটা তুলে নিয়ে সম্ভ্রম জানানো গলায় বলে, 'আপনি কি ধরণের শ্যাম্পেন পছন্দ করেন মঁসিয়ে পল, কড়া না, মোলায়েম?'

'খুব কড়া।'

এরা সব তার স্বামীর নাম জানে দেখে অঁারিয়েতের বেশ ভালো লাগছে। পলের আরো ঘনিষ্ঠতর হলো সে এবং আদর করে পল ওর গালে একটা মোলায়েম ঠোনা মারে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভোজনপর্ব শেষ। দশ-দশটা

মোমবাতির কৃপায় তমোনাশ, পরিবেশজনিত জড়ত্ব কেটে যাচ্ছে, সামনে একখানা মস্ত আয়না, যার বুকে দৃষ্টিশক্তি সুতীক্ষ্ণ এবং মনে হয়, ওখানে যেন বহু মুক্তোখচিত মাকড়সার জাল ঝুলছে, দুলছে ; দেয়ালে বিবিধ রঙের বর্ণচ্ছটা, যাদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সুন্দরী আঁরিয়েত তার পাত্রটি শূন্য করে ফেললো এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সর্বশরীর পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতার অভাবে গুলিয়ে উঠলো। তবু পানে ক্ষান্তি নেই, যেহেতু সে চাইছে—প্রচুর পরিমাণে এলকোহল খেয়ে শরীরটাকে গরম করে তুলতে ; শরীর গরম হলে আড়ষ্টতা থাকবে না, ফূর্তিটাকে পুরোমাত্রায় চাগিয়ে তুলতে পারবে। অপরপক্ষে, পলেরও দিকনির্দেশে ভুল নেই, ঢক ঢক করে মাল গিলছে এবং মনের পর্দায় অতীতের সুখ-স্মৃতিগুলিকে ফিরে পাচ্ছে ; হাত বাড়িয়ে সঙ্গিনীর হাত খুঁজে পায় ও ঘন ঘন চুমু খায়।

আঁরিয়েতের চোখ দীপ্তিময়, পরিবেশের সম্পূর্ণ শিকার হয়ে তার আসঙ্গলিপ্সা ক্রমশই তুঙ্গে, কচিৎ স্বল্পোক্তির মধ্যে এমন সব ইঙ্গিত করছে, যা নির্লজ্জ, অসহ্য সুখ সন্ধানে সে তার খনির দ্বার এখনই খুলে দিতে পারলে যেন বাঁচে!

বেয়ারা দু'জনের মুখে হাসি নেই, কারণ ওরা জানে—এ সময় তাদের নির্বিকার ও নিঃশব্দ থাকতে হবে, প্রতিদিন এমন বহুদৃশ্যের তারা নীরব সাক্ষী ; ওরা তখন নিঃশব্দে প্রবেশ করে, টেবিলে খাবার সাজায় অথবা টেবিল পরিষ্কার করে এবং খরিদ্দাররা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি শুরু করবার আগেই চলে যায়।

আঁরিয়েত একেবারে বেসামাল, রক্তআঁখি ; পল ওর জানুতে থাবা বসিয়েছে, বার বার নুয়ে পড়ছে আঁরিয়েত ; কামের প্রাবল্যে উদ্ভট সব কথা বলতে থাকে....এক সময় সে বলে, "....পল, আমাকে বলো! আমি সব জানতে চাই।'

'সোহাগিনী, কি জানতে চাও, বলো ?'

'আমার যে বলতে বুক কাঁপছে—'

'নির্ভয়ে অবশ্যই তুমি আমার সঙ্গে—'

'আচ্ছা, আমার আগে তোমার কি অনেক প্রেমিকা ছিল ?'

পল যেন দ্বিধায় পড়ে গেল। শত হলেও আঁরিয়েত তার স্ত্রী, তার কাছে নিজের এমত সৌভাগ্যের ইতিকথা খুলে বলা কি উচিত হবে ?

আঁরিয়েত কিন্তু সমানে বকে চলেছে, 'ও, পল! বলো না, তোমার কি অনেক ছিল ?'

'কেন এমন প্রশ্ন করছো? অনেক নয়, কয়েকজন ছিল।'

'ক'জন?'

'জানিনা। এসব কি আমার মনে আছে?'

'ঠিক কতজন বলতে পারছো না?'

'না, পারছি না।'

'তার মানে তাদের সংখ্যা ছিল অগুণতি।'

'তবে তাই!'

'একটু গুণে বলোনা, আমার জানতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে।'

'লক্ষ্মীটি, আমার একদম মনে নেই। এক একটা বছরে অনেক মেয়ে এসেছে আমার কাছে, আবার এমন এক একটা বছরও গেছে, যখন একটি সঙ্গিনীও আমার ছিল না।'

'তবু, আন্দাজ বছরে কতজন যুবতীকে পেতে?'

'কোন বছরে কুড়ি থেকে ত্রিশ। আবার কোন বছরে বড় জোর চার-পাঁচ জন।'

'ইস্! তার মানে শ'খানেকের ওপর মেয়েকে তুমি—'

'হাঁ, ব্যাপারটা তাই দাঁড়ায়।'

'ছ্যাঃ! নোংরা!'

'নোংরা, কেন?'

'কেন, নয়? ঐ সব মেয়ের গুষ্টি বেহায়া—সকলেই নিজের ঐ জিনিসটা চাখাতে পারলে যেন বর্তে যায়! ঘেন্নায় আমার গা গোলাচ্ছে! একশ'র ওপর!'

আঁরিয়েতের ঘৃণাসূচক ভাবান্তর দেখে পল ঈষৎ আহত হলো। পুরুষসুলভ বিজ্ঞতার ভান করে সে বললো, 'যার কাছে একশ'টা যুবতী বিরক্তিকর, তার কাছে একটি যুবতীর সঙ্গও অসহ্য মনে হবে।'

'না, তা কখনোই নয়।'

'কেন নয়, শুনি?'

'কারণ, প্রেম একজনের সঙ্গেই সম্ভব। সেটা তো আসল কথা এবং প্রকৃত আনন্দের উৎস। একশ'টা যুবতীর সঙ্গে যে রঙ্গরস চলে, তার নাম ব্যভিচার। বুঝে পাইনা, তুমি কি করে ঐ সব নোংরা মেয়ের-

'না, তারা নোংরা নয়। যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন।'

'মানতে পারলুম না। ওদের ওটা ব্যবসা।'

'বেশ ; তবে ঐ ব্যবসার খাতিরেই তারা নিজেদের পরিচ্ছন্ন রাখে।'

'ছ্যাঃ! ওরা যে নিত্য নতুন পুরুষের সঙ্গে বিছানায় যায়! এটা কি কোন রুচিবান পুরুষের ভেবে ঘেন্না পায় না? ইতরামি!'

'এই গেলাসে করে মদ খেতে তোমার ঘেন্না হচ্ছে না? সকাল থেকে কত খদ্দের তো এই গেলাসে চুমুক দিয়েছে! এবং এটাও ঠিক, গেলাসগুলি যথেষ্ট পরিষ্কার ভাবে ধোয়া হয় না।'

'চুপ করো! বড্ড বাড়াবাড়ি করছো!'

'তুমিই তো এ ধরণের প্রসঙ্গটা উত্থাপন করলে।'

'আচ্ছা, এবার বলো তো,—ঐ একশ'জনই কি একজাতের মেয়ে?'

'তা কি করে হবে?'

'কি রকম তবে?'

'ওদের কেউ অপেরায় অভিনয় করে, কেউ অফিসে কাজ করে, কেউ আবার নিছক গৃহস্থ ঘরের মেয়ে।'

'গৃহস্থ ঘরের মেয়ে ক'জন ছিল?'

'জনা দুয়েক।'

'রূপসী?'

'নিশ্চয়।'

'গণিকাদের চেয়েও?'

'না।'

'তুমি কাদের পছন্দ করতে? গণিকাদের না, ঐ সব সাধারণ মেয়েদের?'

'ঐ সব গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের নয়। বাজারে মেয়েদেরই আমার পছন্দ।'

হা ঈশ্বর! কি রুচি! কেন তোমার এই মত?'

কেন না, সখের খাতিরে যারা দেহ বিলায়, তাদের আমার পছন্দ নয়।'

'কি সাংঘাতিক! তোমার সুরুচি বলতে কিচ্ছু নেই! নিত্য-নতুন ঐ জাতের মেয়েদের সঙ্গ তোমার ভালো লাগতো?'

'লাগতো।'

'খুব আনন্দ পেতে?'

'খুব।'

'ওরা কি সব একই রকম?'

'না।'

'মেয়েরা সব একই রকম হয় না?'

'মোটেই না।'

'কোন কিছুই কি এক রকম নয়?'

'কোন কিছুই এক রকম নয়।'

'আশ্চর্য! পার্থক্যটা কিসের?'

'সর্বত্র।'

'দেহেতেও?'

'নিশ্চয়।'

'অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ?'

'অনেক তফাৎ।'

'আর কিসে তফাৎ?'

'কথা বলার কায়দায়, জড়িয়ে ধরবার নিয়মে, চুমু খাবার প্রক্রিয়ায়, ইত্যাদি সব কিছুতেই!'

'এই পার্থক্যগুলিই বুঝি আসল আনন্দের উৎস?'

'ঠিক!'

'আচ্ছা, পুরুষে পুরুষে তফাৎ হয় না?'

'আমি বলতে পারবো না।'

'তুমি জানো না?'

'না।'

'নিশ্চয় তাদের মধ্যেও এরকম পার্থক্য রয়েছে।'

'নিশ্চয়।'

আঁরিয়েত গম্ভীর। তারপরই হঠাৎ কি ভেবে জড়িয়ে ধরলো পলকে, আশ্লেষে বললো, 'আমি তোমায় কত ভালোবাসি।'

পলও সাড়া দিলো। আঁরিয়েতকে কোলের ওপর বসিয়ে নিলো সে। ঠিক তখনই একটা বেয়ারা এ ঘরে ঢুকতে গিয়ে বাধা পেয়ে ফিরে গেলো। যাবার সময় দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গেল সে। অন্ততঃ মিনিট পাঁচেক ধরে পল ও আঁরিয়েত ব্যস্ত রইলো।

পাঁচ মিনিট পর আবার দেখা গেল, আঁরিয়েতের হাতে পানপাত্র এবং সে আপন মনেই বিড় বিড় করে: হুঁ, ব্যাপারটা সত্যিই উপাদেয়!

নববর্ষের উপহার

[For the New Year]

নির্জন ঘরে একাকী ভোজনপর্ব সমাধা করলেন জ্যাক্ স্ত বাঁদাল। তারপর বাবুর্চিকে ছুটি দিয়ে চিঠি লিখতে বসলেন। বছরের এই শেষ দিনটিতে তিনি শুধু ব্যস্ত থাকেন রঙিন কল্পনা ও চিঠি লেখা নিয়ে। পিছনে ফেলে আসা বছরে যে সমস্ত বিচিত্র ঘটনা ও অভিজ্ঞতা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, সেইগুলিকে একে একে মনে করবার চেষ্টা করেন। অনেক ঘটনাই স্মৃতিপট থেকে মুছে গেছে, আবার অনেক বন্ধুর মুখ এই মুহূর্তে ভেসে আসছে এবং তাঁদেরই উদ্দেশ্যে চিঠির প্রথম ছত্রটি আন্তরিক প্রীতিতে তিনি লিখে ফেললেন :

'বন্ধু, নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা নাও।'

দেরাজ খুলে তিনি একটি ছবি বের করলেন, এক মহিলার মুখাবয়ব, কিছুক্ষণ নির্নিমেষে তাকিয়ে থেকে ছবির ওপর চুমু খেলেন, ছবিটাকে প্যাডের ওপর রেখে নববর্ষের চিঠি লেখা শুরু করে দিলেন :

'আমার প্রিয়া ইরাণী,

আমি যে উপহারটি পাঠিয়েছি, নিশ্চয় তা তোমার হস্তগত হয়েছে। আজ, এই সন্ধ্যায় আমি একাকী ঘরবন্দী—'

এই পর্যন্ত লিখেই কলম ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন জ্যাক্, ঘরময় পায়চারি করতে থাকেন। ঠিক ছ'মাস আগে তাঁর জীবনে এই নারীর আবির্ভাব ঘটেছে, অন্যান্য প্রেমিকাদের চেয়ে সে অবশ্যই স্বতন্ত্র। শুধুমাত্র ক্ষণায়ু দেহজ কামনায় যে সমস্ত নারীর সঙ্গে প্রেম-প্রেম খেলা করা চলে, সেই সমস্ত পতিতা-চরিত্র নারীদের থেকে ইরাণী একেবারেই আলাদা। এই নারীকে তিনি নিখাদ প্রেমের মাধ্যমেই জয় করেছেন।

বয়সের মাপকাঠিতে জ্যাককে ঠিক তরুণ বলা চলে না, যদিও তাঁর নিটোল স্বাস্থ্য যৌবনদীপ্ত। অভিজ্ঞ বাস্তববাদী পুরুষ, জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ তাঁর মাপা ও হিসেবী, এমনকি কখনো উদ্দীপ্ত আবেগকেও তিনি যুক্তির মারফৎ যাচাই করে নেন। প্রেমের ক্ষেত্রেও তাঁর এই হিসেবী চরিত্র লক্ষণীয়। বর্তমানে তাঁর চিত্তে যে ইরাণীর আবির্ভাব ঘটেছে, তার ভবিষ্যৎ কতদূর পর্যন্ত গড়াতে পারে, সে সম্পর্কে একজন ব্যবসায়ীর মতোই তিনি সতর্ক। তিনি

জানেন, স্নেহ, প্রীতি ইত্যাদি মানবিক কারণে লালিত প্রেম স্বভাবতই মহৎ ও দীর্ঘস্থায়ী হতে বাধ্য।....

হঠাৎ দরজায় কলিংবেল বেজে ওঠে। পায়চারি থামিয়ে চিন্তা করলেন জ্যাক্, এখন তাঁর পক্ষে দরজা খুলে দেওয়াটা উচিত হবে কিনা। পরক্ষণেই ভাবলেন, হয়তো কোন পথিক নববর্ষের রাত্রিতে তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী এবং সৌজন্যের খাতিরে তাকে আসতে দেওয়া উচিত।

কিন্তু দরজা খুলতেই প্রায় আঁতকে উঠলেন জ্যাক্। তার প্রেয়সী ফ্যাকাশে শবদেহের মতো দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'কি ব্যাপার?'—বিস্মিত জ্যাক্ জিজ্ঞেস করেন।

'তুমি কি এখন একা?'—সে বলে।

'হাঁ।'

'চাকর-বাকর কেউ নেই তো?'

'না।'

'তোমার এখন বাইরে যাবার মতো কোন কাজ আছে কি?'

'না।'

সে শ্লথগতিতে ভেতরে এলো, এ ঘরের সবকিছুই তার পরিচিত বলে মনে হয়, প্রথমেই একটা সোফার ওপর নিজেকে এলিয়ে দেয়, বিধ্বস্ত অবসন্নতায় দু'হাতে মুখ ঢেকে নিদারুণ কান্নায় ভেঙে পড়ে।

বিচক্ষণ জ্যাক্ ওর পায়ের কাছে বসলেন, ওর দুটি নরম হাতকে মুখের ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে গলার স্বরে বিস্ময় প্রকাশ করলেন, 'কাঁদছো কেন ইরাণী? তোমার কি হয়েছে, খুলে বলো।'

ইরাণী ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে, 'এ ভাবে আর আমার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।'

'কি ভাবে? একটু খুলে বলো।'

'বলছি, আমার পক্ষে বেঁচে থাকাটাই শক্ত। অনেক অত্যাচার আমি এতদিন সহ্য করে এসেছি। কিন্তু আজ বিকেলে যা হলো—তারপর আর নয়। সে আমার গায়ে হাত দিয়েছে!'

'কে? তোমার স্বামী!'

'হাঁ, আমার স্বামী!'

'বলো কি।'

জ্যাক্ এবার সত্যি অবাক হলেন। ইরাণীর স্বামী ওর গায়ে হাত তুলতে পারে—এতটা তিনি আশা করেননি। এ বড় বর্বরতা। জ্যাকের হিসেব যেন ঠিক মতো মিললো না। ইরাণীর স্বামী তো খুব একটা নীচুস্তরের লোক নন, রীতিমত ভারিক্কী, অভিজাত পরিবারের সন্তান এবং বহু সভা-সমিতির সক্রিয় সদস্য। তিনি ঘোড়ায় চড়ে সখ মেটান, থিয়েটার দেখতে যান, অসিযুদ্ধে পারঙ্গম। গণ্যমান্যদের শিবিরে তাঁর যাতায়াত আছে, লোকে একডাকে চেনে, সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী, অনেক লোকেই তাঁর ব্যবহারের প্রশংসা করে। শিক্ষাগত মান তাঁর খুব বেশী না হলেও তিনি নম্র ও সামাজিক, —এমন একজন লোক, সামাজিক সংস্কারগুলিকে যিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। স্ত্রীর প্রতি তাঁর আনুগত্য যে কোন সম্ভ্রান্ত রুচিশীল লোকেরই মতন, স্ত্রীর পোশাক স্বাস্থ্য সুখ ইত্যাদির প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ সংবেদনশীল নজর। সর্বোপরি, স্ত্রীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় অদ্যাবধি তিনি হস্তক্ষেপ করেননি। জ্যাক্ ইরাণীর বন্ধু হিসেবে তাঁর কাছ থেকে উষ্ণ-অভ্যর্থনা এতকাল পেয়ে এসেছেন। জ্যাক্ ইরাণীর প্রেমিক হবার পর থেকে যেন ঐ সম্পর্ক আরো মধুর করে তুলেছেন ভদ্রলোক।

সুতরাং, জ্যাক্ কোনদিন কল্পনাও করতে পারেননি, পরিবারটির ভেতরে এতখানি ঝড় বয়ে চলেছে। এই মুহূর্তে তিনি তাই রীতিমত শঙ্কিত।

'কেন এমন ঘটলো?'

ইরাণী তার দুঃখের দীর্ঘ ইতিহাস জানায়।—

বিয়ের পর থেকেই ইরাণী ও তার স্বামী বুঝতে পারেন, চারিত্রিক দিক থেকে তাঁরা দু'জনে দুই বিপরীত মেরুর। দিনের পর দিন সেই ব্যবধান বেড়েই চলেছে। লোকচক্ষুর আড়ালে তাঁদের ঝগড়া-ঝাটি চলেছে; স্বামী পরিণত হয়েছেন খিটখিটে মেজাজের, স্ত্রীর ওপর সবসময় সন্দেহের দৃষ্টি রাখেন, স্ত্রীকে লাঞ্ছিত করে আনন্দ পান। গোপনে তিনি জ্যাক্‌কে দারুণ ঈর্ষা করেন। এরই চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে আজ ইরাণীর গায়ে হাত পর্যন্ত তুললেন তিনি।

ইরাণী তার সিদ্ধান্ত জানায়, 'এখন আর আমি ওর কাছে ফিরে যাবো না। তুমি এখন আমাকে নিয়ে যা করবার করো।'

জ্যাক্ ওর মুখোমুখি বসে নিজের হাঁটু দিয়ে ওর জানুদ্বয়কে ঈষৎ প্রসারিত

করে দিলেন, ওর হাত ধরে বিনীত স্বরে বললেন, 'তুমি নিজের সর্বনাশ করতে যাচ্ছো সোনা। স্বামীকে ত্যাগ করবার আগে তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অভিযোগ আনতে হবে। একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা হিসেবে নিজের মান রাখতে হবে তো!'

অস্থিরতার সঙ্গে ইরাণী বললো, 'তোমার কি পরামর্শ?'

'আমি বলছি, আজ বাড়ি ফিরে যাও। যতদিন না আইন অনুযায়ী বিবাহ-বিচ্ছেদ হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত তোমাকে এইসব সহ্য করতে হবে।'

'তোমার পরামর্শটা কি খুব নেতিবাচক হয়ে যাচ্ছে না?'

'না, এটাই যথার্থ বাস্তব যুক্তি, পরামর্শ। নিজের মর্যাদা, সম্মান রেখে এইভাবেই এগুতে হবে। বন্ধুরা তোমার সাহায্যে এগিয়ে আসবে, আত্মীয়-স্বজনরা তোমার স্বপক্ষে এসে দাঁড়াবেন। ঝোঁকের বশে এইসব সুবিধাগুলি হারানো বোকামি হবে।'

ইরাণী উঠে দাঁড়িয়ে অস্থির ভাবে বলতে থাকে, 'না, না। আমি আর ঐ নোংরামির মুখোমুখি হতে পারবো না। সেই জীবন আমি শেষ করেই এসেছি। খতম হয়ে গেছে সেই খেলা।'

ইরাণী জ্যাকের কাঁধে হাত রেখে তাকে আকর্ষণ করে, বড় বড় চোখ তুলে জিজ্ঞেস করে,

'জ্যাক্, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো?'

'হাঁ!'

'নির্খাদ প্রেম?'

'আলবৎ।'

'তাহলে আজ থেকেই আমাকে তোমার কাছে রেখে দাও।'

বিস্মিত বিব্রত জ্যাক্ বললেন, 'আজ থেকেই রেখে দেবো? আমার এই বাড়িতে? তোমার কি মাথায় গোলমাল হয়েছে? এর মানে কি জানো? এর মানে, তোমাকে আমি চিরদিনের মতোই হারাবো। কোনদিনই আর আমাদের তবে মিলন সম্ভব হবে না। পাগলামি ছাড়ো।'

ইরাণী ধমকায়, অভিজ্ঞা মহিলার মতো গম্ভীর স্বরে থেমে থেমে উচ্চারণ করে, 'জ্যাক, তুমি তবে এবার কথা শোন। আমার স্বামী আমাকে বারণ করেছেন, তোমার সঙ্গে দেখা করতে। আমি আর এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে এসে তোমাকে সঙ্গ দিয়ে যেতে পারবো না। হয় আমাকে স্থায়ীভাবে গ্রহণ করো, না হলে চিরতরে সম্পর্ক ছিন্ন করে দাও।'

'ও, ইরাণী, প্রিয়তমা! তুমি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাও, আমি নিশ্চয় বিয়ে করবো।'

'আচ্ছা, আচ্ছা—তুমি আমাকে বিয়ে করবে! অর্থাৎ খুব তাড়াতাড়ি করলেও ব্যাপারটা চুকতে বছর দুয়েক তো বটেই! হুঁ, তোমার প্রেমে স্থৈর্য আছে ব'ট!'

'মাথা ঠাণ্ডা রেখে ব্যাপারটা ভেবে দেখো। আজ যদি তোমাকে আমি এখানে রেখে দিই, কাল সকালেই তোমার স্বামী এখানে এসে হানা দেবেন। নিজের স্বামীত্বের জোরে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবেন। যেহেতু আইন তাকেই সমর্থন জানাবে।'

'আমি তো এমন কথা বলিনি যে, আমাকে তোমার নিজেরই বাড়িতে রাখতে হবে। আমাকে তোমার পছন্দমতো অন্য কোন জায়গায় রাখতে পারো। আশা করেছিলাম, এতটুকু ভালোবাসা তোমার কাছে থেকে আমি পেতে পারি। আমারই ভুল! ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করুন। আমি চলি।'

চটপট দরজার দিকে এগিয়ে যায় ইরাণী। জ্যাক্ একরকম ছুটে গিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনেন।

'ইরাণী, শোন।'

সে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে, তার দু'চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে, বিড় বিড়িয়ে কোন রকমে বলে, 'আমাকে ছেড়ে দাও জ্যাক্। আমি একাই ফিরে যেতে চাই। আমাকে একা যেতে দাও।'

জ্যাক্ কিন্তু জোর করে তাকে বসিয়ে দিলেন, নিজে বসলেন ওর হাঁটুর সামনে, নানা রকম যুক্তিতে শান্ত করবার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু ইরানী নিরুত্তর, কঠিন।

জ্যাকের যাবতীয় বক্তব্য শেষ হবার পর সে নিরুত্তাপ গলায় বলে, 'এবার দয়া করে আমার যাবার পথ ছেড়ে দেবে কি? হাতটাও সরিয়ে নাও। আমি উঠবো।'

'ইরাণী!'

'যেতে দেবে কি?'

'তোমার প্রতিজ্ঞা কি অপরিবর্তনীয়?'

'আমাকে যেতে দাও।'

'এ ভাবেই ব্যবধানে সরে যাবে? নিজের ভুল সিদ্ধান্তের জন্য একদিন

তোমায় পরিতাপ করতেই হবে, আমি বলে দিলাম। যাবার আগে একবার সত্যি করে বলো—তোমার শপথের কি কোন খেলাপ হতে পারে না?'

'পথ ছাড়ো।'

'তবে থেকেই যাও। কাল ভোরে আমরা বেরিয়ে যাবো।'

তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে ইরাণী, 'দয়া দেখিও না জ্যাক্‌, আমি আর এখন মোহাবিষ্ট নই। আমি তোমার কাছে প্রেম চেয়েছিলাম, মর্যাদাপূর্ণ ভালোবাসা; নিষ্ঠুর করুণা নয়।'

'দাঁড়াও। দয়া বা করুণার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমার কাছে যা যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল, তাই বলেছিলাম। এতে যদি তুমি এতই হতাশ বা ব্যথাতুর হয়ে পড়ো, আমার আর বলার কিছু থাকে না। এখন আমার বিবেক শান্ত। যা বলবে, তাই করবার জন্য প্রস্তুত।'

জ্যাকের কথা শুনে আবার ফিরলো ইরাণী। কষ্টে তছনছ হয়ে যাওয়া মন আবার যেন পেলব হয়ে উঠলো, পুরনো জায়গায় বসে শান্তস্বরে বললো, 'তোমার যা বলবার গুছিয়ে বলো।'

জ্যাক্‌ অবাক, 'আমি আবার কি বলবো? কসম কেটেছো তুমি, আর বুঝিয়ে বলবো আমি?'

'হাঁ, এই শেষ সিদ্ধান্তে আসার আগে তোমার যা যা মনে হয়েছে, আমাকে বলবে। তারপর আমি আর একবার চিন্তা করে দেখবো, আমার কি করা উচিত।'

'কিন্তু আমি তো কিছুই ভেবে রাখিনি। মনে হয়েছিল, তুমি একটা বিরাট ভুল করতে যাচ্ছো; একজন দরদী মরমী বন্ধু ও প্রেমিক হিসেবেই তোমাকে সাবধান ক'রে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তোমার জেদ অনেক বড়। এবং তোমার এই জেদ বোকামি জেনেও আমি অসহায়, এর সামিল না হয়েও উপায় নেই; গত্যন্তর না থাকায় তোমাকেই সমর্থন জানাচ্ছি।'

'এত তাড়াতাড়ি যে মত বদলে ফেললে, সেটাও তো স্বাভাবিক নয়।'

'শোন, প্রিয়া, অজান্তেও কখনো আমি তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যাই না। আত্মত্যাগের কথাই ওঠে না। যেদিন থেকে অনুভব করলাম, আমি তোমার প্রেমে পড়েছি—একেবারে একাত্ম হয়ে গেলাম, তোমার সুখে আমার সুখ, তোমার মঙ্গলে আমার মঙ্গল, তোমার দুঃখে আমার বুক ফাটে। নর-নারীর প্রকৃত প্রেম পবিত্র, সবচেয়ে মূল্যবান অঙ্গীকার। সেই কারণেই তো

তোমার সঙ্গে আমার ব্যবহার উচ্ছ্বাসপ্রবণ নয়, এতটা যুক্তিনিষ্ঠ।

বিবাহ জিনিসটা ঠুনকো নয়, এটা একটা বোঝার স্তূপ বয়ে বেড়ানো নয়। এর সামাজিক মূল্য যতটা, আইনগত বাধ্যতাও ততটা। কিন্তু সামগ্রিকভাবে প্রায়শই এতে নৈতিক সামর্থ্য যৎকিঞ্চিৎ। যে কারণে, মতের মিল না হলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়-উভয়ের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে না, তাদের সম্পর্কটা হয়ে দাঁড়ায় একটা জগদ্দল পাথর মাত্র। তখন যদি সেই বঞ্চিতা নারী তার মনমতো পুরুষ খুঁজে পায়, তখন তার কাছে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করবার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারে না। ঐ পুরুষটিও যদি বন্ধনহীন হয়, তবে নিশ্চয় তার বুকের মণিকোঠায় প্রেমিকাকে ঠাঁই দেবে। আমার মতে, তাদের তখন যে মিলন হবে, তা বিবাহের চেয়ে কম পবিত্র নয়, যদিও এক্ষেত্রে কোন বিচারককে সাক্ষী রাখা যায় না।

আমার বক্তব্য হলো, তারা উভয়েই যদি সম্মানিত ব্যক্তিত্ব হয়, যদি তাদের আত্মসম্মানবোধ থাকে, তবে তাদের চূড়ান্ত মিলন ধর্মসাক্ষী রেখে সামাজিক বিয়ের চেয়ে অনেক বেশী কার্যকর, গভীর ও স্বাস্থ্যকর।'

'যে নারী এতটা পথ অতিক্রম করে, তার বিচারবুদ্ধির ওপর আস্থা রাখা উচিত। সে যে এতটা ঝুঁকি নিয়েছে, তা অনেক ভেবে-চিন্তেই। এটা নেহাৎ কৌতূহল বশত সম্ভব নয়। এ সমর্পণ ব্যাপক—মনের সঙ্গে সঙ্গে দেহ, সম্মানের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার সমর্পণ। তার মানসিক স্থৈর্য তখন অসাধারণ, স্বভাবে স্থিতপ্রজ্ঞ, সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে অবশ্যই ওয়াকিবহাল। যে কোন রকম দুঃসাহসিক ঝুঁকি নিতে সে তখন পিছু-পাও হবে না। যে স্বামী ও সমাজ তার সঙ্গে তঞ্চকতা করেছে, সে তাদের বিরুদ্ধে কার্যত এক জিহাদ ঘোষণা করবে। তাই দাম্পত্যশুচিতা রক্ষা না করেও সে দর্পিতা, সাহসিক। সেই কারণেই তার প্রেমিকও তাকে নিঃশর্তে সমর্থন জানিয়ে যাবে, তা সে যতই ভুল ও ঝুঁকিবহুল সিদ্ধান্ত হোক না কেন।

শুরুতে আমি ছিলাম অত্যন্ত হিসেবী ও সতর্ক। তাই তোমার সিদ্ধান্তের বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছিলাম। কিন্তু এখন আমার মধ্যে একটি লোকই বেঁচে রয়েছে, যে তোমায় ভালোবাসে।

এবার জানাও, আমার কি করণীয়?' .

আহ্লাদে আনন্দে উজ্জ্বল ইরাণী জ্যাক্‌কে জড়িয়ে ধরে প্রগাঢ় চুম্বন করে, আদুরে গলায় বলে, 'প্রিয়, আমি এতক্ষণ যা তোমায় বলেছি, তার একটিও

সত্যি নয়। আমার স্বামী মোটেই সন্দেহ করেনি, অত্যাচার তো দূরের কথা। আমি শুধু তোমাকে একটু বাজিয়ে নিতে চেয়েছিলাম। এটাই আমার আকাঙ্ক্ষিত নববর্ষের উপহার—তোমার সদ্য পাঠানো নেকলেসটির পাশে এই উপহারটি অদ্ভুত উদ্দীপক হয়ে থাকবে নতুন বছরে। অনেক—অনেক ধন্যবাদ। ঈশ্বরের অসীম করুণা, তাই তোমার কাছ থেকে এতবড় জিনিসটি আজ পেলাম।'

প্রহরী কুকুর

[The watch dog]

সংসারে লোক বলতে মাত্র দু'জন। মাদাম লেফেবার আর তার চাকরাণী রোজ। নরম্যাণ্ডির একটি সদর রাস্তার পাশেই বাড়িটি। সামনে কিছু খোলা জমিও আছে—সেখানে চাষ হতো নানা রকম সবজি। সরল গ্রাম্য মেয়ে রোজ। আর তার মালিক ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। বিধবা মাদাম লেফেবার ছিল খুব চটপটে। যাই হোক, একভাবে কেটে যাচ্ছিল ছোট্ট সংসারটা। একদিন রোজের খেয়াল হলো ওদের কিছু পেঁয়াজ চুরি হয়েছে। এই ঘটনা জানার পর দু'জনেই চিন্তায় পড়ল। তারা ভাবল, চোর যখন একবার এসেছে তখন আবারও আসবে। এ অবস্থায় কি করা যায়! মাদাম দেখলো চোরের পায়ের ছাপও রয়েছে। মাদাম রোজকে বলল, 'রোজ, দেখ দেখ, চোর এই পথ দিয়ে গিয়ে ফুল বাগানের মধ্যে দিয়ে দেয়াল টপকেছে।'

এই ঘটনায় দুজনেই দুশ্চিন্তায় রাত্রে ঘুমতে পারল না। চোরের আলোচনায়ই রাত কাবার।

খবর শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এলো মাদামের বাড়িতে। সকলেই পরামর্শ দিল, একটা শিকারী কুকুর রাখবার জন্য। মাত্র দু'জন মেয়েছেলে বাড়িতে থাকা ঠিক নয়। একটা কুকুর থাকলে কিছুটা ভরসা তো পাওয়া যাবে। আর চোর ঢুকলে কুকুরের চীৎকারে আমরা প্রতিবেশীরাও আসতে পারবো। এই পরামর্শ দিয়ে তারা যার যার কাজে চলে গেল।

এই চিন্তা মাদামকে ঘিরে রাখলো অনেকক্ষণ। তার বড় চিন্তা, কুকুর পুষলে তো তাকে খাওয়াতে হবে, এতে তার উৎসাহে ভাঁটা পড়লো।

রোজ কিন্তু নাছোড়বান্দা, কুকুর একটা সে রাখবেই। তখন ঠিক হলো কুকুর একটা রাখা হবে তবে মূল্যের বিনিময়ে নয়, যদি এমনি পাওয়া যায় আর

কুকুরটিও হবে ছোট।

দরজার কড়া নাড়ার শব্দে ছুটে এসে দরজা খুলে দিয়ে রোজ তো বিস্ময়ে বিমূঢ়, দরজায় দাঁড়িয়ে আছে এক রুটিওয়ালা। তার কোলে ছোট্ট একটি কুকুরের বাচ্চা। হলুদ রঙের বড় বড় লোমে ঢাকা কুকুরটি দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।

মাদামেরও কুকুরটি দেখে খুবই পছন্দ হল। তার আরো আনন্দ হলো রুটিওয়ালা যখন বলল, পীয়েরোর জন্ম কোন মূল্য দিতে হবে না।

কিন্তু কোন আগন্তুক বাড়ির সীমানায় এলে চীৎকার করা তো দূরে থাক বরং কুকুরটি গিয়ে তার পা চাটতে আরম্ভ করতো।

যা হোক, মাদাম কিন্তু কুকুরটিকে খুব ভালোবাসতে আরম্ভ করেছিল। নিজে হাতে মাংসের ঝোল মাখা রুটি খেতে দিত তাকে।

হঠাৎ মিউনিসিপ্যালিটি থেকে আট ফ্রাঁ দাবীর এক নোটিশ এলো মাদামের নামে। কুকুর রাখার জন্ম এই দাবী।

পীয়েরোকে এইবার বিদায় করতেই হবে। যে কুকুর ভুলেও একবার ডাকে না তার জন্ম আট ফ্রাঁ ট্যাক্স। হা ঈশ্বর! এর চাইতে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে। কিন্তু কে নেবে তার পীয়েরোকে? ধারে কাছে কেউ এমন একজন নেই। অগত্যা ঠিক হলো গ্রামের লোকেরা অবাঞ্ছিত কুকুরদের যে চক খনিতে ফেলে দেয়, সেখানেই পীয়েরোকে ফেলে দেওয়া হোক। ওখানকার কাণ্ড-কারখানা খুবই ভয়ানক। পূর্বের ফেলে দেওয়া কোন কুকুর হয়তো তার পূর্বের ফেলে দেওয়া কুকুরের মাংস খেয়ে শেষ করে ক্ষুধায় ছটফট করতো। তখন আর একটি সতেজ কুকুরকে এনে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তখন সেই সতেজ কুকুরটি ও পূর্বের ফেলে দেওয়া কুকুরটি জলন্ত চোখে ঝাঁপিয়ে পড়তো পরস্পরের প্রতি। এ অবস্থায় ধরে নেওয়া যায় নতুন কুকুরটি জয়ী হয়ে বিজিত কুকুরটিকে খেয়ে ফেলতো।

মাদাম লেফেবার ও রোজ নিজেরাই পীয়েরোকে চক খনিতে ফেলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। লোক নিয়োগ করলে আবার খরচ। সন্ধ্যা হতেই পীয়েরোকে জন্মের মত বেশ ভালভাবে খাইয়ে রোজ কোলে তুলে নিলো তাকে এবং মাদামকে সঙ্গে নিয়ে চক খনিতে যেয়ে উপস্থিত হলো।

জায়গাটা খুবই অন্ধকার এবং সুমসাম। একদম নিস্তব্ধ। রোজের মন কিন্তু দুঃখে ভারাক্রান্ত। তবু উপায় নেই। উঁচু করে তুলে গর্তের মধ্যে ছুঁড়ে

ফেললো তাকে। ভিতরে কি হয় শুনবার জন্য গর্তের পাশে বসে রইলো উদ্‌গ্রীব হয়ে। একটা শব্দ। তারপরই আহত কুকুরের আর্তনাদে চক খনির আকাশ বাতাস ভরে উঠলো।

ইতিমধ্যে সকাল হয়েছে। সূর্যের ঝলমলে সোনালী আলো এসে পড়েছে তার গায়ে।

চোখ খুলতেই মনে পড়লো গত রাত্রির ঘটনা। ছুটলো চক খনির দিকে। পীয়েরো তখনো চীৎকার করছে। মাদাম চিন্তায় পড়লো। ভাবলো পীয়েরোকে ফিরিয়ে নিতে হবে। খনির মালিকের কাছে গিয়ে বললো সমস্ত ঘটনা।

মালিক শুনে কুকুরকে তুলে দেবার জন্য চার ফ্রাঁ দাবি করলো।

শুনে আঁতকে উঠলো মাদাম, চার ফ্রাঁ।! অসম্ভব।

মালিক বললো, ঐ কুকুর যদি পাগলা হয়ে আমাকে কামড়ে দেয় তখন কি হবে? কুকুরটাকে গর্তের মধ্যে ফেলবার কি দরকার ছিল।

মাদাম বিমর্ষ হয়ে ফিরে এলো।

সবিস্তারে বললো সব রোজকে।

রোজ পরামর্শ দিলো, চলুন, বরং পীয়েরোকে কিছু খেতে দিয়ে আসি, তাহলে তো আর সে না খেতে পেয়ে মরবে না।

যুক্তিটা মাদামের খুব মনে ধরলো।

দু'জনে মিলে রুটি নিয়ে ছুটলো গর্তের ধারে।

পীয়েরোকে ডেকে টুকরো রুটি ছুঁড়ে খাওয়াতে লাগলো তারা। পীয়েরোও আনন্দের সঙ্গে খেতে লাগলো। প্রতিদিন এই চলতে লাগলো।

কিন্তু একদিন পীয়েরোর নাম ধরে ডেকে রুটির টুকরো ছুঁড়ে দিতেই অন্য কুকুরের ডাক শুনতে পেলো। গর্তের মধ্যে আর একটি বড় কুকুর ফেলা হয়েছে। যতবার ওরা রুটির টুকরো ছোঁড়ে ততবারই সেই বড় কুকুরটা খেয়ে নেয় আর পীয়েরো কুঁই কুঁই করতে থাকে কিন্তু কিছুই খেতে পায় না।

মাদাম ও রোজ স্তম্ভিত। মাদাম খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে বললো, আমি তো আর সব কুকুরকে খাওয়াতে পারি না। এ অসম্ভব। চল রোজ, এবার ফেরা যাক।

মাদাম ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়ির পথে ফিরলো। মেজাজ এত খারাপ ছিল যে মাদাম পীয়েরোকে খাওয়াবার রুটির টুকরো হাতে নিয়েই ফিরলো। অগত্যা রোজও চোখের জল মুছতে মুছতে মাদামকে অনুসরণ করলো।

হাত

[The Hand]

তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট মঁসিয়ে বারমিউতুঁর সেণ্ট ক্লাউডের রহস্যময় ঘটনা সম্পর্কে নিজের অভিমত জানাচ্ছেন, তাঁকে গোল ক'রে ঘিরে আছে বহুজন। গত একমাস ধরে এই দুর্বোধ্য অপরাধকে কেন্দ্র ক'রে তামাম প্যারিস উত্তাল। কেউই এর মাথামুণ্ড কিছুই ব্যাখ্যা করতে পারছে না।

মঁসিয়ে বার মউতুঁর ফায়ার প্লেসের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন, সমস্ত সবুদগুলিকে একত্রিত ক'রে বিভিন্ন তত্ত্ব উপস্থাপিত করছেন, কিন্তু কোন উপসংহার টানতে পারছেন না।

একদল মেয়েমানুষ তখনো দাঁড়িয়ে আছে, চেষ্টা করছে তাঁর কাছাকাছি যাবার, তাঁদের দৃষ্টি আটকে আছে ম্যাজিস্ট্রেটের চক্‌চকে মুখের ঠোঁটের ওপর; যখনই তিনি কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন, এরা কেঁপে উঠছে, রোমাঞ্চিত হচ্ছে। তারা ভয়, লোভ ও বাসনার কামড়ে স্নায়ু জর্জর।

তাদের মধ্যে একজন সবচেয়ে বিবর্ণ। ম্যাজিস্ট্রেট বলতে বলতে বারেকের জন্য থামলে সে মন্তব্য করে, 'এ বড় ভয়ানক। অলৌকিক ব্যাপার। কেউই এ রহস্য ভেদ করতে পারবে না।'

ম্যাজিস্ট্রেট তার দিকে ঘুরে তাকালেন। বললেন, হাঁ, মাদাম। সম্ভবত কেউই পারবে না। যেহেতু, আপনি যে 'অলৌকিক' শব্দটি ব্যবহার করলেন, তার সঙ্গে বর্তমান ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই। আমরা একটা সুপরিকল্পিত ও দক্ষতার সঙ্গে সংঘটিত এক অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত করছি। আপাততঃভাবে ঘটনাটা এমন রহস্যময় যে, আমরা ঠিক আলো দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু আমার জীবনে একবার এমন ঘটনাও ঘটেছে, যার অলৌকিকত্বকে আমি অস্বীকার করতে পারিনি। আমরা ও ব্যাপার নিয়ে আর মাথা ঘামাই না, সেটা চিরকালই রহস্যাবৃত হয়ে রইলো।

কয়েকজন মেয়েমানুষ সমস্বরে চীৎকার করে ওঠে, 'গল্পটা আমাদের শোনান না!'

তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেটের মতনই মৃদু গম্ভীর হাসি হাসলেন মঁসিয়ে বারমিউতুঁর। 'কিন্তু দয়া করে মনে করবেন না,' তিনি বলতে শুরু করেন,

'যে আমি এক মুহূর্তের জন্যও সেই রোমাঞ্চকর ঘটনার পিছনে অলৌকিক কোন কিছুর অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছিলাম। আমি যা স্বাভাবিক ও যুক্তিগ্রাহ্য, একমাত্র তাতেই আস্থাশীল। আসলে 'অলৌকিক' শব্দের চেয়ে 'দুর্বোধ্য' শব্দটিই আমার পছন্দ। যাক, যে গল্প বলতে যাচ্ছিলাম, শুনুন :—

তখন আমি এ্যাজাকিওর তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট। ছোট্ট সাদা শহর—সমুদ্রতীরে পাহাড়বেষ্টিত অবস্থায় তার সৌন্দর্য অনুপম।

ঐ শহরে অনেকগুলি নাটকীয়, সাংঘাতিক ও সাহসিকতাপূর্ণ বংশগত ও শরিকী বিবাদ ও সংঘর্ষ লেগেই থাকতো। ওখানে গিয়ে আমি এই ব্যাপারে কত যে ভয়ানক রোমাঞ্চকর গল্প শুনেছি এবং প্রত্যক্ষ ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি, তার ইয়ত্তা নেই! দু'বছর ধরে আমি কেবল খুনকা-বদলা-খুন-এর গল্পই শুনে এসেছি, এখানকার মানুষগুলি স্বভাবে এখনও আদিম, আইন-কানুন যে যার নিজের হাতেই তুলে নিয়েছে। স্বচোক্ষে দেখেছি একাধিক বৃদ্ধের কাটা মাথা, সপরিবারে নিহত হয়েছে এক একজন। আমার মাথা ভারাক্রান্ত হ'য়ে থাকতো শুধু ঐ সব খুন-খারাপির গল্পে।

একদিন শুনলুম, একজন ইংরাজ ভদ্রলোক কয়েক বৎসর যাবৎ উপসাগরের তীরে একটি ছোট্ট ভিলা নিয়ে আছেন। তাঁর সঙ্গে ভার্সাই থেকে সংগ্রহ করে আনা একটি ফরাসী চাকরও আছে।

শীঘ্রই প্রত্যেকেরই কৌতূহল কেন্দ্রীভূত হয় এই অজানা বিদেশীর ওপর, যিনি বড় একটা বাড়ি থেকে বের হতেন না, একমাত্র শিকার বা মাছ ধরতে না গেলে। কারুর সঙ্গে বাক্যালাপ করতেন না, কোনদিন শহরের দিকে যাননি। প্রতিদিন সকালে দু-এক ঘণ্টা ধরে পিস্তল ও হালকা বন্দুক নিয়ে নিশানায় অভ্যস্ত হতেন।

তাঁকে ঘিরে বিভিন্ন উপকথা ছড়িয়ে পড়ে। অনেকের ধারণা, লোকটি বিখ্যাত ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব—রাজনৈতিক কারণে জন্মভূমি ছেড়ে চলে এসেছেন। এরপর আবার শোনা গেল, সাংঘাতিক এক অপরাধ করে গা ঢাকা দিয়ে আছেন মানুষটি। তাঁর চরিত্র সম্পর্কে নানান সব ভয়ংকর কথা ভেসে বেড়াতে থাকে।

তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে আমিও ঐ লোকটি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে উৎসাহী হই। কিন্তু ব্যাপারটা প্রায় অসম্ভব। তিনি নিজের নাম দিয়েছিলেন স্যার জন রাওয়েল বলে।

আমি তাঁর ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখলাম ; কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই আবিষ্কার করতে পারলাম না।

কিন্তু গুজব ক্রমশঃ তুঙ্গে ওঠায় আমি স্বয়ং ঐ বিদেশীর সঙ্গে মুলাকাতে উৎসাহী হলাম। আমি তাঁর ভিলার সম্পত্তির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে প্রতিদিন গুলিতে লক্ষ্যবিদ্ধের মহড়া শুরু করে দিলাম। দীর্ঘদিন ধরে আমি সুযোগ খুঁজছিলাম। অবশেষে সুযোগ মিললো। আমার গুলিতে বিদ্ধ একটি পাখি গিয়ে পড়লো তাঁর বাগানে। আমার কুকুরটা মুখে ক'রে নিয়ে এলো সেই আহত পাখিটাকে। আমি এই সুযোগে চললাম স্যার জন রাওয়েলের কাছে নিজের এই কাজের জন্য ক্ষমা চাইতে ও পাখিটাকে তাঁরই হাতে তুলে দেবার জন্য।

তিনি বিশালদেহী, মাথার চুল লাল, দাড়ি লাল, যেমন লজ্জায় তেমনি চামড়ায়—এযুগের এক ভদ্র ও আকর্ষণীয় হারকিউলিস! সেই মুহূর্তে বৃটিশ সুলভ কোন কাঠিন্য আমি তাঁর ভেতর দেখতে পাইনি, সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন ; তাঁর ফরাসী উচ্চারণে ইংলিশ চ্যানেলের অন্য পাড়ের টান নিশ্চয় ছিল।

ঐ মাসের মধ্যেই আমাদের আরো পাঁচ ছ'বার মুলাকাৎ হয়েছিল।

এক সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় নজরে এলো, ভদ্রলোক বাগানে চেয়ারে দোল খেতে খেতে পাইপ টানছেন। আমি তাঁকে নমস্কার জানাতেই তিনি আমাকে ভেতরে আসতে অনুরোধ করলেন। এক গ্লাস বিয়ারও পান করা হলো।

তিনি আমার সঙ্গে ব্যবহারে ইংরাজসুলভ সমস্ত সৌজন্যবোধই মেনে চলছিলেন। কর্সিকা ও ফ্রান্সের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করলেন।

তারপর যথেষ্ট সাবধানে ও জীবন্ত কৌতুকে আমি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে দুটি-একটি প্রশ্ন করতে শুরু করি। উত্তর দিচ্ছেন এতটুকুও বিব্রতবোধ না করে ; বললেন, ভ্রমণে তাঁর বিরাট অভিজ্ঞতা আছে,—আফ্রিকা, ভারতবর্ষ ও অ্যামেরিকা চষে বেড়িয়েছেন তিনি। হেসে মন্তব্য করলেন, 'হাঁ, জীবনে আমার অনেক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা আছে।'

নিজের মন্তব্য সমর্থনে তিনি একের পর এক শিকারের গল্প বলে চললেন। তিনি জীবনে জলহস্তী শিকার করেছেন, বাঘ মেরেছেন, এমনকি গরিলাও খতম করেছেন!

'এরা তো সব ভয়াবহ জন্তু'—আমি অনুধাবন করি।

'না, এরা তেমন ভয়াবহ নয়' তিনি সামান্য হেসে বলেন, 'সবচেয়ে ভয়ানক হলো মানুষ।' বলেই তাঁর স্মিত হাসি সরব হাসিতে রূপান্তরিত হয়, একজন দিলখোলা ইংরাজ যেভাবে হেসে থাকে।

'জীবনে আমি মানুষ শিকারও প্রচুর করেছি।'

তারপর তিনি অস্ত্র সম্পর্কে বলতে শুরু করলেন। এবং আমাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন বিভিন্ন ধরনের বন্দুক দেখাতে।

তাঁর ড্রয়িং রুমখানা সোনার কারুকার্যময় কালো সিল্কের কাপড়ে ঢাকা। বিরাট বিরাট হলুদ ফুল যেন আগুনের শিখার মত কম্পমান কালো ধাতুর পাত্রে।

'এটা জাপানী ধাতু।'—তিনি বললেন।

হঠাৎ কপাটের খোবে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখে থমকে দাঁড়াই। লাল ভেলভেটে মোড়া কালো রঙের বস্তু। আমি ওটার কাছে এগিয়ে যাই। একখানা হাত! মানুষের হাত! কোনো কঙ্কালের সাদা পরিষ্কার হাত নয়, চামড়া শুকিয়ে যাওয়া কালো একখানা হাত! হলুদ নখগুলি ঝুলছে, অনাবৃত পেশী স্পষ্ট, বাসি রক্তের দাগ আবিষ্কার করা কঠিন নয়। বেশ নিখুঁতভাবে কেটে রাখা হয়েছে হাতটাকে, মনে হয় যেন কোন ধারালো কুঠারের এক কোপে কনুই থেকে কব্জি অব্দি হাতের মধ্যাংশ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল।

একটা মোটা সমর্থ শিকল, যা দিয়ে হাতী বেঁধে রাখা যায়, ঐ হাতখানাকে ঘিরে রয়েছে এবং ঐ শিকলের সাহায্যেই ঝুলন্ত রয়েছে হাতটা।

'এটা কি?'—আমি জিজ্ঞেস করি।

'এ আমার শ্রেষ্ঠ শত্রু', শান্তভাবে ইংরাজ ভদ্রলোক বললেন, 'এটা এসেছিল আমেরিকা থেকে। এক ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে কাটা, তীক্ষ্মমুখ পাথর দিয়ে চামড়া সরিয়ে আটদিন ধরে সূর্যের আলোতে শুকানো হয়েছিল। আহ্, বস্তুটা আমার সৌভাগ্যের উৎস!'

আমি সেই বিচ্ছিন্ন অঙ্গটিকে ছুঁয়ে দেখলাম। এটা নিশ্চয় কোন বিশাল চেহারার মানুষের। আঙুলগুলি অসম্ভব লম্বা, সমর্থ পাকানো পেশীগুলির জায়গায় জায়গায় তখনো মাংস লেগে রয়েছে। হাতটাকে দেখলে সত্যি ভয় হয়। ওটার দিকে তাকালেই মনে এক বন্য প্রতিহিংসা এসে বাসা বাধে।

'এই হাতটা যার সে নিশ্চয় খুব বলবান ছিল'—আমি বললাম।

'ঠিকই বলেছেন', মিষ্টি গলায় ইংরাজ ভদ্রলোক বললেন, 'কিন্তু আমি তার চেয়েও বলবান। তাইতো কেমন শিকলে বেঁধে ফেলেছি!'

আমার মনে হলো তিনি যেন তামাশা করছেন এবং তাই বললাম, 'এখন তো আর ঐ শিকলের দরকার নেই। কাটা হাত নিশ্চয় পালিয়ে যাবে না।'

স্যার জন রোয়েল কিন্তু এর জবাবে গম্ভীরস্বরে বললেন, 'ওটা সব সময়ই চেষ্টা করছে পালিয়ে যাবার জন্য। শিকল খুবই দরকার।'

চকিতে আমি তাঁর মুখের ভাষা পড়বার চেষ্টা করি; নিজেকেই প্রশ্ন করি: মানুষটা পাগল? অথবা খুব হাল্কা রসিকতায় অভ্যস্ত?

কিন্তু তাঁর মুখের ভাব দুরূহ,—শান্ত ও দয়ার ছাপ। আমি অন্য প্রসঙ্গে কথা বলতে শুরু করি, তাঁর বন্দুকগুলির প্রশংসা করি।

লক্ষ্য করলাম, গুলিভর্তি তিনটে পিস্তল রয়েছে আসবাবপত্রের ওপর। ঐগুলি দেখলে মনে হয়, তিনি যেন সবসময়ই এক আক্রমণের আশঙ্কা করছেন।

আমি এরপরও বারকয়েক তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি। তারপর আর যাইনি। সাধারণ লোকেরাও ক্রমশঃ তার উপস্থিতি সম্পর্কে নিস্পৃহ হয়ে পড়ে।

একটি বছর অতীত হয়ে গেল। তারপর নভেম্বরের শেষে এক সকালে আমার চাকর আমাকে ভোরে ডেকে তুলে খবরটা দেয়,—স্যর জন রোয়েল নাকি গতরাতে খুন হয়েছেন!

আধঘণ্টার মধ্যে আমি সেই ইংরেজ ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন কমিশনার-জেনারেল এবং পুলিশের বড়কর্তা। বাড়ির চাকরটা কিংকর্তব্যবিমূঢ়, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আমি প্রথমেই তাকে সন্দেহ করেছিলাম, কিন্তু লোকটা নিরপরাধ।

অপরাধীকে খুঁজে বের করা কখনোই সম্ভব হয়নি।

স্যর জনের ড্রয়িং রুমে ঢুকে প্রথমেই দেখতে পেলাম, তাঁর নিথর প্রাণহীন দেহ উবুড় হয়ে পড়ে আছে ঘরের মাঝখানে।

তাঁর ফতুয়াটা ছিঁড়ে ফালা ফালা, জামার একটা আস্তিন ছিঁড়ে

ঝুলছে। সবকিছু মিলে এটাই প্রমাণ করে যে, এখানে একটা প্রচণ্ড লড়াই হয়ে গেছে।

ইংরেজ ভদ্রলোকের মৃত্যুর কারণ শ্বাসরোধ। মুখ কালচে ও ফুলে উঠেছে। চোখ দুটো আতঙ্কে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। দাঁত দিয়ে কি যেন কামড়ে ধরে আছেন। তাঁর ঘাড়ে পাঁচ জায়গায় পাঁচটি গভীর গর্ত, দেখে মনে হয় লোহার কোন ফলা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে করা হয়েছে ওগুলো। গর্তগুলি চাপ চাপ রক্তে ঢাকা।

আমাদের সঙ্গে একজন ডাক্তার এসে যোগ দিলেন। অনেকক্ষণ ধরে তিনি খুনীর আঙ্গুলের ছাপ পরীক্ষা করে সবিস্ময়ে বলে ওঠেন, 'আশ্চর্য! এ যে এক কঙ্কালের আঙ্গুলের ছাপ!'

আমার মেরুদণ্ড বেয়ে হিমস্রোত নেমে যায়। আমি ঘুরে তাকাই সেই দেয়ালের দিকে, যেখানে একদিন কাটা হাতটা ঝুলন্ত অবস্থায় দেখেছিলাম। ওটা আর সেখানে নেই। শিকলটা টুকরো টুকরো হ'য়ে মেঝেতে ছড়িয়ে আছে।

আমি মৃতের দিকে গভীর অনুসন্ধিৎসায় ঝুঁকে পড়ি। এবং তখনই আবিষ্কার করি, অদৃশ্য হাতের একটা আঙ্গুল তাঁর কঠিন দাঁতে আটকে আছে। তিনি ওটাকে ছিঁড়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

প্রাথমিক তদন্ত, অনুসন্ধান সমাপ্ত। কিছুই ধরা গেল না। কোন দরজায় হাত পড়েনি, জানালাগুলি যথাযথ, আসবাবপত্র যেমনটি ছিল তেমনটিই রয়েছে। বাড়ির কুকুরদুটোও কিছুই টের পায়নি। আর তাঁর চাকর এ ব্যাপারে যা বক্তব্য রাখলো, তার সংক্ষিপ্ত বয়ান নিম্নরূপ:

গত একমাস ধরে তার প্রভুকে খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছিলো। তিনি অনেক চিঠি পেয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেগুলিকে পুড়িয়েও ফেলেছেন। ঘোড়া মারবার চাবুকটাকে নিয়ে যখন তখন তিনি দেয়ালে লটকানো কাটা হাতটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেন, সপাং সপাং চাবুক চালাতেন ওর ওপর।... তাঁর অভ্যাস ছিল অনেক রাত করে শুতে যাবার। বিছানায় যাবার আগে তিনি যথেষ্ট সাবধানে ঘরের দরজা ও জানালাগুলি বন্ধ করতেন। সব সময়ই নিজের নাগালের মধ্যে অস্ত্র রাখতেন। অনেক সময় মধ্যরাতে তাঁকে চড়া গলায় কথা বলতে শোনা যেত, যেন কারুর সঙ্গে দারুণ ঝগড়া করছেন।

সেই বিশেষ রাতে তাঁকে কোন রকম শব্দ করতে শোনা যায়নি।

পরদিন চাকরটি জানালা খুলেই তাঁর মৃতদেহ দেখতে পায়। আর কিছুই সে জানে না।

এই ঘটনার তিনমাস বাদে এক রাতে আমি একটা ভয়ানক স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম, সেই কাটা হাতটা, সেই ভয়ঙ্কর হাতটা একটা কাঁকড়া-বিছা বা মাকড়সার মতন ঘুরঘুর করছে আমার ঘরের পর্দায় ও দেয়ালে। তিনবার আমি জেগে উঠি, তিনবার আবার ঘুমিয়ে পড়ি এবং তিনবারই আমি স্বপ্নে সেই কাটা হাত ও থাবার মতন তার আঙ্গুলগুলিকে নড়তে চড়তে দেখি।

পরের দিন কাটা হাতখানাকে আমার কাছে আনা হলো। এটাকে পাওয়া গেছে স্যার জন রোয়েলের কবরের ওপর। স্যার রোয়েলের কোন আত্মীয়-পরিজনের সন্ধান না পাওয়ায় আমরাই তাঁকে কবরস্থ করেছিলাম।

হাতটির একটি বিশেষ আঙ্গুল ছিল না।

"অতএব, মহিলারা, আমার গল্প এখানেই শেষ। এর বেশী কিছু আমি জানি না।"

মেয়েরা ভয়ে আতঙ্কে বিবর্ণ, কেঁপে ওঠে।

'কিন্তু এটা কেমন আধখাঁমচা গল্প হলো, প্রকৃত সত্যটা কি বুঝতে পারলুম না!' তাদের একজন বলে, 'আপনি যদি রহস্যটা একটু খুলে না বলেন, ভাবতে ভাবতে আমরা হয়তো রাতে ঘুমোতেই পারবো না।'

'ইস্, আমি তবে আপনাদের ঘুম হরণ করলাম?' তিনি বললেন, 'আমার অভিমত হলো, ঐ কাটা হাতখানা যার, সে তখনো জীবিত ছিল। সে একদিন সুযোগ বুঝে অবশিষ্ট হাতখানা দিয়েই প্রতিশোধ নেয়। অবশ্যই আমি বলতে পারবো না, কি ভাবে সেটা সম্ভব হলো! নির্ঘাৎ শরিকী সংঘর্ষের পরিণতি।'

'না,' মেয়েরা একযোগে প্রতিবাদ জানায়; 'এটা কোন যুক্তিই হলো না।'

এবং বিচারক তখনো স্মিতমুখ, উপসংহার টানলেন:

'আমি তো আপনাদের আগেই বলেছি, আমার যুক্তি আপনাদের মনঃপূত হবে না।'

রহস্য

[The Secret]

ব্যারোনেস্ দ্য গ্রানজির তাঁর ছোট্ট শরীরখানা নিয়ে নরম সোফায় আস্তে আস্তে যেন তলিয়ে যাচ্ছিলেন। ঠিক তখন রেনিডনের মারকিউস-পত্নীর সেখানে হঠাৎ আবির্ভাব। তাঁকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে, তাঁর কাঁচুলি ঈষৎ কুঁচকে গেছে, টুপিটা একদিকে সামান্য কাৎ হয়ে আছে, ধপ্ ক'রে একটা চেয়ারে বসে পড়েই আবেগে বললেন :

"উফ্! কাজটা ক'রে ফেললাম।"

তাঁর বান্ধবী, যিনি তাঁকে কখনো এমন বেসামাল অবস্থায় দেখেননি, বিস্ময়ে সোজা হয়ে বসেন, জানতে চান :

"ব্যাপারটা কি? কি করে এলে?"

মারকিউস-পত্নীর পক্ষে আর একজায়গায় যেন বসে থাকা সম্ভব নয়, মানসিক অস্থিরতায় উঠে দাঁড়ান, গোটা ঘরময় পায়চারি করতে থাকেন। তারপর একসময় সোফার কাছে বসে বান্ধবীর একখানা হাত তুলে নিয়ে বলেন :

"এই শোন, আমি তোমাকে সব বলছি! কিন্তু তার আগে তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, এ কথা তুমি কাউকে ফাঁস করে দেবে না।"

"প্রতিজ্ঞা করছি।"

"নিজের অমর আত্মার নামে শপথ করো।"

"নিজের অমর আত্মার নামে দিব্যি কাটছি।"

"বেশ তা হলে শোন,—আমি নিজে সাইমনের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছি

দ্বিতীয় মহিলা সোল্লাসে বলে ওঠেন :

"তাই নাকি? বেশ করেছো, বেশ করেছো!"

"হাঁ, উচিত কাজ করিনি? চিন্তা করে দেখো, গত ছ'মাস ধ মানুষটাকে কেমন অসহ্য মনে হয়েছে; এত অসহ্য যে ভাষায় ব্যাখ্যা ক যায় না। আমি যখন তাকে বিয়ে করি, তখনই জানতাম লোকটা ক বিশ্রী, কিন্তু আমার ধারণা ছিল, মানুষটা দয়ালু। কী ভুল যে করেছি

সে নিশ্চয় ভেবেছিল, আমি তারই জন্য তাকে ভালোবেসে ফেলেছি! বিরাট চর্বিবহুল উদর ও লাল নাক নিয়ে তাই সে কি যে প্রেমের প্যানপ্যানানি শুরু ক'রে দিলো! সামুদ্রিক কচ্ছপ অথবা ঘুঘুর মতন তার প্রেম-নিবেদন! নিশ্চয় কল্পনা করতে পারো, ওর ওই ন্যাকামি দেখে আমার হাসি পেতো; এর জন্য আমি ওকে একটা আদুরে নামও দিয়েছিলাম—'নির্বোধ ঘুঘু।' মানুষ তার কুৎসিৎ ধারণাগুলিকে নিজেরাই মনে মনে তৈরি করে নেয়।

যখন আমার স্বামী উপলব্ধি করতে পারলো, বন্ধুত্বের চেয়ে বেশী কিছু সে আমার কাছ থেকে আশা করতে পারে না, সে সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়ে। মেজাজটা হয়ে ওঠে, দিন-কে-দিন তিরিক্ষি, কথা বলে তিক্তস্বরে; এমনভাবে ব্যবহার শুরু করে যেন আমি কোন ছিনাল মেয়ে, অথবা আমি যেন কোন হা-ভাত ঘরের মেয়ে অথবা আমি যেন কিছুই বুঝি না! এবং ক্রমে ক্রমে এটা আরো ভয়ানক হয়ে উঠলো, কারণ···কারণ··· কারণটা ঠিক সহজ কথায় আমি ব্যক্ত করতে পারছি না। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়, সে আমাকে ভালোবেসেছিল, দারুণ ভালোবেসে ফেলেছিল।···তার সেই অদম্য ভালোবাসা প্রায়ই প্রকাশ পেয়ে যেত, প্রায়ই! ওহ্, বান্ধবী সে যে কী শাস্তি আমার···জোকারের উদ্ভট প্রেম-নিবেদন আর কি!···না, সত্যি, এ ধরনের ব্যাপার আমি বেশীদিন সহ্য করতে পারিনি···আদৌ নয়··· প্রত্যেক রাতে যেন আমার শরীরে ওর দাঁত বসে যেত···তারচেয়েও খারাপ, তারচেয়েও নোংরা।···আচ্ছা, তোমার পরিচিতজনের মধ্যে এমন কাউকে কল্পনা করতে পারো, যে দেখতে অত্যন্ত কুৎসিৎ, ব্যবহারে হাস্যাস্পদ, অত্যন্ত বিতৃষ্ণাজনক, সঙ্গে ইয়া ভুঁড়ি, দেখলে মনে হয় যেন একটি লোমশ গোবৎস? বলো, কল্পনা করতে পারো এমন এক অসহ্য লোককে? এখন ধরো, এমনই একজন তোমার স্বামী··· এবং সেই অপদার্থটা···প্রত্যেক রাতে···নিশ্চয় বুঝতে পারছো, আমি কি ইঙ্গিত করছি! না, এ সহ্যের বাইরে!···একেবারে অসহ্য! এমন লোকের প্রাত্যহিক সঙ্গ আমাকে অসুস্থ করে তোলে, বড়ই অসুস্থ বোধ করি নিজেকে—সত্যি বলছি, আমি আর পারছি না! এদেশে এমন আইন থাকা দরকার, যার সাহায্যে আমার মতন বিপদাপন্ন স্ত্রীরা যেন তাদের স্বামীর হাত থেকে রেহাই পায়। নিজেকে তুমি আমার জায়গায় বসিয়ে একবার ভেবে দেখ, অমন একটা ভয়ংকর লোক প্রতিটি রাতে!··· ধ্যাৎ, এর চেয়ে পাশবজীবন আর কি হতে পারে!

তাই বলে ভেবো না, আমি খুব প্রেম-মধুর স্বপ্ন-টপ্ন দেখে থাকি—সে রকম মোটেই নয়।…এই পৃথিবীর সব পুরুষরাই হলো হয় অশ্বপালক, নয়তো ব্যাঙ্কের মালিক। ওরা ঘোড়া অথবা টাকা ছাড়া আর কিছুকেই গুরুত্ব দিতে চায় না। যদি তারা কখনো মেয়েদের ভালোবেসে ফেলে, তবে ঐ ভালোবাসাটাও হবে অশ্ব-প্রেমের সামিল। ঘোড়াকে যেমন সে খুশিমতন খেলায়, ব্যবহার করে, নিজের প্রেমিকাকেও সে তা করতে চাইবে। এর বাইরে কিছু নেই। আধুনিক জীবনে রোমাঞ্চের কোন স্থান নেই।

আমাদেরও এর পাল্টা ব্যবস্থা নিতে হবে। এমনভাব দেখাতে হবে, যেন আমরা আদৌ ভাবপ্রবণ ও স্পর্শকাতর নই। আর যৌন-সংযোগ? ওটা এখন দাঁড়িয়েছে একটা নির্দিষ্ট সময়ে দেহে-দেহে মিলন মাত্র, একই জিনিস একই সময়ে রোজ রোজ পুনরাবৃত্তি! এই যুগে কেউ কি কারুর জন্য দয়া ও আসক্তি বোধ করতে পারে?…আমি তামাম প্যারিসের উত্তমর্ণ সমাজে একজন প্রকৃত আদর্শ পুরুষের সন্ধানে আছি; কিন্তু আমি জানি, সেরকম কাউকে আমি কোনদিনই খুঁজে পাবো না। আমি এখন আমার স্বামীর সঙ্গে এমন ব্যবহার শুরু করে দিয়েছি, যাতে সে লোকটা নিজেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়…এবং আমার ওপর বিরক্ত হয়। প্রথমে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, তারপর তার মন অধিকার করে ঈর্ষায়; তার তখন ভাবনা হয়, আমার দ্বারা সে বুঝি প্রতারিত হচ্ছে' প্রথম প্রথম কয়েকদিন সে আমাকে চোখে চোখে রেখে নিজেকে প্রবোধ দেয়। শিকারী বাঘ যেমন মানুষের পিছন পিছন তক্কে তক্কে ঘুরে বেড়ায়. সেও ঠিক তেমনি সব সময় যেন আমার পিছনে থাবা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। কারুর সঙ্গে আমাকে কথা পর্যন্ত বলতে দেয় না। কোন প্রীতিসম্মেলনে আমি যে খোলামেলা মন নিয়ে সামাজিকতা করবো, তারও উপায় নেই; সে আমাকে কারুর সঙ্গে নাচতে দেবে না; কোন পরিচিতজনের সঙ্গে দেখা হলে আমি বাধ্য হয়ে এমন ভাব দেখাই, যেন আমি তাকে চিনিই না; সব সময় একটা বোকা বোকা ভাবের অভিনয় আমাকে ক'রে যেতে হয়েছে। বিরক্ত হ'য়ে শেষ পর্যন্ত আমি সভা-সমিতিতে যাওয়াই বন্ধ করে দিলাম।

তবু পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে গেল…বললে বিশ্বাস করবে না শয়তানটা আমার সঙ্গে ব্যবহার করছে…বলতে লজ্জা হচ্ছে…আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছে, যেন আমি একটা বেশ্যা।

বান্ধবী !…একরাতে সে আমাকে বলে বসলো, 'কি, আজ কার সঙ্গে শুয়েছো ?' আমি কেঁদে ফেললাম, আর আমার কান্না দেখে সে উল্লসীত হলো।

দিনের পর দিন সে আরো ভয়ঙ্কর হচ্ছে। গত সপ্তাহে সে আমাকে ডিনার খাওয়াতে নিয়ে গেল চ্যাম্পস এলিসিস রেঁস্তরায়। ভাগ্যক্রমে আমার টেবিলের মুখোমুখি আর এক ভদ্রলোকের আসন নির্দিষ্ট হয়েছিল। ব্যস, আর যায় কোথায় ! সাইমন পাগলের মতন আমার পা দুটোকে নিজের পা দিয়ে চেপে রাখলো, তরমুজের থালার উপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে বদমেজাজী কুকুরের মতন গরগর করতে থাকে, 'নষ্ট মাগী কোথাকার ! নিশ্চয় এর আগে থেকেই ওর সঙ্গে কথা হয়েছিল তোর, এখানে এই টেবিলে বসবার ! দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা !' তারপর—তারপর সে যা করলো, তা তোমার কাছে অকল্পনীয়—কী দুঃসাহস ওর ! আমার মাথা থেকে একটা কাঁটা তুলে নিয়ে সজোরে আমার হাতে ফুঁটিয়ে দিলে !

আমি জোরে চীৎকার করে উঠলাম। সকলে ছুটে এলো আমার কাছে। তারপর নিশ্চয় কল্পনা করতে পারছো, সকলের সামনে কেমন ঘৃণ্য বিরক্তিকর মজাদার অভিনয় সে করলো ! কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই আমি শপথ গ্রহণ করি: 'এর প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব !' তুমি হলে এ অবস্থায় কি করতে ?"

"আমি ! আমি নিজে বদলা নিতাম।"

"খুব ভালো, আমিও তাই নিয়েছি।"

"কি ভাবে ?"

"কি ! বুঝতে পারছো না ?"

"কিন্তু, বন্ধু…এখনো…বেশ, হাঁ।"

"হাঁ, কি ? দয়াময়ী, একবার তার মাথাটার কথা চিন্তা করে দেখো ! সেই চর্বি থলথলে মুখ, মোটা লাল নাক এবং কুকুরের কানের মত ঝুলন্ত গালের দু'পাশে দাড়ি।"

"যথার্থ।"

"হাঁ, আমি নিজেকেই নিজে বলেছিলাম, 'নিজের সুখের জন্যই আমি এই প্রতিশোধ নেবো।' আর আমি প্রথম থেকেই ঠিক করেছিলাম, ঘটনাটা আমি শুধু তোমাকেই বলবো, আর কাউকে নয়। একবার শুধু ওর মুখটার কথা চিন্তা করে দেখ…সে…সে…."

"কি···ঘটালে···"

"ও বান্ধবী, বলছি। কিন্তু আমার দিব্যি রইলো, কারুর কাছে একথা ফাঁস করে দেবে না! কি মজার ব্যাপার ভেবে দেখো···সে এখন আমার মুখের দিকে অন্য দৃষ্টিতে তাকায়, আর আমি তাকে দেখলেই হাসিতে ফেটে পড়ি···এ হাসি চেপে রাখা যায় না···একবার তার মাথার কথা চিন্তা করে দেখো।"

ব্যারোনেস্ তাঁর বান্ধবীর মুখের দিকে তাকান। বান্ধবী বাতিকগ্রস্ত রুগীর মতন অফুরাণ বুনো হাসিতে ফুলে ফুলে উঠছেন, হাসির দমকে তাঁর পাতলা ঠোঁটদুটো সমানে কাঁপতে থাকে। হাসতে হাসতে নিজের বুক নিজে খামচে ধরেন, মুখে রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধি পায়, কণ্ঠনালীতে যেন শ্বাসরোধ ঘটে, হাসির দমকে এখনই বুঝি মুখ থুবড়ে পড়বেন।

আবার মারকিউস-পত্নী বলতে থাকেন, "চিন্তা করো···ভেবে দেখো···এটা কি খুব মজার ব্যাপার হয়নি? বলো আমাকে···ওর মাথার কথাটা চিন্তা করে দেখো···ভাবো তার গালপাট্টার কথা!···কল্পনা করো তার নাকের বাহার···একটিবার ভাবো···মজা লাগছে না? কিন্তু ভাই, একথা যেন গোপন থাকে···কাউকে বলবে না···ফাঁস করে দিও না!"

দু'জনেরই উত্তেজনায় এমন অবস্থা, যেন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। কথা বলতে পারছেন না। চোখ বেয়ে আনন্দের অশ্রু গড়াচ্ছে।

ব্যারোনেসই প্রথমে নিজেকে অনেকখানি সংযত করে ফেলেন, তবে তখনো তাঁর গলা কাঁপছে, "কিভাবে কি করলে, বলো না!···আমার জানতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে!···"

কিন্তু অন্যজন কথাই বলতে পারছেন না···কোন রকমে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন:

"যখন আমি মনস্থির করে ফেললাম···নিজেকে বললাম:···'এই সেই সময়···আর দেরী করো না··· এখনই তোমাকে তা ঘটাতে হবে'···এবং আমি ···তা ঘটিয়েছি···আজই···"

"আজই!"

"হাঁ···এই কিছুক্ষণ আগে···আমি সাইমনকে বলে এসেছি, তোমার এখানে এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হতে। আমরা ওর দিকে চেয়ে খুব

আমোদ পাবো।···সে আসছে···এখনই···সে আসছে···চিন্তা করো···চিন্তা করো, তোমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে তার মাথাটা···'

ব্যারোনেস, যিনি অপেক্ষাকৃত নম্র, এমন একটা ভাব দেখালেন যেন এইমাত্র দীর্ঘ এক দৌড়যাত্রা শেষ ক'রে এসেছেন, বললেন :

"আহা, বলো না, কি করলে···বলো আমাকে।"

"খুব সহজ। আমি নিজেকে বললাম : 'সে তো আমার পরিচিত লোক বউগিবাগকে ঈর্ষা করে; খুব ভালো, তবে আমার নতুন নাগর হবে বউগিবাগই। লোকটা অবশ্য তার পা দুটোর মতনই খুব কদাকার, তবে যথেষ্ট সম্মানীয় লোক; মিথ্যা গল্প মারে না।' সুতরাং চটপট প্রাতরাশ সেরেই আমি চললুম তার বাড়ির উদ্দেশ্যে।"

"তুমি তার বাড়িতে গেলে। কিন্তু উপলক্ষটা কি?"

"চাঁদা আদায়···অনাথা শিশুদের জন্য···"

"গোটা গল্পটা খুলে বলো··তাড়াতাড়ি···সবটা আমি খোলাখুলি শুনতে চাই।"···

"লোকটা তো আমাকে দেখে এত অবাক যে, কথাই বলতে পারছে না। দুই লুইস্ চাঁদাও দিল। আমি উঠে দাঁড়াবার পরই মুখ খুললো সে, আমার স্বামীর খবরাখবর জানতে চাইলো, সেই সুযোগে এমন ভাব দেখালাম, যেন নিজের বেদনাদায়ক আবেগ আর আমি কিছুতেই চেপে রাখতে পারছি না. এতক্ষণ মনে যে কথা লুকিয়েছিল ইনিয়ে বিনিয়ে বলে ফেলি। স্বামীকে এই লোকটার চেয়েও কালো ও কুৎসিৎ বলে বর্ণনা করলুম,···বউগিবাগ ক্রমশ বিচলিত, স্পর্শকাতর। সে ভাবতে শুরু করে দেয়, কিভাবে আমাকে সাহায্য করতে পারে।···আর আমি তো কাঁদছি, যেভাবে একজন নারী কেঁদে থাকে ··যেভাবে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে একজন যুবতী কান্নার ভান করে থাকে···সে আমাকে সান্ত্বনা দেয়···আমাকে ধরে আবার বসিয়ে দেয়···এবং তারপর, আমি থামছি না দেখে সে আমাকে শান্ত করতেই হাত বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরে···আমি সেই অবস্থাতে উচ্চারণ করি : 'আমার বন্ধু!···আমার হতভাগ্য বন্ধু!' তারও কণ্ঠস্বরে সেই একই বাণী ধ্বনিত হয় : 'আমার বান্ধবী!···আমার ভাগ্যহীনা বান্ধবী!' তার আলিঙ্গন ক্রমশই নিবিড় হতে থাকে···নিবিড়তর···একসময় আমরা দু'জনে ভীষণভাবে জড়াজড়ি করতে শুরু করে দিই···তারপর—তারপর সেই কাজটি শেষ হতেই আমার ভিন্নমূর্তি।

সমানে তাকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিতে হবে। ইস্, সে সময় তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করলুম যেন তার মতন হীন নীচ লোক আর হয় না!··· কিন্তু আসলে তখন যে আমার কী হাসি পাচ্ছিলো! শুধু ভাবছিলাম সাইমনটার কথা, তার মাথার কথা, তার দাড়ির কথা। কল্পনা করো···কল্পনা করে দেখো একবার! আমি তার ওপর প্রতিশোধ নিয়েছি। সে সব সময় যা আশঙ্কা করছিল, নীরবে নিরাপদে তাই করে ফেললাম। লাগুক যুদ্ধ, কেঁপে উঠুক পৃথিবী ভূমিকম্পে, মহামারীতে দুনিয়া জুড়ে শুরু হোক হাহাকার, মারা যাই আমরা সকলে···আমি তো সাইমনের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছি! দুনিয়ার কোন কিছুই আর ব্যতিক্রম ঘটাতে পারবে না! আর ফিরে আসবে না সেই পূর্বাবস্থা! ভেবে দেখো তার মাথাটার কথা···আর মনে মনে বলো, আমি তা করতে পেরেছি!"

ব্যারনস্, যিনি এতক্ষণ বান্ধবীর বর্ণনা শুনতে শুনতে বিস্ময়ে পুলকে মৃতপ্রায়, জানতে চান:

"তুমি কি আবার বউগিবাগের কাছে যাবে?"

"না, আদৌ নয়। কখনোই নয়···ওর সঙ্গে যা হবার, তা যথেষ্টই হয়েছে ···ওকে এখন আমার স্বামীর চাইতেও খারাপ লাগছে।'

আবার তাঁরা দু'জনে একসঙ্গে হাসতে আরম্ভ করেন। হাসতে হাসতে একে অপরের ওপর গড়িয়ে পড়েন। ঠিক তখনই দরজায় বেল বেজে ওঠে এবং কিছুক্ষণের জন্য তাঁদের হাসিও থেমে যায়।

দরজা খুলে প্রবেশ করলেন একজন শক্ত সমর্থ চেহারার লোক, লাল মুখ, পুরু ঠোঁট, দু'গাল বেয়ে দাড়ি ঝুলছে, রক্তবর্ণ চক্ষু তাঁর চারদিকে ঘুরতে থাকে।

দুই যুবতী ক্ষণিকের জন্য নির্নিমেষে তাঁর দিকে চেয়ে থাকেন; তারপরই উৎকট হাসির ফোয়ারায় এমন ভাবে সোফার ওপর গড়িয়ে পড়েন, যেন কি ভয়ংকর ঘটনা এইমাত্র ঘটে গেল।

সেই বিরামহীন হাসির মধ্যে বারবার শোনা যায় তাঁর কণ্ঠস্বর:

"এই, কি ব্যাপার! তোমরা কি পাগল হয়ে গেলে?···পাগলের মতন হাসছো কেন?···তোমাদের কি মাথা খারাপ?"

পাগল ?

[Mad ?]

আমি পাগল না, ঈর্ষাকাতর ?

ঠিক ত্রুটিহীনভাবে বলতে পারবো না কি আমার হয়েছে, কিন্তু কষ্ট পাচ্ছি খুব। আমি একটা অপরাধ করেছি, এটা ঠিক, একটা উন্মাদ অপরাধ! কিন্তু দিশেহারা অসহ্য ঈর্ষা, আবেগতপ্ত প্রেম, প্রতাড়িত হবার জ্বালা, হেরে যাবার যন্ত্রণা—এ সব কি কারুর পক্ষে অপরাধ করে ফেলার যথেষ্ট কারণ নয়, যদিও সে স্বভাবে অপরাধী নয়? এ অবস্থায় কোন মানুষ কি নিজের কর্তৃত্বে থাকে ?

ওহ! আমি কত কষ্ট পেয়েছি, অবিরত দগ্ধ হয়েছি, নিরবচ্ছিন্ন তীব্র যন্ত্রণা! আমি এই মেয়েটিকে পাগলের মত ভালোবেসেছিলাম,—কিন্তু এখন মনে হয়, সত্যি কি আমার প্রেম এত গভীর ছিল? আমি কি ওকে ভালো-বাসতাম? না, না! সে আমার দেহ ও মন অধিকার ক'রে নিয়েছিল; আমি যেন ছিলাম এবং আছি তার হাতের খেলার পুতুলটি হয়ে; তার স্মিত হাসি, তার দৃষ্টি, তার দেহের স্বর্গীয় মাধুরি আমার ওপর নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বিস্তার করে ছিল। আমি তার অভাবনীয় শারীরিক আকর্ষণের বিরুদ্ধে প্রাণপনে লড়াই করেছি. ওর দেহগত বস্তুগুলিকে আমি ঘৃণা করার চেষ্টা করতুম, চাইতুম এড়িয়ে যেতে। কারণ, সে ছিল অপবিত্র. অবিশ্বাসী, পশুবৎ, নোংরা স্বভাবের মেয়ে, যার ভেতর মন বলে কোন পদার্থ ছিল না; সে ছিল মানুষ-পশু, তার নরম মাংসল শরীর ছিল অপযশের উৎস।

আমাদের মিলনের প্রথম কয়েকমাস ছিল অদ্ভুত তৃপ্তিকর। আমি তার সাময়িক উন্মত্ত কামনার বাহুপীড়নে হাঁপিয়ে উঠতাম। চোখ দিয়েই সে আমার ঠোঁট দুটিকে মেলে ধরতো, আমার তৃষ্ণা নির্বাপিত হতো। তার ঐ চোখের রঙ নিয়ত পরিবর্তনশীল,—দুপুরে ধূসর, গোধূলিলগ্নে ঈষৎ সবুজ, এবং সূর্যোদয়কালে নীলাভ। আমি পাগল নই। শপথ করে বলছি, ওর ভেতর এই তিন রঙের খেলা আমি প্রত্যক্ষ করতাম। প্রেম-নিবেদনের

সময়গুলিতে তার দৃষ্টি তীব্র নীল হয়, দৃষ্টি যেন ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে ; চোখের তারা বিস্ফারিত ও দিশাহারা। তার ঠোঁট কাঁপে, কখনো কখনো তার পাটলবর্ণ জিহ্বার অগ্রভাগ দেখতে পাই, যা সাপের মতন লকলকিয়ে ওঠে এ ং যেন এক ধরনের শিঁস আমি শুনতে পাই। তার ভারী চোখের পাতা আস্তে আস্তে উন্মুক্ত হয়, তার কামনামদির দৃষ্টি আমাকে পাগল ক'রে তোলে। যখনই আমি তাকে আমার হাতের বেষ্টনিতে আঁকড়ে ধরেছি, আমি তার চোখের দিকে চেয়েছি, শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে, তখনই মনে হয়েছে, আমি যে শুধু ওকে লাভ করতে চাই তা নয়, আমি এই পশুটাকে খুনও করতে চাই।

তার পায়চারির সময় প্রতিটি পদক্ষেপ আমার বুকের কন্দরে প্রতিধ্বনি তুলতো, তারপর যখন সে উলঙ্গ হতো, আমার চো.খর সামনে তার পোষাকগুলি খুলে খুলে পড়তো এবং যখন সেই কুখ্যাত, অথচ বন্যসুন্দর শ্বেতশুভ্র দেহখানা দেখতে পেতাম, কাঁপতে কাঁপতে আমার হাঁটু ভেঙ্গে পড়তো, আমার পা ও হাতগুলি তখন অবশ, অসীম ভয়জনিত দুবলতা আমার বুকখানা অধিকার ক'রে নিতো।

একদিন দেখলাম, সে আর আমাকে বরদাস্ত করতে পারছে না। তার চোখের দিকে চেয়েই এটা বুঝতে পারলাম। আমি তার কাছ থেকে সেই কামনাতুর বন্য দৃষ্টির প্রত্যাশা করেছিলাম। কিন্তু পরিবর্তে দেখলাম, তার নীল চোখ হিম, সেখানে ক্লান্তি ও বিরক্তির ছাপ সুস্পষ্ট। চকিতে আমার বুকে আগুন ধরে যায়, বাসনার তাগিদে আমি মরিয়া হয়ে উঠি।

যখন সে তার চোখের তারা মেললো, আমি দেখলাম এক ভাবলেশহীন উদাসী দৃষ্টি. ঐ চাউনিতে কামনা নেই, সমর্পণের কমনীয় উষ্ণ তাগিদ নেই, বুঝতে পারি, আমাকে আর তার ভালো লাগছে না। মানুষের সাধারণ অনুভূতির সাহায্যে আমি ওর এই নির্বিকারত্ব বুঝতে পারি, অনুভব করতে পারি—সব কিছুই শেষ হয়ে গেছে, এখন থেকে প্রতিটি মুহূর্ত নিরুত্তাপ। যখন আমি আমার হাত ও ঠোঁট দিয়ে তার ভেতর উত্তেজনা সঞ্চারের প্রয়াস পাই, সে বিব্রত হ'য়ে ব্যবধানে সরে যায়। "আমাকে একা থাকতে দাও," সে বললো, "তুমি ভয়ানক ! তুমি কি কখনো আমাকে একা থাকতে দেবে না ?" আমার ভেতর কুকুরসুলভ এক ধরনের গোপন ঈর্ষা ও সন্দেহ প্রবল হ'য়ে ওঠে। আমি বুঝতে পারছিলাম, ওর

ভেতরকার সেই তুর্নিবার কামনা আবার জেগে উঠবে এবং অন্য কোন লোক সেই সুযোগে তাকে কব্জা করবে, যেহেতু আমি নেহাৎই অপাংক্তেয়। আমি ঈর্ষায় পাগল হয়ে উঠলাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাগল আমি হইনি! ওকে নজরে রাখি এবং অপেক্ষা করতে থাকি—দেখতে হবে ওর এই নির্বিকারত্ব কাম-শীতলতা না, আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা? কিন্তু ওর নির্বিকার শীতলতাই সত্যি!

সে তখন কখনো কখনো বলে উঠেছে ঃ

"মানুষ আমাকে ঘৃণা করে!" হায়! কথাটা মর্মান্তিকভাবে সত্যি।

তখন আমার জ্বালাময় ঈর্ষা কেন্দ্রীভূত হয় তার অস্তিত্বেরই ওপর: তার নির্বিকারত্ব, তার নির্জন একাকীত্বপূর্ণ রাত্রিগুলি, তার কার্যকলাপ, তার চিন্তাধারা—সবকিছুই অসহ্য। আমার মনে হতো, তার সবকিছুই কুরুচিপূর্ণ, শয়তানিতে ভরা। সময় সময় তার ভেতর সেই পুরনো কামনা-বাসনা জেগে উঠতো, ফুটে উঠতো চোখে সেই ইশারা। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি ভিন্নতর মানুষ, প্রচণ্ড রাগ ও ঘৃণা আমাকে অধিকার ক'রে নিয়েছে; ইচ্ছে হয়, ওকে হাঁটুর গুঁতোয় তু'টুকরো করে ফেলি, গলা টিপে ওর মনের সমস্ত গোপন লজ্জাকর কথাগুলি আদায় করে নিই। আমি কি উন্মাদ? না।

একরাতে দেখলাম, সে বেশ খুশি খুশি। অনুভব করলাম, স্থির প্রত্যয় জন্মালো,—নিশ্চয় ওর ভেতর নতুন কামনার জন্ম নিয়েছে। আমার উষ্ণ আলিঙ্গন ও চূড়ান্ত সঙ্গ পাবার উদগ্র বাসনায় তার শরীর রোমাঞ্চিত, দেহের ত্বক তপ্ত, চোখ মুখ রক্তাভ,—এই সেই সব লক্ষণ, যা একদিন আমায় দিশেহারা করে তুলতো।

আমি না জানার ভান করলুম, কিন্তু ঘনিষ্ঠ থেকে গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করছি তার ভাবান্তর। কিছুই অবশ্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হলুম না। দেখতে দেখতে একটি সপ্তাহ কেটে যায়, একটি মাস পেরিয়ে যায়, প্রায় একটি বৎসর অতীত হয়। সময় সময় তার চোখে সেই খুশির ঝিলিক দেখতে পাই, সেই কামনা-তৃপ্তির পরিষ্কার ছাপ তার মুখাবয়বে। কারণ কি?

অবশেষে অনুমান করতে পারলাম।

না, আমি পাগল নই। শপথ ক'রে বলছি, মাথায় গণ্ডগোল আমার হয়নি। কিভাবে আমি এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ব্যাখ্যা করতে পারলাম? কিভাবে বুঝতে পারলাম? এখানে সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতা!—

এক রাতে প্রথম ব্যাপারটা আমার নজরে এলো। সেই রাতে ঘোড়া য়ে সে এলো আমার ঘরে, এসেই আমার মুখোমুখি চেয়ারে বসে যেন ক্রমশঃ তলিয়ে যেতে থাকে। মুখে-চোখে তার সুখকর ক্লান্তি। মুখে চিবুকে অস্বাভাবিক রক্তসঞ্চালন, পুরুষ্টু বুকের দ্রুত ওঠা-নামা, পা কাঁপছে, দুই চোখে অভাবনীয় উল্লাস। ভুল আমার হয়নি। এরকম রূপান্তর এর আগেও ওর দেখেছি। সে প্রেমে পড়েছে! আমার মাথায় আগুন জ্বলছে। আমি আর ওর দিকে না তাকিয়ে চলে গেলাম জানালার কাছে। দেখলাম, এ বাড়ির খানসামা ওর মেয়েটিকে নিয়ে যাচ্ছে আস্তাবলের দিকে। ক্লান্ত সুন্দরীও আমার পিছনে এসে দাঁড়ায়, মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে সুন্দর পশুটাকে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যেতে, তারপরই খুব দ্রুত সে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে।

সারাটা রাত ধরে কেবলই ভেবেছি। আমার মন রহস্যের অতলান্তে ডুব দিয়ে প্রকৃত সত্যের সন্ধান করেছে। ইন্দ্রিয়াসক্ত নারীর বিকৃত কাম ও উৎকল্পনার পরিমাপ কে করতে পারে? কে এই বিচিত্র চরিত্রের উদ্ভট কল্পনা ও অস্বাভাবিক সুখের কারণকে খুঁজে পাবে?

প্রতি সকালে সে ঘোড়ায় চেপে পূর্ণ গতিতে মাঠ-ঘাট পেরিয়ে বনে ঢুকতো এবং ফিরে যখন আসতো, তখন তার মুখাবয়বে সেই রক্তাভ ভাবান্তর, প্রেমবিধুর ক্লান্তি! অবশেষে রহস্যভেদ করলাম। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কোন মানুষ নয়। আমার ঈর্ষার পাত্র ঐ তেজী ঘোড়াটা, যে তাকে চড়া দুলকি চালে নিয়ে বেড়ায়, আমার সঙ্গে শত্রুতা করছে বাতাস, যে তার সর্বাঙ্গে সোহাগ-পরশ বুলিয়ে যায়; আমার প্রতিদ্বন্দ্বী সূর্যের আলোয় পরিপুষ্ট সবুজ গাছের পাতারা, যারা তাদের নীচু নীচু ডালগুলি থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় ওকে বার বার ছুঁতে পারে। এরা সকলে মিলেই তো তাকে অমন সুখ দিচ্ছে এবং এদের জন্যই সে আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এরাই তাকে সুখকর ক্লান্তি দেয়, তার চোখে গভীর ঘুম ডেকে আনে! আমি এর প্রতিশোধ নেবো! আমি খুব সজাগ হ'য়ে উঠি! যখনই সে ঘোড়া ছুটিয়ে আসে, আমি এগিয়ে যাই তাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে সাহায্য করতে। সেই মুহূর্তে ঘোড়াটা আমাকে দেখে কেমন যেন হিংস্র হয়ে ওঠে, তেড়ে আসে আমার দিকে। আর সোহাগিনী তখন সেই ক্ষ্যাপা ঘোড়ার কেশর ধরে আদর করে, তার পিঠে চুমু খায়, তার নত্তানো দেহ দেখলে তখন মনে

হয়, সে যেন কোন প্রেমিককে আঁকড়ে ধরে বিছানায় আবেশে শুয়ে আছে, তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে তেজী ঘোড়ার বিচিত্র ঘ্রাণ।

আমি সুযোগের প্রতীক্ষায়।

একই পথ ধরে সে প্রত্যেকদিন ঘোড়া ছুটিয়ে যায়,—যে পথের দু'ধারে সারি সারি সংবদ্ধ বার্চগাছ এবং যে পথ শেষ হয়েছে এক বনভূমির গায়ে। আমি সেদিন সূর্য উঠবার আগেই বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াই। একখণ্ড দড়ি হাতে নিই, বুকের তলায় পিস্তলটা লুকিয়ে রাখি; আমাকে দেখে মনে হতে পারে, যেন চলেছি কোন ডুয়েল লড়তে।

তারপর তার সেই প্রিয় পথ ধরে ছুটতে আরম্ভ করি। একসময় থমকে দাঁড়াই, দুটি গাছকে ঘিরে সেই দড়িতে প্যাঁচ কষি, পথ বন্ধ হ'য়ে যায়, আমি ঘন ঘাসের আড়ালে আত্মগোপন করি। মাটির বুকে কান পেতে শুনতে পাই, সে আসছে! তার তেজী ঘোড়ার ছুটে আসার শব্দ বাজছে কানে! মুখ তুলে দেখতে পেলাম, প্রচণ্ড গতিতে সে ছুটে আসছে! হাঁ, উল্লাসে তার মুখ লাল, চোখের দৃষ্টিতে অজস্র পরিতৃপ্তি। হুঁ, এখনই তো তার পরম সুখের লগ্ন! ভুল আমি করিনি! ঐ অভাবনীয় দ্রুত অশ্বগতি তার যাবতীয় গর্জন বন্য-আনন্দের কারণ।

ছুটতে ছুটতে ঘোড়াটা মুহূর্তে ঐ দড়ির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে, আচমকা এই বাধায় হতচকিত তেজী জানোয়ারটার সামনের দু'পা মুড়ে যায় এবং সে আর টাল সামলাতে পারে না। ঠিক তখনই আমি ছুটে গিয়ে যুবতীকে অনায়াসে টেনে তুলি, আমি যে একটা ষাঁড় তুলে ধরবার ক্ষমতা রাখি! যুবতীকে মাটিতে দাঁড় করিয়ে এবার এগিয়ে যাই দুশমনের দিকে—ঘোড়াটা! ও এতক্ষণ তাকিয়ে দেখছিল আমাদের। এখন আমাকে এগিয়ে আসতে দেখেই সে তেড়ে আসে, আমাকে কামড়াবার চেষ্টা করে। তার কানের কাছাকাছি পিস্তলটা তাক করি। গুলি করি,—যেভাবে ডুয়েলে একজন অপরজনকে গুলি করে থাকে।

প্রেয়সী রাগে ক্ষোভে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার ওপর, হাতের ঘোড়া-ছুটানো চাবুক দিয়ে দু'বার সপাং সপাং প্রচণ্ড আঘাত করে আমার মুখের ওপর। আমি একটু সরে যাই, সে দ্বিগুণ তেজে আবার আমার দিকে ছুটে আসতে থাকে। তখন—

তখন আমার পিস্তল দ্বিতীয়বার অগ্নিস্রাবী হয়।

এখন বলুন, আমি কি পাগল?

বিক্রয়যোগ্য

[For sale]

যখন মাত্র সূর্য উঠছে, তখন শিশির ভেজা মাঠে অথবা, শান্ত সমুদ্রের তীরে পায়ে পায়ে হেঁটে বেড়াতে কী অভাবনীয় আনন্দ! অনাস্বাদিত সুখ! সমুজ্জ্বল আলোকে আলোকিত দৃশ্য নয়নকে তৃপ্তি দেয়, তীক্ষ্ণ বায়ু তাড়িত সুগন্ধ প্রবেশ করে নাশারন্ধ্রে এবং ত্বকে প্রেমপূর্ণ স্পর্শ বুলিয়ে যায় বাতাস। কেন তখন পৃথিবীর সঙ্গে এমন আবেগপূর্ণ আত্মীয়তা অনুভব করি? দ্রুত, পবিত্র, স্নেহাতুর কোন গ্রাম, কোন গ্রামীণ পথ, কোন উপত্যকার প্রবেশ-মুখ বা কোন নদীর প্রান্তরেখা ইস্তক দৃশ্যাবলীর স্মৃতিরা কেন তখন মনকে পুলকিত রাখে? মনে হয়, যেন কোন সুন্দরী আকর্ষণীয়া যুবতীর অন্তরঙ্গ হচ্ছি বুঝি!

অনেকদিনের মধ্যে এরকম একটি দিনের স্মৃতি আজ আমার মনে আসছে। ব্রিটানির উপকূল বরাবর হেঁটে চলেছি ফিনিস্ত্রির দিকে। হাঁটছি দ্রুততর লয়ে, মন একেবারে চিন্তাশূন্য। জায়গাটা হচ্ছে ব্রিটানির সুন্দরতম আদরণীয় স্থান কুইমপার্ল।

বসন্তের সকাল,—এমনি একটি সকাল, যা আমাকে আবার কুড়ি বছরের যুবকে পরিণত করছে,—এমন একটি সকাল, যা আমার মনে অতীত প্রত্যাশা-গুলিকে আবার জীবন্ত ক'রে তোলে এবং প্রথম যৌবনের স্বপ্নগুলি আবার আমাকে পেয়ে বসে।

হাঁটছি; এক পাশে শস্যক্ষেত্র, অন্যদিকে সমুদ্র; পথের অবস্থা গ্রামীণ কোন রাস্তার চেয়ে ভালো নয়। শস্যগুলি স্থির এবং সমুদ্রের ঢেউগুলি মৃদু ও শান্ত। বাতাসে পাকা ফসলের গন্ধ, আবার সামুদ্রিকভূমির লবণাক্ত ঘ্রাণও রয়েছে।

আমি চিন্তামুক্ত মগজ নিয়ে সোজা হেঁটে চলেছি। পনেরো দিন আগে আমার এই যাত্রা হয়েছিল শুরু। ব্রিটানির গোটা উপকূলভাগকে পরিক্রমণ ক'রে চলেছে একটানা পদযাত্রা। নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ মনে হচ্ছে, কোন যন্ত্রণা নেই, হালকা পা, হালকা মন। আমি শুধু হাঁটছিই।

দুশ্চিন্তাহীন সময়।···বহুদূর থেকে ভেসে আসা ধর্ম-সংকীর্তন শুনতে পাচ্ছি। সম্ভবত দল বেঁধে কারা চলেছে চার্চের দিকে, কারণ আজ রবিবার।

তারপর আমি একটি ছোট্ট অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে নিথর হ'য়ে দাঁড়াই, বিস্ময় ও পুলকে নীরব। দৃষ্টির সামনে ভাসমান পাঁচটি বিশাল মাছ ধরার নৌকা; নৌকাগুলিতে হরেক জনের জটলা—পুরুষ, স্ত্রী এবং শিশুর দল; চলেছে তারা প্লাউনেভেনের দিকে।

নৌকাগুলি চলেছে তীর ঘেঁষে, গতি মন্থর, মৃদু নরম বাতাসে পাল তেমন জোরদার নয়।···নৌকাগুলির যাত্রীরা সমস্বরে গান গাইছে; নৌকার এক ধারে দণ্ডায়মান পুরুষদের মাথায় মস্ত মস্ত টুপি, চড়া গলায় তারা বাতাস কাঁপায়; মেয়েদের কণ্ঠস্বর তীব্র তীক্ষ্ণ, তারপর শিশুদের গান পবিত্র ভাবনাকে পরিস্ফুট করে।

একই সুরে পাচটি নৌকার যাত্রীরা গান গাইছে; সেই একঘেয়ে ধ্বনি-তরঙ্গ যেন আকাশস্পর্শী। পাচটি নৌকা চলেছে একের পিছনে অপরে, ব্যবধান সামান্যই।

ওরা আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি তাদের গান শুনছি, যে গান ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে বাতাসে।

আমি সুখ-স্বপ্নে তলিয়ে যাচ্ছি, যৌবন যে স্বপ্নগুলিকে ডেকে আনে, অবাস্তব মনোহর কল্পনা সব। কত দ্রুত আমরা আমাদের স্বপ্নময় সময়টা পার হয়ে যাই, অথচ ওটাই তো একটা গোটা জীবনের একমাত্র সুসময়। এই দুনিয়ায় যে লোকের ভ্রমণের প্রবল ক্ষমতা রয়েছে, সে কখনো নিজেকে একাকী বোধ করে না, কখনো দুঃখী হয় না, কখনো তার মাথা হেঁট হয় না, সে যখন একান্ত আত্মগত, তখন সুখময় স্বপ্নের জগতে বিচরণ করে।···গুঁড়ো গুঁড়ো সোনার স্বপ্নে মোড়া জীবন কী সুন্দর!

হায়, সেই দিনগুলি আজ গত!

আমি স্বপ্ন দেখছি। কিসের স্বপ্ন? মানুষের চিরন্তন আশার, প্রত্যাশার, সম্মানের এবং নারীর। হাঁটছি, হাঁটতে হাঁটতে পাকা ফসলগুলিকে স্পর্শ করি; ফসলগুলি সঙ্গে সঙ্গে মাথা হেঁট করে, আমি শিহরিত হই, মনে হয় আমি যেন কোন জীবন্ত প্রাণীর নরম চুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছি। এক শৈলান্তরীপ

অতিক্রম করে এসময় দেখতে পেলাম, সংকীর্ণ বালুবেলার প্রান্তে দেখতে পেলাম সাদা-দেয়াল একটি বাড়ি, সমুদ্রের দিকে ঝুঁকে থাকা তিনখণ্ড ছাদের মতন সমতল ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কেন ঐ বাড়িটার দিকে চেয়ে মন আমার নেচে ওঠে? আমি তা জানি। দীর্ঘ ভ্রমণের মাঝে-মধ্যে আমরা সময় সময় এমন এক একটা জায়গায় চলে আসি, যাদের দেখলে মনে হয় বুঝি আমাদের কতকালের পরিচিত, বুকের কন্দরে সাড়া পড়ে যায়! এটা কি সম্ভব যে এর আগে আমরা কখনো তাদের দেখিনি এবং আমাদের অতীত জীবনে কখনো এখানে কিছুদিনের জন্যও বসবাস করিনি? ওদের সব কিছুই কিন্তু আমাদের মনে অনুরণন তোলে, মন আনন্দে নেচে ওঠে, শান্ত দিগন্ত চোখের সামনে ভাসে, শ্রেণীবদ্ধ গাছ-গাছালি ও মাটির রং খুব আপনার মনে হয়!

সুউচ্চ সোপানের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সুন্দর বাড়িটা। বিশাল বিশাল ফলবতী গাছগুলি ঘিরে আছে, দৈত্যের মতন তারা ঝুঁকে আছে জলের দিকে। তিনখণ্ড উঁচু সমতল ভূমিরই কিনারে কিনারে সোনার মুকুটের মতন ঘিরে আছে অজস্র প্রস্ফুটিত ফুল সহ স্প্যানিশ মাঁচা।

আমি থমকে দাঁড়াই। হঠাৎ ঐ বসতবাড়ির প্রেমে পড়ে যাই। কেন যেন আমার মনে হলো, ঐ বাড়িটা আমার চাই, আমি ওখানে বাস করবো, চিরটা কাল ওখানেই থাকবো!

ধীরে ধীরে বাড়ির দরজার কাছাকাছি এগিয়ে আসি। বাসনার তাগিদে বুক কাঁপে। সোল্লাসে দেখলাম, বাড়ির একটা স্তম্ভে বিশাল একখণ্ড কাগজ ঝুলছে, যাতে লেখা: "বিক্রয় হবে।"

এমন এক উত্তেজনা আমাকে অধিকার করে বসে, যেন মনে হয়—বসতবাড়িখানা আমাকেই দেয়া হচ্ছে, আমি এটা পেয়ে গেছি। কেন, হাঁ, কেন? আমি জানি না।

"বিক্রয় হবে!"

অর্থাৎ, এই মুহূর্তে এটা আর কারুর বিশেষ এক্তিয়ারে নেই, এই পৃথিবীর যেকোন লোক ওটার মালিক হতে পারে। মালিক হতে পারি আমি, হাঁ আমি-ই! কেন এই আনন্দ, এমন দৃঢ় প্রত্যয়যুক্ত উল্লাস? অথচ, একথা আমার ভালোই জানা ছিল, এ বাড়ি কেনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কি করে এর দাম দেবো? যাই হোক, বাড়িটা বিক্রয়যোগ্য। এই বাড়ির

মালিকের আছে খাঁচায় আবদ্ধ পাখি, আর স্বাধীন বিচরণকারী পাখিটি হচ্ছে আমার, কোন স্বাধীন পাখি তার নয়।

আমি বাগানে প্রবেশ করি। আহ! কী চমৎকার বাগান।···একেবারে শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। নাতিদীর্ঘ উপসাগরের তীরভূমি আমার পায়ের কাছে. তীরভূমি বালুময় ও বক্র, তিনটি বিশাল প্রস্তরময় পাহাড় সমুদ্র থেকে এই অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।···ঠিক বিপরীতে দুটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড প্রতিমূর্তির মতন, এত দূর থেকে মনে হয়— ওরা বুঝি নর ও নারী, স্বামী ও স্ত্রী, যেন এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তাদেরই তৈরী এই আবাসের দিকে—তারা জানে, তারা প্রত্যক্ষ করছে, দিনের পর দিন ক্ষয় পেতে পেতে একদিন এই ছোট্ট বাড়িটি হেলে পড়বে, ভাঙন শুরু হবে, তারপর একদিন একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে! বোধহয় সেইজন্যই আবাসটি বিক্রয়যোগ্য।···

আমি দরজার কড়া নাড়তে থাকি, যেন নিজের বাড়ির কপাটে ধাক্কা দিচ্ছি। বাড়ির চাকরাণী দরজা খুলে দেয়। তার বয়স হয়েছে, চেহারার মাপ ছোট, পরণে সাদা বোতাম লাগানো কালো গাউন, দেখাচ্ছে, অনেকটা কর্মরতা সন্ন্যাসীনীর মতন।

তাকে বললাম:

"আপনি ব্রিটনের মেয়ে নন?"

সে জবাব দেয়:

"না, মশাই, আমার আদি নিবাস ছিল লোরেনে।"

সে আরো বলে:

"আপনি কি বাড়ি দেখতে এসেছেন?"

"ও, হাঁ, তাই।"

এবং আমি তাকে অনুসরণ করি।

মনে হলো, এখানকার সব কিছুই আমার পরিচিত—দেয়াল আসবাব পত্র, ···শুধুমাত্র যেন অবাক হচ্ছি আমার হাঁটবার লাঠিটাকে না দেখে।

ড্রয়িং রুমের মধ্য দিয়ে চলেছি। চমৎকার কার্পেট বিছানো ঘর, বড় বড় তিনটে জানালার মধ্য দিয়ে সমুদ্রকে দেখা যায়। ধাতু নির্মিত তাকের ওপর চৈনিক কারুকাজ করা পাত্র এবং এক মহিলার বড় ছবি। আমি তৎক্ষণাৎ ঐ দিকে এগিয়ে যাই। মনে হলো, এই মহিলাকে যেন আমি চিনি। এবং

তাঁকে চিনতে পারলাম, যদিও নিশ্চিত জানা ছিল, এঁর সঙ্গে কোনদিনই আমার সাক্ষাৎ ঘটেনি! ইনিই তো সেই আকাঙ্খিতা, যাঁর জন্য আমি এতকাল প্রতীক্ষা করে আছি, যাঁকে আমি চাই, ভীষণভাবে চাই, যাঁর মুখশ্রী স্বপ্নে দেখতে পাই! তিনিই সেই নারী, যাকে সব সময় খোঁজা হয়, প্রত্যেক স্থানে যাঁর উপস্থিতি কাম্য, তাঁরই সন্ধানে পথ-পরিক্রমা, রক্তমুখী সূর্যে তাঁর অবয়ব দেখা যায়, শস্যক্ষেত্রে তাঁর উপস্থিতি, নিশ্চয় ভ্রমণ প্রাকালে হোটেলে তাঁকে আমি দেখেছিলাম, রেলের কামরায় উঠবার মুহূর্তে নিশ্চয় একটিবার তাঁকে দেখেছিলাম, দরজা খোলামাত্র এই বৈঠকখানাতেও চকিতে যাঁকে আমি দেখেছিলাম—তিনি সর্বত্র!

কোন ভুল নেই,—এই সেই মহিলা!

আমারই দিকে চেয়ে থাকা তাঁর চোখ দেখে চিনতে পারছি। চিনতে পারছি, ইংরেজদের কায়দায় সাজানো চুলের বাহার দেখে, সর্বোপরি তাঁর মুখ ও স্মিত হাসি আমার স্মৃতিকে সজাগ করে দিচ্ছে।

আমি তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞেস করি:

"কে এই মহিলা?"

সন্ন্যাসীনী চেহারার চাকরাণী জবাব দেয়:

"তিনি মাদাম।"

আমি বলি:

"আপনার মালিকিনী?"

সে মাথা নাড়ে:

"না, না।"

আমি বসে পড়লাম এবং জোর দিয়ে বলি:

"তাঁর সম্পর্কে আমায় কিছু বলুন।"

সে বিস্মিত, হতবুদ্ধি, নিথর।

আমি জিজ্ঞেস করি:

"তা হলে কি এই বাড়িটা ওঁরই ছিল?"

"না, না।"

"তাহলে বাড়িটা কার?"

"এটি আমার প্রভু মঁসিয়ে তুঁরনেলের।"

আমি আঙুল তুলে ছবিটাকে দেখাই:

"তাহলে এই মহিলা, ইনি কে ?''

"উনি মাদাম।''

"আপনার প্রভুর স্ত্রী ?''

"না, না।''

"তাহলে তাঁর কর্ত্রী ?''

কোন জবাব নেই। আমার মন এক অদ্ভুত ঈর্ষায় ভবে ওঠে। আমি ঈর্ষা করছি সেই লোকটিকে, যে প্রথম ঐ নারীকে দেখেছিল।

"তারা এখন কোথায় ?''

পরিচারিকা করুণস্বরে বলে :

"মঁসিয়ে, ভদ্রলোক রয়েছেন এখন প্যারিসে, মাদাম সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।''

আমি কেঁপে উঠি।

"ও। তাঁরা তবে আর একসঙ্গে নেই ?''

"না।''

অদম্য কৌতূহল আমায় পেয়ে বসে :

আমাকে বলুন না, কি ঘটেছিল। হয়তো আমি আপনার মালিকের কাজেও লেগে যেতে পারি। আমি এই স্ত্রীলোকটিকে চিনতে পেরেছি, তাঁর ভাগ্য ছিল খারাপ।''

বৃদ্ধা আমার মুখের দিকে তাকায়, আমার অভিব্যক্তিতে সততা খুঁজে পায়, আমাকে বিশ্বাস করে।

আঃ, কি বলবো, ঐ মেয়েমানুষটি আমার মালিকের জীবনে দুর্ভাগ্য বয়ে এনেছিল। প্রভু ওর সঙ্গে পরিচিত হন ইতালীতে এবং এমন ঘটা করে নিয়ে আসেন যেন ওকে বিয়ে করেছেন। মাদাম গান গাইতো চমৎকার। প্রভু ওর প্রেমে এমন মজে গিয়েছিলেন যে দেখলে করুণা হতো। গত বছর তাঁরা এই জিলায় বেড়াতে আসেন। এবং এই বাড়িটা আবিষ্কার করেন ; বাড়িটা তৈরী করেছিল এক মহা বোকা লোক, যে চেয়েছিল মানুষের বসতি আছে এমন শেষ গ্রামটি থেকেও অন্ততঃ মাইল পাঁচেক দূরত্বে থাকতে। মাদাম দেখেই বাড়িটা কিনতে চাইলো ; উদ্দেশ্য, আমার মালিকের সঙ্গে এখানে বসবাস করা। এবং ওকে খুশি করবার জন্য তিনি বাড়িটা কিনলেন।

গত গ্রীষ্মে তাঁরা এখানে ছিলেন ; গোটা শীতটাও এখানে কাটিয়েছেন।

তারপর একদিন সকালে প্রাতঃরাশের সময়, মঁসিয়ে আমাকে ডাকলেন।

'পেসার, তোমার মাদাম ফিরে এসেছেন ?'

'না, স্যর।'

"সারাটা দিন ধরে আমরা তার প্রতীক্ষায় রইলুম। মালিকের অবস্থা পাগলের মতন। সর্বত্র পাতি পাতি ক'রে খোঁজা হলো। কোথাও তার দেখা পেলুম না। সে হারিয়ে গেছে স্যর, জানি না—কোথায় ও কিভাবে !"

ওহ্, এই গল্প শুনে কী উল্লাস আমাকে পেয়ে বসলো ! আমার ইচ্ছা হলো, এই সন্ন্যাসীপ্রতিম বৃদ্ধাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ড্রয়িং রুমে নাচতে শুরু করে দিই।

ওহ্, তিনি চলে গেছেন, রেহাই পেয়েছেন, লোকটাকে ত্যাগ করেছেন, ওর ওপর ক্লান্ত হয়েছিলেন, বিরক্ত হয়েছিলেন। আমি খুব সুখী।

বৃদ্ধা বলে চলেছে :

"মঁসিয়ে দুঃখে একেবার ভেঙ্গে পড়লেন, আবার ফিরে গেলেন প্যারিসে, শুধু আমি এখানে আমার স্বামীর সঙ্গে রয়ে গেলাম বাড়িটা বিক্রি করে দেবার জন্য। এর দাম ধার্য হয়েছে বিশ হাজার ফ্রাঁ।"

কিন্তু আমি তার কথা শুনছি না। আমি তাঁর কথাই ভাবছি। সহসা মনে হলো, তাঁর দেখা পাবো, এই মনোহর বসন্তকালে তিনি নিশ্চয় ফিরে আসবেন এই চমৎকার আবাসে ; তিনি যে আবাসটিকে বড় ভালোবাসেন, এই কর্তাহীন বাড়িটিতে আবার তিনি ফিরে আসবেন।

আমি বৃদ্ধার হাতে জোর করে দশটি ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে একরকম জোর করে ছবিটা তুলে নিই এবং তাঁর মুখমণ্ডলে অজস্র চুমু খেতে থাকি, চুমু খাচ্ছি সেই চোখের পাতায়—যে চোখের মোহময় দৃষ্টি ছবির মধ্যেও জীবন্ত, অন্তর্ভেদী।

আমি তার দিকে চেয়ে চেয়েই আবার পথে নেমে আসি। তিনি মুক্তি পেয়েছেন, তিনি বন্ধনের মায়া কাটিয়েছেন। সন্দেহ নেই, আজ অথবা কাল দেখা তাঁর পাবোই, এই সপ্তাহ অথবা তার পরের সপ্তাহে ; তিনি বাড়ির মালিককে ছেড়েছিলেন, কারণ এবার আমার সঙ্গে তাঁর মিলনের লগ্ন উপস্থিত।

এই পৃথিবীর কোথাও না কোথাও তিনি স্বাধীন। আমি শুধু তাঁকে খুঁজে বের করবো এবং বলবো, 'আমি তোমাকে চিনি।'

ভীষণ উত্তেজনায় দুলতে দুলতে হঠাৎ পাকা শস্যের মাথাগুলি স্পর্শ করি, বুক ভরে সামুদ্রিক বাতাস নিই, আমার মন আনন্দে পরিপূর্ণ, প্রত্যাশার নেশায় বুঁদ। হাঁটছি; বড় আশা, শীঘ্রই তাঁর দেখা পাবো, তাঁকে নিয়ে আমার দিনগুলি মধুময় হ'য়ে উঠবে সেই আবাসে, যার দেয়ালে ঝুলছে বিজ্ঞাপন: "বিক্রয়যোগ্য।" তিনি কেমন আমোদ-উল্লাসে উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে উঠবেন, এই লগ্নে!

অন্তিম ভ্রমণ

[Last Excursion]

মেসার্স লাবুজ এণ্ড কোম্পানীর হিসেব আজীবন রাখতে রাখতে ক্যাশিয়ার লেভা এখন বয়স-প্রাচীন। দোকান থেকে পথে নামামাত্র আজ পশ্চিমে ঢলে পড়া বর্ণালী সূর্যের ঝলকানি এসে আঘাত করে তাঁর দৃষ্টিকে। তিনি থমকে দাঁড়ান। সারাটা দিন তাঁকে এক হলুদ বাতির সামনে প্রায়ান্ধকার এক ছোট্ট ঘরে বসে কাজ করতে হয়। ঐ দোকানের পেছনে সংকীর্ণ এক ঢালু জমির ওপর তাঁর কুঁড়ে। দরজায় এসে দাঁড়ালে গ্রামের অবারিত মাঠ নজরে আসে। গত চল্লিশ বছর ধরে একটানা তিনি এই অন্ধনিবাসেরই নিবাসী। গ্রীষ্মের খটখটে রোদ্দুর সত্ত্বেও তাঁকে অন্ধকারে বাতি জ্বালিয়ে কাজ করতে হয়।

ঘরের ভেতরটা হিম হিম, স্যাঁতসেতে, সোঁদা সোঁদা গন্ধ। ঘরের বাইরে জানালার ঠিক নিচে নর্দমার পচা কাঁদা ডাঁই হয়ে আছে, সব সময় দুর্গন্ধ। প্রতিদিন সকাল আটটায় এই নরক-কুণ্ডে তাঁর প্রবেশ। আর গোটা দিনের হিসেব মিলিয়ে এখন বেরিয়েছে এই সন্ধ্যা সাতটায়। চল্লিশ বছর ধরে চলেছে এমন ধারাবাহিকতা।

চাকুরি শুরু করেছিলেন বার্ষিক দেড় হাজার ফ্রাঁ মাইনেতে; এখন তাঁর বেতন দাঁড়িয়েছে বার্ষিক তিন হাজার ফ্রাঁতে। এই সামান্য আয়ে তো সংসার চলে না, তাই তিনি অকৃতদার। নিঃসঙ্গ নিঃস্ব জীবনে চাহিদাও খুব সীমিত। সময় সময় একটানা একঘেয়েমিতে বিরক্তি আসে, মন উদাসী হয়। কখনো কখনো পরমপুরুষের দরবারে তিনি নিজের ব্যথা প্রতিবেদন করেন:

"ঈশ্বর, আজ যদি আমার বার্ষিক আয় পাঁচ হাজার ফ্রাঁ হতো, আমার জীবনে সুখের বান ডাকতো!"

কিন্তু আয়বৃদ্ধির কোন উপায় নেই। কোন উপরি আয় তাঁর নেই। জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ তিনি দেখলেন না। নির্বিকার দিনগত পাপক্ষয়ে কোন রোমাঞ্চ নেই। উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেনি। অতি অক্ষম অলস মানুষও বৃহৎ সুখের স্বপ্ন দেখে, কিন্তু তাঁর ভেতর তেমন কোন স্বপ্নেরও অবকাশ নেই। সেই কোন কালে কুড়ি বছর বয়সে মেসার্স লাবুজ এণ্ড কোম্পানীতে ঢুকেছিলেন, তারপর থেকে বৈচিত্র্যহীন সময় বয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে কিছু কিছু পারিবারিক চিরাচরিত ঘটনা ঘটে গেছে। আঠারো শো ছাপ্পান্ন সালে দেহ রাখলেন বাবা, আর মা বিদায় নিলেন আঠারো শো উনষাটে। এরপর একদিন বাড়িওয়ালা আরো ভাড়া বাড়াবার নোটিশ দিলেন, বাধ্য হয়ে আঠারো শো আটষট্টিতে পুরনো বাড়ি ছেড়ে এই এঁদো বাড়িতে উঠে এলেন তিনি।

এই তো মোটামুটি তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

প্রতিদিন সকাল ছ'টায় কামানের গোলা ফাটার মতন বিকট হুঁশিয়ারী তুলেছে ঘড়িটা। সেই শব্দে তড়াক্ ক'রে বিছানা ছেড়ে উঠে বসেছেন। কেবলমাত্র দু'বার—একবার আঠারো শো ছেষট্টিতে, আর একবার আঠারো শো চুয়াত্তরে ঐ ঘড়িটা খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল।

সকালে উঠে গায়ে জামা গলান, বিছানা তোলেন, ঘরদোর পরিষ্কার করেন, চেয়ার-টেবিল মোছেন—এই তো তাঁর প্রাত্যহিক সাংসারিক কাজ। এই কাজগুলি করতে তাঁর ঘণ্টাদেড়েক সময় লাগে। এরপর লাম্বর রুটির দোকান থেকে রুটি কিনে খান। ঐ রুটির দোকানটির এগারোবার মালিকানা বদল হয়েছে, কিন্তু নাম ঠিক একই আছে। দিনের বাকি সময়টা কাটে অন্ধকার অফিস-ঘরে, যেখানকার দেয়ালে সাঁটা কাগজগুলিকে আজ পর্যন্ত বদলানো হয়নি। মঁসিয়ে ব্রুঁসতেঁর সহকারী হয়ে কাজে যেদিন ঢুকেছিলেন, সেদিন তাঁর মনে একটি উচ্চাশা ছিল,—একদিন তিনি এই মঁসিয়ের চেয়ারে বসবেন; ব্যস্, এর বাইরে আর কোন প্রত্যাশা তাঁর ছিল না।

প্রবহমান জীবনে মানুষ কত রকমের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, তার স্মৃতির ভাণ্ডারে জমে ওঠে হরেক রকম সুখ দুঃখের স্মৃতি, একাধিক দৈব ঘটনা, কখনো কখনো সাহসিক কাজের অভিজ্ঞতা, প্রেম ও প্রেম-বিচ্ছেদের যন্ত্রণা

ইত্যাদি। অথচ, তাঁর নিথর জীবন-দর্পণে এরা কোনদিনই ছায়া ফেলেনি। তাঁর কাছে এখন সময়ের বিবর্তন অর্থহীন, নিস্তরঙ্গ। প্রতিদিনের বৈচিত্র্যহীন কাজ তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে,—সেই ঘড়ির ডাকে তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে ওঠা, বিছানা-পত্র গুটিয়ে রাখা, লাঞ্চ খাওয়া, অফিস যাওয়া, অফিস থেকে ফিরে ডিনার খাওয়া, ডিনার খেয়ে শূন্য বিছানায় ফিরে যাওয়া। এর কোন ছেদ নেই, ব্যতিক্রম নেই। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া তাঁর ঠাকুর্দার আমলের একখানা আয়না আছে ঘরে। যৌবনে তার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চটকদার গোঁফ ও কোঁকড়ানো চুলের বাহার দেখতেন। এখনো বাড়ির বাইরে যাবার সময় সেই একই আয়নার সামনে দাঁড়ান, কিন্তু এখন তাঁর গোঁফ পেকে সাদা এবং কোঁকড়ানো চুলের বদলে বিশাল টাক সহ প্রশস্ত কপাল—ক্ষণিকের জন্য তিনি নিজের এই রূপান্তর উপলব্ধি করেন। দীর্ঘ চল্লিশটা বছর একটা দুঃস্বপ্নময় রাত্রির মতন কত দ্রুত শেষ হয়ে গেল! বাপ-মায়ের মৃত্যু ছাড়া এই দীর্ঘ সময়ে আর কোন উল্লেখযোগ্য স্মৃতি তাঁর নেই। এই দিক থেকেও তিনি অত্যন্ত রিক্ত।

কিন্তু আজ, এই মুহূর্তে, দোকানের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মঁসিয়ে লেভা ঈষৎ পুলকিত, তাঁর দু'চোখ যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে। পশ্চিম আকাশে সূর্যাস্তের উৎসব। সেই উৎসবের ছন্দ যেন তাঁকেও এসে স্পর্শ করে। এই প্রথম তাঁর মনে হলো, এখন ঘরে ফিরে গিয়ে কাজ নেই; তার চেয়ে ডিনারের আগে আমি একটু পায়চারি করবো।

খুশি খুশি মনে হাঁটতে হাঁটতে এসে গেলেন বুলভার্দে। গাছে গাছে থোকা থোকা ফুলের অপূর্ব বাহার, নিচে বয়ে চলেছে জনতার স্রোত। নতুন বসন্তের সন্ধ্যা, মন-প্রাণ সোহাগে-উল্লাসে উন্মাদ।

মঁসিয়ে লেভার হাঁটার ভঙ্গীতে নির্ঘাৎ বয়সের ক্লান্তি। কিন্তু দৃষ্টিতে সবুজ সতেজতা। মন আনন্দে ভরপুর—উষ্ণ বাতাস, প্রকৃতির স্নেহ তাঁর যাবতীয় অবসাদকে মুছে দিচ্ছে। তাঁর মনে কোথা থেকে আসছে যেন যুবকসুলভ রোমাঞ্চ, তিনি এগিয়ে চলেছেন সাঁজেলিজির মধ্য দিয়ে।

আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বর্ণময় আগুনের ছটা যেন। দিগন্তে আর্ক অ ট্রায়াম্ফি দৈত্যের মতন ঝুঁকে আছে। অতিকায় সেই স্তম্ভের পাদদেশে পৌঁছে প্রবীণ হিসাবরক্ষকের মনে হলো, তাঁর খিদে পেয়েছে। দ্রুত ঢুকে পড়লেন এক রেঁস্তরায়।

খেতে বসে তিনি পেলেন ভেড়ার পালের খুরের শব্দ। ঐ শব্দ তাঁর কাছে এখন খুবই শ্রুতিমধুর। শাক-সব্জির সঙ্গে চাটনি দিয়ে খেতে লাগছেও চমৎকার। এরপর খানিকটা ক্লারেতও * পান করলেন। এরপর অভ্যাস মতন এক কাপ কফি ও এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি।

বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে। নিজেকে বেশ হালকা ঝরঝরে মনে হচ্ছে। নিজেকেই নিজে বলেন, "কি সুন্দর রাত একটা। বয় দ্য বুলন অব্দি হেঁটে যেতে আমার আদৌ কষ্ট হবে না।"

হাঁটতে শুরু করলেন। অনেকদিন আগে তিনি এক প্রতিবেশিনীর মুখে গান শুনেছিলেন, এখন আবছা আবছা তা মনে আসছে, আপন মনে গুনগুনিয়ে উঠলেন :

"গাছেরা সব সবুজে সবুজ
প্রিয়া আমায় হাতছানি দেয়,
মিলনে মোরা উষ্ণ হবো
চলো গো ঐ বনের ছায়ায়।"

এই দুটি মাত্র কলি বারবার ভাঁজতে থাকেন। ক্রমশ নামছে আঁধার, নিরঙ্কুশ নিথর রাত।

তিনি বয় দ্য বুলনের মোড় পার হচ্ছেন। সারি সারি চলন্ত গাড়ির আলো তাঁকে আকর্ষণ করছে। হঠাৎ চোখে পড়লো, একটা গাড়ির মধ্যে একজন পুরুষ ও একজন নারী জড়াজড়ি করছে। পুরুষটির পরণে কালো পোশাক, আর নারীর দেহে পোশাকের স্বল্পতা। আহ, এই রাতে অসংখ্য তারকাদের নিচে যুগলবন্দী প্রেমিকরা। সব চলেছে পর পর। একজন অপর-জনকে জড়িয়ে ধরে স্বপ্ন দেখে। চুম্বনে-চুম্বনে রাতের পরিবেশ গরম ক'রে তোলে। ওদেরই শরীর ছুঁয়ে আসছে বলে বাতাস এত উষ্ণ। সেই উষ্ণ বাতাস আর সব মানুষের মনে রং ধরাচ্ছে।···

সুখকর শ্রান্তি এসে অধিকার করে লেভাকে। তিনি পথের পাশে একটি বেঞ্চে বসে পড়েন ; বসে বসে ভালোবাসার গাড়িগুলিকে লক্ষ্য করেন। ঠিক তখন, হঠাৎ, কোথা থেকে এক মহিলা এসে তাঁর পাশে বসে পড়ে।

বসেই সেই মহিলা সোহাগপূর্ণ গলায় ডাকে, "হ্যালো, ডার্লিং।"

লেভা বিস্ময়ে হতবাক, মুখে রা-টি নেই।

---

* ক্লারেত=এক ধরনের ফরাসী মদ।

মেয়েটি গলার স্বর অপরিবর্তিত রেখে বলে, "এসো, আমি তোমাকে একটু আদোর করি। দেখবে, এতে কত সুখ!" তিনি বিব্রত গলায় বলেন, "মাদাম, আপনি লোক চিনতে ভুল করেছেন !...."

মেয়েটি কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর একখানা হাত ধরে ফেলেছে, হাতের তারায় আঙুলের বিলি কাটতে কাটতে বলে, "বাধা দিয়ো না শোন, আমি তোমায় অঢেল আনন্দ দেবো, এসো, কাছে এসো..."

আপ্রাণ চেষ্টায় মন শক্ত করে লেভা উঠে দাঁড়ান, হাঁটতে শুরু করেন। কিন্তু এক শ' গজ যেতে না যেতেই আর একটি মেযের পাল্লায়।

"হ্যালো, এসো আমার সঙ্গে বসবে চলো।"

মেয়েটি আবেদন জানায়।

তিনি এবার থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা, তোমরা এ ধরনের জীবিকাকে বেছে নিয়েছো কেন?"

মেয়েটি কিন্তু তাঁর পথ থেকে সরে দাঁড়ায় না, কর্কশ স্বরে বলে, "নিশ্চয় নিছক ফূর্তি করবার জন্য নয়।"

লেভার স্বর শান্ত, "তবে কেন?"

"তাও বলে দিতে হবে? পেটের জন্য, বুঝলে?"

ঠোঁট বাঁকিয়ে গানের একটি কলি ভাঁজতে ভাঁজতে মেয়েটি চলে যায়।

মঁসিয়ে লেভা স্তম্ভিত। যেতে যেতে আরো কয়েকটি মেয়ের ইশারা পেলেন তিনি। মনে হচ্ছে, মাথার মধ্যে অসম্ভব ভারী কি একটা বস্তু বয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি। আবার একটি বেঞ্চে বসে পড়লেন। গাড়ির স্রোত এখনো সমানে প্রবহমান। তিনি ভাবলেন,—আমার এখানে আসাটা ঠিক হয়নি। মাথার ভেতরটা ঝিম ঝিম করছে।

কিন্তু থেকে থেকে প্রেমের ছবিগুলি তার মগজে হাতুড়ি পিটতে থাকে। বৈধ অথবা অবৈধ ভালোবাসা, স্বতঃস্ফূর্ত অথবা পয়সার বিনিময়ে পাওয়া শরীরে শরীরে মাখামাখি ও চুম্বন-বৃষ্টি,—তাঁর চোখের সামনে কেবলই ভেসে ভেসে আসছে।

প্রেম, ভালোবাসা!

না, এদের সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণাই নেই। তাঁর কাছে নারীর প্রেম তো এক ধরনের বিলাসিতা এবং সেই বিলাসিতা উপভোগ করবার মতন সঙ্গতি তাঁর কোন কালেই ছিল না। সারা জীবনে দৈবাৎ দু' চারজন মহিলার

সঙ্গে বাক্যালাপ করেছেন মাত্র, অন্তরঙ্গ হতে সাহসী হননি। সমাজের আর পাঁচজন লোকের মতন স্বাভাবিক সুখের জীবন তো তাঁর নয়। তাঁর দিনগুলি একঘেয়ে, বিষাদময় ও নিস্তরঙ্গ।

তাঁর মতন হতভাগ্য লোক এই পৃথিবীতে কিছু কিছু আছে। মঁসিয়ে লেভা এখন এখানে বসে বসে তাঁর মরুপ্রায় জীবনের মূল্যায়ণ করছেন। শুধুই শূন্যতা, নিঃসীম শূন্যতা। জীবনের শেষ দিনটিও তাঁর কাছে প্রথম দিনটিরই মতন অর্থহীন বিষাদ বয়ে আনবে—এটা অনিবার্য, এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া তাঁর সম্ভব নয়।

এখনো গাড়িগুলি ছুটছে। ছুটবেও গোটা রাত ধরে। ঐ তো দেখা যায়, পুরুষ ও নারী কেমন নিবিড় সুখে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আছে। আহ্, কী গভীর সুখ ওদের,—সুখ—সুখ—অঢেল সুখে দুনিয়াটা মাতাল। একমাত্র তিনিই এখানে নিঃস্ব, লোভী উপবাসী চোখে চেয়ে আছেন। এই একাকীত্ব অসহ্য। আগামী দিনগুলি, যতদিন তিনি বাঁচবেন এই নিঃসঙ্গতা ও বিষাদ তাঁকে ত্যাগ করবে না। পৃথিবীতে তাঁর মতন হতভাগ্য আর কে ?

আর কেন এখানে বসে থাকা ?

কেন ? তাঁর তো আপন বলতে কেউ নেই। এই পড়তি বয়সে মানুষ ঘরে ফিরে কচি-কাঁচা বাচ্চা-কাচ্চাদের কলকাকলি শুনতে কত না ভালোবাসে ! সন্তান-সন্ততিরা ঘিরে আছে, আর বুড়োর চুলগুলি দিনের পর দিন সাদা হয়ে যাচ্ছে,—কি চমৎকার অনুভূতি ! মন সেই রকম পরিবেশ চায়, ভালোবাসা চায়, বাচ্চাদের আবোল তাবোল প্রশ্ন শুনতে চায়···।

আর তাঁর জন্য কি অপেক্ষা করছে ? অপেক্ষা করছে এক ভয়াবহ নির্জন কুঠুরি, জীবনের অধিকাংশ রাত যেখানে তিনি শূন্য বিছানায় ছটফটিয়ে কাটিয়েছেন ! অফিস ঘরটার চেয়েও তাঁর ঐ আবাস-ঘরটি বেশি খারাপ ও মর্মান্তিক। ও ঘরে তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোন লোকের আবির্ভাব ঘটে না।

কারুর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয় না। সেখানে মৃত্যুর থমথমানি। যেন একটা নোংরা জলে পূর্ণ ডোবা, যার কোন স্মৃতি নেই।

সেই মৃত্যুপুরীতেই তাঁকে ফিরে যেতে হবে, প্রাত্যহিক কাজগুলি সারতে হবে, সেই বিছানা পাতা, শুয়ে পড়া, ঘড়ির বিকট হুঁশিয়ারী···ইত্যাদি ইত্যাদি সব সরল, অথচ অতি ভয়ঙ্কর কার্যকলাপ।

মুক্তি চাই! এর হাত থেকে মুক্তি চাই!! ছটফটিয়ে উঠলেন লেভা। বয়-এর এক নম্বর পথ ধরে হন্‌হনিয়ে এগিয়ে চললেন একটা ছোট্ট ঝোপের দিকে। সেখানে পৌছে ঘাসের ওপর পা বিছিয়ে বসলেন।

মাথার ওপর বিশাল আকাশ। বাতাসে ভেসে আসছে হাজার জনের কলকলানি। কিন্তু তাঁর মনে হচ্ছে, তিনি যেন শুনছেন, কার হৃদয়বিদারক হাহাশ্বাস!

আবার সূর্য পশ্চিমে। অদ্ভুত আলো চরাচরে। আবার শুরু হয়েছে দুটি একটি গাড়ির আনাগোনা। একদল অশ্বারোহী মনের আনন্দে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

নববিবাহিত একজোড়া স্বামী-স্ত্রী রাস্তার জনবিরল দিকে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলো। হঠাৎ একটা ঝোপের ওপর গাছের ডালে নজর পড়তেই যুবতীর সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে, আর্তস্বরে বলে ওঠে, 'ওকি! ওটা কি ওগো?'

বলেই সে সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে যায় তার স্বামীর গায়ের ওপর। লোকটা তার হতচেতন দেহ ধীরে ধীরে শুইয়ে দেয় মাটির ওপর।

খবর পেয়ে পুলিশের দল আসে। গাছের ওপর থেকে নামিয়ে আনা হলো এক বৃদ্ধের জীর্ণ দেহ। প্যাণ্ট ছিঁড়ে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছেন!

মৃতদেহ পরীক্ষা করে জানা গেল, গত রাত্রে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। তাঁর পকেটে পাওয়া কাগজ পত্রগুলি সনাক্ত করলো—এই ভদ্রলোক ছিলেন মেসার্স লাবুজ এণ্ড কোম্পানীর হিসাবরক্ষক। নাম লেভা।

মৃত্যুর কারণ আত্মহত্যা। কিন্তু কেন এই আত্মহনন? সাময়িক মানসিক বৈকল্য?

ক্ষমা

[Forgiveness]

পৃথিবীর তাবৎ উত্তেজনার আগুন থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থানকারী এক পরিবারের সদস্যা সে।

রাজনীতি-টাজনীতি নিয়ে তারা কখনো হৈ-হুল্লোড় করে না। তবে খাবার টেবিলে বসলে কিছু না কিছু নিয়ে আলোচনা হবেই। কিন্তু

আলোচনার বিষয়বস্তু বেশিরভাগই অতীত নিয়ে, ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে,—সুদূর অতীতে কি ভাবে এক রাজশক্তির পতন হয়েছিল, কেমন করে বিপ্লবের কালে সম্রাট ষোড়শ লুই নিহত হলেন, কিংবা ভুবন-বিখ্যাত নেপোলিয়ন কি ভাবে একটির পর একটি যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন ইত্যাদি।

অথচ, আধুনিক সমাজে যে দ্রুত বিবর্তন চলেছে, সে দিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। তারা আঁকড়ে ধরে আছে অতীতকে, অতি পুরাতন ঐতিহ্যকে। তাদেরই এলাকাতে যদি কখনো অঘটন ঘটে, তারা তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। বর্তমানের কেলেঙ্কারিকে তারা সযত্নে এড়িয়ে চলে।

কখনো কখনো সন্ধ্যাবেলায় বাড়ির কর্তা ও কর্ত্রী একা থাকলে, নিজেদের মধ্যে এ রকম দু'চারটে সাম্প্রতিক ঘটনার আলোচনা করে থাকে। তখন তাদের স্বর খুব চাপা। যেন কি ভয়ে ভয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে কথা বলছে।

কর্তার স্বর হয়তো তখন খুব চিন্তান্বিত, "বিভোল পরিবারে কি ভয়ানক ঘটনা ঘটে গেছে, জানো?"

গিন্নীর জবাব, "জানি। বিশ্বাস করা কষ্টকর। কী সাংঘাতিক!"

ছেলে মেয়েরা নির্বিকার। তাদের মনে ভাবনা-সন্দেহ নেই। তাদের জগৎ সীমিত। শুধু নিজেদের নিয়েই তারা ব্যস্ত, দুনিয়ার আর কিছু নিয়েই তারা ভাবিত নয়। মানুষ নামক জীবটি যে অতি জটিল এবং সব সময়ই যে তারা যা বলে, তাই করে, তা নয়,—এ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে যে লড়াই করতে হয়, এমনকি আত্মরক্ষার জন্য কখনো কখনো সশস্ত্র থাকাও দরকার,—এ জ্ঞান তাদের হয়নি। তারা জানতো না যে, সোজা-সরল মানুষরা এই পৃথিবীতে পদে পদে ঠকে, প্রতারিত হয়; নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার বদলে তাচ্ছিল্য লাভ আশ্চর্যের নয়; সৎ ও ভালো লোকের প্রায়শই ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটে থাকে।

অথচ এই পরিবারের প্রতিটি সদস্য অতিমাত্রায় ভালোমানুষ, সৎ, স্পষ্টবাদী, অর্থাৎ বর্তমান যুগ সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণই অন্ধ। আর কোন দিনই হয়তো তাদের চোখ ফুটবে না।

এমনই এক পরিবারের অষ্টাদশী সুন্দরী বার্থের বিয়ে হলো প্যারিসের ছেলে জর্জ ব্যারন সেভি জেঁালসের সঙ্গে। জর্জ স্টক এক্সচেঞ্জের ব্যবসায়ী। বয়সে তরুণ, আচার-ব্যবহারে রীতিমত আকর্ষণীয়। ভদ্র মিষ্টি ভাষায় কথা বলে সে সকলকে মুগ্ধ করতে পারে। সামাজিক আদব-কায়দায় সে কেতাদুরস্ত কিন্তু মনে মনে সে তার সরল শ্বশুর শাশুড়িকে বোকা ও অপাংক্তেয় ভাবে। ইয়ার দোস্তদের সঙ্গে আড্ডায় বসে সে তাদের সম্পর্কে টিপ্পনী কাটে, "ওরা হলো একজোড়া অতীতকালের ভূত, অবশ্য আমার প্রিয়।"

ব্যারনের পারিবারিক সুনাম আছে, তার চেয়েও বড় কথা,—ওদের পয়সার অভাব নেই।

বিয়ের পর ঘটা করে নববধূকে নিয়ে ফিরলো প্যারিসে। সেখানে অজস্র মানুষের ভিড়ে হতচকিতা বার্থে, স্বভাব অনুযায়ী সে নিজেকে এক কোণে গুটিয়ে রাখে। জীবনের রহস্য, প্রতারণা সে বোঝে না, জানে না নাগরিক জীবনের আদব কায়দা, হৈ-হুল্লোড়, আমোদ-ফূর্তি।

তার পরিচিত জগতের পরিধি ছিল মাত্র তাদের বাড়িটি, বাড়ির সামনে নির্জনপ্রায় পথটি। সেই বাড়ি ছেড়ে সে যখন রওনা দিয়েছিল, তখন তার মনে হচ্ছিলো—সে কোন সুদূর, অজ্ঞাত, বিচিত্র এক দুনিয়ায় পাড়ি জমাচ্ছে।

বছরে দু'-তিন দিনের বেশি স্বামী তাকে থিয়েটারে নিয়ে যেত না; কিন্তু ঐ দু'-তিন দিনের স্মৃতিই ছিল তার কাছে অবিস্মরণীয়। এ যেন রূপকথা! ঐ নাটকের স্মৃতি তার মনকে বিভোর করে রাখতো। হয়তো নাটক দেখার তিনমাস পরে খাবার টেবিলে বসে হঠাৎ সে স্বামীর দিকে চেয়ে খিল খিল করে হেসে উঠেছে, "মনে আছে সেই অদ্ভুত অভিনেতার কথা, যে মুরগীর ডাক নকল করেছিল?"

বাইরের জগতের লোক বলতে সে চিনতো প্রতিবেশী দু'চার জনকেই, যাদের প্রতি তার সম্ভ্রমের অন্ত ছিল না, যাদের নাম প্রতিবার উচ্চারণ করবার য় সে 'মাননীয়' বা 'মাননীয়া' বিশেষণটি জুড়ে দিত; যেমন, 'মাননীয় মারভিনেতম্' কিংবা 'মাননীয়া মিকেলিতস্'।

স্বামীটি কিন্তু স্বাধীন, চলেছে প্রাক-বিবাহিত জীবনের জের টেনেই। যখন

ইচ্ছে বাড়ি থেকে বের হতো, যখন ইচ্ছে ফিরে আসতো ; কখনো কখনো ব্যবসায়িক কাজকর্মের দোহাই দিয়ে রাত কাটাতো বাইরে। স্ত্রীর মতামতের আদৌ পরোয়া করতো না সে। স্ত্রীর সরল মানসিকতার পূর্ণ সুযোগ নিতে কসুর করেনি সে।

এমন সময় বার্থের নামে একটা উড়ো চিঠি এলো। কে একজন লিখেছে, বার্থে নাকি তার স্বামীর দ্বারা সাংঘাতিকভাবে প্রতারিত! চিঠিটা পড়ে বার্থের মনে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

সে ঐ পত্রলেখককে ঘৃণা করছে, আবার স্বামীর প্রতি সন্দেহে মন ও শরীরও ভেঙ্গে পড়ছে। সে অনুধাবন করতে পারলো, গত দু'বছর ধরে তার স্বামী মাদাম রোসেত নামে এক কমবয়সী বিধবার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। ওর বাড়িতেই মাঝে-মধ্যে রাত কাটাতে যায় সে !

বার্থে স্ত্রীসুলভ ছলাকলায় অভ্যস্ত নয়। স্বামীর ওপর গোয়েন্দাগিরি করার প্রবৃত্তি তার নেই। সরাসরি খাবার টেবিলে বসা স্বামীর দিকে চিঠিটা ছুঁড়ে মারে। তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যারণের কিছুক্ষণ সময় লাগলো। মনে মনে স্ত্রী-ভোলানো পরিকল্পনা এঁটে স্ত্রীর ঘরের দরজায় গিয়ে ঘা দিতে শুরু করে। বার্থে দরজা খুলে দেয়, অভিমানী দৃষ্টি তার অন্যদিকে। ব্যারণ হাসতে থাকে, হাসতে হাসতে বার্থেকে জড়িয়ে ধরে, এক রকম জোর করে তাকে টেনে নিয়ে যায় বিছানায়, মোলায়েম পরিহাসের গলায় বলে, "লক্ষ্মী প্রিয়া আমার, তুমি এত অল্পেতেই আমাকে ভুল বুঝলে ?···হাঁ, একথা সত্যি, মাদাম রোসেতের সঙ্গে আমার অনেক দিনের পুরনো বন্ধুত্ব, আমাদের পরিচয় দশ বছরের ওপর। কিন্তু এই অন্তরঙ্গতা অত্যন্ত নির্দোষ। আর দেখ, এরকম আরো অন্তত গোটা কুড়ি পরিবারের সঙ্গে আমার দহরম মহরম আছে। ওদের কথা তোমাকে কোনদিন বলিনি ; কারণ আমি জানতাম, এসব সম্পর্কে তোমার কোনদিনই আগ্রহ নেই। কিন্তু তাই বলে, এই ধরনের কুৎসা ! ছিঃ ছিঃ ! না, না, এরকম ভুল বোঝাবুঝি চলতে দিতে পারি না। খাওয়া-দাওয়া সেরে তুমি তৈরী হ'য়ে নাও, আজই আমি মাদাম রোসেতের সঙ্গে তোমার পরিচয়

করিয়ে দেবো। তোমার নিজেরও ভালো লাগবে, তুমি একজন মনমতো নতুন বান্ধবী পেয়ে যাবে।”

স্বামীর স্তোকবাক্যে বার্থের মন গলে যায় ; গভীর আবেগে স্বামীকে আঁকড়ে ধরে চুমু খায়। মাদাম রোসেতের সঙ্গে পরিচিত হতে তার তখন অদম্য কৌতূহল। স্বামীর মুখে সব শুনবার পরও বুকের মধ্যে একটা কাঁটা খচ্ খচ্ করছে ; মাদামের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে সে সেই কাঁটাটাকে চিরদিনের মতন তুলে ফেলতে চায়।···

চৈনিক সজ্জায় সজ্জিত সুন্দর একটা বাড়ির তিনতলার একটি ঘরে তারা প্রবেশ করে। সেই ড্রইংরুমের জানালায় ঝুলছে অপূর্ব সব পর্দা, সূর্যের আলো যেন রঙিন হয়ে আছড়ে পড়ে এ ঘরের মেঝেতে। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষার পর সে এলো। বয়সে যুবতী, গায়ের রং অভাবনীয় কালো, ছোট-খাটো দেহের গড়ন। হাসি হাসি মুখ, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বিস্ময়।

জর্জ পরিচয় করিয়ে দেয়, “এ হচ্ছে আমার স্ত্রী ; আর উনি মাদাম জুলি রোসেত।”

আনন্দে-উল্লাসে রোসেত শব্দ করে ওঠে, বার্থের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসে। সেই আনন্দ স্পর্শ করে বার্থেকেও। জর্জ একে বোনের মত ভালোবাসে। আর সে জর্জের স্ত্রী বলেই তো তার এত কদর! বার্থের খুব ভালো লাগছে! খুব!

মাসখানেকের মধ্যেই দুই যুবতীর মধ্যে প্রগাঢ় হৃদ্যতা। দিনে অন্ততঃ দু'বার তাদের মুলাকাৎ হবেই। প্রায়ই রাতে তারা একসঙ্গে খানা-পিনা করে। দু' তরফ থেকেই আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ লেগেই আছে। জর্জ আজকাল আর বাইরে বিশেষ রাত কাটায় না। বান্ধবীটি তো এখন তার হাতের কাছেই। এখন তার বক্তব্য,—'বাড়িতেই ভালো। চুল্লির ধারে বসে থাকতে আরাম তো খুব।”

এমন সময় মাদাম রোসেতের আবাস-সংলগ্ন একটি ফ্ল্যাট বাড়ি খালি হলো। ব্যারণ-গিন্নী নিজের উৎসাহে এ ফ্ল্যাটটি ভাড়া নিয়ে বসে ; উদ্দেশ্য, তার প্রাণের বান্ধবীর সাহচর্য লাভ।

দু'বছর চললো তাদের দহরম-মহরম। এমন বন্ধুত্ব যেন আর হয় না। বার্থে কথা বলতে গেলেই জুলির কথা উল্লেখ করে,—জুলির মতন মেয়ে আর

হয় না, ফুলের মতন পবিত্র মেয়ে। কোন দুশ্চিন্তা নেই, উদ্বেগহীন জীবন-প্রবাহে তারা সকলেই সুখী।

কিন্তু এমন দিন বেশিদিন রইলো না।

মাদাম রোসেত হঠাৎ একদিন অসুস্থ হয়ে পড়লো। অজানা রোগ। বার্থের চোখে ঘুম নেই, সব সময় বসে আছে বান্ধবীর শিয়রে। দুশ্চিন্তা ও হতাশায় ভেঙ্গে পড়ছে সে। জর্জ নিজেও কম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নয়। ডাক্তার এলেন। রোগিণীর অবস্থা দেখে মুখ তাঁর গম্ভীর। জর্জ আর বার্থেকে কাছে ডেকে নিয়ে বলেন, "দেখুন, ভদ্রমহিলার অবস্থা আমার খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না।"

ডাক্তার চলে গেলেন। বেদনাহত, স্তম্ভিত স্বামী ও স্ত্রী কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থাকে। তারপর উদ্গত বেদনা আর চেপে না রাখতে পেরে দু'জনেই ডুকরে কেঁদে ওঠে। রোসেতের শিয়রে বসে রাত জাগলো দু'জনেই।

বার্থে আপ্রাণ ব্যাকুলতায় আদোর করছে তার মরণাপন্ন বান্ধবীকে। জর্জ রোগিণীর পায়ের কাছে নিথর হ'য়ে বসে লক্ষ্য করছে এই দুই বান্ধবীকে। পরের দিন মাদাম রোসেতের অবস্থার আরো অবনতি হলো।

কিন্তু সন্ধ্যার দিকে মাদাম রোসেতই জানালো, অন্যান্য দিনের তুলনায় সে নাকি আজ অনেকটা সুস্থ বোধ করছে। এক রকম জোর ক'রে সে এই দম্পতিকে বাড়ি পাঠিয়ে দিল।

ঘরে ফিরে খাবার টেবিলের সামনে বসে তারা দু'জনে। ভীষণ অবসাদ ও বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন দু'জন। খাবারে তাদের অরুচি। প্রায় কিছুই মুখে তুললো না। ঠিক সেই সময় বাড়ির ঝি জর্জের হাতে একখানা চিঠি এনে দেয়। চিঠি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে বিষণ্ণ জর্জের মুখ আরো কালো ও ফ্যাকাশে হ'য়ে ওঠে।

কোন রকমে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, ভাঙ্গা স্বরে বলে, "বার্থে, কিছু মনে করো না, তোমায় কিছুক্ষণ একা রেখে আমাকে বের হতে হচ্ছে। দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসবো। তুমি কিন্তু লক্ষ্মীটি কোথাও যেও না।"

—বলেই টুপি আনবার জন্য অন্য ঘরে চলে গেল জর্জ।

বার্থে প্রতীক্ষা করছে। তার স্বামী দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসবে। এই সময়টুকু সে নিশ্চয় এখানে নিশ্চল হয়ে বসে বসে অপেক্ষা করবে।

—কিন্তু স্বামী তো আসছে না। সময়সীমা পেরিয়ে গেল। বার্থে কৌতূহল-বশতঃ তার স্বামীর ঘরে প্রবেশ করে। আশ্চর্য, জর্জ তো তার দস্তানা জোড়া নিয়ে যায়নি ; অথচ কোথাও বাইরে গেলে সে ঐ দস্তানা জোড়া সঙ্গে নেবেই। হঠাৎ নজরে এল একটা দলাপাকানো কাগজ পড়ে আছে বিছানার ওপর। কাগজটা দেখেই বার্থে চিনতে পারলো, একটু আগে বাড়ির ঝি এটাই তার স্বামীর হাতে দিয়ে গিয়েছিল। জীবনে এই প্রথম বার্থের মানসিকতা কিছুটা জটিল হ'য়ে ওঠে। এই প্রথম গোপনে অপরের চিঠি পড়তে উৎসাহী হ'য়ে উঠলো সে। বিবেক অবশ্য বাধা দিচ্ছে, নিজের সঙ্গে যেন রীতিমত লড়াই করছে বার্থে। শেষ অব্দি তার হাত এগিয়ে এল, খামচে ধরলো কাগজ-খণ্ডকে, চোখের সামনে মেলে ধরতেই দেখলো, পেন্সিলে জুলির আঁকা বাঁকা লেখা :

"প্রিয়তম, একটিবার এসো ; এসে আদরে আদরে আমায় ভরিয়ে তোল। আমার যে মৃত্যু ঘনিয়ে এল।"

চিঠি হাতে বার্থে নিথর। তার মুখ চোখ ভাবলেশহীন। কিছুক্ষণ তার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। তারপর হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতন ঐ চিঠির মর্মান্তিক সম্পর্ক তার মগজে আঘাত হানে। সে বুঝতে পারছে। সমস্ত রহস্য এই মুহূর্তে তার কাছে জলের মতন স্বচ্ছ। দিনের পর দিন তার সরলতার সুযোগে কী জঘন্য চক্রান্ত, কী ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতাই না গড়ে উঠেছে। সে বড় সাংঘাতিকভাবে প্রতারিত। তাকে কেমন ফাঁকি দিয়ে জুলি আর জর্জ তাদের অবৈধ মেলামেশাকে বজায় রেখেছে। বার্থে যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছে,—দিনের পর দিন নিরালায় জুলি আর জর্জ কেমন একে অপরের ঘনিষ্ঠতা উপভোগ করছে। আজ মনে পড়ছে, বই পড়তে পড়তে জর্জ ও জুলি কেমন মোহ-মদির দৃষ্টিতে একে অপরকে লক্ষ্য করতো।

অভিমানে, ঘৃণায়, বিতৃষ্ণায় বার্থে থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে। অসহ্য যন্ত্রণায় নীল হয়ে যাচ্ছে সে। অতলস্পর্শী হতাশায় ডুবে যাচ্ছে সে। হঠাৎ কার পায়ের শব্দ ভেসে আসতেই বার্থে ছুটে গিয়ে নিজের ঘরে খিল তুলে দিল।

দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে ব্যস্ত গলায় জর্জ বলতে থাকে, "বার্থে, শিগগির এসো, মাদাম রোসেতের অন্তিমকাল ঘনিয়ে এসেছে।"

বার্থে দরজা খুললো ঠিকই, কাঁপা গলায় বললো, "তুমিই যাও। আমার যাবার কি দরকার ?"

জর্জ চমকে ওঠে। বিস্মিত চোখে সে বার্থের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর আবার উচ্চারণ করে, "একটুও দেরী করো না। ও মারা যাচ্ছে।"

বার্থে বলে, "যদি ওর বদলে আমি মারা যেতাম, নিশ্চয় খুব খুশী হতে।"

তার এই কথায় জর্জ বুঝতে পারে, এই অন্তিম মুহূর্তে সমস্ত রহস্যই ফাঁস হয়ে গেছে। জর্জ তখন একাই গেল জুলিকে দেখতে।

মাদাম রোসেতের দিকে চেয়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে জর্জ। আজ থেকে সে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেল। ঘরে-বাইরে তার জন্য কেউ রইলো না। তার স্ত্রী তো আর কোনদিনই তাকে আপন ভালোবাসার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারবে না। আবার মাদাম রোসেতের মতনও কেউ রইলো না, যে তাকে দু' দণ্ড শান্তি দিতে পারে।

তবু তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবেই একসঙ্গে ঘর করতে থাকে। প্রাত্যহিক জীবন-যাপনের যে আপাতঃ ছন্দ, তা থেকে তারা বিচ্যুত হলো না। কিন্তু মনের দিক থেকে তারা এখন দুই পৃথক মেরুর বাসিন্দা। একটা বছর এমনি তিক্ততার মধ্যে কেটে গেল। তারা দু'জন দু'জনের প্রতি এখন এমন ভাব দেখায়, যেন কেউ কাউকে চেনে না। নিঃসঙ্গতার অমানুষিক জ্বালায় বার্থে প্রায় ক্ষিপ্ত। এই দুর্বিসহ জীবনের জোয়াল সে আর টেনে বেড়াতে পারছে না।

একদিন খুব সকালে বার্থে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। ফিরে যখন এল, দেখা গেল তার হাতে একটি মস্ত শ্বেত গোলাপের তোড়া।

অনেকাল পর আজ সে স্বেচ্ছায় তার স্বামীর সঙ্গে কথা বললো। তার স্বরে দুঃখ আছে, উদ্বেগ আছে, সহানুভূতি আছে।

বার্থে বললো, "চলো, আজ আমরা একসঙ্গে বেড়াতে যাই।"

জর্জ ব্যারণ হতবাক।

বার্থে আবার বলে, "তুমি এই ফুলের তোড়াটা আমার হাত থেকে নাও। অত ভারি আমি বইতে পারছি না।" তোড়াটা নিয়ে জর্জ তার স্ত্রীকে অনুসরণ করে। অপেক্ষমান একটা ঘোড়ার গাড়িতে তারা চেপে বসে। গাড়ি ছুটতে থাকে।

গাড়ি থামলো এসে এক সমাধিক্ষেত্রে।

ভেজা চোখে কাঁপা গলায় বার্থে তার স্বামীকে বলে, "আমাকে তার কবরের কাছে নিয়ে চলো।" জর্জের শরীর রোমাঞ্চিত। সে বুঝতে

পারছে না, তার হাত-পা কেন কাঁপছে। কোন রকমে ফুলগুলি আঁকড়ে ধরে সে এক মার্বেল পাথরে গড়া সমাধির কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। মুখে কোন কথা না বলে শুধু আঙুল তুলে দেখায়।

বার্থে স্বামীর হাত থেকে তোড়াটা নেয়, সেটা সযত্নে সাজিয়ে রাখে সমাধির ওপর, তারপর নতজানু হয়ে ধ্যানের অতলান্তে তলিয়ে যায়।

পিছনে দাঁড়ানো জর্জের দু'চোখে তখন জল।

বার্থে উঠে দাঁড়ায়; ঘুরে তাকায় তার স্বামীর মুখের দিকে; প্রীতিকর উষ্ণতায় দুই হাত বাড়িয়ে উচ্চারণ করে:

"তোমার যদি আপত্তি না থাকে, আজ থেকে আমরা পরস্পরের বন্ধু!"

মুসাফিরের কাহিনী

॥ এক ॥

ক্যানাস থেকে মাল-পত্তরে, যাত্রী-সাধারণে গাড়ি একেবারে ঠাসা। গাড়িতে যারা উঠেছে, তারা একে-অপরকে চেনে, গল্প-গুজবে মেতে উঠতে তাই তাদের কোন বাধা নেই। গাড়ি যখন তারাসকন এলাকা পার হচ্ছে, হঠাৎ একজন বলে ওঠে, "এই জায়গাতেই সেই বিখ্যাত খুনটা হয়েছিল!"

সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা তার গতি বদলায়,—সকলেই এখন সেই খুনের প্রসঙ্গে আলোচনা রত।

জায়গাটা ভয়ানক। গত দু'বছর ধরে এই জায়গায় অনেক ভ্রমণকারী প্রাণ হারিয়েছেন। অথচ, তাঁদের একটি খুনেরও আজ অব্দি কিনারা হয়নি। খুবই রহস্যময়!...

যে যার মতে কথা বলে যাচ্ছে, খুনগুলি সম্পর্কে নিজের নিজের সিদ্ধান্ত জানাচ্ছে। মেয়েদের আতঙ্ক স্বভাবতই বেশি, জানালার মধ্য দিয়ে অন্তহীন অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে; প্রতিক্ষণে তাদের ভয়, এখনই বুঝি কোন কিম্ভূতকিমাকার মুখ উঁকি মারবে দরজা দিয়ে! আর পুরুষরা সমানে বকর

বকর ক'রে চলেছে। কে কবে একদল ডাকাতের মুখোমুখি হয়েছিল, চলন্ত ট্রেনে কবে এক ভয়ানক পাগলের আবির্ভাব ঘটেছিল, ছুটন্ত গাড়িতে রহস্যময় পুরুষের মুখোমুখি বসে থাকার অস্বস্তি ইত্যাদি সব গল্প। সকলেই চায়, তার গল্পটি যেন অন্য সকলের গল্পকে টেক্কা দিতে পারে! গল্পের কারিকুরিতে নিজের নিজের সাহস ও বুদ্ধির কথাই জাহির করতে চাইছে তারা।

এই গাড়িতে একজন ডাক্তার আছেন; প্রত্যেক শীতে তিনি দক্ষিণে বেড়াতে আসেন; তিনিও এবার তাঁর অভিজ্ঞতার গল্প বলতে শুরু করেন:

"আমি যে আমার জীবনে সাহসিকতার খুব একটা বড় পরীক্ষা দিয়েছি, তা নয়। কিন্তু আমার চিকিৎসাধীনে ছিলেন, এমন এক রমণীর জীবনে অদ্ভুত বিচিত্র ঘটনা ঘটেছিল, যাকে পৃথিবীর আশ্চর্যতম ঘটনা বললেও অত্যুক্তি হয় না! তিনি আজ বেঁচে নেই। কিন্তু তাঁর মর্মান্তিক গল্প আজো আমি বয়ে বেড়াচ্ছি।

তিনি এক সম্ভ্রান্তবংশীয়া রুশ মহিলা, কাউণ্টেস মেরী বারণো, অসাধারণ রূপবতী। নিশ্চয় স্বীকার করবেন, রুশ মেয়েরা দেখতে সুন্দরী হয়; অন্ততঃ আমাদের চোখে তারা প্রায় ডানাকাটা পরী। সুগঠিত নাসিকা, চকচকে কপোল, ঈষৎ নীলাভ অথবা বাদামী চোখ, নমনীয় তনুতে কিছুটা কাঠিন্য,—তাদের এই রূপ মাতাল করে দেয় যে কোন পুরুষকে, সে নিজের সর্বনাশ হবে জেনেও ঝাঁপিয়ে পড়ে; ঐ অহঙ্কারীও স্নিগ্ধ, কোমল অথচ কঠিন রূপের দুর্নিবার আকর্ষণকে কিছুতেই অতিক্রম করতে পারে না। ফরাসী পুরুষরা তাই রুশ মেয়ে দেখলে পাগল হ'য়ে ওঠে। আসল ব্যাপার কিন্তু এই,—ওরা বিদেশিনী এবং বিদেশিনীদের প্রতি চিরদিনই আমাদের আকর্ষণ তুঙ্গে।

আমার এই রোগিনী বহুকাল যাবৎ তাঁর শ্বাসযন্ত্রের অসুখে কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাঁর বাড়ির ডাক্তার তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন বায়ুপরিবর্তনের—দক্ষিণ ফ্রান্সের আবহাওয়া হয়তো তাঁকে অনেকটা চাঙ্গা করে তুলবে! কিন্তু ভদ্রমহিলা কিছুতেই সেণ্টপিটার্সবার্গ ছাড়তে রাজি নন।

কিন্তু দিনের পর দিন তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটায়, ডাক্তার ও স্বামীর যৌথ পিড়াপিড়িতে অবশেষে তিনি রাজি হলেন সেণ্টপিটার্সবার্গ ছেড়ে অন্য কোথাও জলবায়ু পরিবর্তনে যেতে। স্বামীরই পছন্দ করা জায়গা মেন্তোনের উদ্দেশ্যে একদিন রওনা দিলেন তিনি।

প্রায় একাই চলেছেন তিনি। সঙ্গে একজন ভৃত্য মাত্র। প্রথমে ঘোড়ার গাড়ি, তারপর ট্রেন। কামরাটায় তিনি একেবারে একক। ভৃত্যটি অন্য এক তৃতীয় শ্রেণীতে। ধাবমান ট্রেনের দরজার সামনে এসে তিনি দাঁড়ালেন। তাঁর বিষণ্ণ চোখের সামনে ঘূর্ণায়মান গ্রাম ও উপত্যকা। অনুভব করছেন, জীবনে তিনি নিঃসঙ্গ, বৈচিত্র্যহীন! স্বামীর অকুণ্ঠ ভালোবাসাও তো তিনি পাননি! স্বামীর নিশ্চয় উচিত ছিল নিজে অনেকদূর এগিয়ে এসে তাঁকে বিদায় জানানো। কিন্তু তিনি তা না করে এমন একটা ভাব দেখালেন যেন, এই পৃথিবীর শেষ প্রান্তে তিনি তাঁর বুড়ো খানসামাকে এক হাসপাতালে পাঠাচ্ছেন। হৃদয়হীন কর্তব্যপালন মাত্র।

এক একটা স্টেশনে গাড়ি থামে, আর ভৃত্য আইভান এসে তাঁর খবরা-খবর নিয়ে যায়। আইভানের বয়স অনেক, খুব অনুগত, কর্ত্রীর হুকুমে যেকোন কাজ সে করতে রাজি।

রাত ঘনায়মান। অন্ধকার ঝুপ ক'রে নেমেছে চরাচরের বুকে। ট্রেন ছুটছে পূর্ণ গতিতে। এই নিঃসঙ্গতায় তার স্নায়ুর ওপর চাপ বাড়ছে। তিনি ভয় পাচ্ছেন, কিভাবে সময় কাটাবেন? হঠাৎ তাঁর মনে হলো, আসবার সময় তাঁর স্বামী তাঁকে যে কতকগুলি ফরাসী স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলেন, সেগুলি এখন নেড়েচেড়ে দেখলে মন্দ হয় না। ছোট্ট ব্যাগটা পেড়ে ফেললেন তিনি। কোলের ওপর বিছিয়ে দিলেন বিচিত্র চাকচিক্যময় কয়েকমুঠো স্বর্ণমুদ্রা। হঠাৎ—

হঠাৎ তাঁর মুখের ওপর কার হিমেল নিঃশ্বাস। বিস্ময়ে মাথা তুললেন; তখনই কামরার দরজাটা খুলে গেল। কেমন এক অজানা শিহরণে বিভ্রান্ত হচ্ছেন কাউন্টেস্ মেরী; চটপট নিজের শাল দিয়ে টাকাগুলো ঢেকে ফেললেন। বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে রইলেন দরজার দিকে।

মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সেই দ্বারপথে একজনের আবির্ভাব। সান্ধ্য পোশাক, মাথায় টুপি নেই, জখমী একখানা হাত থেকে সমানে রক্ত গড়াচ্ছে, অতি পরিশ্রান্তের মতন হাঁপাচ্ছে।

লোকটা দরজা বন্ধ করে দেয়, সহযাত্রিনীর দিকে এক পলক চেয়ে হাতের জখমে রুমাল জড়ায়, তারপর নীরবে একটা আসন গ্রহণ করে।

আতঙ্কে মেরীর মূর্ছা যাবার উপক্রম। এই লোকটা—এই লোকটা নিশ্চয় গুণ্ডা, বদমাইশ, ডাকাত। তাঁকে সোনার টাকা গুণতে দেখে ছিনতাই করতে এসে ঢুকেছে। হয়তো প্রয়োজন হলে তাঁকে খুনও ক'রে পালাতে পারে। আর কেমন তীব্র চাউনি লোকটার চোখে, নিশ্চয় এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে।···

কিন্তু মেরীর সন্দেহ বাস্তবায়িত হলো না।

লোকটা হঠাৎ দরদী গলায় বললো, "ভয় পাবেন না।"

মেরীর তো প্রত্যুত্তর দেবার শক্তিও ততক্ষণে নিঃশেষ। দুই কানের মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ রব, শুধুই নিজের হৃৎপিণ্ডের দ্রিম্ দ্রিম্ শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। বিশ্ব চরাচর, এমন কি এই ধাবমান ট্রেনটাও নিঃশব্দ।

লোকটা আবার বললো, 'মাদাম, আমি ক্রিমিন্যাল নই।'

মেরী তবুও নিশ্চুপ। কিন্তু এমন সময় তিনি ঈষৎ কেঁপে ওঠায়, হাঁটু দুটো ফাঁক হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে একরাশ ফরাসী স্বর্ণমুদ্রা ঝন্‌ঝনিয়ে কামরার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

ঝর্ণার উৎসারিত জলধারার মতন উজ্জ্বল মুদ্রাগুলি। চমকপ্রদ ওদের চাকচিক্য। আগন্তুক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর হেঁট হয়ে কুড়োতে শুরু করে।

আর কোন সন্দেহ নেই মেরীর। লোকটা ডাকাত, খুনীও হতে পারে! তার শেষ সম্বলগুলি কুড়িয়ে নিয়ে তারপর তাঁকে খতম করে যাবে! ভয়াবহ আতঙ্কে মেরী দরজার দিকে ছুটে যান, এখনই এই চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়তে চান! কিন্তু—

কিন্তু লোকটি তাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দিলে না! তাঁর মনোভাব আগেই টের পেয়ে দৌড়ে মেরীকে জাপটে ধরে ভেতরে টেনে আনে, সবেগে আসনে বসিয়ে দেয়, কঠিন হাতে চেপে রাখে মেরীর বাঁ হাতের কব্জিকে।

অত্যন্ত বিব্রত স্বরে সে বলতে থাকে: 'মাদাম, আপনি যা আশঙ্কা করছেন, তা নয়। আমি গুণ্ডা-বদমাইশ নই! এটা প্রমাণ করবার জন্যই তো আপনার টাকাগুলোকে কুড়িয়ে দিচ্ছিলাম।

কিন্তু মাদাম, আপনার কাছে আমার প্রয়োজন একটা আছে। আপনি আমাকে সীমান্ত পার ক'রে দেবেন। পার হতে না পারলে আমার মৃত্যু

অবধারিত! এর বেশি আর কিছু বলতে পারছিনা। আর মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই রাশিয়ার প্রান্তিক রেল স্টেশনটি আমরা পার হয়ে যাবো। বড় জোর আর এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিট—এরই মধ্যে আমরা চলে যাবো রাশিয়ার বাইরে। এই ভয়ানক মুহূর্তগুলিতে আপনার সাহায্য আমি চাই। আপনিই আমার রক্ষাকবচ। বিশ্বাস করুন, আমি খুনী নই, ডাকাত নই, এমনকি জীবনে কোন অশালীন কাজও আজ অব্দি করিনি শপথ করে বলছি, আমাকে ঐসব বিষয়ে সন্দেহ করবেন না। আর আমার বলার কিছু নেই। দোহাই—'

কথাগুলি এক দমে শেষ করেই সে হাঁটু মুড়ে বসে, একটা একটা করে প্রত্যেকটি টাকা তুলে সে মেরীর ব্যাগে রাখতে থাকে, এমন কি অনেক দূরে গড়িয়ে যাওয়া মুদ্রাটি অব্দি তুলে এনে দেয়। মুদ্রাভর্তি চামড়ার ব্যাগটা আবার মেরীর হাতে নিরাপদে ফিরে আসে। কামরার আর এক কিনারে বসে পড়ে সে। কিছুক্ষণ কারুর মুখে রা নেই। ভুরু কুঁচকে নিশ্চল মাদাম। তখনো ভয়ের দৈত্যটা তাঁর বুকে ঘাঁপটি মেরে আছে; অবশ্য আতঙ্কের বহরটা আর আগের মতন তীব্র নয়। লোকটার মুখের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকান। বিবর্ণ ভাবলেশহীন একখানা মুখ—যেন প্রাণহীন! মাদাম তাঁর দৃষ্টি নত করতে বাধ্য হন। সুপুরুষ। লোকটির চেহারায় এক ধরনের মাদকতা আছে, বয়স ত্রিশের মধ্যে, শান্ত ও ভদ্র।

গাড়ি সাঁ সাঁ শব্দে ছুটে চলেছে অন্ধকারের বুক চিরে। কখনো গতির মত্ততা তুঙ্গে ওঠে, কখনো অপেক্ষাকৃত মন্থর। এদের শরীর দুলছে, দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে সময় সময়। অদূরে স্টেশন, তীব্র তীক্ষ্ণ চিৎকার ট্রেনের। ক্রমশ গতি মন্থর। রাশিয়ার প্রান্তিকতম রেল স্টেশনে গাড়ি এসে থামে।

যথারীতি খোঁজ খবর নেবার জন্য ঠিক তখনই বুড়ো আইভান এসে কামরার দরজায় দাঁড়ালো।

কাউণ্টেস্ মেরী চকিতে তাঁর সহযাত্রীর দিকে এক পলক তাকিয়ে ঢোঁক গিলে কাঁপা গলায় আইভানকে বললেন: 'আইভান, তুমি তোমার মালিকের কাছে ফিরে যাও; তোমার আর যাবার দরকার নেই।'

আইভান অবাক। বড় বড় চোখ মেলে কিছুক্ষণ চেয়েই থাকে মেরীর দিকে। কোন রকমে বলে, 'কিন্তু মা…'

ওর কথা শেষ হবার আগেই মেরী বলে ওঠেন: 'না, তোমার আর

সঙ্গে যেয়ে কাজ নেই। আমি মত বদলে ফেলেছি। তুমি কাউণ্টের সঙ্গে রাশিয়াতেই থেকো। এই নাও ফিরে যাওয়ার টাকা। তবে তোমার টুপি আর জোব্বাটা আমার দরকার। ঐ দুটি জিনিস আমাকে দিয়ে যাও।'

বুড়ো আইভান রীতিমত ঘাবড়ে গেছে। তবু কোন প্রশ্ন না তুলেই টুপি আর জোব্বাটা তার প্রভু-পত্নীর হাতে তুলে দেয়। সে জানে, সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারের পুরুষরা বা, মহিলারা এ রকম স্বভাবেরই হন বটে। কখন যে কি মর্জি, খোদায় মালুম। অগত্যা চোখের জল মুছতে মুছতে বিশ্বাসী ভৃত্য বিদায় নেয়।

আবার ট্রেন চলতে শুরু করে। হুঁ-হুঁ করে ছুটে চলেছে সীমান্তের দিকে।

কাউণ্টেস্ মেরী এবার আগন্তুকের দিকে ফিরে তাকান: 'মঁসিয়ে, এই পোশাক দুটো আপনার ছদ্মবেশের জন্য। আপনাকে এখন আমার ভৃত্য আইভানের ভূমিকা নিতে হবে। আর একটা শর্ত আছে,—আপনি এখন থেকে আমার সঙ্গে একদম বাক্যালাপ করবেন না, এমনকি মৌখিক ধন্যবাদ জানানোও নয়।'

আগন্তুক নীরবে স্বকৃতজ্ঞতায় মেরীকে অভিবাদন করে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চেকপোস্টে গাড়ি থামে। সরকারি লোকেরা কামরার ভেতরে প্রবেশ করে।

কাউণ্টেস্ স্বাভাবিক সপ্রতিভতায় নিজের পাশপোর্ট দেখালেন; এক কোণে বসে থাকা মানুষটার দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'ঐ যে আমার চাকর, আইভান। এই যে ওর পাশপোর্ট।'

সরকারি লোকেরা সন্দেহমুক্ত মন নিয়ে বিদায় নিলো। আবার ছুটলো ট্রেন। সারাটা রাত এরা দু'জন মুখোমুখি। সাড়া নেই, শব্দ নেই—যেন মূক।

পরদিন সকাল বেলা জর্মনীর একটা স্টেশনে গাড়ি থামে। এতক্ষণে মুখ খোলে লোকটি, 'আমাকে মাফ করবেন মাদাম; আমি প্রতিজ্ঞা রাখতে পারলুম না। শুধু একটি কথা বলতে চাই, আপনাকে আমি আপনার ভৃত্যের সেবা থেকে বঞ্চিত করেছি। প্রতিদানে আমি কি আপনার কোন কাজেই লাগতে পারি না?'

তিনি নিরাসক্ত গলায় বললেন, 'আপনি আমার জন্য একটি পরিচারিকা খুঁজে দিন।'

লোকটি মাদামের জন্য পরিচারিকা যোগাড় করে দেয়। এরপর থেকেই তারা বিচ্ছিন্ন। একবার শুধু মেরী দুপুরে অন্য এক স্টেশনে নেমে দেখেছিলেন, বহুদূরে দাঁড়িয়ে লোকটি এক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

অবশেষে গাড়ি মেন্তোনে পৌছালো।

॥ দুই ॥

এই অব্দি বলে ডাক্তার কিছুক্ষণ নীরব থাকেন।

তারপর আবার তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যায় :

একদিন চেম্বারে বসে রুগী দেখছি, এমন সময় একজন দীর্ঘদেহী যুবক আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে, 'ডাক্তারবাবু, আমি কাউণ্টেস মেরী বারনোর খোঁজ করছি। আমি তাঁর স্বামীর বন্ধু; অবশ্য মেরী আমাকে চেনেন না।'

আমি বললাম, 'আপনি যাঁর কথা জানতে চাইছেন, তাঁর সম্পর্কে আমি কোন সুখবর দিতে পারছি না। তাঁর ঐ রোগ কোন দিনই সারবার নয়। তাঁর পক্ষে রুশদেশে ফিরে যাওয়াও সম্ভব হবে না।'

আমার উত্তর শুনে হঠাৎ ভদ্রলোক ঝর-ঝর ক'রে কেঁদে ফেললেন। চলে গেলেন মাতালের মতন টলতে টলতে।

আমি ঘটনাটা জানাতেই কাউণ্টেস্ দারুণ বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাঁর মুখ থেকেই শুনলাম সমস্ত ঘটনা। আরো বললেন :…'জানেন, সেই অজানা অপরিচিত লোকটি আমাকে ছায়ার মতন অনুসরণ করে চলেছে। আমি কখনো পথে বের হলেই তাকে দেখতে পাই। সে মর্মভেদী দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকে, কিন্তু কোন কথা বলে না!'

একটু থেমে মাদাম বললেন : '…আমি হলপ্ ক'রে বলছি, সে এখনো এই জায়গা ছেড়ে যায়নি। চলুন, দেখবেন,—ঠিক জানালার নিচে দাঁড়িয়ে আছে!'

বলতে বলতে উঠে গিয়ে তিনি জানালার পর্দা তুলে দেখালেন। দেখলাম, সত্যি সেই যুবক আগন্তুক এখন নার্সিংহোমের দেয়ালের কাছে একটা বেঞ্চে বসে আছে! এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে এই জানালার দিকে। আমাদের দেখতে পেয়েই সে দৃষ্টি নামিয়ে নেয়, বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, সোজা চলতে থাকে সামনে, একবারও পিছনে ঘুরে তাকায় না।

সেই মুহূর্তে আমি অনুভব করলাম, এক জোড়া বিষণ্ণ হৃদয়ের আশ্চর্য মূক ভালোবাসা! কাউণ্টেসের প্রতি ঐ যুবকের যে প্রেম, তাতে কোন কামনা-বাসনার স্পর্শ নেই, আছে শুধু আত্মত্যাগের ব্যাকুলতা। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার পেলে কোন লোক যেমন পরিত্রাণকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে, এই লোকটিও তেমনি মেরীর প্রতি তার জীবন-মন সঁপে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, মেরীর প্রতি জন্মেছে তার অদ্ভুত অনুরাগ, যার তাড়নায় সে ছুটে এসে আমার কাছে জানতে চেয়েছিল: 'ওর অবস্থা কেমন বুঝছেন, ডাক্তার? ও কি সুস্থ হ'য়ে উঠবে না?' প্রত্যুত্তরে নিরেট বাস্তবের আঘাতে সে ভেঙ্গে পড়েছে, একজন বলিষ্ঠ যুবক হয়েও ডুকরে কেঁদে উঠেছে।

এর আরো কিছুদিন পর দুর্বল, ফ্যাকাশে মেরী আমাকে বললেন, 'জানেন, আমি ঐ অদ্ভুত মানুষটির সঙ্গে জীবনে একবারের বেশি কথাই বলিনি। অথচ, আজ আমার মনে হচ্ছে, ওর সঙ্গে যেন আমার বিশ বছরের ঘনিষ্ঠতা।'

এরপর চোখাচোখি হলেই মেরী স্মিত হেসে তাকে যেন নীরবে অভয় দিতে শুরু করলেন। তিনি জানেন,—'দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন,' তবু জীবনের সেই শেষ প্রান্তে তিনি যেন প্রকৃত প্রেমের সংস্পর্শ লাভে অদ্ভুত সুখী, পরিতৃপ্ত।

কিন্তু মাদামের বিচিত্র খেয়াল। কিছুতেই তিনি তাঁর প্রেমিকের সঙ্গে বাক্যালাপ করবেন না, এমনকি ওর নাম-ধাম জানতেও চান না। এ ব্যাপারে কিছু বলতে গেলেই তিনি বলেন, 'না-না, তা হয়না। তা হলে আমাদের এই বন্ধুত্বের মাধুর্যটুকু নষ্ট হয়ে যাবে। আমরা চিরকাল পরস্পরের অচেনা থেকে যাবো।'

আর তাঁর প্রেমিকটিকেও বলিহারি, কল্পনায় একটি আস্ত ডন কুইক্সোট! প্রেমিকার সঙ্গে বাস্তব ঘনিষ্ঠতা-অর্জনে তার কোন উদ্যমই নেই। গাড়িতে বসে সেই যে কথা না বলার শপথ নিয়েছিল তারা, আজো সেই পাথর বুকে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

মেরীর দিন ঘনিয়ে এসেছে। রক্ত শূন্যতায় তিনি বিবর্ণ। তবু মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে জানালার পর্দা ফাঁক করে দেখেন,—সে বেঞ্চের ওপর নিথর অবস্থায় বসে আছে। নিজের চেয়ারে ফিরে এসে হাঁপাতে থাকেন মেরী।

কিন্তু তাঁর সমস্ত মুখময় প্রশান্ত তৃপ্তি, ঠোঁটে ফুলের মতন ফুটে থাকে এক চিলতে হাসি।

তারপর একদিন বেলা দশটায় কাউণ্টেস্ মেরী এই পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিলেন।

শোকাচ্ছন্ন মনে রাস্তায় পা রাখতেই মুখোমুখি হলাম সেই প্রেমান্ধ যুবকের। তাকে দেখেই বুঝতে পারলাম, খবর সে পেয়ে গেছে। অবরুদ্ধ আবেগে সে বললো, 'আমি তাকে দেখতে চাই! মাত্র একটিবার দু'চোখ মেলে তাকে দেখতে চাই! ডাক্তারবাবু,...!'

আমি তাকে জড়িয়ে ধরি। বুকে আগলেই নিয়ে যাই মেরীর শোবার ঘরে।

দু'জনে গিয়ে দাঁড়ালাম মৃতার শয্যাপার্শ্বে। সে কাঁপতে কাঁপতে মেরীর হাত দু'খানা তুলে নেয়, গভীর বিশালব্যাপ্ত প্রেমের অভিপ্রকাশে সুদীর্ঘ চুম্বণ করে সেই দুই হিম, নিথর হাতে; তারপর হতচেতন মানুষের মতন টলতে টলতে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

ডাক্তার থামলেন। কিছুক্ষণ নীরবতার পর উপসংহার টানলেন:

'দীর্ঘ রেলপথযাত্রার এটাই হলো আমার জানা সেরা প্রেমের ইতিকথা। সত্যি, ওরা দু'জনে বড় অদ্ভুত চরিত্রের ছিল।'

একজন স্ত্রীলোক আপন মনে বিড় বিড় করে উঠলেন:

'না, ডাক্তার, তাঁরা পাগল ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন—তাঁরা ছিলেন—'

কথা শেষ করতে পারলেন না, কান্নায় তাঁর স্বর বুজে আসে। তাঁকে স্থির করবার জন্যই অন্য প্রসঙ্গে সকলে আলোচনা করতে শুরু করে দেয়; অথচ তিনি কি যে বলতে চেয়েছিলেন, সেটা আর জানা গেল না।

আসন বুনতো যে নারী

[The chair mender]

শিকারের মরশুম যখন আরম্ভ হলো, মারকুঁই দ্য বারট্রাসে'র বাড়িতে খানা পিনার জোর আসর জমে উঠেছে। আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন এগারোজন

শিকারী, আটজন যুবতী এবং এক প্রতিবেশী ডাক্তার। থরে থরে ফুল ও ফল দিয়ে সাজানো আলোকিত একটা টেবিলকে ঘিরে আলোচনারত তাঁরা। খাওয়া-দাওয়া শেষ। মনের আনন্দে গল্প-গুজবে মেতে উঠেছেন। গল্পের গতি এঁকে বেঁকে যেতে যেতে যে মুহূর্তে প্রেমের প্রসঙ্গ এলো, এঁরা একেবারে তর্কের উত্তেজনায় ফেটে পড়লেন। বিষয়বস্তু : নিখাঁদ প্রেম একজনের জীবনে ক'বার সম্ভব ? একবার না, একাধিকবার ?

জীবনে একটিমাত্র প্রেমে একনিষ্ঠ আছেন, এমন ব্যক্তির উদাহরণ অনেকেই দিলেন ; আবার এমন তথ্যও পাওয়া গেল, একজন তাঁর জীবিতকালে বহু নারীর প্রেমে সমআগ্রহে ডুব দিয়েছেন ! পুরুষরা বললেন,—এইজাতীয় বহুবিধ প্রেমে যারা মগ্ন, মানসিক দিক থেকে তারা এক ধরনের পাগলমাত্র। এবং এই রোগ থেকে রেহাই পাওয়া তাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়, নিজেদের স্নায়ুকে হয়রাণ করতেই তাদের আনন্দ। শুধু তাই নয়, প্রেমের পথে তারা কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে সহ্য করতে পারে না, ইপ্সিত নারীকে লাভ করতে এরা খুন করতেও পিছপাও হয় না।

এ সবই পুরুষদের ভাষ্য।

মেয়েরা কিন্তু তাদের স্পর্শকাতর মন নিয়ে প্রেমকে বর্ণনা করছেন, স্বর্গীয়-বস্তু হিসেবে। স্বর্গ থেকে হতভাগ্য মানুষ কেবল এই একটি বস্তুই ছিনিয়ে আনতে পেরেছে—অমর্ত্য প্রেম। বলাবাহুল্য, এমন প্রেম মানুষের জীবনে একবারই আসে, অকস্মাৎ বজ্রপাতের মতন তার আবির্ভাব। যার হৃদয় একবার সেই বজ্রপাতের মুখোমুখি হয়েছে, জীবনের গতিই তার পরিবর্তিত হয়ে যাবে,—বিকট মরুপ্রায় শূন্যতায় সে কষ্ট পাবে আজীবন। এর কোন বিকল্প নেই।

কিন্তু মহিলাদের এই মন্তব্যে সায় দিতে পারছেন না মারকুঁ, যাঁর নিজের জীবনে প্রেমের অভিজ্ঞতা অজস্র ; তিনি তাই প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একজন মানুষ জীবনে বহুবার প্রেমে পড়তে পারে এবং প্রতিবারই তার প্রেম সমান গভীর ও অকৃত্রিম হতে পারে। প্রেম একবারই সম্ভব, এর স্বপক্ষে যুক্তিটা কোথায় ? আপনারা কি এমন লোক দেখাতে পারেন, যিনি তাঁর সারাটা জীবন শুধু প্রেমের জন্যই উৎসর্গ করে গেছেন ? প্রেমের জন্য যারা আত্মহননের পথ বেছে নেয়, তারা মূর্খ। ভেঙ্গে না পড়ে তার উচিত প্রতীক্ষা করা—প্রেম দ্বিতীয় দফায় তার কাছে আসবে, দ্বিতীয় দফার পর

তৃতীয় দফা, এমনি করে আমৃত্যু সে নতুন নতুন নারীর প্রেম আস্বাদন করবে। প্রেমিক আর মাতালে তফাৎ নেই।

মদ যে খায়, সে তো আর মদ ছাড়া বাঁচতে পারে না; তেমনি প্রেমে যে একবার মজেছে, সে নেশা তার হাড়ে-হাড়ে মজ্জায়-মজ্জায় গেঁথে যাবে। আরো সহজ কথায় বলতে পারি, প্রেম হচ্ছে এক ধরনের ঝোঁক ও প্রবৃত্তি, যে একবার তার স্বাদ পেয়েছে, সে নিত্য নতুনের দিকে হাত বাড়াবেই!'

অর্থাৎ প্রেমের ব্যাখ্যায় এরা কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না। তখন মধ্যস্থ মানা হলো ডাক্তারের, যাঁর প্যারির-জীবন অভিজ্ঞতায় ভরপূর এবং বিশাল অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি এখন তাঁর অবসরজীবন কাটাচ্ছেন। অগত্যা সকলেই ঘিরে ধরলেন তাঁকে: ডাক্তারবাবু, আপনি কিছু বলুন।

ডাক্তারের জীবনবোধ যদিও গভীর, মারকুঁর মতন সোচ্চার তিনি নন। নিজেকে কেন্দ্র করে প্রেম সম্পর্কে বক্তব্য রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

তবু তিনি মুখ খুললেন, 'প্রেম সম্পর্কে কোন আলোচনা উঠলেই আমি আমার স্মৃতি-ভাণ্ডার থেকে একটি মাত্র ঘটনাকেই খুঁজে পাই। এটি এমন এক একনিষ্ঠ প্রেম, যা পঞ্চান্ন বছর টিকে ছিল। এক মুহূর্তের জন্যও এ প্রেমে মালিন্যের ছাপ লাগেনি, একটি দিনের জন্যও ছেদ পড়েনি; একেবারে মৃত্যুতেই ঘটেছিল এর পরিসমাপ্তি।'

মারকুঁ টেবিল চাপড়ে বাহবা জানালেন।

এক ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন, 'অপূর্ব দৃষ্টান্ত তো! এরকম ভালোবাসা পাওয়া আমাদের সুন্দরতম স্বপ্ন। পঞ্চান্ন বছর যে প্রেমের আয়ু, না জানি তা কত সুখের, কত অতলস্পর্শী! এমন প্রেম যে উপভোগ করেছে, সেই নারীর মতন সৌভাগ্যবতী আর কে! তিনি ধন্য!'

ডাক্তার স্মিত হাসলেন, ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'না, মাদাম, আপনি যা ভাবছেন, তা নয়। শুনলে আপনি হয়তো নিরাশই হবেন। কারণ, এমন বিরল ভালোবাসা যিনি পেয়েছিলেন, তিনি নারী নন, একজন পুরুষ!

এবার হয়তো আপনি আরো চমকে উঠবেন শুনলে যে, সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিটি আপনার পরিচিত। রসায়নে সুপণ্ডিত মঁসিয়ে ককেত। আর মেয়েটি? সেও আপনার অপরিচিতা নয়! সেই বুড়ি মেয়েমানুষটি, প্রতি

বছর বেত দিয়ে আসন বুনে দিতে এ বাড়িতে যার আগমন ঘটতো। কিন্তু এই দু'জন বিপরীতধর্মীকে নিয়ে যে ভালোবাসার ইতিকথা, কি করে যে আমি আপনাদের তা বোঝাবো, ভেবে উঠতে পারছি না!'

ডাক্তারের কথা শুনে মেয়েমহলের উৎসাহে ভাঁটা পড়লো, তারা প্রত্যেকেই অল্প-বিস্তর হতাশ, কারুর কারুর ঠোঁট বেঁকেছে, কেউ কেউ আবার মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে অন্যদিকে। এখানে সমবেত উচ্চবংশীয় নারী-পুরুষ সকলেরই ধারণা, প্রেম করবার অধিকার সকলের নেই। সমাজের আর পাঁচটা সুবিধা যেমন তাঁরা একচেটিয়াভাবে ভোগ করেন, তেমনি প্রেমটাও থাকবে একমাত্র তাঁদেরই কুক্ষিগত। যে মেয়েমানুষ বেত দিয়ে কুশন বোনে, তার জীবনের প্রেম নিয়ে আবার গল্প হয় নাকি? ফুঃ!

ডাক্তার কিন্তু বলে চলেছেন:

'তিন মাস আগে ঐ বৃদ্ধার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। তখন তার অন্তিম-কাল। ঘোড়ায় টানা নড়বড়ে জীর্ণ একটা এক্কাতে বিছানা পেতে শুয়ে ছিল সে। আপনারা হয়তো অনেকেই সেই গাড়িটা দেখে থাকবেন। আদতে ঐ ঘোড়ায় টানা গাড়িটাই ছিল তার বাড়ি। আর ছিল দুটো বিশাল কালো কুকুর, যারা তার বিশ্বাসী বন্ধু এবং অতন্দ্র পাহারাদার।

মরণাপন্ন বৃদ্ধার শিয়রে উপস্থিত ছিলাম আমরা দু'জন,—আমি ও গ্রামের গির্জার যাজক। আমাকে আর যাজককে সে তার উইলের অছি করেছিল। বড় বিচিত্র ও রহস্যময় সেই দলিল; এবং সেই দলিলের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়েই সে তার জীবননাট্যের আশ্চর্য ঘটনা শোনালো। এর চেয়ে করুণ, সত্যনিষ্ঠ, মর্মস্পর্শী গল্প আমি আর কখনো শুনিনি।

বেত দিয়ে চেয়ার বোনা তাদের পারিবারিক পেশা। তার বাপ-মাও ঐ করে জীবিকা নির্বাহ করেছে। কিন্তু দারিদ্র্য কোনদিন ঘোচেনি। এই বিশাল পৃথিবীতে মাথা গুঁজবার মত আস্তানাও তারা গড়তে পারেনি। সে যখন ছোট্ট মেয়েটি ছিল, ভালো বা চলনসই পোশাক একটাও তার ছিল না—শতচ্ছিন্ন ময়লা জামা-প্যাণ্ট পরে সে ইতিউতি ঘুরে বেড়াতো।

ঘোড়ায় টানা গাড়িতে মেহনতী পরিবারটি আজ এখানে, কাল সেখানে। শহরে ঢুকেই পথের পাশে তারা এসে থামতো, ঘোড়াটাকে খুলে দেওয়া হতো চরে বেড়াবার জন্য, দানা-পানি খাবার জন্য। কুকুর দুটো লাফিয়ে নামতো গাড়ি থেকে, এদিক-ওদিক ঘুর ঘুর করে এক সময় খাবার মধ্যে নাক গুঁজে

ঘুমিয়ে পড়তো। আর সে তখন ছোট্ট মেয়েটি,—সবুজে সবুজ ঘাসের রাজত্বে হাঁটি হাঁটি হেঁটে বেড়াচ্ছে। তার বাপ-মা রাস্তার ধারে এল্‌ম্‌ গাছের ছায়ার নিচে যেন পশরা সাজিয়ে বসেছে,—সেই শহরের যত ভাঙ্গা-ছেড়া-খোঁড়া চেয়ার, সব তারা চটপট নিপুণ হাতে মেরামত করে চলেছে।

তাদের ঐ ঘোড়ায় টানা চলমান বাড়িটি যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাত্রা শুরু করে, তারা সকলেই নিশ্চল নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকে। দরকারী কথা ছাড়া একটি শব্দও তারা ব্যয় করে না। সামান্য নিজেদের মধ্যে আলোচনায় ঠিক করে নেয়, আজ কে রাস্তায় নেমে হাঁক ছাড়বে: চেয়ার সারাবেন নাকি? চেয়ার···

দুলতে দুলতে গাড়ি ছুটছে। তাদের শরীরগুলি ঘনিষ্ঠ, নীরবে খড়গুলিকে পুরু ক'রে বিছিয়ে রাখছে বিশ্রামের সময় শুয়ে পড়বে বলে।

ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটি হয়তো কখনো হাঁটতে হাঁটতে বেশ খানিকটা দূরে চলে গেছে, হয়তো গ্রামের দু' চারটে বখাটে ছোকরা এগিয়ে আসছে ওর সঙ্গে একটু ভাব জমাতে, কিন্তু ঠিক তখনই ছুটে এসেছে তার বাবা, রাগে হুঙ্কার ছেড়েছে, 'হারামজাদি, চলে আয় বলছি।'

জীবনে এর চেয়ে বেশি স্নেহ মাখানো ডাক সে কখনো শুনতে পায়নি।

ক্রমশ তার বয়স বাড়লো। বাপ-মার জীবিকা-অর্জনে সেও তখন অংশ নিতে শুরু করেছে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে ভাঙা চেয়ার সংগ্রহ করে আনা তার কাজ। তখন তার মনে এক ব্যাকুল প্রত্যাশা,—রাস্তায় স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঐ যে সব ছেলে-মেয়ে, সে তাদের সঙ্গে পরিচিত হবে। কিন্তু তা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। ওদের অভিভাবকরা তাকে হেয় নজরে দেখেন। নিজেদের ছেলে-মেয়েদের ডেকে সাবধান করে দেন, 'খবর্দার, ঐ ছোট ঘরের মেয়েটার সঙ্গে একদম কথা বলতে যাবি না।'

সে শুধু উপহাসের পাত্রী নয়; মানুষ হিসেবে সামান্যতম মর্যাদাও সে পায় না। তাকে দেখলে অনেক ছেলে-ছোকরার মনে বন্য উল্লাস জেগে ওঠে। তারা ওকে তাক্‌ করে ঢিল ছোঁড়ে। সে পালিয়ে কোন রকমে আত্মরক্ষা করে।

কোন কোন মহিলা আবার তাকে মনে করে ভিখিরিণী মেয়ে। দয়া করে দু-এক পেনি তার দিকে ছুঁড়ে দেয়।

তখন তার বয়স্ এগারো। একদিন তারা এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলো এবং

এই পথেই প্রথম সে পরিচিত হয় ফুটফুটে বাচ্চা ককেত্তের সঙ্গে, যে সেই সময় দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল; কান্নার কারণ, তার দুষ্টু খেলার সাথীরা তার হাত থেকে দুটি সুঁ * কেড়ে নিয়েছে। এই সম্ভ্রান্ত ছোট্ট খোকনের কান্নায় সে বিচলিত বোধ করে। তার মনে হলো, ছেলেটি সুখী পরিবারের, ওর প্রতিটি অশ্রুবিন্দুতে সেই বিশেষ অভিমান ঝরে পড়ছে। তবু সেই অভিমান মেয়েটির বুকে বাজে, মন তার সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে। ওর কষ্টের কারণ বুঝতে পেরে সে তার যাবতীয় সঞ্চয় সাতটি 'সুঁ'ই ছেলেটির দু'হাতে গুঁজে দিল। ছেলেটির সঙ্কোচ নেই, মনের আনন্দে নেচে ওঠে সে, তার কান্না থেমে যায়। ওর সেই হাসি হাসি উজ্জ্বল মুখ দেখে মেয়েটির মনেও খুশির বান ডাকে, অনেক সাহসে সে ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে, গভীর সোহাগে চুমু খায়। ছেলেটি তখন পয়সাগুলি গুণতেই ব্যস্ত, ওর চুমু খাওয়া না-খাওয়ায় তার কিছু আসে যায় না। ছেলেটি বাধা না দেওয়ায় মেয়েটির সাহস ও ভরসা আরো বেড়ে যায়; সে ওকে আবার জড়িয়ে ধরে, আবার চুমু খায়। বহুক্ষণ ধরে বুকের উষ্ণতায় ওকে আঁকড়ে রাখার বিচিত্র সুখ তাকে রোমাঞ্চিত ক'রে রাখে। তারপর হঠাৎ এক সময় সে ওকে ছেড়ে দিয়ে ছুটে পালাতে থাকে।

এরপর তার বিড়ম্বিত অসহায় দিনাতিপাতে কোন তরঙ্গের অনুরণন? কি তার মনের ভাব? কেন সে হঠাৎ ঐ রকম একটা শিশুর সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে জড়িয়ে ফেললো? জীবনে প্রথম বালকের কোমল অধরের স্পর্শ তাকে কি উন্মাদ করে তুলেছিল? ছোট হোক, বড় হোক, নারী-মনের এই রোমাঞ্চ বড় রহস্যময়!

ঐ ঘটনার পর থেকে সে প্রতিনিয়ত আনমনা। তার চোখের সামনে ভাসছে সেই ছবি—নির্জন পথ, ভাঙা কবরখানা এবং একটি বালকের উজ্জ্বল মুখ। আবার হয়তো ঐ বালকটির সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে, এমন আশায় সে মা-বাবার কাছ থেকে নিয়মিত পয়সা চুরি করতে শুরু করে। চেয়ার সারাবার জিনিসপত্র কিনতে দিলেই সে তা থেকে পয়সা সরিয়ে রাখে।

কিছুকাল পর আবার সে ছেলেটিকে দেখতে পেলো তার বাবার মদের

---

* সুঁ একপ্রকার ফরাসী মুদ্রা। পাঁচ সেঁন্তে এক সুঁ।

দোকানে একটা লাল জারের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে। রঙিন কাঁচ ও মদের রঙের ভেতর দিয়ে আশ্চর্য বর্ণালী সেই মুখ, যেন কোন দেবশিশু। বিস্মিত আনন্দে আরো গভীর স্নেহে আচ্ছন্ন তার মন।

এই ছবি আজীবন তার হৃদয়ে গেঁথে রইলো। স্মৃতি আরো উজ্জ্বল হলো পরের বছর, যখন তৃতীয়বার ছেলেটির চাক্ষুস সাক্ষাৎ পেলো সে। ছেলেটি তার সহপাঠীদের সঙ্গে মার্বল খেলছিল। ওকে দেখেই সে আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না; দিশেহারা হ'য়ে ছুটে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে, এলোপাথাড়ি চুমু খেতে থাকে। এই আকস্মিক ঘটনায় দারুণ ঘাবড়ে গেল ছেলেটি। হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। স্নেহের পাত্রটির কান্না থামাতে সে তার সমস্ত সঞ্চয় পুরো সত্তরটি 'সেঁত' * দিয়ে বসলো। ছেলেটির কান্না থামে, লোভাতুর চকচকে চোখে সে দেখে অতগুলি পয়সাকে। এবার তার আদর খেতে আর আপত্তি নেই।

আরো চারটি বছর অতীত হলো। এই সময়ের মধ্যে যতবার সে ছেলেটির দেখা পেয়েছে, নিজের সব পয়সা উজাড় করে দিয়েছে। পরিবর্তে সে ওকে খুশিমত আদর করতে পারতো, চুমু খেতো। এক একবার দেখা হয়, আর মেয়েটি কখনও পনের, কখনও চল্লিশ 'সেঁত' দান করে দেয়। একবার অর্থনৈতিক দুরবস্থায় মাত্র সাড়ে পাঁচ সেঁতএর বেশি দিতে পারেনি এবং নিজের এই দারিদ্র্যে সে কেঁদে ফেলেছিল। আর একবার এসেছিল খুব সুদিন; সেদিন তার সঞ্চয়-ভাণ্ডারে ছিল পাঁচটি ফ্রাঁ—ভারী সুন্দর চকচকে গোলগোল মুদ্রাগুলি! আনন্দে নেচে উঠেছিল তার মন।

এইভাবেই নিজের মজুরী সে একটি ছেলেকে খুশী করবার জন্য উজাড় করে দিচ্ছিলো। ঐ ছেলেটিই তার স্বপ্ন, যেন তার ভবিতব্যও বটে। ছেলেটিও আজকাল তার প্রতীক্ষায় অধীর; দূরে দেখতে পেলেই ছুটে এসে হাত ধরে। মেয়েটি গভীর সুখে রোমাঞ্চিত।

তারপর হঠাৎ দীর্ঘ বিচ্ছেদ।

ছেলেটির আর সে দেখা পায় না। ও নাকি উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য পড়তে গেছে দূর কোন কলেজে; খবরটা অনেক কষ্টেই সে যোগাড় করেছিল। একদিন কলেজ ছুটির সময় ছেলেটি তার বাড়িতে ফিরে এসেছে,

* ১ সেঁত = ১ ফ্রাঁর শতাংশ।

মেয়েটিও তখন অসামান্য আগ্রহে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সময়ের বিবর্তন অপ্রতিরোধ্য, দু'বছরে ছেলেটির চেহারায় কী বিরাট পরিবর্তন, তাকে তো চেনাই যায় না! বালকত্ব অতিক্রম ক'রে সে এখন যুবক! দীর্ঘদেহী, সুদর্শন, গর্বিত যুবক, ব্যক্তিত্বের ঝলকে আকর্ষণীয়! পরনে সুন্দর মানানসই জামা-প্যাণ্ট, বিশেষ করে কোটের চাকচিক্যময় পেতলের বোতামগুলি সহজেই নজর কাড়ে! এক লহমায় অনাথা যুবতীটির দিকে তাকিয়েই না চেনার ভান ক'রে সে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

শেলবিদ্ধ বুক নিয়ে নির্জনে যুবতীটি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। দু'দিন ধরে সমানে চোখের জল ফেললো সে। মানসিক কষ্টে বেশ কিছুদিন রোগভোগ করেও উঠলো। আর তারপরই নিজের বুককে শক্ত করে বাঁধলো সে। এরপর যতবারই যুবকটির মুখোমুখি হয়েছে, সেও তাকে না চেনার ভান করেছে, এমন ভাব দেখিয়েছে যেন সে কারুর পরোয়া করে না। যুবকটিও নির্বিকার, মুখ তুলেও তাকায় না সে যুবতীটির দিকে। অথচ, অন্ধ ভালোবাসায় বুক যেন তার ফেটে যায়।

অনেক পরে সে আমার কাছে কবুল করেছিল, 'ডাক্তারবাবু, পৃথিবীতে ওকে ছাড়া দ্বিতীয় কোন পুরুষকে জানতুম না। আমার সমস্ত সত্ত্বা ওর কাছেই নীরবে উৎসর্গীত হয়েছিল!'

পৃথিবীর অবধারিত নির্মম নিয়মে ক্রমে সে পিতৃ-মাতৃহীনা হলো। জীবিকার জন্য পারিবারিক ব্যবসাটাই সে চালিয়ে যেতে থাকে—সেই চেয়ার বোনার কাজ। কিন্তু তার যৌবন লোভনীয়, শয়তানরা সেদিকে হাত বাড়াতে পারে—এই আশঙ্কায় সে দুটো ভয়ঙ্কর শিকারী কুকুর পুষতে শুরু করে। ওরাই তার একমাত্র সাথী, বিশ্বাসী প্রহরী।

একদিন আরো মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলো; দেখলো, ককেতের দোকান থেকে এক সুবেশা সুন্দরী তার প্রেমিকের সঙ্গে হাত ধরাধরি ক'রে বেরিয়ে আসছে। তার বুঝতে অসুবিধা হয় না—সুন্দরীটি কে? ও তার প্রিয়র প্রিয়া। স্ত্রী! সে তবে ইতিমধ্যে বিয়েও করেছে!

সেই সন্ধ্যাতেই সে আত্মহত্যা করতে গেল। মেয়রের পুকুরে ঝাঁপ দিল। কিন্তু মরা তার হলো না। একজন মাতাল তাকে উদ্ধার ক'রে তুলে নিয়ে

গেল সেই যুবকের কাছেই, যে তার যাবতীয় স্বপ্নের কেন্দ্রমণি—সেই ককেত! ককেত কিন্তু ওকে চিনতে ঠিকই পেরেছিল, কিন্তু ভান করলো না চেনার; সাধারণ পোশাক পরে সে নেমে এলো ক্লান্তশায়িতা যুবতীটির কাছে, প্রাথমিক শুশ্রূষা সে নিজের হাতেই করতে থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক করবার জন্য সে যুবতীর বুকের বাঁধন আলগা করে দেয়, কাপড়ের গিট ঢিলে করে দেয়; তারপর গোটা শরীরে মালিশ করতে করতে ক্ষোভের সঙ্গে বলে, 'কেন এমন করতে গেলে? বোকা মেয়ে! এমন ভাবে জলে ঝাঁপ দেবার কি দরকার পড়েছিল তোমার?'

গভীর সুখে সে তখন তার সমস্ত যন্ত্রণা ভুলে গেছে। তার প্রিয় তার শরীরে হাত বোলাচ্ছে, কথা বলছে!···বহুকাল ধরে ঐ একটি দিনের স্মৃতি তার জীবনের সবচেয়ে সুখময় অভিজ্ঞতা হয়ে বেঁচে রইলো।

···সারাটা জীবন তার এমন করেই নিস্তরঙ্গভাবে কেটে গেল। দিনে-রাতে কুসন দিয়ে চেয়ার বুনতো এবং কেবলি ককেতের কথা ভাবতো। চলমান আস্তানার বিশাল জানালার মধ্য দিয়ে প্রতি বৎসর ওকে দেখতে পেতো। ওষুধপত্র কিছু কিনতে হলেই সে ছুটে যেত ককেতের দোকানে; ওর সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা, দু'একটি ওষুধের কথা জিজ্ঞেস করা, ওষুধের দাম দিয়ে আসা—এই মুহূর্তগুলি তার কাছে যেন স্বর্গীয় সুখের উৎস!

আগেই আপনাদের বলেছি, গত বছর বসন্তকালে সে মারা গেছে। মৃত্যুর আগে সে তার জীবনের এই মর্মব্যথা আমাকে বলে গিয়েছিল; আর আমাকে অনুরোধ করেছিল, তার জীবনের যাবতীয় সঞ্চয় যেন ঐ ককেতকে দেওয়া হয়। কারণ, ওর কথা চিন্তা করেই সে প্রতিটি পয়সা জমিয়ে গেছে। এই সঞ্চয়ের জন্য তার কৃচ্ছ্রতার অন্ত ছিল না; অনেকদিন খরচের ভয়ে উপোসও করেছে। সে চায়, অন্ততঃ মৃত্যুর পরও যেন তার প্রিয় তাকে মনে রাখে।

তার সারা জীবনের সঞ্চয় দু'হাজার তিনশো সাতাশ ফ্রাঁ আমার কাছে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলো। এর মধ্যে সাতাশ ফ্রাঁ পাদরী মারফৎ খরচ হয়েছিল তাকে কবরস্থ করতে।···পরদিনই আমি গেলাম ককেতের সঙ্গে দেখা করতে; দেখলাম, খাবার টেবিলে সে ও তার স্ত্রী পরম তৃপ্তিতে একটি বড়সড় মদের বোতল থেকে উত্তেজক পানীয় পান করছে। আমাকেও তারা আপ্যায়িত

করলো এক গ্লাস কার্শ* দিয়ে। গেলাসে চুমুক দিতে দিতে গোটা ঘটনাটা আমি ওদের বললাম, আমার গলায় আবেগের অভাব ছিল না; আমার বড় প্রত্যাশা ছিল, ওদের চোখ ক্রমশ সজল হ'য়ে উঠবে।

কিন্তু পরিবর্তে দেখলাম, ককেতের অভিব্যক্তিতে এক ধরনের ঘৃণা ও অপমানবোধ! একটা হা-ভাত নোংরা চেয়ার মিস্ত্রীণীর নীরব প্রেমেও তাঁর ঘৃণা ও ক্ষোভ! রাগে সে চেয়ারটাকে ঠেলে উঠে দাঁড়ায়। যেন ঐ মেয়েটা তার প্রচণ্ড ক্ষতি করে গেছে! যেন তার সামাজিক সম্মান, সুখ, পারিবারিক ইজ্জৎ সব কিছুই অনাথা মেয়েটি কেড়ে নিয়ে গেছে।

তার স্ত্রীও সমান ঘৃণায় বিকৃত মুখে বলতে থাকে: ছ্যাঃ! ছ্যাঃ! একটা ভিখিরিণী! শেষকালে একটা ভিখিরিণী!'...রাগে-উত্তেজনায় আর কোন বিশেষণ সে খুঁজে পাচ্ছে না!

উত্তেজিত ককেত দুম্ দাম্ পা ফেলতে ফেলতে টেবিলটার চারপাশে চক্কর কাটছে, তার গ্রীক টুপিটা একদিকে হেলে কানের ওপর ঝুলছে, দাঁতে দাঁত চেপে সে আমাকে বলছে, 'ডাক্তারবাবু, একটিবার ভেবে দেখুন,—কি সাংঘাতিক অপমানটা করে গেছে আমাকে! কি করে আর এখন এর বদলা নেবো? ইস্, মাগীটা বেঁচে থাকতে যদি সব জানতে পারতাম, ওকে আমি জেলে পুরে রাখবার ব্যবস্থা করতাম। নিশ্চয় তাই করতাম এবং আপনি জেনে রাখুন, কিছুতেই ও সেখান থেকে ছাড়া পেত না!'

আমি ওদের এই পশুবৎ প্রতিক্রিয়া দেখে স্তম্ভিত। এই নীচতার যে কি জবাব দেবো, ভেবে উঠতে পারছি না। তবু আমার কর্তব্য তো আমাকে পালন করতেই হবে! বুকের বাষ্প চেপে রেখে তাই শুকনো গলায় বললাম, 'দেখুন, মৃত্যুর আগে সেই নারী আমার কাছে তার সারা জীবনের সঞ্চয় দু'হাজার তিনশ' ফ্রাঁ জমা রেখে গেছে আপনাকেই দেবার জন্য। আপনাদের যখন তার প্রতি এত ঘৃণা, তখন বোধহয় টাকাটা গ্রহণ করতে আপনাদের বিবেকে লাগবে। আমার মতে, টাকাটা তবে গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়াটাই শ্রেয়।'

আমার বক্তব্যের গুরুত্ব বুঝে উঠবার আগেই, তাদের ঐ ঘৃণা মিশ্রিত অভিব্যক্তিতে লোভের ছুরি ঝলকে উঠবার আগেই, আমি আমার পকেট থেকে টাকাগুলি বের করে ফেললাম। স্বামী-স্ত্রীর চোখগুলো সেই মুহূর্তে

---

* কার্শ—একপ্রকার দামী ফরাসী মদ।

বিস্ফারিত হ'য়ে ওঠে। অনেকগুলি টাকা! তিল তিল সঞ্চয় করা হরেক রকমের মুদ্রা—স্যুঁ, সেঁত, ফ্রাঁ থেকে আরম্ভ করে স্বর্ণমুদ্রা অব্দি! ঝন্‌ঝনিয়ে উঠলো তারা একসঙ্গে।

মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলাম, 'বলুন, আপনারা কি স্থির করলেন?'

মাদাম ককেতই প্রথম মুখ খুললো। ওর স্বরে লোভ ঝরে পড়ে, 'তা, মেয়েটার অন্তিম ইচ্ছা বলে কথা। আমার মনে হয়, এ দান ফিরিয়ে দিলে ওর আত্মার প্রতি আমাদের নিষ্ঠুরতা হবে।' হকচকিয়ে ককেতও আমতা আমতা করে, 'টাকাগুলিকে সৎকাজে লাগানো দরকার বটে। আমাদের ছোট ছেলেমেয়ের জন্য টুকি-টাকি জিনিস তো কিনতে পারি।'

আমি তেতো গলায় মন্তব্য করি, 'যেমন আপনাদের ইচ্ছা।'

ককেত এবার অনেক জোর গলায় বললো, 'হাঁ, তার ইচ্ছানুযায়ী টাকাটা অবশ্যই আপনি আমাদের দিয়ে যাবেন। কোন না কোন সৎ কাজে ব্যয় করবো।'

আমি আর কথা না বাড়িয়ে সব টাকা ওদের টেবিলের ওপর ঢেলে দিয়ে এলাম। তারপর নমস্কার জানিয়ে ফিরে এলাম।

কিন্তু ব্যাপারটার এখানেই ইতি হলো না। পরদিন সকালে লোভী ককেত আমার বাড়িতে এসে হাজির, অত্যন্ত নীচু স্বভাবের দৃষ্টান্ত রেখে সে বললো, 'তার তো একটা গাড়ি ছিল, স্যর। সেটাও নিশ্চয় আপনারই কাছে—। কি আর আপনি করবেন ওটা দিয়ে?'

'কিছুই না,' কঠিন গলায় বললাম, 'দরকার হলে আপনি নিয়ে যেতে পারেন।'

'আজ্ঞে ওটা দরকার হবে ঠিকই। ওটা দিয়ে আমার রান্নাঘরে উনুনের ওপর একটা ছাউনি দেবো।'

সে চলে যাচ্ছিলো। আমি ডাকলাম, 'শুনুন।' সে ফিরে তাকায়। বললাম, 'একটা বুড়ো ঘোড়া, আর একজোড়া কুকুর রেখে গেছে দরকার?'

সে হতবাক হ'য়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর সেই আমতা আমতা জবাব 'আজ্ঞে, হাঁ, না—না, ওদের নিয়ে আমি কি করবো? আপনি বরং ইচ্ছামত ওগুলিকে বিলিয়ে দিতে পারেন।'

বলেই সে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। চাপা ঘৃণা নিয়েও আমি তার সঙ্গে দেঁতো হাসি হেসে করমর্দন করি। উপায় কি, বলুন? এ দেশে ডাক্তার হয়ে ওষুধ-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে শত্রুতা করাটা বিধেয় নয়।

কুকুর দুটো আমার বাড়িতেই আছে। ঘোড়াটা পাদরীর জমিতে চাষ করে। গাড়িটা এখন ককেতের আর একটি ছোট ঘরের কাজ করছে। এবং সেই আজীবন কষ্টের টাকায় ককেত পাঁচখানা রেল কোম্পানীর ঋণপত্র কিনে রেখেছে।

'প্রকৃত ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসার নজীর আমি আমার জীবনে এই একটাই দেখেছি।'

ডাক্তার থামলেন।

অভিভূত মঁারকুর চোখে জল, দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তাঁর মন্তব্য শোনা যায়: 'এতে প্রমাণিত হলো, ভালোবাসতে জানে শুধু মেয়েরাই!'

মারোকা

[Marocca]

বন্ধুবরেষু,

যে মহাদেশের গহনে আমার অভিযান, সেই মহাদেশ আফ্রিকা সম্পর্কে তুমি আমার অভিজ্ঞতার কথা জানতে চেয়েছো; আরো জানতে চেয়েছো, প্রকৃতি যেখানে বৈষম্যহীন, সেই মনলোভা দেশে প্রেমের কতখানি ঝাপটা বুক পেতে গ্রহণ করছি। আমার এই প্রেমিকারা, যাদের তুমি নাম দিয়েছো কৃষ্ণাঙ্গী রূপসী, হয়তো তোমার পরিহাস ও উপহাসের পাত্রী হতে পারে, কিন্তু আমার অনুরাগকে সংশোধন করতে মোটেই রাজি নই।

তুমি তো দেখেছো, এ রকমই এক মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে সেবার আমি ফ্রান্সে গিয়েছিলাম। দীর্ঘাঙ্গী, গায়ের রং যেন নিকষ আবলুস কাঠের, মাথায় হলুদবর্ণ রিবন, পরণে ঝক্‌মকে বর্ণালী ট্রাউজার্স; স্পর্শদোষ বাঁচাবে, এমন পুরুষ ক'জন?

আমার স্থির প্রত্যয়, মরোক্কোর ঐ মূর-রূপসীরা একদিন তাদের নিশ্ছিদ্র

রূপ নিয়ে দুনিয়া জয় করবে। ব্যবহারগত প্রকরণে যৌবনের উদ্দাম অভি-প্রকাশে বহু রূপসী এখানে আমাকে আকর্ষণ করেছে, অবসরবিনোদনমুহূর্ত-গুলিতেও ওদের মঙ্গল লাভের কামনায় আমি মূঢ়, মাতাল!

কিন্তু সুপ্রসন্ন অদৃষ্টের বরাভয়ে আমি এখানে সূচনাতেই এমন এক 'বস্তু'র সন্ধান পেয়েছি, যার উৎকর্ষতা ও আকর্ষণ সম্পর্কে পুলকিত না হয়ে পারছি না। নিরবকাশ শিহরণে দুলতে দুলতে বলতে পারি—সে যে অতুলনীয়া!

এর আগের চিঠিতে তুমি লিখেছিলে, 'একটি জাতির ধাত বোঝা যায়, যদি ঐ জাতির প্রেম করার নিয়মগুলি জানতে পারি।' তাই যদি হয়, তবে বলছি—এখানকার মানুষরা সব প্রেম-পাগল, প্রেমের তাগিদে তারা পরস্পরকে প্রচণ্ড টানা-হেঁচড়া করে।

আদতে ওদের সংস্পর্শে এলেই শরীরের রক্ত গরম হ'য়ে ওঠে, আমাদের চাপা ভদ্রতার মুখোশটা খসে পড়ে, তেজ-মরুৎ-ব্যোম এই তিনেরই সমাবেশে মন তখন আসঙ্গ লিপ্সায় দিশেহারা। স্পর্শসুখ পাবার জন্য আঙ্গুলগুলি লক-লকিয়ে ওঠে, ইন্দ্রিয়-তাড়নায় দেহে তখন আসুরিক শক্তি, মুখে কখনো অসম্বন্ধ প্রলাপ। সামান্য হাতের স্পর্শ ঘটলেই দেহে-মনে এমন রূপান্তর অনিবার্য হ'য়ে ওঠে, ফলে অনেক সময়ই আমরা ভীষণ ভুল করে বসি!

আমায় ভুল বুঝো না বন্ধু, তোমরা যাকে বলো হৃদয়মথিত করা প্রেম, আত্মার মিলন-আকুতি, আদর্শ একনিষ্ঠ প্রেম, স্বর্গীয় দেহাতীত ভালোবাসা, আমার সে সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতাই নেই, এদের আদৌ অস্তিত্ব সম্ভব কিনা সন্দেহ। আমি ঐ সব উদার মনোযোগের প্রেম বুঝি না। আমি প্রেম বলতে বুঝি নর ও নারীর ইন্দ্রিয়সুখ। এই প্রেমের ভালো দিকও একটা আছে, যার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায় এদেশের মতন ভয়ঙ্কর তপ্ত জলবায়ুতে।

প্রচণ্ড দাবদাহে দেহ সর্বদাই উত্তপ্ত, দক্ষিণ কোণ থেকে অহরহ মরু-ঝড় ছুটে আসে, কখনো কখনো উত্তর-মরু থেকেও ঝঞ্ঝা এসে আক্রমণ করে, যার তপ্ততা ধ্বংসাত্মক বললেও অত্যুক্তি হয় না, সব কিছু যেন জলছে, এমনকি ঐ পাথরগুলিও বুঝি জলছে, জলুনি শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে—তখন একটি নারী দেহকে হাতের কাছে না পেলে পঙ্গু হ'য়ে উঠবো!

যাক এবার আমার গল্পের প্রসঙ্গে আসা যাক। আফ্রিকার কোথাও

স্থায়ীভাবে ডেরা বাঁধবো, এমন ইচ্ছা আমার কখনোই ছিল না, প্রথম থেকেই আমি স্থান থেকে স্থানান্তরে উৎক্ষিপ্ত—বনা, কন্স্তান্তাইন, বিস্কারা, স্তেফাঞ্চল ইত্যাদি ঘুরতে ঘুরতে আমি একদিন চাবেতের সঙ্কীর্ণ মরুপথে উপস্থিত হলাম, তারপর সেখান থেকে বোগীতে।

এই ভ্রমণ-পথের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী অতুলনীয়; বোগীর মরুপথ এক বিশাল আরণ্যক ভূমির বুক চিরে ছ'শ' ফুটেরও বেশি ঢালু অধিত্যকা বেয়ে সোজা এসে নেমেছে বোগীর ঝকঝকে বিচিত্র উপসাগরে। আমি আমার ভ্রাম্যমান জীবনে নেপলস্, এ্যাজাক্কিও, জেনিজ ইত্যাদি ভুবনবিখ্যাত অপূর্ব সব উপসাগরের রূপ আস্বাদন করেছি; বোগী উপসাগর তাদের চেয়ে কিন্তু কম আকর্ষক নয়।

নিশ্চল সমুদ্র খাঁড়ি অতিক্রম করবার অনেক আগেই বোগী দৃষ্টি কাড়ে, গাছ-গাছালিতে শ্যামলবর্ণ পাহাড় গাত্র দ্বারাই তো বোগীর সৌন্দর্য অনুপম, মনে হয়—সে যেন ঐ সবুজের রাজত্বে একটি শ্বেতবিন্দু, ঠিক যেন সমুদ্রের বুকে আছড়ে পড়া কোন জলপ্রপাতের ফেনায়িত শুভ্রতা।

এই ছোট্ট অতুলনীয় মন জয়করা দেশে যেদিন এলাম, সেদিনই আমার মনে হয়েছিল—এখানে আমি অনেকদিন থাকবো, এর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ আমাকে এখানে আটকে রাখবে। যেদিকেই তাকাই, বিচিত্র চেহারার সমস্ত পাহাড়, ওরা যেন একটি আর একটিকে জড়িয়ে ধরে আছে। পাহাড়গুলিই সমুদ্রের প্রবেশ মুখে দ্বাররক্ষীর কাজ করছে, সমুদ্রের খুব কাছাকাছি থেকেও কেউ চট ক'রে সমুদ্রকে খুঁজে পাচ্ছে না।

এবং সেই সাগরের জল—স্ফটিকদীপ্ত নীলবর্ণ; যে বর্ণ আকাশের গায়ে, সেই বর্ণই সাগরের বুকে। মনে হয় আকাশ যেন সাগর-আয়নায় নিজের মুখ দেখছে।

আদতে বোগী একটা প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ। কিন্তু সমুদ্রের তীরে এই বিধ্বস্ত স্মৃতিনিদর্শন থিয়েটারের দৃশ্যপটের মতন। রাজকীয় সারাসেন * দের তৈরী প্রকাণ্ড সিংহদরজাটা আজো লক্ষণীয়। এখন ওটার সর্বাঙ্গ

* সারাসেন—আরবীয় যোদ্ধাদের মধ্যযুগে এই নামে ডাকা হতো। সারাসেনরাই তলোয়ার ঘুরিয়ে জেরুজালেম অধিকার করেছিল, তাদের বিরুদ্ধেই খ্রীষ্টসমাজের একটির পর একটি ক্রুসেড, তারাই পূর্ব রোমক সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্তান্তিনোপল অধিকার করে নিয়েছিল এবং ফলতঃ শুরু হয়েছিল য়ুরোপীয় রেনেসাঁস।—অনুবাদক।

আইভিলতায় আচ্ছাদিত। সব কিছুই কালের বিবর্তনে ধ্বসে ধ্বসে পড়ছে, এমন কি পাহাড়গুলিও। ভাগ্যিস মানুষ এখনো এখানকার স্মৃতিস্তম্ভগুলির খোল নলচে বদলে ফেলেনি।

এখনো দেখতে পাচ্ছি তাই; রোমানদের তৈরী প্রাচীরের ভগ্নাংশ, আরবীয়দের চূর্ণ বিজয়স্তম্ভ, সারাসেনদের বিধ্বস্ত প্রাসাদ।

শহরের ওপরের দিকটায় আমি এক মরোক্কোপ্যাটার্ণের বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলাম ; এই জাতীয় বাড়ির বৈশিষ্ট্য হয়তো তোমার জানা আছে, কারণ, বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে তোমরা এদের সম্পর্কে অল্প-বিস্তর ওয়াকিবহাল। তবু জানাচ্ছি—এই সব বাড়ির ঘরগুলিতে কোন জানালা নেই, কিন্তু খোলামেলা উঠোন থেকে আলোবাতাস যথেষ্টই আসে। আমার বাড়িটা দোতলা ; দোতলার ঘরটি অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা হওয়ায় দুপুর বেলাটি আমি ওখানেই কাটাই। আর রাতে শুয়ে থাকি সমতল ছাদে। আমিও তখন গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকদের মতন দিবানিদ্রায় অভ্যস্ত। আফ্রিকায় গ্রীষ্ম—সে যে কী ভয়ানক ! কাঠফাটা রোদ্দুরে পথ-ঘাট খা খা করছে অদ্ভুত নির্জনতায়, এমনকি ঝক ঝকে প্রশস্ত রাজপথও জনশূন্য, শ্বাস নিতে মানুষের রীতিমত কষ্ট। এ সময় মানুষ চায় দেহকে যতটা সম্ভব অনাবৃত রেখে ঘুমিয়ে পড়তে অথবা, ঘুমের চেষ্টা করতে।

আমার বসবার ঘরটি সবদিক থেকেই বনেদী, আরবী ভাস্কর্যে এটি নির্মিত, মস্ত সেকেলে সৌখিন পালঙ্কটা দৃষ্টি কাড়ে, পালঙ্কের ওপর বিছিয়ে দিয়েছি দিজবেলআমের থেকে আনা কোমল কার্পেট। সেখানে আমি আদিম মানুষের মতন স্বল্পবেশ পরে বিশ্রামের আপ্রাণ চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু বাইরের ঐ দাবদাহের মতন আমার স্নায়ুতেও কামনার জ্বর আমাকে উত্যক্ত ক'রে রাখছে। বাসনার এই কামড়ে আমি সত্যি অত্যাচারিত।

পৃথিবীতে দু'রকমের অত্যাচার আছে, যাদের সম্পর্কে তোমার কোন বাস্তবজ্ঞান আছে বলে আমার মনে হয় না। এক নম্বর অত্যাচার জলের অভাব, দু'নম্বর অত্যাচার নারীর অভাব। জানি না, এই দুটোর মধ্যে কোনটা বেশী মর্মান্তিক। মরুভূমিতে এক গেলাস ঠাণ্ডা পরিষ্কার জলের জন্ত মানুষ তার অনেক মানবিক গুনকে খুন করতে পারে ; আর এই রকম একটা উপকূল শহরে সুন্দরী নারীকে পাবার জন্ত মানুষ কী মরিয়া হ'য়ে উঠতে পারে !

আফ্রিকায় মেয়েমানুষের অভাব নেই ; বস্তু হিসেবে তারা যে খুব একটা অপছন্দের, তা নয়। কিন্তু আমার মতে, ওরা হচ্ছে সাহারার বুকে কর্দমাক্ত অপরিষ্কার জলাশয়, স্বাস্থ্যকর টলটলে পরিষ্কার জল নয়। ঐ জল অস্বাস্থ্যকর এবং সুস্বাদুও নয়।

এক দুপুরে আমার ঐ পিপাসা চূড়ান্ত। কিছুতেই দু'চোখের পাতা এক করতে পারছিনা—ঘুম নেই। প্রবৃত্তির তাড়নায় দুই পায়ে খুব যন্ত্রণা, মনে হচ্ছে কে যেন সূঁচ ফোটাচ্ছে আমার শরীরে। ছটফটিয়ে পালঙ্কের একদিক থেকে অন্যদিকে গড়াগড়ি দিচ্ছি। শেষে আর সহ্য না করতে পেরে বেরিয়ে পড়লাম ঘর ছেড়ে। জুলাই মাসের মাঝামাঝি মধ্যাহ্ন সূর্যের কী প্রচণ্ড দাপট! রাস্তা ঘাট এত তেতে আছে যে, তাতে যেন রুটি সেঁকা যায়, আমার জামা ঘামে ভিজে শরীরের সঙ্গেই লেপ্টে গেছে, চতুর্দিকে ভাপ বের হচ্ছে, পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে যেন স্পর্শ করা যায় এই উত্তাপ।

চললাম সমুদ্রের দিকে হাঁটতে হাঁটতে, উপস্থিত হলাম প্রকৃতি নির্মিত স্নানের ঘাটের কাছে। ধারে কাছে কেউ নেই, নিঝুম, নিথর, একটা পাখির কিংবা পশুর ডাকও শোনা যায় না। সমুদ্রের ঢেউগুলি পর্যন্ত আশ্চর্য শান্ত ও শব্দহীন, সমুদ্র বুঝি ঘুমিয়ে আছে সূর্যের চাদর গায়ে চাপিয়ে। ঠিক তখনই—

ঠিক তখনই একটি দৃশ্য দেখে ফেললাম।

দেখলাম, শিলাখণ্ডের আড়ালে একটি সজীব দেহ নড়ে চড়ে উঠলো। বুক অব্দি জলে ডুবিয়ে স্নান করছে এক নগ্ন দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী। এই জ্বালাময় নির্জন সময়ে ঐ দৃশ্য! সুন্দরীর সামনেটা সমুদ্রের দিকে, আমাকে সে এখনো দেখতে পায়নি, গোটা দেহটাকে ঢেউয়ের তালে তালে দোলাচ্ছে, স্বচ্ছ জলের নীচে তার হিল্লোলিত নগ্ন দেহ—পুলকে রোমাঞ্চিত আমি উপভোগ করছি এই বিরল দৃশ্য। পাথরে ক্ষোদিত এ এক অনুপম দেহলতা।

হঠাৎ সে ঘুরে তাকাতেই আমার সঙ্গে চোখাচোখি। অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে, ত্রস্তে জল কেটে একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে ; আমি আর তাকে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু প্রতীক্ষা করছি, কারণ জানি বেরিয়ে সে আসবেই। তপ্ত বালুর ওপর বসে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছি ঐ পাথরটার দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পেলাম তার মাথার ভগ্নাংশ—কোকড়ানো ভেজা চুল কাঁপছে।

ক্রমশ ভেসে উঠলো তার মুখখানা, পুরু ঠোঁট, বড় বড় চোখ দুটোতে উত্তেজনা ও ক্ষোভ, জলের তলায় হাতির দাঁতের মতন রঙ তার ত্বকের।

চীৎকার করে সে বলে, "সরে যান বলছি।"

তার ঐ কণ্ঠস্বরই প্রমাণ করে, কতখানি স্বাস্থ্যবতী যুবতী সে। আমি নড়ছিনা দেখে আবার সে চড়া গলায় বলে, "দেখুন মশাই, ওভাবে বসে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না।"

তবু আমি অনড়, আবার সে অদৃশ্য। কিছুক্ষণ পর আবার লুকোচুরি খেলার মতনই ধীরে ধীরে ভেসে উঠলো তার মাথা, চুল, কপাল এবং চোখ। এবার সে রীতিমত ক্ষুব্ধ, "আপনি দেখছি আমার বুকে ঠাণ্ডা লাগিয়ে ছাড়বেন। আপনি যতক্ষণ ওখানে থাকবেন, আমি কিছুতেই জল ছেড়ে উঠবো না।"

অগত্যা আমি উঠে চলে গেলাম, কিন্তু থেকে থেকে পিছন ফিরে না তাকিয়ে পারছি না।

যখন আমি অনেক দূরে, সে জল ছেড়ে বেরিয়ে এলো। আমার দিকে পিছন দিয়ে সে তার পোষাক পরে নেয়।

পরদিন আবার আমি সেখানে। আবার তাকে দেখলাম স্নানরতা অবস্থায়, এবার অবশ্য পোষাক পরা।

আজ আমাকে দেখেই হাসিতে ভেঙে পড়ে, ঝক্‌ঝকে দাঁতগুলি অপূর্ব। এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা একে অপরের অন্তরঙ্গ, আরো এক সপ্তাহের ব্যবধানে আমরা পরস্পর প্রিয় ও প্রিয়া। তার নাম মারোকা। শরীরে স্প্যানিশ ঔপনিবেশিকদের রক্ত বইছে। বিবাহিতা। স্বামী ফরাসী, নাম পেনতাবেজ। সরকারী অফিসে কাজ করেন, ঠিক কোন অফিসে আমার জানা নেই, তবে সব সময়েই খুব ব্যস্ত, আর তাকে নিয়ে মাথা ঘামানো আমার ইচ্ছাবিরুদ্ধ।

মারোকা তার স্নানের সময় বদলে প্রতি দুপুরে দিবানিদ্রার সময় আমার আস্তানায় আসতে শুরু করে দিল। সেও নাকি এখানে ঘুমোবে! আর সেই ঘুমের কী বাহার! বড্ড ছটফটে মেয়ে, কামের তাগিদে পশুপ্রায়। চোখ দুটো কামনায় জ্বল জ্বল করে, ঈষৎ উন্মুক্ত মুখগহ্বর, তীক্ষ্ণ দাঁত, শাণিত হাসি, প্রেমে ডগমগ। স্তনযুগল অতুলনীয়, শঙ্খের মতন তীক্ষ্ণমুখ, কামনায়

পাশবিক শক্তির অভিপ্রকাশ, মিলন পদ্ধতিতে অনেকটা নিকৃষ্ট রুচির, কিন্তু বড় আনন্দদায়ক, স্বৈরিণী কার্যকলাপের জন্যই বুঝি ওর এমন অটুট যৌবন। ওর সঙ্গে তুলনা করা চলে কামনার দেবীদের। মনে কোন জটিলতা নেই, সরল অঙ্কের মতন মানসিকতা, প্রাণ খুলে হাসতে পারে, অবলীলায় চোখের সামনে নগ্ন হয়ে দাঁড়ায়, নিজের গর্বের যৌবন দেখিয়ে তার উল্লাস, আমাকে নিয়ে সে ঘরময় গড়াগড়ি খায়, লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করে, তারপর এক সময় শ্রান্তি এলে ঘুমের অতলান্তে নিশ্চিন্তে তলিয়ে যায়, তার বাদামী চামড়ার ওপর ফোঁটা ফোঁটা ঘামের দিকে আমি চেয়ে থাকি।

কোন কোন সন্ধ্যায় তার স্বামী বাড়ি থাকতো না, সেই সুযোগে সে ছুটে আসতো আমার কাছে, ন্যাড়া ছাদে আমরা শয্যা পাততুম। আমরা দু'জনেই তখন পোষাকে আদম ও ইভ। রাত যদি হতো পূর্নিমা, আমরা চাঁদের থৈ থৈ আলোতে ভাসতাম ; দেখতে পেতাম, অন্যান্য বাড়িগুলির ছাদেও দলে দলে লোক উঠে আসছে, শুয়ে পড়ছে আকাশ ও চাঁদের দিকে চেয়ে।

চাঁদের আলো স্পষ্ট। আফ্রিকার পূর্নিমারাত অত্যন্ত উজ্জ্বল। অথচ, সেই উজ্জ্বল আলোকে মারোকার বিচিত্র বায়না, আমি তাকে নিজের হাতে ধীরে ধীরে বিবস্ত্র করি। অথচ, এ কাজ ঐ ছাদে শুয়ে করতে গেলে ভয়ের কারণ ছিল,—চাঁদের আলোতে যে কেউ আমাদের ঐ নগ্নরূপ ও স্বৈরাচার আবিষ্কার করে ফেলতে পারতো।

আমি তাকে ভয় দেখাতাম, সংযত থাকতে অনুনয় করতাম, কিন্তু সে কামের তাড়নায় এমন শব্দ করে উঠতো যে, রাস্তার কুকুরটা অব্দি চমকে ঘেউ ঘেউ ডেকে উঠতো।

সেদিন রাতে আমি একা ছাদে শুয়ে তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে আছি, এমন সময় সে এলো, এসেই আমার পাশে হাঁটুমুড়ে বসে তার বাঁকা ঠোঁটে আমাকে এক গভীর চুম্বন উপহার দেয়, ফিসফিসিয়ে বলে : "এই, তোমাকে আজ আমাদের বাড়িতে গিয়ে থাকতেই হবে!"

আমি অবাক : "কি বলছো তুমি ?"

"হাঁ, আজ রাতে আমার স্বামী থাকবে না। তোমাকে আমার সঙ্গে আমারই বিছানায় রাত কাটাতে হবে।"

আমি হেসে বললাম, "তার কি দরকার সুন্দরী ? তুমিই তো চলে এসেছো আমার কাছে।"

সে কামড়ে আমার গোঁফ ভিজিয়ে দেয়, আমার মুখের ভেতর তার জিভ, বলছে, "চলো আমার ঘরে। আমার কাছে রাতটা স্মৃতি হয়ে রবে।"

আমি এখনো তার কথার তাৎপর্য বুঝতে পারছি না। তখন সে আমার া জড়িয়ে ধরে বলে, "যখন তুমি আর এখানে থাকবে না, নিজের ঐ শোবার র ঢুকে আমি তোমাকে মনে করতে পারবো।"

আমি অভিভূত হলেও কঠিন স্বরে বললাম, "না, এটা খুব বাড়াবাড়ি হয়ে চ্ছে।"

আসলে আমি ওদের স্বামী-স্ত্রী ব্যবহৃত ঘরে গিয়ে হাজির হতে চাইছিলুম। এসব অভিসার অত্যন্ত ঝুঁকিবহুল—প্রায় ইঁদুর ধরার ফাঁদ। কত বধ প্রেম যে এভাবে ফাঁস হয়ে গেছে।

মারোকা কিন্তু তবু বার বার অনুনয় করছে আমাকে, ভেজা গলায় বলছে, ামার এই অনুরোধটা তুমি রাখবে না? আমি তোমায় কত লোবাসি!"

আমার মনে হলো, মারোকা নিশ্চয় তার স্বামীকে শুধু অপছন্দ করেনা, তীব্র ও করে। তাই গোপন প্রতিশোধের বাসনায় স্বামীরই ব্যবহৃত বিছানায় পুরুষ নিয়ে হুল্লোড় করতে চাইছে।

প্রশ্ন করলাম, "তোমার স্বামী কি তোমার ওপর খুব অত্যাচার করে?"

প্রশ্ন শুনে সে বিরক্ত, চোখ কুঁচকে সে বলে, "মোটেই না, তিনি যথেষ্ট পুরুষ।"

"তুমি কি তাকে পছন্দ কর না?"

তার দৃষ্টিতে বিস্ময়, "নিশ্চয়। আমি তাকে পছন্দ করি! খুব ভালোবাসি। তোমাকে যতখানি, অতটা নয়।"

আমি ওর এই মানসিকতার রহস্য ধরতে পারছি না, এদিকে সে আমার চুম্বন-বৃষ্টি করে চলেছে, কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, "চললুম। তুমি অবশ্যই আসবে।"

তবু আমি অস্বীকার করলুম যেতে।

দারুণ অভিমানে সে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ায়, হন্‌হনিয়ে যায় বাইরে।

এক সপ্তাহ আমাদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ নেই। আট দিনের দিন সে ার দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো, "আজ রাতেও আমি নিঃসঙ্গ। তুমি

কি আমার কাছে আসবে? যদি না আসো, আমিও আর কোন দি
আসবো না।"

বন্ধুবর, আট দিনের অদর্শনে আমি তো তখন দিশেহারা। ওর প্রস্তাবে
রাজি না হয়ে পারি!

দু'হাত বাড়িয়ে ওকে লুফে নিয়ে আসি। সেও বাধা দেয় না।

রাতে রাস্তার একপাশে সে অপেক্ষা করছিল। আমি যেতেই বেরিয়ে এসে
নিয়ে গেল নিজেদের বাড়িতে। বাড়িটা জেটির কাছাকাছি। রান্নাঘরে তখনো
খাবারের টুকরো ছড়িয়ে রয়েছে। নতুন রঙ করা দেয়াল, শোবার ঘরটি পরিপাটি
বহু ছবি ঝুলছে দেয়ালে, ফুলদানীতে কাগজের ফুল। আনন্দে আত্মহারা মারোক
নাচতে শুরু করেছে, বার বার বলছে, "তা হলে তুমি এলে! তুমি এলে!"

আমিও বিচলিত, খানিকটা অস্বস্তিও হচ্ছে, যদিও ব্যবহারে তা বুঝতে
দিচ্ছি না। এই অজানা ঘরে ঢুকে উলঙ্গ হতে কোথায় যেন একটা সংকোচ ও
ভয়, কিছুতেই উত্তেজনায় পৌরুষ আমার জেগে উঠতে পারছে না। কিন্তু
মারোকা তাকে না জাগিয়ে ছাড়বেই না, আমাকে এক রকম জোর করে নগ্ন
করে, নিজেও বিবস্ত্র হয়, তারপর পোষাকগুলি দলা পাকিয়ে পাশের ঘরে রেখে
আসে। ক্রমশ সাহস ও উত্তেজনা ফিরে পেলাম। বহুক্ষণ ধরে আমার বলিষ্ঠ
পৌরুষ মারোকার ওপর নিজের সক্ষমতা প্রমাণ করলো। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে
চললো আমাদের এই দৈহিক উল্লাস। আশ্চর্য এই যে, এরপরও কিন্তু আমর
ক্লান্ত হয়ে পড়লাম না।

হঠাৎ দরজায় জোর করাঘাত, আমরা ভীষণ চমকে উঠি, শোনা গেল
পুরুষ-কণ্ঠ, "মারোকা, দরজা খোলো।"

সেও আঁতকে ওঠে, ফিসফিসিয়ে বলে, "আমার স্বামী, যাও—খাটের নীচে
লুকিয়ে পড়। যাও তাড়াতাড়ি।"

হতবুদ্ধি আমি আমার বিবস্ত্র শরীরটাকে কোন রকমে তালগোল পাকিয়ে
খাটের তলায় উপুড় করে রাখলাম।

মারোকা রান্না ঘরে গেল; শব্দ পেলাম সে আলমারি খুলছে, কি যেন
একটা হাতে করে এনে এ ঘরে রাখলো—জিনিসটা আমি দেখতে পেলুম না।
তার স্বামী বাইরে অস্থির, বার বার দরজায় ঘা মারছে। মারোকা বললো,
"দাঁড়াও দেশলাইটা খুঁজে পাচ্ছি না।" তারপর হঠাৎ সে বলে উঠলো, "এই
তো পেয়েছি। আসছি।"

দরজা খুলতে সে ভেতরে এলো। আমি তার পা ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু বিরাট চরণজোড়াই প্রমাণ করে, লোকটি নিশ্চয় দৈত্যাকৃতি।

চুমু খাচ্ছে ওরা বুঝতে পারলুম। মারোকার নগ্ন দেহটাকে খুব চটকাচ্ছে, বুঝতে পারছি।

জাতীয় সঙ্গীত গাইবার গলায় যেন সে বলে ওঠে, "আমি মানিব্যাগটা ফেলে গিয়েছিলাম। খুব ঘুমোচ্ছিলে!"

লোকটা নানান অছিলায় মারোকাকে নিয়ে একপ্রস্থ বিছানায় যেতে চাইছে। কিন্তু মারোকা নারাজ। কিছুতেই এখন স্বামীর সঙ্গে শোবে না সে। লোকটা শেষে হতাশ স্বরে বলে, "আজ রাতে তুমি মোটেই ভালো মেয়ে নও। চললাম।"

সে চলে যেতেই আমি খাটের তলা থেকে অপমানিত অন্তরে বের হয়ে আসি। মারোকার উল্লাস আর ধরে না। সে ঘরময় ধেই ধেই করে নাচছে। হঠাৎ আমি আঁতকে উঠি—একটা কাঠ কাটা দা এনে রাখা হয়েছে চেয়ারের ওপর, ভীষণ ধারালো। আমার সর্বাঙ্গ আতঙ্কে কেঁপে ওঠে।

বললাম, "তোমার স্বামী যদি আমায় দেখতে পেতো?"

সে জবাব দিলো, "কুছ পরোয়া ছিল না।"

"রসিকতা করো না। মাথা হেঁট করলেই সে আমায় দেখতে পেতো।"

এবার তার মুখে হাসি নেই, চোখ দুটো আরো চকচকে, "উঁকি মারলে মজাটা টের পেতো।"

"মানে?"

"তা হলে তাকে আর মাথা তুলতে হতো না।"

"মানে?"

মারোকা চকিতে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলো ধারালো অস্ত্রটা। তারপর কায়দা করে দেখালো, কি ভাবে সেই চরম বিপদের সময় সে তার স্বামীকে খতম করে ফেলতো।

বুঝলে বন্ধু, এই হচ্ছে এখানকার প্রেমের রীতি। এভাবেই এখানকার নর-নারীরা তাদের দাম্পত্য জীবন, প্রেম, কর্তব্য ইত্যাদির মূল্যায়ন করে থাকে।

দামী গহনাগুলি

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বড়বাবু মঁসিয়ে লঁাতিন ছোট সাহেবের বাড়িতে এ সন্ধ্যায় সান্ধ্যচায়ের আসরে প্রথম পরিচিত হয় মেয়েটির সঙ্গে এবং প্রথ দর্শনেই পূর্বরাগ। মেয়েটির বাবা, যিনি ছিলেন গ্রামের কলেক্টর, বছ কয়েক আগে মারা গেছেন, ফলতঃ মায়ের সঙ্গেই মেয়েটি এখন প্যারিসে আছে; অর্থ নৈতিক অবস্থা সুবিধের নয়, কিন্তু ব্যবহারে সম্ভ্রমতা জাগায়— মিষ্টি ভদ্র ব্যবহার! ধর্মভীরু মেয়েটির বেশ কতগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল, য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মুখে হাসি লেগেই আছে, হৃদয়ের কোমলত সেখানে প্রস্ফুটিত, স্বর্গীয় আভা সেখানে আঁকা। এমন একটি মেয়ের কাছে সেই পুরুষই তো নিজেকে উৎসর্গ করে, যার নজর আছে, রুচি আছে; এমন লোক নেই, যে তার প্রশংসা না করে। সকলেরই এক কথা, "যে ওকে বিয়ে করবে, সে বড় ভাগ্যবান। এমন সুলক্ষণা কন্যা হাজারে একটি মেলে কিনা সন্দেহ!"

লঁাতিন আর বেশিদিন দেরী না ক'রে বিয়ের প্রস্তাব পেশ করলো বলাবাহুল্য প্রস্তাবটি মঞ্জুরও হলো এবং পরম এক শুভদিনে তাদের পরিণয় সুসম্পন্ন হলো।

সুখের স্বচ্ছ যৌথ জীবন, যদিও লঁাতিনের আয় সামান্য—বাৎসরিক মাত্র তিন হাজার পাঁচশ' ফ্রাঁ। কিন্তু হিসেবী বউ ঐ টাকাতেই সুন্দর সাজিয়ে গুছিয়ে সংসার চালাচ্ছে, অভাবের তাড়না অনুভূত হয় না, বরং মনে হয়, ওরা বুঝি স্বচ্ছল পরিবারের সদস্য-সদস্যা। প্রেমের স্রোতেও মোটেই ভাটা পড়েনি; স্বামীর প্রতি স্ত্রীর খুব টান, যত্ন-আত্তি করে, নিজের কোমল ব্যক্তিত্বের প্রভাবে স্বামীকে সম্মোহিত করে রাখে যেন।

বিয়ের পর দু'টি বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও লঁাতিনের মনে হয়, এখনও বুঝি তার স্ত্রী নবপরিণীতা, প্রেম ও আকর্ষণের গভীরতা একটুকুও হ্রাস পায়নি, বরং দিন দিন যেন বাড়ছে।

এমন এক গুনসম্পন্না গৃহিণীর কিন্তু বদদোষ আছে দুটো। এক নম্বর, থিয়েটারের নামে সে পাগল; দুই নম্বর, নকল মুক্তোর প্রতি লোভ।

তার এমন কয়েকজন বান্ধবী জুটেছিল, যাদের স্বামীরা পদমর্যাদায়

ছোটখাটো অফিসার। ওরা প্রায়ই নামী অপেরার দামী টিকিট কিনে এনে তাকে ডাকতো থিয়েটারে যাবার জন্য। কোন নতুন বই শুরু হলে মাঝে-মধ্যে প্রথম রজনীতেই সে হাজির হতো থিয়েটার হলে। এ ব্যাপারটায় স্বামী বেচারির পছন্দ-অপছন্দের তোয়াক্কা সে রাখতো না। লাঁতিন সারাদিন অফিসে খেটেখুটে আসবার পর এই ধরনের হুল্লোড় পছন্দ করতো না, তখন তার দরকার নিভৃতে বিশ্রামের, স্ত্রীর তাড়নায় সে হাঁপিয়ে উঠতো। বলতো, "তুমি তোমার কোন বান্ধবীকে নিয়ে থিয়েটারে যাও। তার সঙ্গেই ফিরে এসো।"

কিন্তু স্ত্রী রাজি হতো না। স্বামীর সঙ্গে অপেরায় না গেলে মেয়েদের নাকি মান থাকে না। লাঁতিনের রাগ চড়তো। অগত্যা তার স্ত্রী একাই যেত থিয়েটারে, শূন্য ঘরে একাকী বসে থাকতো লাঁতিন। অতিরিক্ত নাটক দেখার কতকগুলি কুফল আছে, যা ক্রমশ লাঁতিনের স্ত্রীর ওপর বিষক্রিয়া শুরু করে দেয়। সাজগোজের প্রতি তার আসক্তি বাড়ে, অবশ্য বেশী জামা-কাপড় কেনা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না বলে পুরনো পোশাকই নতুন কায়দায় সাজিয়ে গুছিয়ে পরতে থাকে সে। কিন্তু পোশাকের সঙ্গে দরকার গহনা। তাই ক্রমশ দেখা গেল তার কানে ঝিলিক দিচ্ছে ঝুটা হীরের মস্ত দুল, গলায় ঝুলছে নকল মুক্তোর মালা, নকল সোনার ব্রেসলেট, হালকা কাচ বসানো চটকদার চিরুনি,—সর্বাঙ্গ ঠুনকো গহনায় তার ঝলমল করছে। স্ত্রীর এই মনোবিকার দেখে কষ্ট পেতো লাঁতিন, মাঝে মধ্যেই কাছে ডেকে বলতো, "ডার্লিং, ঈশ্বর তোমায় যে অঢেল রূপ দিয়েছে, সেটাই তো তোমার গহনা! ঝুটা মুক্তোর প্রতি তোমার এই আসক্তি বেমানান, বিশেষত সত্যিকারের মুক্তো কিনে দেবার ক্ষমতা আমার নেই।"

মৃদু মিষ্টি হেসে স্ত্রী জবাব দিতো, "এই একটা ব্যাপারে আমার মাত্র দুর্বলতা। আমার ভালো লাগে যে! এ স্বভাব, ভালোই হোক মন্দই হোক, বদলাবার সাধ্যি আমার নেই। গয়না পরে সেজে থাকতে খুব ভালো লাগে!"

এরপর হীরের নেকলেশটি আঙ্গুলে জড়াতে জড়াতে সে আরো বললো, "দেখো, চেয়ে দেখো—কী সুন্দর এই হারটি, তাই নয়? লোকে সাদা চোখে দেখে বুঝতেই পারবে না, এটি আসল না, নকল।"

লাঁতিনের চোখের সামনে নকল হীরের দ্যুতি ঝকমকিয়ে উঠলো।

আত্মগ্লানি চেপে মুখে হাসির রেখা টেনে লাঁতিন বললো, "যাই বলো, তোমার রুচি কিন্তু এ ব্যাপারে যে কোন জিপসী মেয়ের মত।"

কোন কোন দিন তারা স্বামী-স্ত্রী ফায়ার প্লেসের সামনে বসে হয়তো আলাপরত, স্ত্রী তার গহনাভর্তি ব্যাগটি রেখেছে ঐ ফায়ার প্লেসের ওপরই, লাঁতিনের ঘৃণামিশ্রিত দৃষ্টি ঐ ব্যাগটার ওপর—গহনাগুলিকে সে বলে থাকে ছাইভস্ম। অথচ মহিলাটি সেই সব ঝুটা গহনাগুলিকেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরখ করছে, কি এক গভীর আনন্দে সে অভিভূত। আনন্দে উল্লাসে কখনো কখনো সে একটা নেকলেশ তার স্বামীর গলায় পরিয়ে দেয়, খিল খিল করে হেসে ওঠে, "তোমায় কী চমৎকার দেখাচ্ছে গো!" বলেই লাঁতিনের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, চুমুতে চুমুতে বেচারিকে অস্থির করে তোলে।

অতঃপর এক সন্ধ্যায় থিয়েটার দেখে ফিরবার পথে প্রবল হিমেল বাতাসে আক্রান্ত হলো লাঁতিনের স্ত্রী। তার বুকে ঠাণ্ডা বসে গেছে। পরদিন সকাল থেকে তার সেই যে শুরু হলো কাশি, তা আর থামে না। ক্রমশই কাহিল হয়ে পড়লো সে। নিমুনিয়ার মরণ-কামড় থেকে রেহাই পেলোনা লাঁতিন-প্রিয়া। আটদিনের দিন এই পৃথিবী থেকেই বিদায় নিলো সে।

স্ত্রীবিয়োগের এত বড় আঘাত লাঁতিনের পক্ষে সহ্য করাই দুরুহ হ'য়ে উঠলো। তামাম দুনিয়াটাই তার চোখের সামনে অন্ধকার, অবর্ণনীয় দুশ্চিন্তায় মাত্র এক মাসের মধ্যে তার মাথার সমস্ত চুল সাদা হয়ে গেল, বিক্ষত হৃদয়ে দিনরাত কেবলই চোখের জল ফেলছে। মৃত স্ত্রীর প্রতিটি স্মৃতি, তার হাসি, কণ্ঠস্বর, বায়না, ভালোবাসা সর্বক্ষণ মনের দুয়ারে এসে আঘাত করে যাচ্ছে।

সময় বয়ে যায়। কিন্তু বেদনার্ত স্মৃতি মন থেকে মুছে যায় না। অফিসে সহকর্মীদের সঙ্গে সাময়িক প্রসঙ্গে উত্তেজিত আলোচনা-লগ্নেও হঠাৎ সে অন্যমনস্ক হয়ে যায়, তার চোখ লোনা জলে টস টস করতে থাকে, সারা মুখময় বিষাদের রেখাগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কণ্ঠনালী ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায় চাপা কান্না।

স্ত্রীর ব্যবহৃত ঘরটিকে সে অবিকৃত রেখেছে। আজ মনে পড়ে, তার অতি সামান্য আয়ে কত হিসেব করে স্ত্রী সংসার চালাতো, ওরই মধ্যে বাঁচিয়ে বুচিয়ে টুকিটাকি জিনিস কিনতো, দামী মদ কিনতো, এক আধটা বিলাস-

সামগ্রী এনেও ঘর সাজাতো,—কি করে যে এতো করতো, লাঁতিন ভেবে পায় না।

আজ সেই মহিয়সী ইহজগতে নেই। লাঁতিন বেহিসেবী, দিশেহারা। সামান্য আয়ে তার ন্যূনতম প্রয়োজনও মেটে না, ক্রমে লাঁতিন ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লো, ঋণ যত বাড়ে, টাকার সন্ধানে সে ততই মরীয়া হ'য়ে ওঠে ; মাস শেষ হবার সাতদিন আগেই পকেট তার ঢুঁ-ঢুঁ। ভাবলো, মৃত স্ত্রীর নকল গহনাগুলি বেচে দিলে ক্ষতি কি ? ওগুলির প্রতি বরাবরই তার একটা ঘৃণা ও বিরক্তি ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, ঐ গহনাগুলিই তার স্ত্রীর সৌন্দর্য-মহিমাকে ছোট করে রেখেছিল !

উজ্জ্বল গহনাগুলির দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে লাঁতিন। তার স্ত্রীর বড় সোহাগের ধন—জীবনের শেষ দিন অব্দি ওগুলিকে সে সঞ্চয় করে গেছে। প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই তো সে একটি করে নূতন অলঙ্কার এনে জমিয়ে রেখেছে।

গহনাগুলির মধ্যে একটি ওজনদার নেকলেশ লাঁতিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ; বেচে দিলে নিদেনপক্ষে ছ' সাত ফ্রাঁ তো পাওয়া যাবেই, কারণ নকল হীরে হলেও এর চাকচিক্যময় কারুকার্য মোহাবেশের সৃষ্টি করে।

নেকলেশটিকে বেচে দেবার বাসনায় পকেটে পুরে অফিসের দিকে চলতে শুরু করে লাঁতিন ; চলতে চলতে বুলভার্দের গহনাপট্টিতে উপস্থিত হয়। প্রথম দোকানটাতে সে ঢুকেও পড়ে ; ঢুকেই কিন্তু লজ্জা ও সঙ্কোচ—একটা নকল বাজে জিনিস বিক্রি করতে এসেছে সে। তার দারিদ্র্য নগ্ন হয়ে পড়বে এখানে !

তবু কোন রকমে দোকানদারের সামনে দাঁড়িয়ে বলে বসে : "আচ্ছা, দেখুন তো এটার দাম কত হতে পারে ?"

নেকলেশটিকে দোকানদার উল্টে-পাল্টে পরীক্ষা করে, নিক্তিতে ওজন করে, তারপর আবার আতস কাচের মধ্য দিয়ে যাচাই করে এর সম্ভাব্য মূল্যমান, তার মুখের চেহারা পরিবর্তিত হয়, একজন কর্মচারীকে ডেকে ফিস্‌ফিসিয়ে কি যেন বলাবলি করে। . .

কাউন্টারে দাঁড়িয়ে লাঁতিন সবই খেয়াল করছে, একটা দারুণ অস্বস্তি তাকে আচ্ছন্ন করে রাখছে ; কেমন এক ধরনের হীনমন্যতায় কেঁপে ওঠে সে ; ইচ্ছে হলো, এখনই বলে ওঠে : আমি জানি, ওর দাম উল্লেখযোগ্য কিছু হবে না।

এমন সময় দোকানদার তাকে বললো, "দেখুন, নেকলেশটার দাম পনেরো হাজার ফ্রাঁর মতন হবে। কিন্তু আপনি এটি কোত্থেকে পেলেন, না জানা অব্দি আমাদের পক্ষে ক্রয় করা উচিত হবে না।"

বিস্ময়ে লাঁতিন হতবাক, চোখ চড়ক গাছ, দোকানদারের কথা যেন তার কানে ঢুকছে না, কোন রকমে স্খলিত স্বরে বলে, "কি বলছেন, যথার্থই বলছেন তো?"

দোকানদার আহতস্বরে বলে, "আপনি অন্য কোথাও যাচাই করে দেখতে পারেন, মনে হয়, এর চেয়ে বেশি দাম পাবেন না। যদি না পান এখানে কিন্তু আসবেন।"

এই মুহূর্তে লাঁতিনের মনে হলো, তার এখন নির্জনতার প্রয়োজন: নির্জনে গিয়ে গোটা ব্যাপারটা নিয়ে সে ভাববে। বিস্ময়তাড়িত মনে নেকলেশ হাতে বেরিয়ে আসে লাঁতিন।

বাইরে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে তার ইচ্ছে হলো হা-হা অট্টহাসিতে ফেটে পড়তে: কি বোকা—কি বোকা লোকগুলি! নকল হীরের নেকলেশের দাম বলছে পনেরো হাজার ফ্রাঁ। আচ্ছা আহাম্মক তো স্বর্ণকার! বেচে দিয়ে এলে মন্দ হতো না। এখনো বেচারি আসল ও নকলের পার্থক্য বুঝতে শেখেনি।

ভাবতে ভাবতেই লাঁতিন রুঁ দ্য পাইয়ের আর একটি দোকানে প্রবেশ করে। এখানে তার জন্য আরো বিস্ময় অপেক্ষমান। এখানকার স্বর্ণকার নেকলেশটি দেখেই সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে ওঠে: "আরে ব্বাস। এযে আমার খুব পরিচিত নেকলেশ, এই দোকান থেকেই কেনা হয়েছিল।"

অস্বস্তি ও আতঙ্কে ভয়ার্ত লাঁতিন কোনক্রমে জিজ্ঞেস করে: "দাম কতো?"

"বিক্রি তো করেছিলাম পঁচিশ হাজার ফ্রাঁতে। এখন আপনার কাছে এটা কি করে এলো জানতে পারলে আঠারো হাজার ফ্রাঁ দাম দিতে পারি। এর সঙ্গে আইনগত ঝামেলাও তো জড়িয়ে থাকতে পারে।"

বিস্ময়ে লাঁতিনের হাত-পা যেন হিম কঠিন হ'য়ে আসছে, দুই পায়ের ওপর ভর ক'রে যেন দাঁড়াতে পারছে না। কোনক্রমে উচ্চারণ করে:

"মালটা একটু ভালো ক'রে পরীক্ষা করে দেখুন। এই কিছুক্ষণ আগেও আমার ধারণা ছিল নেকলেশটা নকল।"

গহনা ব্যবসায়ী কৌতূহলী হয়: "আপনার নামটা কি জানতে পারি?"

"নাম লাঁতিন, স্বরাষ্ট্র বিভাগের কেরাণী; বর্তমান ঠিকানা—১৬ নং রু ত্য মারতারস্।"

দোকানী একটা বিরাট খাতা উল্টে দেখতে দেখতে স্বীকৃতিসূচক গলায় বলে ওঠে: "হুঁ, এই তো পাওয়া গেছে—১৮৭৬ সনের ২০শে জুলাই এই নেকলেশটি পাঠানো হয়েছিল ১৬ নং রু ত্য মারতারসের মাদাম লাঁতিনের ঠিকানায়।"

দু'জন দু' জনের মুখের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ; বিপত্নীক লোকটি বিস্ময়ের সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছে, আর স্বর্ণকারের চোখে সন্দেহের ভ্রূকুটি।

দোকানদার আবার বলে, "নেকলেশটা পরীক্ষার জন্য আমার কাছে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য রেখে যান; আপনাকে রসিদ দিচ্ছি।"

"ঠিক আছে", অনেকটা স্বস্তির সঙ্গে বলে লাঁতিন এবং দোকানদারের দেওয়া রসিদটি পকেটস্থ করে রওনা দেয়।

হাঁটতে হাঁটতে এক সময় তার খেয়াল হলো সে পথ ভুল করেছে। কিছুতেই মাথাটাকে হাল্কা রাখতে পারছে না,—একবার গেল তুলারি গার্ডেনের দিকে, অতিক্রম করলো সীন নদী। আবার পথ ভুল হলো তার।

অবশেষে যখন ফিরে এলো সাঁজে লিজিতে, মন ভাবলেশহীন। গোটা ঘটনার পিছনে সে কোন যুক্তিকে দাঁড় করাতে পারছে না। তার স্ত্রীর তো এত দামী গহনা কিনবার মতন সামর্থ্য ছিল না। কোথা থেকে, কোন রসদ থেকে সে এই রাজকীয় ঠাট-বাট বজায় রেখেছিল?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে লাঁতিনের বিক্ষত হৃদয় একটি উত্তরই খুঁজে পায়: উপহার।

কিন্তু কে দিয়েছিল এমন মহার্ঘ উপহার? এবং কেন?

ভাবতে গিয়ে লাঁতিন স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। অনিবার্য ভাবেই এক কুটিল সন্দেহ ছায়া ফেলে তার মনে। নিশ্চয় তার স্ত্রীর সঙ্গে এমন কারুর গোপন ভালোবাসা গড়ে উঠেছিল, যে তাকে ঐ সমস্ত অত্যন্ত মূল্যবান গহনাগুলি উপহার দিয়েছে। তার স্ত্রী! লাঁতিনের মনে হলো, পৃথিবী কাঁপছে, সামনে দাঁড়িয়ে থাকা গাছটা ভেঙ্গে পড়ছে তার ঘাড়ের ওপর। জ্ঞান হারিয়ে পথের মধ্যে চিৎ হ'য়ে লুটিয়ে পড়লো সে।

জ্ঞান হতে দেখলো, সে এক চিকিৎসালয়ে শুয়ে আছে। পথের লোকেরা তাকে এখানেই নিয়ে এসেছিল।

জনাকয়েক লাঁতিনকে তার বাড়ি অব্দি পৌঁছে দিয়ে গেল। নিজের ঘরে ঢুকে খিল তুলে দেয় লাঁতিন। মুখে রুমাল পুরে অঝোরে বহুক্ষণ ধরে কাঁদলো। সন্ধ্যা ঘনাতে ক্লান্ত শরীরে বিছানা আঁকড়ে ধরে, গভীর সুপ্তি নেমে আসে তার ওপর।

সূর্যের আলো মুখের ওপর এসে পড়াতে পরদিন ঘুম ভাঙলো লাঁতিনের; যদিও অফিস যাবার সময় ঘনিয়ে এসেছে, এই বিধ্বস্ত মানসিকতা নিয়ে কিছুই করতে ইচ্ছে হচ্ছে না তার। অফিসের বড়কর্তার কাছে ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দিল সে। এখন তার একবার সেই গহনার দোকানে যাওয়া দরকার; কিন্তু গভীর আত্মগ্লানিতে মাথা হেঁট হ'য়ে আছে তার, এখনো কেবল ভাবছেই এবং ভাবতে ভাবতে সময়টা হারিয়ে যাচ্ছে তার কাছ থেকে।

কিন্তু দোকানদারের সঙ্গে নেকলেশটার ব্যাপারে একটা রফা ক'রে ফেলা এখনই উচিত। পোষাক পরে লাঁতিন বেরিয়ে পড়ে।

সুন্দর ফুটফুটে রৌদ্র-উজ্জ্বল সকাল, মাথার ওপর অমল নীল আকাশ, পথে নিরুদ্বেগ জনতার স্রোত। এদের দেখে লাঁতিন সিদ্ধান্ত নেয়: এই পৃথিবীতে ধনীরাই একমাত্র সুখী। টাকার কাছে দুনিয়া বশ, টাকা দিয়ে দুঃখকে মুছে ফেলা যায়; পকেটে অঢেল টাকা থাকলে পৃথিবীর দূরত্ব সীমিত হয়ে যায়, অনায়াসে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো যায়। আহ্! আমার যদি অমন প্রচুর টাকা থাকতো!

ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে, অথচ পকেট ঢুঁ ঢুঁ। তখনই মনে পড়ে গেল নেকলেশটার কথা। আ-ঠা-রো হাজার ফ্রাঁ! এত টাকা!

দ্রুত পা চালিয়ে লাঁতিন রু দ্য লা পাইয়ে গিয়ে উপস্থিত হলো। মগজের মধ্যে কেবল আঠারো হাজার ফ্রাঁ হাতুড়ি পিটছে, যদিও মনের গহনে লজ্জা ও ভয় দলা পাকিয়ে আছে। সর্বোপরি, তার খুব ক্ষিদে পেয়েছে, পকেটে একটি সেঁতও নেই। মানসিক গ্লানিকে চাপা দিয়ে দোকানে ঢুকে পড়ে লাঁতিন।

দোকানের মালিক সাদরে আহ্বান জানায় তাকে, বসবার জন্ত একটা চেয়ার এগিয়ে দেয়; অন্যান্য কর্মচারীদের চোখে-মুখেও বিনীত হাসি।

দোকানদার বলে: "নেকলেশটা সম্পর্কে আমি এখন নিশ্চিন্ত। আমার দামে যদি রাজি থাকেন, এখনই কিনে নিতে পারি।"

লাঁতিন কোন রকমে বলে: "নিশ্চয়।"

কাঁপা হাতে রসিদে সই করে আঠারো হাজার ফ্রাঁ পকেটে নিয়ে বেরিয়ে এলো লাঁতিন। বেরিয়ে আসবার আগে বললো: "দেখুন, আরো কিছু গহনা আমার অধিকারে এসেছে। কিনবেন?"

"নিয়ে আসবেন।"

কৌতুকে একজন কর্মচারী হাসি চাপতে পারে না; আর একজন নাক ঝাড়ার শব্দ করে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই অভূক্ত লাঁতিন গাড়ি ভাড়া করে বাকি গহনাগুলি নিয়ে হাজির হয় ঐ দোকানে।

এবার কিন্তু লাঁতিন বাকি গহনাগুলি বিক্রির সময় রীতিমত দরাদরি করতে থাকে, তর্ক জুড়ে দেয়, মেজাজও তুলে ধরে সপ্তমে।

হীরের তুটি তুলের দাম পেলো বিশ হাজার ফ্রাঁ, ব্রেসলেটের জন্য পঁয়ত্রিশ হাজার; আংটি, ব্রোচ ও নক্সা আঁকা হীরের লকেটগুলির জন্য ষোলো হাজার ফ্রাঁ। এ ছাড়া এক সেট পান্না-নীলার দাম পেলো চোদ্দ হাজার ফ্রাঁ, একটি সোনা ও মুক্তো খচিত নেকলেশের জন্য পাওয়া গেল চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ। সব মিলিয়ে লাঁতিনের পকেটে ঢুকলো একশ ছিয়ানব্বই হাজার ফ্রাঁ।...

লাঁতিনের ফূর্তি আর ধরে না! আকাঙ্খা হলো, কর্ণেল ভেঁদমের বিশাল মূর্তিটাকে জড়িয়ে গড়াগড়ি খায় শিশুর মতন। বাসনা হলো, ফরাসী সম্রাটের প্রতিমূর্তিটাকে ব্যাঙের মতন লাফিয়ে পেরিয়ে যেতে। দামি মদ সহযোগে লাঞ্চ সারলো বনেদী ভোয়াসিনে, একটা গাড়ি ভাড়া করে শহরময় চক্কর কাটলো, পথচারিদের দিকে করুণার দৃষ্টিতে চেয়ে সে যেন চীৎকার করে উঠতে চাইছে:

দেখো, এই একজন ধনী লোক চলেছে, যার দাম তু'শো হাজার ফ্রাঁ!

অফিসে গিয়ে সে গট মট করে সরাসরি বড়কর্তার ঘরে গিয়ে ঢুকলো, বলদর্পী গলায় বললো:

"উত্তরাধিকারসূত্রে এই মাত্র লাখ তিনেক ফ্রাঁ আমি পেয়ে গেছি। আর এই চাকরিতে আমার দরকার নেই।"

পুরনো সহকর্মীদের সঙ্গে বড় বড় কথা বলে কাফে অ্যাঁগলাইতে ডিনার খেলো। জীবনে এই প্রথম সে থিয়েটার দেখে আনন্দ পেলো। তারপর একসঙ্গে জনাকয়েক মেয়েমানুষের সঙ্গে মহড়া দিয়ে রাত কাবার করে ফেললো।

অতঃপর দু'মাসের মধ্যেই লাঁতিনের দ্বিতীয় বিবাহ। তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীটির চরিত্র নির্মল, কিন্তু বড় মুখরা, এবং ঐ খিটমিটে মেজাজের জন্ত লাঁতিনের দুর্ভোগের অন্ত নেই।

বিপদ

উনানে আগুন গনগনে, টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম দু'জনের। কাউন্ট দ্য সালু নিজের টুপি, দস্তানা, উলের কোট ইত্যাদি খুলে চেয়ারের ওপর রাখলো। কাউন্টেস্ এর আগেই তার ভালো পোশাকটি ছেড়ে রেখে এসেছে। তবু তার আঙ্গুলগুলিতে চিক্‌চিক্ করছে মণিমুক্তো, ঐ আঙুল দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে চুল বিন্যস্ত করছে। আয়নার বুকে তার রূপ প্রতিবিম্বিত, নিজের দিকে চেয়ে মুচকি হাসলো কাউন্টেস্। পিছনে তার স্বামী স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছে তার স্ত্রীকে। কি যেন সে বলতে চাইছে, কিন্তু বলতে পারছে না কোন অজানা সঙ্কোচে। অবশেষে অবশ্য বলেই ফেলে: আজকে রাতে তুমি যে ভাবে খেলায় মেতে উঠেছিলে! স্বামীর মন্তব্যে স্ত্রীর মুখে বিজয়িনীর হাসি, বেপরোয়াভাবে গ্রীবা বাঁকায়, স্বামীর চোখে চোখ রেখে বলে, "সত্যি তাই?"

তারপর মহিলা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কাপে চা ঢালতে থাকে। কিছুক্ষণ তাদের পারিবারিক আলাপ ও লোক-ভাষা অনুচ্চার থাকে। স্বামী এগিয়ে এসে তার মুখোমুখি বসে। অভিযোগের স্বরে বলে, "দেখো, তোমার ঐ—কাণ্ডকারখানায় আমি বেশ অপদস্থ হয়েছি।" কাউন্টের কথায়

কাউন্টেসের ভ্রূভঙ্গ ঘটে "কেন আমি কি অন্যায়টা করেছি? তুমি কোথায় আমাকে বেচাল হতে দেখলে?"

"না ঠিক তা আমি বলছি না। তবে অনেকরকম ঘটনা ও ইঙ্গিতের সমন্বয়ে একটা ব্যাপারে আমার আর কোন সন্দেহই নেই। সেটা হলো এই যে, মঁসিয়ে বুরেল ইদানীং তোমার প্রতি অতিমাত্রায় নেক নজর দিচ্ছে। এগুলি এক ধরনের অসভ্যতামি। আমার উপায় থাকলে বরদাস্ত করতুম না।"

"ও আমার সোনামণি, তোমার মানসিক অবস্থা আবার এ রকম হলো কবে থেকে? এক বছর আগেও তো তোমার এ সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখিনি। মনে আছে নিশ্চয়, তুমিই বরং একবার একজন প্রণয়িনী জুটিয়েছিলে এবং আমি তোমাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম (অথচ, আমার বেলায় সে রকম প্রেমিকের অস্তিত্ব আমি খুঁজে পাচ্ছি না।) তখন আমি তোমাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলাম,—মাদাম দ্য সারভির সঙ্গে তুমি খুব মাখামাখি করছো আজকাল। বলেছিলাম, তোমার এই মতিচ্ছন্নতা আমার কাছে অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার, আমি মরমে মরে যাচ্ছি।

তুমি সেদিন আমাকে কি জবাবটা দিয়েছিলে, মনে আছে?

বলেছিলে—বিয়ে জিনিসটা হলো দু'জন শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে সম্পাদিত একটা চুক্তি, যার সামাজিক বন্ধন স্বীকৃত, কিন্তু নৈতিক বাধ্যবাধকতা বলতে কিছু নেই। অর্থাৎ মনের বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই স্বাধীন। কি মনে আছে সেই সব কথা? সেইসব দিনে আমি তো তোমার কাছে পোড়োজমি ছিলাম মাত্র। তুমি কেমন নির্মমভাবে আমাকে শুনিয়েছিলে, তোমার প্রণয়িনী নাকি আমার চেয়ে অনেক বেশী মনোমুগ্ধকর ও কোমল! অবশ্য তখন তোমার স্বরে কোন রকম উপেক্ষা বা উষ্মা ধরা যাচ্ছিলো না। তুমি বেশ সুন্দর সাজিয়ে-গুছিয়ে কথাগুলি বলতে পারছিলে আমাকে। আমাকে সরাসরি আহত করবার বাসনা যে তোমার ছিল না, তার জন্য আজো আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। কিন্তু মানুষ হিসেবে তুমি যে কি, তোমার মনের পরিসীমা কতদূর, আমার কাছে আর অজ্ঞাত নয়।

সেই থেকে আমাদের পারস্পরিক বন্ধন শিথিল, অনিবার্যভাবেই সেখানে কোন নিশ্চয়তা নেই। আমরা একই ঘরের ছাদের নীচে বাস করেও একে

অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু তোমার ও আমার মধ্যে ছিল আমাদের একমাত্র সন্তান, যার মুখের দিকে চেয়ে অপরাধপ্রবণতাকে গোপন রেখে অভিনয় করে আসতে হয়েছে দু'জনকে।

তুমি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতে, আমার বিপথগামিতায় তোমার কোন মাথাব্যথা থাকবে না, শুধু এই নিয়ে একটা সামাজিক কেচ্ছা ছড়িয়ে না পড়লেই হলো! পরকীয়া প্রেমে অভ্যস্তা নারী কেমন চতুরতার সঙ্গে নিজের গোপন প্রেম গোপনই রাখে, তুমি বেশ চটকদার বক্তৃতার সাহায্যে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করতে।

আমার আহত অন্তঃস্থল তোমার মানসিকতাকে ঠিকই ধরতে পেরেছিল। তুমি তো তখন মাদাম দ্য সারভির উচ্ছ্রিত প্রেম ও কামনায় আকণ্ঠ ডুব দিয়েছো! ঐ অবস্থায় আমাদের আইনসিদ্ধ সরল ভালোবাসা কি আর তোমার ভালো লাগে? দাম্পত্য প্রেম তোমার কাছে তখন অর্থহীন, তোমার সুখের পথে কাঁটা।

ফলতঃ আমাদের মধ্যে গড়ে উঠলো একটা বিচিত্র সম্পর্ক, যা যে কোন কৌতুকপ্রিয় মানুষের কাছে আকর্ষক মনে হবে। আমরা বাইরে পাঁচজনের সামনে পরস্পর প্রণয়-নির্ভর স্বামী-স্ত্রী; আর ঘরে ফিরে আমরা একে অপরের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। অথচ, গত এক দু'মাসের মধ্যে দেখা দিয়েছে তোমার এই মানসিক পরিবর্তন—তুমি কেমন ঈর্ষাকাতর হয়ে উঠছো।"

"ডার্লিং, ঈর্ষা করবার মতো কোন ক্ষয়িষ্ণু মানসিকতা আমার নেই। তবে আশঙ্কা হয় তুমি যুবতী, তদুপরি অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ—বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে নিজেকে গোপন রাখতে পারবে না, পাঁচজনের মুখরোচক আলোচনার পাত্রী হয়ে দাঁড়াবে।"

"তোমার কথা শুনে আমার হাসি পাচ্ছে। মুখরোচক আলোচনা ও সমালোচনার কথা বলছো? সজ্ঞান জীবনে তুমি কি এর বাইরে? উপদেশ না দিয়ে স্বয়ং দৃষ্টান্ত স্থাপন করো।"

"আমার অনুরোধ, অমন করে হেসে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিও না। গত্যন্তর ছিল না বলেই বলছি। একজন যথার্থ বন্ধুর মতোই তোমাকে এই পরামর্শটা দিচ্ছি। আর তমি অতিরিক্ত উপেক্ষায় নিমেষে তাকে উড়িয়ে দিচ্ছো।"

"আদৌ তা নয়। যেদিন তুমি নিজের মুখে মাদাম দ্য সারভির সঙ্গে তোমার

পরকীয়া প্রেম কবুল করলে, আমি তো সেদিন থেকেই অনুরূপ কোন ঘটনার নায়িকা হবার অধিকার লাভ করেছি। অথচ, বাস্তবে আজ অব্দি আমি তেমন কিছু করে উঠতে পারিনি।"

"আমার আরো কিছু বলবার আছে—"

"দাঁড়াও, আগে আমাকে বলতে দাও। হাঁ, তোমার মতো কোন ঘটনা এখনো ঘটাতে পারিনি। এখনো কোন মনমতো পুরুষ আমার জোটেনি; তবে সন্ধানে আছি। পেলেই ঠিক খেলিয়ে তুলবো। আহ! আমার সেই প্রেমিক হবে সুন্দর বলিষ্ঠ—তোমার চেয়েও সুন্দর—আমার পছন্দ ও রুচিকে তখন তুমি প্রশংসা করবে। কি ব্যাপার, মুখ কালো হয়ে যাচ্ছে কেন?"

"তোমার কাছ থেকে এ ধরনের রসিকতা আমি আশা করিনি।"

"যা বাবাঃ। আমি রসিকতা করছি না। এটা আমার অন্তরের কথা। তোমার এক বছর আগের একটি কথাও আমি ভুলে যাইনি। কাজেই আজ বা আগামী কাল তুমি কি ভাববে বা বলবে, তা নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাই না। ইচ্ছে যখন হয়েছে, প্রেমিক একজন জোটাবই। এ ময়দানে তোমার চেয়ে আমি যে কম কুশলী খেলোয়াড় নই, তার প্রমাণ আমি রাখবো।"

"তুমি এ সব কথা কি করে যে মুখে আনছো, ভেবে পাই না।"

"ভেবে পাও না? তাজ্জব! বেচারা মসিয়ো দ্য সারভিকে নিয়ে মাদাম দ্য জারস্ যখন সেদিন ঠাট্টা করেছিল, তুমিই তো সেই লোক, যে তখন সোল্লাসে হেসে উঠেছিলে। মনে নেই?"

"তা হতে পারে। কিন্তু তোমার মুখে এ সব উক্তি শোভন নয়।"

"তাই নাকি! উর্দিপরা পরিচারক পরিবৃত কাউণ্ট বলে নাকি তোমার এই বিশেষ একপেশে সম্মানবোধ? নতুবা, মসিয়ো দ্য সারভির বেলায় যা ঠাট্টা, তোমার বেলায় তা অন্যায় ঠেকবে কেন? একেই বলে মানুষের বিধিলিপি! যাক, এ সব নিয়ে বকবকানি বা স্বগতোক্তি করতেও আমার ভালো লাগে না। আসলে আমি দেখতে চেয়েছিলাম, অনাগত পরিণতির জন্য মানসিক দিক থেকে তুমি প্রস্তুত আছো কিনা!"

"প্রস্তুত? কিসের প্রস্তুতি?"

"বঞ্চিত হবার প্রস্তুতি। ইয়ার্কি নয়, মানসিক দিক থেকে তৈরী না থাকলে কোন মানুষই তখন ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে না। এ সব কথা শুনলেই মানুষের মাথায় খুন চড়ে।..."

"তুমি এই রাতে আমার সঙ্গে খুব নিষ্ঠুরের মতো ব্যবহার করছো। তোমার এ রকম রূঢ় ব্যবহারের আমি কোন হদিশ খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি দারুণ বদলে গেছো।"

"ঠিক বলেছো। সত্যি আমি দারুণ বদলে গেছি। আমার ভেতর এখন পাপের বনিয়াদ মজবুত। নষ্ট হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমার স্বাভাবিক সরল সহজ বৃত্তিগুলির এই যে বিকট পরিবর্তন, এর জন্য দায়ী কে? তুমি।"

"প্রিয়া লক্ষ্মীটি, এসো, আমরা সদ্ভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে পরস্পরকে গ্রহণ করি। তোমার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, আমার সকাতর ভিক্ষা —মসিয়ো বুরেলেকে তুমি আর প্রশ্রয় দিও না।"

"বুঝতে পারছি, তুমি একেবারে হিংসুটের বেহদ্দ। ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে মরছো।"

"না, হিংসা নয়, ঈর্ষা নয়। আসলে আমি কারুর করুণার ও উপহাসের পাত্র হয়ে বেঁচে থাকতে পারি না। আর যদি কোন দিন দেখি, আমারই চোখের সামনে লোকটা তোমার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, আমি ওকে গুঁড়িয়ে দেবো।"

"তাহলেই কি তুমি আমাকে ভালোবাসতে পারবে?"

"পারবো না কেন? তোমার জন্য আমি আরো সাংঘাতিক কিছু করে বসতে পারি। নিজের ওপর এ আস্থা আমার আছে।"

"ধন্যবাদ। তোমার ঐ শূন্যীভূত মনের জন্য আজ আমার করুণা হচ্ছে। আমি তোমার জন্য দুঃখ করছি, কারণ তোমাকে ভালোবাসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।" কাউন্ট উঠে দাঁড়ালো। এই মর্মান্তিক জিজ্ঞাসার সে একটা হিল্লে করতে চায়। টেবিলটাকে এক চক্কর পাক খেয়ে তার স্ত্রীর পিছনে এসে দাঁড়ালো, নতুন করে সে আবিষ্কার করলো—তার স্ত্রী অপূর্ব রূপসী, ডানাকাটা পরী যেন। অন্তঃস্থলের সমস্ত আবেগ নিয়ে চকিতে সে স্ত্রীর ঘাড়ে চুমু খেয়ে বসে।

এই আচমকা ব্যাপারটা মোটেই সাধারণ সোহাগ বা রসিকতার গয়না হিসেবে নিলো না কাউণ্টেস, সটান চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, কুঁদুলি মেয়ের গলায় কল্‌কলিয়ে ওঠে:

"তোমার সাহস তো কম নয়! প্রকৃতপক্ষে যার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক নেই, তাকে ছুঁতে চাইছো কোন অধিকারে?"

"রাগ করো না সুন্দরী। তোমায় আজ কী চমৎকার দেখাচ্ছে, আদর না করে থাকতে পাচ্ছি না!"

"তাহলে হালফিল আমার চেহারায় বেশ চটক এসেছে, বলতে হবে।"

"তোমাকে দেখছি, আর আমার ভেতর লোভের পোকাটা সুড়সুড়ি দিয়ে উঠছে। এমন বাহু, গ্রীবা, মসৃণ ত্বক—রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয়—"

"আশা করি, আমার এইসব নিজস্ব বস্তু সহজেই মসিয়ো বুরেলকে আকর্ষণ করতে পারবে—"

"ছিঃ! এ রকম নোংরা ভাবনা তোমার! মাইরি বলছি, এখন আমার মনে হচ্ছে—তোমার মতো সুন্দরী যৌবনবতী এর আগে কখনো আমার নজরে পড়েনি।"

"কয়েকদিন কি খাদ্য পাচ্ছো না?"

"মানে?"

"মানে, বর্তমানে তোমার শরীর নিশ্চয় উপোসী রয়েছে।"

"যা বলতে চাইছো, স্পষ্ট করে বলো।"

"যা বলছি, না বুঝবার কারণ তো তোমার নয়। নিশ্চয় তুমি বেশ কিছু-দিন উপোস করে এখন রীতিমত বুভুক্ষু। ফলে হাতের কাছে যা পাচ্ছো, তাই সুস্বাদু খাদ্য হিসেবে ছিনিয়ে নিতে চাইছো। না হলে, আমি তো এত-কাল তোমার কাছে অখাদ্যই ছিলাম! আজ রাতে সেই অখাদ্যের প্রতিই তোমার এত আসক্তি!"

"মার্গারেত, এমন কুৎসিৎ কথাবার্তা কার কাছ থেকে শিখেছো?"

"তোমার ভাঁড়ার থেকেই তো যোগাড় করেছি এই সমস্ত চোখা চোখা শব্দ। যতদূর জানি, বাজারে তোমার চারজন নর্মসহচরী রয়েছে,—তাদের একজন অভিনেত্রী, একজন সম্ভ্রান্তবংশীয়া, একজন নেহাতই বাজারে সস্তা মেয়ে, অন্যজন—! কাজেই আজ যে হঠাৎ তোমার আমার প্রতি প্রেম উথলে উঠছে, এর ব্যাখ্যা তো একটিই হতে পারে—অনেকদিন তোমার শরীর খাদ্য পায়নি।"

"তুমি ভাবতে পারো, এটা আমার অভ্যাসগত ব্যাপার। ভাবতে পারো, আমি নিষ্ঠুর ও বর্বর। আদতে আমি কিন্তু দ্বিতীয়বার তোমার প্রেমে পড়েছি। তোমার প্রেমে আমি উন্মাদ।"

"দারুণ খুশির খবর। আমি বিলকুল নিঃশব্দ। অর্থাৎ তোমার বাসনা—"

"ঠিক ধরেছো, ঠিক ধরেছো।"

"আজ রাতেই হবে ?"

"আহ্, মার্গারেত।"

"এই খবরদার, দূরে দাঁড়িয়ে যা বলবার বলো। আবার অসভ্যতামি। গা আমার ঘুলিয়ে ওঠে এ সব অনধিকার জুলুম দেখলে। শান্ত ভদ্র হয়ে কথা বলো এবং বলতে দাও। তোমার ব্যবহার হওয়া উচিত নৈর্ব্যক্তিক ; কারণ আমি তোমার কেউ নই, তুমিও আমার কেউ নও। এটা সত্যি বটে, আমি তোমার স্ত্রী। কিন্তু আমরা পরস্পর স্বাধীন। আজ হোক, কাল হোক, আমি কাউকে না কাউকে প্রেম নিবেদন করবোই। তবে যদি উপযুক্ত মূল্য দিতে রাজি থাকো, আমি তোমাকেই প্রথম সুযোগ দেবো।"

"কি যে ছাই বলছো, বুঝতে পারছি না। স্পষ্ট করে বলো।"

"বেশ, খুলেই বলছি। আমি কি তোমার নর্মসহচরীদের মতো সুন্দরী ?"

"আলবাৎ। হাজার গুণ বেশি সুন্দরী।"

"সবচেয়ে সুন্দরীদের সঙ্গে আমার কোন তুলনা হয় ?"

"তুমি সুন্দরীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা।"

"আচ্ছা, গত তিনমাসে তুমি তোমার সবচেয়ে আকর্ষণীয়া প্রণয়ীকে মাসিক কত করে দিয়েছো ?"

"ধ্যাৎ, কি তুমি বলতে চাও ?"

"বলছি, তোমার সেরা প্রেমিকাকে খুশি করতে মাসিক কত ব্যয় করতে হতো ? দামী গহনা কিনে দিতে, গাড়ি ভাড়া করে চক্কর খেতে, যখন তখন ডিনার পার্টিতে কি পরিমাণ খরচটা হয়েছে তোমার ?"

"কি যন্ত্রণা ! কি করে আমি তা এখন বলবো ?"

"তোমার বলা উচিত। তা আন্দাজে বলতে পারি, মাসে হাজার পাঁচেক ফ্রাঁ। তাই নয় ?"

"প্রায় তাই।"

"বেশ, আমারও দাবি ঐ—মাসিক পাঁচ হাজার ফ্রাঁ। আজ রাত থেকে পাক্কা একটি মাস তুমি আমাকে উপভোগ করতে পারবে।"

"মার্গারেত, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ?"

"মাথা আমার ঠিকই আছে। দরে না পোষালে বলো, আমি এখন নিজের ঘরে ঢুকি।"

কাউণ্টেস্ নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে। গোটা ঘরময় কাউণ্টেসের শারীরিক সুগন্ধ ম'-ম'। দিশেহারা কাউণ্ট তার স্ত্রীর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললো:

"কি সুন্দর তোমার দেহের গন্ধ।"

"ভালো লাগছে বুঝি? আমি সব সময়ই পয়স্য এস্পেন দিয়ে প্রসাধন সেরে থাকি। অন্য কোন সুগন্ধি আমার পছন্দ নয়।"

"আমি তো এতকাল খেয়াল করিনি—চমৎকার জিনিস।"

"বেশ। দয়া করে এবার তুমি আমার ঘরের সামনে থেকে সরো। আমি শুয়ে পড়বো।"

"মার্গারেত!"

"অনুগ্রহ করে যাবে কি?"

কাউণ্ট কিন্তু যায় না। উল্টো ঘরে ঢুকে একটা আসন টেনে নিয়ে বসে। কাউণ্টেস্ বলে:

"ও, তুমি তবে সরছো না? বেশ, তবে তোমার চোখের সামনেই আমাকে পোশাক বদলাতে হচ্ছে।"

আস্তে আস্তে কাউণ্টেস্ তার শরীর থেকে একে একে পোশাকগুলিকে মুক্তি দিতে থাকে। দেখা গেল অনাবৃত তার দীর্ঘ বাহু ও মসৃণ কাঁধ; তারপর চুল খুলবার জন্য মাথায় হাত দিতেই লোভনীয় একজোড়া স্তন-বৃত্ত দৃষ্ট হয়। তপ্ত শরীর নিয়ে কাউণ্ট তার দিকে এগিয়ে এলো এক পা।

সঙ্গে সঙ্গে কাউণ্টেস্ হুঁশিয়ার করে দেয়, "আবার বর্বরতা করতে এসো না। আমি বরদাস্ত করবো না।"

কাউণ্ট ওর দুটি হাত জড়িয়ে ধরে চুমু খাবার প্রাণান্ত প্রয়াস পায়। কাউণ্টেস্ ঝটিতি নিজেকে মুক্ত করে নেয়, ড্রেসিং টেবিল থেকে একটা সেণ্টের শিশি তুলে স্বামীর মুখের উপর ছুঁড়ে মারে। আঘাত পেয়ে কাউণ্ট তেতে লাল। দাঁতে দাঁত ঘষে উচ্চারণ করে:

"শয়তানী। নচ্ছার।"

"হ্যাঁ, আমি শয়তানী নচ্ছারই বটে। কিন্তু তুমি তো আমার শর্ত জানোই —মাসিক পাঁচ হাজার ফ্রাঁ।'

"অসম্ভব।'

"কারণ?"

"কারণ, কোন স্বামী তার স্ত্রীর বিছানায় যাবার জন্য টাকা ঘুষ দেয় না।"

"টাকা না দিলে তুমি আমার কাছে জুলুমবাজ লোক হিসাবেই অভ্যর্থনা পাবে।"

"হাঁ, আমি জুলুমবাজই। তাই বলে টাকা দিয়ে স্ত্রীকে কেনার মতো কুৎসিৎ কাজ করতে আমি রাজি নই।"

"অথচ বাজারে একটা মেয়ের পায়ে টাকা ঢেলে দিতে তোমার রুচিতে বাধে না। বাড়িতে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও এরকম মেয়েবাজি করে যাওয়াটা কি কুৎসিৎ নোংরা কাজ নয়?"

"কুৎসিৎ নোংরা হলেও সেটা খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু স্ত্রীকে সম্ভোগ করবার জন্য টাকা ঢালতে হচ্ছে—এর চেয়ে অপমানকর ঘটনা কি আর হতে পারে?"

কাউণ্টেস্ বিছানায় উঠে তার মোজা খুলতে থাকে। ক্রমশ দেখা যায় তার অনুপম পদযুগল, নরম পায়ের ডিম, মাখন-রং জানু…।

কাউণ্টের গলার স্বর ধরে আসে:

"মার্গারেত, তোমার অসংগত বাসনা ত্যাগ করো।"

"কোনটা অসংগত?"

"ঐ পাঁচ হাজার ফ্রাঁ।"

"অসংগত মোটেই নয়। তুমি আমার সঙ্গে প্রেম-প্রেম ফষ্টি-নষ্টি করতে চাইছো। অথচ, কার্যত আমরা একে অপরের কাছে অপরিচিত। তুমি তো আমাকে আবার বিয়ে করতে পারো না, কারণ সে পর্বটা অনেকদিন আগেই সম্পন্ন করা হয়েছে। এখন কেবল মাত্র তুমি আমাকে কিনে নিতে পারো। আমার যা দাম, তাই দেবে। ঈশ্বর! তুমি কি এর আগে টাকার বিনিময়ে নারী-সম্ভোগ করোনি? তুমি যদি বাজারে বহুভোগ্যা মেয়েদের পিছনে জলের মতো টাকা ব্যয় করতে পারো, আমার মতো প্রায় পবিত্র স্ত্রীর জন্য কেন খরচ করবে না? বরং সেটাই কি চমৎকার হবে না? একটা নতুন দৃষ্টান্তও স্থাপন করতে পারবে। তোমার মজা আসবে। আমি জানি, টাকা খরচ করতে পারলে পুরুষদের পৌরুষ তৃপ্ত হয়। দেখবে, ঐ সব অবৈধ প্রেমের চেয়ে এ দাম্পত্য চুক্তিতে ফূর্তি অনেক বেশি পাবে। কি?"

কথা শেষ করে কাউণ্টেস্ কলিংবেল টেপে, বলে: "এখনো যদি সসম্মানে বিদায় না হও, আমি আমার পরিচারিকাকে ডাকতে বাধ্য হবো।"

উপায়হীন দুঃখিত কাউণ্ট পকেট হাতড়ে একতাড়া নোট বের করে স্ত্রীর দিকে ছুঁড়ে দেয় :

"এই নাও ডাইনি ছ'হাজার ফ্রাঁ আছে। কিন্তু মনে রেখো—"

হাসি হাসি মুখে টাকাটা গুণে কাউণ্টেস্ জিজ্ঞেস করে, "কি মনে রাখতে হবে ?"

"এ টাকা খরচ তুমি করতে পারবে না।"

খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে কাউণ্টেস্ :

"প্রতি মাসে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ। যখনই দিতে পারবে না, আমিও তোমাকে কিছু দিতে পারবো না, সোজা ঠেলে দেবো আবার ঐ সব নাটুকে মেয়েদের কাছে। আর যদি তোমার সব তৃপ্তিই আমি মেটাতে পারি, তবে আরো বেশি টাকা কিন্তু দাবি করবো।"

সংসার

[A Family]

গত পনেরো বছর যাবৎ যাকে দেখিনা আমার সেই বন্ধু সাইমন র‍্যাডিভিনের সঙ্গে আবার দেখা করতে চলেছি।

একসময় সে ছিল আমার সেরা বন্ধু। ঘনিষ্ঠতম সুহৃদ। কত দীর্ঘ, শান্ত ও উৎফুল্ল সন্ধ্যা তার সঙ্গে কাটিয়েছি! মনের কত সংগোপন রহস্য সে অকপটে আমাকে বলেছে। তার স্বরে ফুটে উঠতো অকৃত্রিমতা, সহানুভূতি, সৌজন্য-বোধ, যা সহজেই মনের ভার লাঘব করে। অনেকগুলি বছর ধরে আমরা সত্যি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আছি। একসঙ্গে খেলেছি, ঘুরেছি, চিন্তা করেছি, স্বপ্ন দেখেছি; একই ধরনের বস্তুতে আমাদের আসক্তি ছিল, আমরা একই ধরনের বই পড়েছি, শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের অভিমত ছিল অভিন্ন। আমরা একে অপরের মনের কথা বুঝে নিতাম এক পলক দৃষ্টিপাতেই।

সেই বন্ধু হঠাৎ প্যারিসের এক বিবাহে ইচ্ছুক মেয়েকে একদিন বিয়ে করে বসলো। এই নাতিদীর্ঘ চেহারার পরিপাটি চুল, ঝক্‌ঝকে চোখ, শূন্যদৃষ্টি,

খাটো খাটো হাত, বোকার মতন কথাবার্তা, আরো হাজারটা সাধারণ মেয়ের সমগোত্রীয়—কোন কৌশলে আমার বন্ধুর মতন একজন শানিত বুদ্ধি, পরিশীলিত যুবককে দিব্যি তুলে নিয়ে চম্পট দিলো? এ প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে পারবে না। নিশ্চয় আমার বন্ধু আশা করেছিল, বিশ্বস্ত সুগৃহিণীর প্রেমপূর্ণ বাহু বন্ধনে সে জীবনের সুখ খুঁজে পাবে। সে হয়তো সেই প্রতিশ্রুতি দেখতে পেয়েছিল মেয়েটির দুই চোখে।

বন্ধুবর সে সময় বুঝবার চেষ্টা করেনি,—একজন কর্মক্ষম, উৎসাহী ও সংবেদনশীল মানুষ কোন বস্তুর স্থূলতা বেশীদিন সহ্য করতে পারে না। অবশ্য এর মধ্যে যদি সে নিজের স্বকীয় বুদ্ধি ও রুচি বিসর্জন না দিয়ে থাকে।

আজ আমি সেই বন্ধুকে কি অবস্থায় দেখবো? সে কি এখনো প্রাণপূর্ণ, রহস্যপ্রিয়, সদালাপী ও উৎসাহী? অথবা, প্রাত্যহিক স্থূল একঘেঁয়েমিতে এখন নিছক ঘুম-কাতুরে? পনেরো বছরে একটি মানুষের অনেক পরিবর্তনই সম্ভব।

ছোট স্টেশানে ট্রেন থামলো।

যে মুহূর্তে কামরা থেকে নামতে যাবো, জনৈক লাল চোয়াল পেট মোটা সমর্থ্য চেহারার লোক দু'হাত বাড়িয়ে আমার দিকে ছুটে আসতে আসতে চীৎকার করে ডাকে, "জর্জ!"

যদিও প্রথমে তাকে চিনতেই পারিনি, তবু সেই আলিঙ্গনে ধরা দিই।

"অদ্ভুত লাগছে! তুই আর সে রকম রোগাটে নস।"

—বিস্ময়ে অস্ফুটস্বরে বলি।

"তুই কি আশা করেছিলি?" উচ্ছল হাসির সঙ্গে সে জবাব দেয়, "মোটা হবো না? পরম সুখে আছি। বহাল তবিয়তে দিন কাটাচ্ছি। রাতগুলি মনোরম! ভালো ভালো খাবার খাই, নিশ্চিন্তে ঘুমাই। এই আমার জীবন।"

আমি তার মুখের দিকে চেয়ে তখনো খুঁজছি সেইসব বৈশিষ্ট্যগুলি, যাদের এককালে ভালোবাসতাম।

একমাত্র চোখদুটোর মধ্যে অতীতের ছায়া দেখছি, তাও সেই পরিচিত চাকচিক্য আর সেখানে নেই।

আপন মনে ভাবি: দৃষ্টির ঔজ্জ্বল্য যদি বুদ্ধির অভিপ্রকাশ হয়, তবে আমার বন্ধুটি আর আগের মতো বুদ্ধিদীপ্ত নয়। অবশ্য চোখ তার জলছে, আনন্দ ও বন্ধুত্বের প্রভাবে চক্ চক্ করছে, শুধু প্রার্থিত বুদ্ধির ছাপ নেই।

"ঐ দেখ, আমার প্রথম দুই সন্তান।"

—সাইমন হঠাৎ বলে ওঠে।

বছর চৌদ্দর একটি মেয়ে চেহারায় প্রায় মহিলা এবং বছর তেরোর একটি ছেলে স্কুলের পোষাক পরে, ঢিমে-তালে এগিয়ে আসছে।

"তোর ছেলে-মেয়ে?"

—আমি অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞেস করি।

'হাঁ।"

—হেসে জবাব দেয় সে।

"ছেলে-মেয়ে ক'টি?"

"পাঁচটি। বাকি তিনটে বাড়িতে আছে।"

সে বেশ অহঙ্কারে খুশী খুশী গলায় বিজয়ীর দর্পে কথা বলছে যেন. আমার মুখ বিকৃত হয়, মনে মনে আমি সাইমনকে করুণা করতে শুরু করেছি। রাতে ঘুমের আচ্ছন্নতায় স্থুলসুখে খরগোশের মতন খালি বাচ্চা পয়দা করা—আর সেই সৃষ্টি-গর্বে বন্ধুটি আমার কেমন অকপট ও ডগমগ।

গাড়িতে উঠে বসি। সে নিজেই গাড়ি চালায়। চলেছি শহরের মধ্য দিয়ে। শহরের পরিধি প্রশস্ত নয়, কেমন একটা বিমর্ষ, ঘুমন্ত ও অলস পরিবেশ। রাস্তায় দ্রষ্টব্য বলতে কিছুই নেই, মাত্র কয়েকটা কুকুর ও চাকর শ্রেণীর লোক নজরে আসে।

যেতে যেতে একাধিক দোকানদারের সঙ্গে চোখাচোখি হয়, তার সাইমনকে দেখে টুপি হেলায়, সাইমনও প্রতিঅভিবাদন জানায়; প্রতিটি দোকানদারের নাম-ধাম গড়গড়িয়ে বলে চলে; যেন প্রমাণ করতে চাইছে, এই অঞ্চলের সকলের সঙ্গেই তার দহরম মহরম। আমি ভাবছি, সাইমন হয়তো আগামী নির্বাচনে ডেপুটী হবার স্বপ্ন দেখছে। এই সব অজ মফস্বলবাসীর ওটাই তো মোক্ষম বাসনা।

পার্কের মতন একটা জায়গা পাঁক খেয়ে গাড়িটা এসে যে বাড়ির সামনে দাঁড়ায়, তাকে পাড়া-গাঁ এলাকার প্রাসাদ বলা চলে।

"এই আমার দীন কুটির।"

—আমার দিকে চেয়ে সাইমন স্বীকৃতি চায়।

"খুব সুন্দর।"

—আমি বলি।

সিঁড়ির সামনেই গৃহকর্ত্রী। অতিথি অভ্যর্থনায় দাঁড়িয়ে আছে। বাইরের লোক আসছে বলেই চুলগুলি পরিপাটি ক'রে বেঁধেছে, অভ্যর্থনাও জানাচ্ছে যেন মুখস্ত করা বুলিতে। পনেরো বছর আগে গির্জায় আমি যে চমৎকার চুল ও বর্ণহীন যুবতীকে দেখেছিলাম, এ যেন সে নয়! এখন সে অনেক শক্ত সমর্থ চেহারার, অস্বাভাবিক প্রসাধন করেছে। এই মহিলাকে তাদেরই একজন বলে মনে হয়, যাদের কোন বয়স নেই, চরিত্র নেই, রুচি নেই, সলজ্জ সৌন্দর্য নেই—অর্থাৎ, নেই সেই সমস্ত গুণ, যা একজন রমণীকে পূর্ণতা দান করে।. এ শুধু সন্তানের জন্ম দেয়, থাক থাক চর্বিবহুল দেহ নিয়ে যান্ত্রিক নিয়মে শয্যাসঙ্গিনী হয় এবং নতুন নতুন প্রাণীকে পৃথিবীতে নিয়ে আসে। এর যাবতীয় উৎসাহ ও তৎপরতা নিজের সন্তান ও রান্নার বই নিয়ে।

তার স্বাগত আহ্বান পেয়ে আমি বড় ঘরটায় প্রবেশ করি। সেখানে পর পর তিনটে শিশু তাদের উচ্চতা অনুযায়ী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। ভঙ্গীটা এমন যেন কোন মেয়রের সামনে তিনজন তটস্থ প্রহরী একেবারে নিশ্চল।

"বাঃ। এরাই বুঝি বাকি তিনজন?"

—আমি বলি।

সাইমন প্রায় লাফিয়ে এসে ওদের পরিচয় দিতে থাকে, "জাঁ, সাঁফি এবং গণত্রাঁন।"

ড্রয়িংরুমের দরজা খোলা। ভেতরে ঢুকে দেখতে পাই, ঘরের এক কোণে চেয়ারে বসে এক পঙ্গু বুড়ো থরথরিয়ে কাঁপছে।

মাদাম র‍্যাডিভিন পরিচয় করিয়ে দেয়, "উনি আমার ঠাকুর্দা। সাতাশি বছর বয়স।" তারপর বুড়োর কানের কাছে মুখ নিয়ে চীৎকার করে বলে, "দাদু, সাইমনের বন্ধু।" ঠাকুর্দার প্রাচীন মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটে ওঠে, শুভেচ্ছা জানাবার চেষ্টা করে, কিন্তু গলা চিরে শুধু একটা গর্ গর্ আওয়াজ বের হয়ে আসে, কোন রকমে হাত নাড়ায়।

আসন নিতে নিতে প্রথাসিদ্ধভাবে বলি, "আপনাকে ধন্যবাদ।"

এই সময় সাইমন আবার আমাদের সামনে এসে হাজির হয়।

খুব উৎসাহের সঙ্গে সে বলে, "ঠাকুর্দার সঙ্গে তবে পরিচয় হয়ে গেল! ঠাকুর্দা একটি রত্নখনি মাইরি। বাচ্চা-কাচ্চাদের সব সময় একেবারে জমিয়ে রাখে। বুড়ো বয়সে লোভটা বেড়ে গেছে খুব; সুযোগ পেলে এতটা খাবে যে দম বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। তুই কল্পনা করতে পারবি না, ওঁর ওপর নজর না রাখলে গাদা গাদা খেয়ে কী কাণ্ড যে করে বসবে! তুই নিজেই পরীক্ষা করে দেখিস। খাবারের থালায় মিষ্টিগুলির দিকে এমন চোখে তাকাবে যেন মেয়েমানুষ দেখছে। এমন মজা, ভাবতেও পারবি না! দেখবি কিছুক্ষণ বাদেই।"

আমাকে আমার থাকবার ঘর দেখানো হলো। হাত মুখ ধুয়ে নিলুম। কারণ, খাবারের সময় প্রায় উপস্থিত। সিঁড়ির ওপর দুপ্-দাপ্ দুপ্-দাপ্ পায়ের শব্দ শুনতে পাই। বাচ্চারা সব মিছিল করে তাদের বাবার সঙ্গে এদিকেই আসছে। নিঃসন্দেহে আমাকে সম্মান জানাবার জন্য ওদের এই প্রয়াস।

আমার ঘরখানা মসৃণ বড়সড়, জানালা দিয়ে দেখা যায় আদিগন্ত সবুজের হাট, ঘাসের সমুদ্র, গম ও যবের দীর্ঘ ক্ষেত। বড় গাছ একটিও নেই, কোন পাহাড় বা টিলার চিহ্নমাত্রও নেই। এখানে জীবন নিশ্চয় বৈচিত্র্যহীন ও বিষণ্ণ।

বেল বেজে উঠলো। খাবারের টেবিলে যেতে হবে। আমি নামতে থাকি।

মাদাম র‍্যাডিভিন আমার হাত ধরতে শরীরটা শির শির করে ওঠে। ডাইনিং-রুমে এলাম দু'জনে। বাড়ির একটি চাকর ঠাকুর্দার চেয়ারটা টানতে টানতে এ ঘরে নিয়ে আসে। এবং টেবিলের সামনে এগিয়ে আসা মাত্রই বুড়োর লোভী চোখ দুটো চক্ চক্ করতে থাকে, তার দৃষ্টি ঝলকাচ্ছে পুডিং-এর ডিসের ওপর; কাঁপতে কাঁপতে তার মাথা ক্রমশঃ ঘুরতে থাকে—এক ডিশ থেকে আর এক ডিশে।

সাইমন তখন হাত পুঁচছে। হঠাৎ তার এবং এ ঘরের সমস্ত শিশুদের খেয়াল হলো, আমি অবাক হয়ে লোভী বুড়োর কাণ্ডটা দেখছি। আমার এই বিস্ময় দেখে তারা সমস্বরে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। সবাই হাসছে হো-হো হা-হা। শুধু বাচ্চাদের মার হাসি স্মিত এবং সে তার ঘাড় ঝাঁকায়।

র‍্যাডিভিন মুখে চোঙ লাগিয়ে বুড়োকে শোনায়: "আজকের ডিনার—মিষ্টি, ভাত, আরো অনেক কিছু।"

বুড়োর হিজি বিজি কাঁটা মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, মাথা থেকে পা অব্দি গোটা শরীরটা ভয়ানক কাঁপতে থাকে। ঐ কম্পন বুঝিয়ে দিচ্ছে, সে খাবারের তালিকা শুনে খুব খুশি।

ডিনার শুরু হয়।

"দেখ", চাপাস্বরে সাইমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দাদু কিছুতেই ঝোল খেতে চাইছে না, অথচ তাকে জোর করে ঝোল খাওয়ানো হচ্ছে। স্বাস্থ্যের কারণেই ঝোল নিয়ে দাদুর ওপর এত জোরাজুরি। একজন চাকর জোর করে তার মুখের গহ্বরে এক চামচ ঝোল ঢেলে দেয়। কিন্তু দাদুর আর সহ্য হয় না, আচমকা ফোয়ারার মতন সে সেই জলীয় খাদ্য চারদিকে ছড়াতে থাকে; অত্যন্ত কুৎসিৎভাবে তার মুখনির্গত সেই খাবার টেবিলটাকে নষ্ট করে, তার কাছাকাছি যারা বসে আছে তাদেরও জামা-কাপড় নোংরা করে।

বাচ্চাগুলি খিল খিল হেসে ওঠে, আর তাদের বাপ খুব মজাতে গদ গদ হয়ে বলে, "ভারী অদ্ভূত এই বুড়োমানুষটি, তাই নয়?"

খাবার টেবিলের গোটা সময়টাই দাদু যেন অধিকার করে নিলো। সবাই খালি তাকে নিয়েই ব্যস্ত। বুড়োর গোল গোল লোভাতুর দৃষ্টি এ পাত্র থেকে সেপাত্রে ঘুরছে, কখনো কখনো কাঁপা হাতে চেষ্টা করছে থালা থেকে খাবার কেড়ে নিতে। এক আধবার ইচ্ছে করেই লোভনীয় খাবারের থালাটা তার নাগালের মধ্যে আনা হয়, বুড়োর তখনকার প্রাণান্ত প্রয়াস ও পরিণামে গভীর হতাশা উপস্থিত সকলকে দারুণ আনন্দ দেয়।

তারপর ছোট্ট এক টুকরো খাবার তার পাতে দেওয়া হলো। সে এমন গোগ্রাসে তা গিলে খায়, যেন এখনই অন্যান্য উপাদেয় খাবার পাবার জন্য পাত পরিষ্কার রাখা দরকার। পায়েসের পাত্র যখন এলো, বুড়োর অবস্থা তখন শোচনীয়। পাগলের মতন আকু পাকু করছে। গনত্রঁন কিন্তু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তাকে বলে, "দাদু, তোমার খাওয়া অনেক হয়েছে। আর নয়।" নাতির কথায় বুড়ো কাঁদতে শুরু করে। শোকের উচ্ছ্বাসে সে যত কাঁপে, খুশির জোয়ারে বাচ্চারা ততই হাসিতে ফেটে পড়ে।

অবশেষে তার ভাগের অংশ, খুব সামান্য পরিমাণ পায়েস তাকে দেওয়া হলো। আর সেই মিষ্টি মুখে নিয়ে বুড়োর কত রকমের অঙ্গভঙ্গী, গলা ও জিভের শব্দ।

ঐটুকু খাওয়া হ'য়ে যাবার পর পা নাচিয়ে নাচিয়ে সে আবার বায়না ধরে

বুড়োর এই করুণ আর্তিতে আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন করতে থাকে। বন্ধুকে না বলে পারিনা, "ওঁকে আর একটু পায়েস দিলে হয় না ?"

"এ্যাঁ! না বন্ধু, না," সাইমন বলে, "এই বয়সে বেশি খাওয়াটা ক্ষতিকারক।"

বন্ধুর যুক্তি শুনে আমি থ! যুক্তি, নৈতিকতা, সদিচ্ছা—সমস্তই বিসর্জিত হলো বয়সের দোহাই দিয়ে। বয়স ও স্বাস্থ্যের যুক্তিতে এরা একজন মানুষকে তার একমাত্র আনন্দ থেকে বঞ্চিত করছে।

কি আর ক্ষতি হতো তাকে ইচ্ছামতন খেতে দিলে? ক'দিন আর আয়ু আছে তার? ক'দিন? দশ, কুড়ি, পঞ্চাশ অথবা, এক শ'? শুধু কি বুড়োর আয়ু ও স্বাস্থ্যের কারণেই এই ধরনের ব্যবস্থা? না, এই পরিবারের সদস্যদের সামনে এক উৎকট আনন্দের উৎস হিসেবে বুড়োকে এভাবে খাবারের টেবিলে ব্যবহার করা হচ্ছে? কোনটা সত্যি?

এ জীবনে তার আর কিছুই করণীয় নেই, কিছুই নেই। মাত্র একটিই আনন্দ, একটিই বাসনা অবশিষ্ট আছে তার। কেন মৃত্যুর আগে তাকে সেই আনন্দের পূর্ণ-স্বাদ গ্রহণ করতে দেওয়া হবে না?

অবশেষে, অনেকক্ষণ ধরে এই রকম অসহ্য এক খেলা দেখবার পর আমি নিজের ঘরে ফিরে আসি, শুয়ে পড়ি। আমি তখন দুঃখিত, ভীষণ দুঃখিত, দারুণ বিমর্ষ!

এক সময় জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। বাইরে নিঃস্তব্ধ প্রকৃতি; শুধু কাছাকাছি কোথায় যেন একটা পাখি মিষ্টি সুরে ডেকে চলেছে। নিশ্চয় পাখিটা রাতভোর ডিম-এ তাঁ দেওয়া তার সঙ্গিনীকে চাপা গলায় ডাকছে।

আর আমি ভাবছি পাঁচ-সন্তানের জনক আমার সেই হতভাগ্য বন্ধুর কথা, যে এতক্ষণে নিশ্চয় তার কুরূপা স্ত্রীকে পাশে নিয়ে যেতে উঠেছে।

ডট এ্যাণ্ড ক্যারি

[Dot and Carry]

কী অদ্ভুত অতীতের সেই সমস্ত স্মৃতিগুলি, যা আমাদের মনকে বরাবর অধিকার করে রাখে এবং আমরা কখনো ভুলতে পারি না

বর্তমান গল্পটি এত পুরনো, এত সুদূর অতীতের যে, কেন এখনো আমি তাকে মনে গেঁথে রেখেছি, বুঝতে পারি না! জীবনে এর পর অনেক উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় ঘটনা ঘটতে দেখেছি, কিন্তু একটি দিনের জন্যও বৃদ্ধা ডট এ্যাণ্ড ক্যারির মুখাবয়বকে ভুলতে পারিনি; দূর অতীতে, যখন আমার বয়স ছিল দশ বারো বছর, তাকে যেমনটি দেখেছিলাম, আজো মনের পর্দায় তাকে ঠিক তেমনটিই দেখতে পাই।

সে ছিল বয়স-প্রাচীন মহিলা দর্জি; প্রতি মঙ্গলবার আমাদের বাড়িতে আসতো জামা-কাপড় সেলাই করতে। আমাদের বাড়িটা পুরনো হলেও চমৎকার ও বিশাল ছাদবিশিষ্ট, চারদিকে চার-পাঁচটি নির্ভরশীল খামার। স্থানীয় এলাকায় ছোট বড় গ্রাম ও শহর বেষ্টিত একটি গির্জাও আছে, সময়ের বিবর্তনে যার লাল ইঁটগুলি ক্রমশঃ কালচে বর্ণ ধারণ করেছে।

প্রতি মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যে ডট এ্যাণ্ড ক্যারি আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হতো এবং সরাসরি উঠে যেত সেলাই-ঘরে তার কাজ শুরু করবার জন্য।

দীর্ঘাঙ্গি ও শীর্ণ এই মেয়েমানুষটির সবাপেক্ষা লক্ষণীয় বস্তু তার চুল, যা উপচে পড়তো তার কপালে, নাকে, মুখে, ঐ রকম এলো-মেলো চুল তাকে যেন অনেকটা কোন পাগল অথবা পেটিকোট পরিহিত পুলিশের মতন দেখাতো, তার দীর্ঘ ও ঘন ভুরু দেখলে মনে হতো, বুঝি এক জোড়া ধূসর বর্ণ ইঁদুর বসে আছে।

সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতো ঠিকই, কিন্তু তার খোঁড়ানোটা ঠিক সাধারণ ছিল না; চলার ভঙ্গী দেখলে মনে হতো যেন একটা জাহাজ নোঙর করছে।···

বৃদ্ধা ডট এ্যাণ্ড ক্যারি আমাকে আকর্ষণ করতো। ঘুম থেকে উঠেই আমি সিঁড়ি বেয়ে তার ঘরে যেতাম। দেখতাম, বুড়ি মাথা হেঁট করে সেলাই করছে, পায়ের কাছে তার শরীর গরম রাখার জন্য গরম জলের পাত্র। আমাকেও সে ঐ পাত্রের কাছেই বসাতো, যাতে ঐ ঘরের অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা আমার কোন ক্ষতি না করতে পারে।

সরু লম্বা লম্বা আঙুলে সেলাই করতে করতে সে আমাকে নানা রকম গল্প শোনাতো। চোখে তার বেশী পাওয়ারের চশমা, বয়সের বিবর্তনে দৃষ্টিশক্তি অতি ক্ষীণ। যতদূর মনে পড়ে, সে আমাকে বাচ্চাদের উপযোগী

সহজ-সরল গল্প শোনাতো। শহরে আজ কি ঘটেছে, বা কোন গরু অথবা কুকুরের মজাদার গল্প। কিন্তু সে এইসব সহজ গল্পগুলিই এমন ভাবে বলতো যে আমার বুকের ভেতর আজো তারা সমানে বেজে চলেছে, অদ্ভূত এক কাব্যপ্রতীম পবিত্রতা ও রহস্যময়তা আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখতো।···

এই রকমই এক মঙ্গলবারের সারাটা সকাল আমি ডট এ্যাণ্ড ক্যারির গল্প শুনে কাটালাম।

তারপর সারাটা দিন ধরে মগজে সেই গল্পের অনুরণন। প্রতিটি গল্পকে মনে গেঁথে রেখে পরদিন আবার সিঁড়ি বেয়ে সেলাই ঘরের সামনে গিয়ে হাজির হই।

কিন্তু দরজা খোলামাত্র একটা অভাবনীয় দৃশ্য দেখতে পেলাম। বৃদ্ধা দর্জি তার চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে পড়েছে মেঝের ওপর, মুখ থুবড়ে আছে. এক হাতে তখনো ধরা আছে সুচ, অন্যহাতে আমার একটি জামা। নীল মোজা পরা তার অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ পা খানা চেয়ারের নীচে সেঁধিয়ে গেছে; এবং তার চশমাটা ছিটকে গিয়ে পড়েছে দেওয়ালের এক কোণে, সেখান থেকে চিক্ চিক্ করছে ওর কাঁচ!

দারুণ ভয় পেয়ে আমি ছুটে পালাই। ক্রমে দৌড়ে এলো অনেকেই এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি জানতে পারলাম, আমার প্রিয় গাল্পিক ডট এ্যাণ্ড ক্যারি আর জীবিত নেই!

আজ আমি ঠিক মতন ব্যাখ্যাও করতে পারবো না, কী দারুণ মানসিক বিপর্যয় ঘটেছিল আমার ঐ আকস্মিক দুর্ঘটনায়। এক বিশাল শোক ও শূন্যতা আমার ছোট বুকখানা অধিকার করে নেয়। ধীরে ধীরে আমি এক নিঃসঙ্গ অন্ধকার ঘরে ঢুকে একটি নরম সোফার ওপর নিজেকে এলিয়ে দিই, দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলি। কাঁদতে থাকি বহুক্ষণ ধরে।

ক্রমে-ক্রমে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। কারা যেন ল্যাম্প হাতে এখানে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু কেউই আমাকে লক্ষ্য করে না। হাঁ, আমার বাবা ও মা ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছেন। আলোচনা করছেন ডট এ্যাণ্ড ক্যারির মৃত্যু নিয়ে। আমি দমবন্ধ করে মৃতের মতন নিশ্চল, কান পেতে শুনেছি ওদের প্রতিটি শব্দ। আজো আমি হুবহু তাদের পর পর মনে করতে পারি।

"বড় ভাগ্যহীনা," ডাক্তার বললেন, "আমার প্রথম পেসেণ্ট ছিল সে। আমি যেদিন এই শহরে পা দিলাম, সেই দিনই দুর্ঘটনায় তার একটা পা ভাঙ্গে। হাত মুখ ধোবারও সময় ছিল না আমার। গিয়ে দেখলাম, সত্যি অবস্থা গুরুতর।"

তার তখন বয়স হবে বছর সতেরো। সত্যিকারের সুন্দরী যুবতী ছিল সে।...আমি এ গল্প এর আগে কাউকে বলিনি। আমি ছাড়া কেউ জানে না। আজ সে আর বেঁচে নেই। কাজেই কি হবে আর সেই গল্প চেপে রেখে?

সেই সময় এই শহরে একজন সহকারী স্কুল শিক্ষক এসেছিল। তার বয়স কম, চেহারাখানাও চমৎকার, মনে হয় যেন কোন সার্জেণ্ট মেজর। দেখতে দেখতে শহরের সব মেয়েরা পিছু লাগলো তার। কিন্তু বেচারি বেশি মাখামাখি করতে সাহস পেতো না, কারণ তার স্কুলের হেডমাষ্টার গ্রেবু এতটুকু বেচাল বরদাস্ত করতে পারতেন না। চরিত্রে স্খলন হলে চাকুরি থেকেও বরখাস্ত।

গ্রেবুই কিন্তু তাঁর স্কুলে সেলাইয়ের কাজ শেখাবার জন্য সুন্দরী হরটেনসকে নিযুক্ত করেছিলেন। এই হরটেনস্কেই সকলে আদোর করে ডাকতো ডট এ্যাণ্ড ক্যারি বলে, যে এইমাত্র আপনাদের ঘরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে।

তরুণ সহকারী স্কুল শিক্ষকটির নজর এসে পড়লো তরুণী হরটেনসের ওপর। দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারে না সে। পারস্পরিক মন দেওয়া-নেওয়ার পর্যায়ে তারা একদিন ঠিক করে, দিনের শেষে অন্ধকার ঘনালে তারা দু'জনে স্কুলের চিলে-কোঠায় সংগোপনে দেখা করবে।

সেই অনুযায়ী বাড়ি যাবার ভান দেখালেও ডট এ্যাণ্ড ক্যারি সেদিন স্কুলে থেকে যায় এবং সন্ধ্যা ঘণাতেই গুটি গুটি গিয়ে হাজির হয় স্কুল-বাড়ির চিলে কোঠায়। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করতে থাকে তার প্রেমিকের। অল্প সময়ের মধ্যেই সে এলো এবং ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে থাকে, সে তাকে কত ভালোবাসে।...হঠাৎ সেই উঁচু ঘরের দরজা খুলে যায় এবং অন্ধকারে এসে দাঁড়ায় স্বয়ং হেডমাষ্টার। জিজ্ঞেস করেন: 'এই অন্ধকারে কি করছো সিগিস্বার্ট?'

তরুণ শিক্ষক মনে করলো, আর উপায় নেই, সে ধরা পড়ে

গেছে। ভয়ে সে বোকার মতন বলে বসে: 'বিশ্রাম নিচ্ছিলাম মঁসিয়ে গ্রেবু।'

চিলে কোঠাটি অনেক উঁচুতে, আয়তনে খুব বড় এবং ভীষণ অন্ধকার। আতঙ্কে সিগিস্‌বার্ট ধাক্কা দিয়ে মেয়েটিকে ঘরের এক কোণে সরিয়ে দেয়। চাপা স্বরে বলে, 'লুকিয়ে পড়ো। না হলে আমি আমার চাকুরি খোয়াবো বুঝলে? লুকিয়ে পড়ো, লুকাতে পারছো না?'

হেডমাষ্টার তার চাপা ফিস্‌ ফিসানি শুনতে পেলেন এবং বললেন, 'তা হলে তুমি এখানে একা নও?'

'আমি এখানে একাই।'

'না তুমি একা নও। কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলে।"

'আমি শপথ করে বলছি মঁসিয়ে গ্রেবু।'

'ঠিক আছে, আমি এখনই খুঁজে বের করছি' বলেই হেডমাষ্টার দরজায় তালা এঁটে নীচে নেমে গেলেন মোমবাতি ধরিয়ে আনতে।

যুবকটি ভয়ে কাঁপতে থাকে। সে দিশেহারা। ছুটে গেল যুবতীর কাছে, 'যেখানেই হোক লুকিয়ে থাকো, না হলে উনি তোমায় দেখে ফেলবেন আর তোমার জন্য সারাজীবন আমাকে উপবাসে কাটাতে হবে। তুমি আমার জীবনটাই নষ্ট করে দেবে…লুকিয়ে পড়ো।'

তারা শুনতে পেলো, দরজার তালা খুলছেন হেডমাষ্টার।

হরটেন্‌স্‌ ছুটে গিয়ে ঐ ঘরের রাস্তার দিকে গিয়ে দাঁড়ায় এবং ঘুরে তার প্রেমিককে বলে, 'আমি লাফ দিচ্ছি। তিনি চলে যাবার পর অন্ততঃ আমাকে তুলে নিয়ে যেও।'

এবং একথা বলেই সে ঝাঁপ দিলো।

বৃদ্ধ গ্রেবু সেই ঘরে ঢুকে দ্বিতীয় কোন জনকে না দেখে অবাক হলেন।

এই ঘটনা ঘটবার পনেরো মিনিট বাদে সিগিস্‌বার্ট আমার কাছে আসে এবং ঘটনাটা খুলে বলে।

গিয়ে দেখি মেয়েটি তখনো আহত অবস্থায় দেওয়ালের ধারে পড়ে আছে। উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই, দো-তালা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়াতে তার পায়ের হাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ। ডান পা খানাই জখম হয়েছে, তিন জায়গায় ভাঙা হাড় চামড়া ও মাংস ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। কাপড়ে সাবধানে জড়িয়ে তাকে তুলে

নিয়ে আসা হলো। আশ্চর্য, কোন অভিযোগ নেই তার, অদ্ভুত সাহসিক সহনশীলতায় কেবল উচ্চারণ করছে : 'এই আমার শাস্তি। আমি আমার উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছি।'

আমি তার বাপ-মাকে ডেকে পাঠালাম এবং মিথ্যা এক গল্প ফেঁদে বললাম,—'আমার বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এই মেয়েটিকে চাপা দিয়ে যায়।'

গল্পটি সকলেই বিশ্বাস করলো। গোটা মাস ধরে স্থানীয় পুলিশ মিথ্যাই খুঁজে বেড়ালো দুর্ঘটনার কারণ সেই গাড়িটিকে।

এই হচ্ছে সম্ভ্রান্ত মহিলার গোপন ইতিকথা। আমার ধারণা, ইতিহাসের নায়িকা হবার মতন গুণ তার ভেতর ছিল।

এইটাই তার জীবনের একমাত্র প্রেমের ঘটনা। অত্যন্ত পবিত্রভাবেই তার মৃত্যু। সে বীরাঙ্গনা মহিয়সী, ভক্তিমতী নারী। এবং আমি যদি তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি না করতুম তবে এই গল্প কখনোই আপনাদের কাছে বলতুম না। তার জীবিতকালে যা চেপে রেখেছি, আজ প্রকাশ না করে পারলুম না।''

ডাক্তার থামলেন। মা যেন কঁকিয়ে উঠলেন। বাবা বিড বিড় করে কি বললেন শুনতে পেলুম না। তাঁরা চলে গেলেন।

আমি তখনো ঘাড় গুঁজে পড়ে আছি। এক সময় শুনতে পেলাম অনেকের ভারী পদশব্দ এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাস।

ওরা ডট এ্যাণ্ড ক্যারির প্রাণহীন দেহটাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বিদায়

[Farewell]

দুই বন্ধু ডিনার খাচ্ছে। কাফের জানালা দিয়ে তারা দেখছে, পথের ধারে ধারে জনসমাগম। গ্রীষ্মের রাত্রে প্রবাহিত বাতাস ছুটে আসছে প্যারিসের বুক বেয়ে, আলতো পরশ বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে তাদের ওপর। এ সময় মানুষের দৃষ্টি হয় উদাস, মন হয় যাযাবরী, বাসনা জাগে বহুদূরে চলে যেতে ;

নিজেকে বিছিয়ে দিতে সবুজ গাছের নীচে ; কল্পনাবিলাসী মন এখন চন্দ্রালোকিত নদীকে স্বপ্নে পেতে চায়, কানে যেন বাজে নাইটেঙ্গেল পাখীর গান।

দুই বন্ধুর একজন হেনরী সাইমন গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, "হায়! আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি! কষ্ট হয়। এক সময়, এই রকম রাতে আমি অনুভব করতাম, আমার হাড়ে যেন শয়তানের বাস। আর আজ কেবলই হতাশা। আয়্ কত দ্রুত ছুটে চলে!"

তার শরীরে ইতিমধ্যেই চর্বি জমেছে, বয়স সম্ভবতঃ পয়তাল্লিশ, বিশাল টাক।

অপর সঙ্গী পেরী কারণীর বয়সে আরো বড়, কিন্তু রোগা এবং হাসিখুশি ; সে জবাব দেয়, "আমি কিন্তু বন্ধু খেয়ালই করিনি, কবে যৌবন হারিয়ে গেল! সব সময় দিল খোলা মেজাজে ছিলুম, সব কিছুই হাল্কাভাবে নিয়েছি। কিন্তু একটি লোক যদি রোজ আয়নায় নিজেকে দেখে, সে নিজের বয়সজনিত বিবর্তন ধরতেই পারবে না। বয়স তার ছাপ রাখে খুব ধীরে ধীরে ও ধারাবাহিকভাবে। এই জন্যই দু'-তিন বৎসরের ভয়াবহ পরিবর্তন সত্ত্বেও মানুষ শোকে মারা যায় না। এটা তার অনুভবের বাইরে। পরিবর্তনটুকু বুঝতে হলে তাকে অন্তত ছ' মাস নিজের মুখ দেখলে চলবে না—তারপর হঠাৎ একদিন নিজের প্রতিবিম্ব দেখে স্বয়ং আঁতকে উঠবে!

আর মেয়েদের কথা? এ ব্যাপারে ওদের কথা চিন্তা করলে আমার কষ্ট হয়! মেয়েদের যাবতীয় সুখ, শান্তি ও জীবন একান্তই নির্ভরশীল তাদের সৌন্দর্যের ওপর—যে সৌন্দর্যের স্থায়িত্ব মাত্র দশ বৎসর।

যাক, আমি পঞ্চাশ বছর বয়স অব্দি এই পরিবর্তন নিয়ে এতটুকুও মাথা ঘামাইনি। নষ্ট যৌবনের জন্য আদৌ দুশ্চিন্তা ছিল না আমার। জীবন ছিল বেপরোয়া ও সুখপূর্ণ।

তারপর একদিন স্বাভাবিক অথচ মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সেই পরিবর্তন আমি ধরতে পেলাম…আমি আমার সৌভাগ্যের দুয়ার থেকে বিদায় নিলুম সেদিন থেকেই।

সকলের মতন আমার জীবনেও প্রেম প্রায়শই এসেছে, কিন্তু একবারের অভিজ্ঞতা কিছুটা ভিন্নধর্মী।

যুদ্ধের কিছুকাল পর তার সঙ্গে আমার প্রথম মুলাকাৎ এতারতাতে সমুদ্র তীরে। আজ থেকে প্রায় বারো বছর আগে। সকালে স্নানের সময়

ঐ সামুদ্রিক তীরভূমি আশ্চর্য সুন্দর। ঘোড়ার খুরের মতন বাঁকা সেই বেলা-ভূমি, সাদা ধবধবে পাহাড় সমুদ্রের দিকে বিশাল এক প্রবেশ পথের সৃষ্টি করেছে···মেয়েরা এই পাহাড়ের গা বেয়ে স্নানের পোষাক পরে সমুদ্রের জলে নেমে আসে। সূর্যের আলো পাথরের বুকে বিচ্ছুরিত, সবুজ নীল ঢেউয়ের মাথায় মাথায় উজ্জ্বল ঝলকানি। চতুর্দিকে আনন্দ ও উল্লাস, প্রকৃতি যেন হাসছে। জলের ধারে গিয়ে বসলে সুন্দরীদের স্নান দেখা যায়। কিন্তু ঐ ঢালু জায়গায় নেমে স্নান করা বেশ দুরূহ। এর জন্য আলাদা এলেম থাকা দরকার। ঢেউয়ের উত্থান পতনে সুন্দরীদের অবয়ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভীষণ ঠাণ্ডা লোনা জলের তলায় তাদের পায়ের ডিম থেকে শুরু করে ঠোঁট অব্দি দেখা যায়।

আমি প্রথম ঐ জলে যুবতীটিকে আবিষ্কার করেছিলাম এবং তার শারীরিক লালিত্য দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারি না। সে দাঁড়িয়েছিল বিজয়িনীর ভঙ্গীতে। এই এক নারী, যার জন্যই বুঝি ভালোবাসা আদায়ের জন্য। মুহূর্তে আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে, আমি আবেগে আপ্লুত।

তার সঙ্গে পরিচিত হলাম। এতখানি অভিভূত এর আগে কখনো হইনি। আমার সমস্ত মন জুড়ে রইল সে! একজন নারীর কাছে এ ভাবে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণে ভয়ঙ্কর ও গৌরবপূর্ণ অভিজ্ঞতা হলো আমার! এটা এক ধরনের কষ্ট, আবার উত্তেজনাপূর্ণ সুখও বটে, তার চাউনি, তার চাপা হাসি, তার বাতাস-কাঁপা চুলের গুচ্ছ, তার মুখের প্রতিটি সূক্ষ্ম কারুকার্য সব সময় আমার মনকে অধিকার করে থাকে, আমাকে পাগল করে।···কোন আসবাব-পত্রের ওপর রাখা তার অবগুণ্ঠনটি দেখলে আমার বুকের রক্ত উত্তাল হয়ে ওঠে, হাতলওয়ালা চেয়ারের ওপর তার দস্তানাজোড়া নজরে এলে আমি স্তব্ধ হ'য়ে তাকিয়ে থাকি। মনে হয়, তার পোষাক-আশাকও যেন অনুকরণীয়। কোন স্ত্রীলোকের টুপি দেখে আমি কখনো অতখানি উল্লসীত হই না।

সে বিবাহিতা। কিন্তু তার স্বামী প্রতি শনিবার আসেন এবং সোমবার ফিরে যান। আমি ঐ ভদ্রলোক সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্বিকার। আদৌ ঈর্ষান্বিত নই; ঠিক বলতে পারবো না, কেন। কোন মানুষকে আমার কখনো অত কমগুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি!

আর আমি কী প্রেমেই না পড়েছিলাম! সে যে অপূর্ব সুন্দরী, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন যুবতী! তার অঢেল যৌবন, লালিত্য এবং পরিচ্ছন্ন স্বকীয়তা! তা

সঙ্গে পরিচিত হবার আগে আমি কখনো ভাবিনি, নারী এতখানি আকর্ষণীয়া ও আনন্দদায়িনী হতে পারে।···

আমার এমন অবস্থা মাস তিনেক স্থায়ী হয়েছিল। তারপর চলে গেলাম অ্যামেরিকায়। মন দুঃখে ভেঙ্গে পড়ে। তাকে আমি ভুলতে পারিনি, শয়নে-স্বপনে সে তখনো আমার ওপর রাজত্ব করছে। বছরের পর বছর কেটে যায়। আমি তাকে ভুলিনি। তার সেই প্রতিমূর্তি তখনো অম্লান। নীরব প্রেমে আমি সমান বিশ্বস্ত।

বারোটা বছর একটি মানুষের জীবনে তুচ্ছ ব্যাপার। সে তাদের পার হয়ে যাওয়াটা অনুভবই করতে পারে না। একের পর এক তারা অতীত হয়ে যায়,—ধীরে ও দ্রুততায়, নীরবে ও সোচ্চারে, সুদীর্ঘ ও খুবই হ্রস্ব।···

মনে হলো, যেন মাত্র কয়েক মাস যাবৎ আমরা একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে আছি। এতারতাতের সমুদ্রের তীর—যেন এই সেদিনের ঘটনা।

গত বসন্তে জন কয়েক বন্ধুর সঙ্গে ম্যাসনস্ লাফিতিতে খানা পিনা করতে গিয়েছিলাম।

ট্রেন চলতে শুরু করা মাত্র একজন স্বাস্থ্যবতী মহিলা আমার কামরায় চারটি ছোট ছোট মেয়ে সহ উঠে পড়লেন। আমি ঐ ছানাপোনা সহ 'মুরগী-মাতা'র দিকে ভ্রূক্ষেপও করিনি।

এস্নিয়েরের মধ্য দিয়ে গাড়ীটা ছুটে চলার সময় আমার সেই সঙ্গিনী প্রথম মুখ খুললেন, 'মাপ করবেন, আপনিই কি মঁসিয়ে কারনীর নন?'

'হাঁ, মাদাম।'

শুনে তিনি হেসে উঠলেন। সামান্য বিষণ্ণতার ছোঁয়া লাগা খুশির হাসি।

'আমাকে চিনতে পারছো না?'

আমাকে দ্বিধায় পেয়ে বসে। নিশ্চিত একে কোথাও দেখেছি, কিন্তু কোথায়? কখন?

'হাঁ···কিন্তু না···', আমি আমতা আমতা করতে থাকি, 'দেখেছি ঠিকই, কিন্তু নামটা ঠিক মনে করতে পারছি না।'

সে সামান্য লজ্জারুণ হয়; বলে, 'মাদাম জুলি লেফেব্রিকে মনে আছে?'

কখনো জীবনে অত বড় আঘাত আমি পাইনি। এক লহমায় মনে হলো, আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি। মনে হলো, যেন একখণ্ড অবগুণ্ঠন আমার

চোখের সামনে ছিঁড়ে ফেলা হলে। আমি আবিষ্কার করছি কোন ভয়াবহ ও মর্মান্তিক সত্যকে।

এই সে! এই চর্বিবহুল সাধারণ মহিলা সে? এবং এরই মধ্যে সে চারটি কন্যার জন্ম দিয়েছে? তারই শরীর থেকে বেরিয়ে আসা চারটি মেয়ে, যারা ইতিমধ্যেই বেশ বড় সড় হয়ে উঠেছে। অথচ, এখনো মনে হচ্ছে, আমি যেন তাকে গতকালও দেখেছি। এমন বিপুল পরিবর্তন কি ভাবে সম্ভব! বিশাল দুঃখময় শূন্যতা আমাকে কুরে কুরে খায়। প্রকৃতির বিরুদ্ধে অভিমান পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে।

হতবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকি। তারপর তার হাত ধরি এবং আমার চোখ সজল হয়ে ওঠে। আমি তার নিহত যৌবনের বেদনায় মুহ্যমান। আমি যে এই চর্বিসার মহিলাকে চিনি না।

সেও যথেষ্ট অভিভূত, 'আমি অনেক বদলে গেছি, তাই নয়? কিন্তু সময় বয়ে যায়, তাই নয়? দেখছো তো, আমি কেমন মা হয়েছি, শুধুমাত্র মা, যথার্থ জননী। আর কিছুই সত্যি নয়, সবকিছুই ফুরিয়ে গেছে। ইস্! আমি ভেবেছিলাম, কোন দিন দেখা হলে তুমি আমাকে চিনতে পারবে না। আর তোমারও তো অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তোমাকে ঠিক মতন চিনতে অনেকটা সময় লেগেছিল। তোমার চুল একদম সাদা হয়ে গেছে। কম কথা! বারো বছর আগের কথা। বারোটা বছর! আমার বড় মেয়ের বয়সই হল দশ বছর।

আমি তার বড় মেয়েটির দিকে তাকাই। তার মার যৌবনকালীন সৌন্দর্য যেন কিছুটা পেয়েছে সে, যদিও সেই রূপ এখনো অপরিণত। জীবন যেন এই ধাবমান ট্রেনেরই মতন দ্রুতগামী।

ম্যাস্‌নস্ লাফিত্তিতে নামলুম আমরা। বিদায় লগ্নে পুরনো বান্ধবীর হাতে চুম্বন করি। কোন কথা নেই। আমার গলা দিয়ে কোন শব্দ বের হয় না।

তারপর রাত্রে নিজের ঘরে একাকী আয়নার সামনে দাঁড়াই। দীর্ঘ—দীর্ঘক্ষণ নিজের বর্তমান প্রতিরূপের দিকে চেয়ে থাকি। এখন বুঝতে পারছি, আমি কি ছিলাম, আর এখন কি হয়েছি। কোথায় গেল আমার ধূসর রঙ গোঁফ ও কালো চুল এবং আমার যৌবনদীপ্ত মুখমণ্ডল। এখন আমি প্রকৃতই বৃদ্ধ। বিদায়।

স্মৃতি

[A memory]

সূর্যের কচি আলোর নীচে দাঁড়িয়ে যৌবনের কত কথাই না মনে পড়ে। যৌবন এমন একটা সময়, যখন সব কিছুকে সুন্দর, সুখকর, আনন্দদায়ক ও উত্তেজনাপূর্ণ মনে হয়। বিগত বসন্তের ইত্যাকার স্মৃতিগুলি কী বিস্ময়কর।

হে আমার পুরনো বন্ধুরা, ভায়েরা, তোমরা কি অতীতের সেই সব বিজয়ী ও উজ্জ্বল দিনগুলিকে মনে করোনা? তোমাদের কি মনে আসে না, কি ভাবে আমরা প্যারিসের পথে পথে ঘুরে বেড়াতাম? স্মরণে নেই আমাদের অভাবের কথা? মনে কি পড়ে না, আমরা কেমন ভেজা বন-পথে ঘুরতাম, কেমন মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে দম নিতাম অথবা কেমন সীন্ নদীর ধারে পায়চারি করতাম? এবং আমাদের বিচিত্র উজ্জ্বল প্রেমের জন্য দুঃসাহসিক কাণ্ড কারখানা?

• আমি সেইসব রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার একটিকে আজ বর্ণনা করবো। বারো বছর আগের কথা।

কিন্তু এরই মধ্যে ব্যাপারটা এত সুদূর অতীতের মনে হচ্ছে যেন তা ঘটেছিল আমার জীবনের আর এক প্রান্তে এবং জীবনের যাত্রাপথ কত দ্রুত শেষ হয়ে গেল!

বয়স তখন পঁচিশ। সবে প্যারিসে এসেছি। কাজ করি এক সরকারী অফিসে। রবিবারগুলিকে অসাধারণ উৎসবের দিন বলে অনুভব করি। সেই দিন আমার উদ্দাম আনন্দের লগ্ন, যদিও উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা কদাচিৎই ঘটে।...

ঐ বিশেষ দিনে আমি তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে আসি, আর পাঁচজন কেরাণীর মতন মন তখন মুক্তির স্বাদ নিচ্ছে। জানালা খুলে প্রত্যক্ষ করি মনোরম আবহাওয়াকে। পরিষ্কার নীল আকাশ শহরের মাথার ওপর বিছিয়ে রয়েছে, সর্বত্র রৌদ্রের ঝিকিমিকি।

খুব তাড়াতাড়ি পোষাক পরে বেরিয়ে আসি বাইরে; বন-ভূমিতে দিনটা কাটাতে উৎসুক, সবুজ পাতার ঘ্রাণ নেবার জন্য মন ব্যাকুল; কারণ আমার জন্ম গ্রামে এবং শৈশব কাটিয়েছি ঘাসের ওপর, সবুজ গাছের নীচে।

আলো ও উষ্ণতায় মাখামাখি প্যারিস জেগে উঠছে খুশিতে। প্রতিটি বাড়িতে, প্রতিটি লোকের চোখে-মুখে উৎসবের, ব্যস্ততার আনন্দ।

আমি 'সোয়ালো' বোটে চেপে সেণ্ট-ক্লাউডে যাবো বলে সীন্ নদীর ধারে পৌছে যাই। তীর-ভূমিতে দাঁড়িয়ে বোটের জন্য প্রতীক্ষা করা এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। মনে হয়, আমি বুঝি পৃথিবীর শেষ প্রান্তে এক নতুন দেশে দাঁড়িয়ে আছি। ক্রমশ দৃষ্টির সামনে ভেসে ওঠে একটি ছোট্ট বোট, দ্বিতীয় ব্রিজটা পার হচ্ছে, ভক্ ভক্ ধোঁয়া উদ্গীরণ করে, যত কাছে এগিয়ে আসে ততই তার অবয়ব বৃদ্ধি পায়।

আমি ওর দিকে এগিয়ে আসি।

ইতিমধ্যেই বোটের পাটাতনে রবিবাসরীয় পোষাক পরে একদল নর-নারী খুশিতে ডগমগ। আমি বোটের এক কিনারে গিয়ে দাঁড়াই, চোখ মেলে দেখতে থাকি—তীরে বৃক্ষের শ্রেণী, বহুদূরে সারি সারি বাড়ি এবং নদীর ওপর দাঁড়ানো পুল।...

দুটি দ্বীপের মধ্য দিয়ে 'সোয়ালো' পার হ'য়ে যাবার পর এক ঢালু বাঁক-মুখ দেখতে পেলাম, যার সবুজ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলি সাদা বাড়ি। কে একজন ঘোষণা করে: "বাস-মিউডন"; তারপর আবার শোনা যায়, "সেভ্রেস্" এবং তারপর উচ্চারিত হয় "সেণ্ট-ক্লাউড।"

বোট থেকে নেমে পড়ি। চটপট ছোট্ট শহরটার পথ ধরে বন-ভূমিতে প্রবেশ করি। আমার সঙ্গে প্যারিসের আশ-পাশ অঞ্চলের একখানা মানচিত্র রয়েছে। পথ হারিয়ে যাবার পথ নেই। এই বনাঞ্চলেই প্যারির লোকেরা আনন্দ-অভিযান করতে আসে।

ছায়ার নীচে দাঁড়িয়ে পথটাকে পরখ করি। মানচিত্র মিলিয়ে ভাবলাম, সহজ পথ। আমাকে প্রথমে যেতে হবে ডান দিকে, তারপর বাঁ দিকে, তারপর আবার বাঁ দিকে এবং এই ভাবেই ভার্সাইতে রাত্রি নামার সঙ্গে সঙ্গে পৌছে যাবো, সেখানে খাওয়া-দাওয়া করবো।

খুব আস্তে আস্তে পা চালাচ্ছি, পায়ের তলায় তাজা সবুজ পাতা, বুক ভরে নিই বিশুদ্ধ বাতাস, বাতাসে ফুলের গন্ধ। ছোট ছোট পা ফেলে চলছি, মন ভাবনা শূন্য—পুরনো কাগজে কি লিখেছিল, এখন ভাবিনা; ভাবিনা আমার অফিসের কথা। অফিসের বড় কত্তা ও সহকর্মীদের বিলকুল ভুলে গেছি। লাল ফিতায় বাঁধা ফাইল পত্তরের জন্য এখন আমার আদৌ মাথাব্যথা নেই। মনে আমার

ঘুরপাক খায় যতসব রোমাঞ্চকর সুখস্বপ্ন, যা নিশ্চয় আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে নিকট ভবিষ্যতে। আমার ভেতর জেগে উঠছে ছেলেবেলার হাজারো স্মৃতি। সেই স্মৃতি ও স্বপ্ন বুকে নিয়ে আমি হাঁটছি—হাঁটছি, সুন্দর আরণ্যক রাজ্যের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ সর্বাঙ্গে মেখে নিয়ে চলছে আমার মন্থর পদচারণা। গাছ-গাছালির মাথায় জুন মাসের তেজী সূর্যের অকৃপণ আলো।

কখনো কখনো বসে পড়ি এবং চারিদিকে ফুটে থাকা নানা জাতের ছোট ছোট ফুলগুলিকে দেখি। ওদের নাম আমি অনেক আগে জানতাম। আজ আবার সহসা তাদের নামগুলি মনে করতে পারছি, যেন আমি আমার ছেলে-বেলা ফিরে পেয়েছি এবং বুঝি আমাদের গ্রামে বসে আছি। কত রকমের রঙ ওদের—হলুদ, লাল, বেগনী, গোলাপী, সাদা!···কোন কোনটি মাথা উঁচু করে আছে, কোন কোনটি আবার প্রায় মাটির বুকেই ফুটে রয়েছে।···

আমি কিছুক্ষণ ঐ প্রকৃতির রাজ্যে একটি ঝোপের ধারে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘুম ভাঙলে আবার চলতে শুরু করি। ঘুম আমার শরীরে নতুন শক্তির সঞ্চার করেছে।···

আমার দৃষ্টির সামনে শূন্য দীর্ঘ পথ। পথের দু'ধারে এই একই বন্য শোভা।···হঠাৎ দেখলাম, পথের প্রান্তে দুটি প্রাণী নড়ে-চড়ে উঠলো,—একজন পুরুষ, অপরজন নারী; ওরা আসছে আমারই দিকে। এতক্ষণ বেশ ছিলাম নির্জনতায়। মানুষ দেখে মেজাজে খিচ্ ধরে গেল। আমি ওদের দৃষ্টির বাইরে সরে যেতে চাইলাম। কিন্তু তার আগেই মনে হলো, ওরা যেন আমায় ডাকছে।

নারী তার ছাতা নাড়ায় এবং পুরুষটি একহাতে তার কোট নাড়িয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আমি তাদের কাছাকাছি চলে আসি। তাদের হাঁটা-চলায় পরিষ্কার অসন্তোষ, মুখ-চোখ লাল, যুবতী হাঁটছে ছোট ছোট পদক্ষেপে, আর লোকটি হাঁটছে বড় বড় পা ফেলে।

মহিলাটি আমাকে জিজ্ঞেস করে, "মশাই, বলতে পারেন, আমরা এখন কোথায় আছি? আমার মাথামোটা স্বামীটি পথ ভুল করেছেন, যদিও আগে দাবী করেছিলেন, এই জিলাটা নাকি ওঁর নখ-দর্পণে।"

"মাদাম" আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললাম, "আপনারা যাচ্ছেন সেণ্ট-ক্লাউডের দিকে। আর আপনাদের পিছনে রয়েছে ভার্সাই।"

"এঁ্যা।" রাগে-দুঃখে মহিলাটি তার স্বামীর ওপর খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে, "ভার্সাই আমাদের পিছনে? অথচ আমরা ওখানেই ডিনার খাবার পরিকল্পনা করছিলাম।"

"মাদাম আমিও তো ওখানেই যাচ্ছি।"

"তাই নাকি। বড় ভালো হলো, আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমার যে কী ভালো হলো!"—সে বার বার আবেগ-মধুর গলায় উচ্চারণ করে।

আমি দেখছি, তার যৌবন ভরন্ত, যথেষ্ট সুন্দরী, চোখের তারা কালো, চুল কালো, অস্বাভাবিক উজ্জ্বল গাত্র-বর্ণের জন্য ঠোঁটের ওপর একটা কালো গোঁফের রেখা লক্ষণীয়।

লোকটি বিব্রত, মোটা ভুরু চুলকাচ্ছে। নিঃসন্দেহে প্যারিসে তাদের ব্যবসা আছে। লোকটি ইতি উতি তাকায়, তাকে ক্লান্ত ও করুণ দেখাচ্ছে।

"কিন্তু আসল ব্যাপারটা হলো তুমি—" কাঁপা স্বরে স্বামী বেচারি স্ত্রীকে বোঝাবার চেষ্টা করে। কিন্তু ওকে কথা শেষ করবার সুযোগ দেয় না মহিলা, কলকলিয়ে ওঠে, "হাঁ, আমি!···হাঁ, এখন আমার ওপর দোষ চাপানো হচ্ছে! না জেনে শুনে নিজেকে সব-জান্তা বলে জাহির করা! আমি কি ঐ পাহাড়-টার দিকে যেতে যেতে বলেছিলাম, এই পথ-ঘাট আমার চেনা? আমিই কি বলেছিলাম—"

মেয়েমানুষটাও তার কথা শেষ করতে পারে না, ওর বকবকানিতে স্বামীর চূড়ান্ত ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, আচমকা সে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে ওঠে—এমন এক বন্য, হিংস্র চীৎকার, যাকে কোন ভাষায় লেখা যায় না, শব্দটা হয়েছিল অনেকটা এই রকম—"তো-তো-কে—"

চীৎকার, গর্জন, হুমকি যত জোরেই উঠুক না কেন, যুবতীটি কিন্তু বিন্দু-মাত্র বিস্মিত বা বিচলিত বোধ করে না। সে সমানে আক্রমণ করে চলে, "হাঁ, কিছু বাকাবাগিশ ফাজিল লোক এই দুনিয়ায় আছে, যারা সব সময়ই সব-জান্তার ভান করে। গত বছর কি আমি হ্যাভার ট্রেনের বদলে ডেপির ট্রেনে উঠে বসেছিলাম? কি বলো, আমিই কি সেই ভুল করেছিলাম?···আমিই কি বিশ্বাস করিনি, সেলিস্ত একজন চোর?···"

মহিলা সমানে ক্ষিপ্ত হয়ে বক বক করতে থাকে, কথা বলার তোড়ও অসাধারণ, অপ্রত্যাশিতভাবে সমস্ত আক্রমণ শানাতে থাকে সে; স্বামীর প্রতিটি কাজের সে খুঁত খুঁজে পাচ্ছে—সে যেন এ যাবৎ যা করেছে, সবই ভুল

ও বোকামিতে পরিপূর্ণ। বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত স্ত্রীর জীবন তার প্রতিটি কাজে ও সিদ্ধান্তে যেন বিষময় হয়ে উঠেছে।

ভদ্রলোক আপ্রাণ চেষ্টা করছে তার স্ত্রীকে সামলাতে, অনেকটা তোষামোদের স্বরে বলে, "এই শোন, লক্ষ্মীটি ...ও সব কথা এখন বলে কি লাভ··· বিশেষতঃ একজন ভদ্রলোকের সামনে···আমাদের এভাবে আচরণ করা উচিত নয়। ভদ্রলোক আসলে এ সবে মাথা ঘামাবেন কেন?"

লোকটি তার করুণ চোখ তুলে চারদিকের সবুজ প্রকৃতির দিকে তাকায়; যেন ঐ শান্ত সমাহিত-গাম্ভীর্য সে প্রার্থনা করছে নিজের প্রগল্‌ভা স্ত্রীর জন্য। অথবা, সে বুঝি এই লজ্জার হাত থেকে রেহাই পেতে আশ্রয় চায় ঐ আরণ্যক গভীরতায়। কিন্তু তার স্ত্রী এতটুকুও সংযত হয় না। ফলে লোকটার গলা চিরে ঠেলে বের হয়ে আসে আবার সেই বন্য চীৎকার: 'তো-তো-কে···' একবার নয়, বেশ কয়েকবার থেকে থেকে ধ্বনিত হয় এই চীৎকার।

বুঝতে পারি, এটা তার ভয় ও স্নায়ু-জর্জরতার ফলশ্রুতি মাত্র। বর্তমানে অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। যুবতী মহিলাটি হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে চকিতে স্বর মোলায়েম করে বলে, "আমাদের যদি আপনার সঙ্গে যাবার অনুমতি দেন, তবে বড় ভালো হয়। তা হলে আর পথ ভুল হবে না, আমাদেরও বনে রাত কাটাবার ঝুঁকি নিতে হয় না।"

আমি মাথা হেঁট করে সম্মতি জানাই।

যুবতী খুশিতে আমার হাত ধরে এবং অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে হাজারটা প্রসঙ্গে কথা বলতে শুরু করে—তার নিজের প্রসঙ্গ, তার জীবন, কেমন তার পরিবার, কেমন চলছে তার ব্যবসা ইত্যাদি।··

স্বামী বেচারি আসছে গুটি গুটি আমাদের পিছন পিছন, বুনো চোখে তাকাতে থাকে ঘন বনের দিকে এবং মানসিক অস্থিরতায় থেকে থেকে উচ্চারণ করছে সেই অস্বাভাবিক শব্দ: "তো-তো-কে—"

অবশেষে আমি তাকে না জিজ্ঞেস করে পারি না, "ও রকম শব্দ করছেন কেন?"

সে চমকে জবাব দেয়, "আমার হারিয়ে যাওয়া কুকুরটিকে ঐভাবে ডাকতুম।"

"তার মানে? আপনার কুকুর হারিয়েছে?"

"হাঁ। কুকুরটার বয়স ছিল বড় জোর এক বছর। সে কখনো দোকানের

বাইরে বের হতো না। আমি তাকে বনে বেড়াতে নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম। সে এর আগে কখনো ঘাস বা পাতা দেখেনি, এখন দেখে তার মাথা বিগড়ে যায়। সে ছুটতে শুরু করে, ডাকতে থাকে এবং ডাকতে ডাকতে বনে হারিয়ে যায়। আমার মনে হয় আসবার সময় রেলগাড়ি দেখেও সে খুব ভয় পেয়েছিল। এটাও তাকে বিভ্রান্ত করে। আমি তাকে ডাকছি, বৃথাই ডাকছি ; সে এলো না। না খেয়ে মরবে কুকুরটা।"

স্বামীর দিকে না ফিরে মেয়েটি বলে, "কুকুরটাকে একটু স্বাধীনতা দিয়ে পুষলে ওটা এভাবে হারিয়ে যেত না। তোমার মতন অকর্মণ্য লোকরাই এমন করে বুকে কুকুর আগলায়।"

"কিন্তু লক্ষ্মীটি, এ ব্যাপারে তুমি—"

কথা শেষ হয় না। যুবতীটি দাঁড়িয়ে এমন জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার স্বামীর দিকে ঘুরে তাকায়, যেন সে তাকে গিলে খাবে। আবার শুরু হয় ওর অবিশ্রান্ত আক্রমণ।

রাত ঘনিয়ে আসছে। যামিনী তার পর্দা সরিয়ে আবির্ভূত হচ্ছে। কেমন এক ধরনের পুলক ও রোমাঞ্চ চারপাশে পাক খায় ; গোটা বনভূমির ওপর নেমে এসেছে মধুর হিম।

হঠাৎ লোকটা থমকে দাঁড়ায়, কেঁপে ওঠে তার শরীর। বলে, "ওহ ! আমার বিশ্বাস, আমি পেয়েছি···"

স্ত্রীলোকটি তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, "বটে, কি পেয়েছো ?"

"আমার এতক্ষণ খেয়ালই ছিল না, আমারই হাতে ঝুলছে আমার ফ্রক-কোটটা।"

"তাই নাকি ?"

"আমি আমার খামটা হারিয়ে ফেলেছি···টাকা রয়েছে ওতে।"

ভদ্রমহিলার শরীর রাগে রি রি করে ওঠে।

"কি বোকা ! মাথায় যদি একবিন্দু ঘিলু থাকতো। আমি কি করে এমন একটি গর্দভচন্দ্রকে বিয়ে করেছিলাম ? আচ্ছা যাও, ওটা খুঁজে বের করো ; আর যদি পাও তো যত্ন করে রেখো। আমি এই ভদ্রলোকের সঙ্গেই ভার্সাই যেতে পারবো। এই বনে রাত কাটাতে পারবো না।"

"তাই হোক সোনা" মিন মিনে গলায় লোকটা বলে, "কোথায় তোমার সাথে দেখা হবে ?"

আমি একটা রেস্টুরেন্টের নাম জানতাম। লোকটিকে তারই নাম বলে দিলাম।

স্বামীটি ঘুরে উল্টো মুখে চলতে থাকে। তার মাথা হেঁট। অনবরত সেই বিচিত্র আওয়াজ, "তো-তো-কে···।" চলবার গতি শ্লথ। দৃষ্টির বাইরে হারিয়ে যেতে অনেকটা সময় নেয়।

আমরা দেখতে পাই, রাতের অন্ধকারে পথের প্রান্তে মিলিয়ে যাচ্ছে লোকটির দেহ। তার কোন চিহ্নই আর নেই। কিন্তু বহুক্ষণ ধরে বাতাসে ভেসে আসতে থাকে করুণ আওয়াজ, "তো-তো-কে···"

আমি বেশ তাজা ও খুশি। আবছা অন্ধকারে অপূর্ব মাধুর্য তথা উন্মাদনা; উন্মাদনার আরো কারণ, একটি অজানা যুবতীর হাত আমার হাতে। আমি আমার মগজকে শান্ত রাখবার চেষ্টা করছি। পারছি না। আমি চুপচাপ, উত্তেজিত ও প্রত্যাশায় উন্মুখ।

কিন্তু হঠাৎ একটা উঁচু পথ দেখতে পেলাম আমাদের রাস্তাকে চিরে অন্য ধারে বেরিয়ে যেতে। এরই দক্ষিণদিকে উপত্যকায় গড়ে উঠেছে একটি শহর।

"এই শহরটার নাম কি?"

একটি লোক আমাদের পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলো। আমি তাকে এই শহরের নাম জিজ্ঞেস করলাম।

"বুগিভ্যাল"—সে উত্তর দেয়।

আমি নামটা শুনে বজ্রাহত।

"বুগিভ্যাল! ঠিক বলছেন তো?'

"ধ্যাৎ মশাই! আমি এখানে বাস করি।"

যুবতীটি খিল খিল করে হেসে ওঠে।

আমি তখন বললাম, একটা গাড়ি ভাড়া নিয়ে ভার্সাইতে তাকে পৌছে দেবো।

"না মোটেই তা নয়!" সে বলে ওঠে, "ব্যাপারটা খুব মজার মনে হচ্ছে। আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে।· আমি আদৌ চিন্তিত নই। আর আমার স্বামী নিজের পথ ঠিকই খুঁজে নেবে। বরং আমি যদি ঘণ্টা কয়েকের জন্য ওর কাছ থেকে দূরে থাকতে পারি, হাঁপ ছেড়ে বাঁচবো।"

সুতরাং আমরা নদীর ধারে একটি রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করলাম। সাহস পেয়ে আমি একটি আলাদা ঘরেরও বন্দোবস্ত করেছিলাম।

আজো আমি বলতে পারি, সেদিন ঐ ঘরে ঢুকে মেয়েটি আকণ্ঠ মদ্যপান করেছিল।

মদের ঘোরে নাচলো, গাইলো, শ্যাম্পেনে হাবুডুবু খেলো। নেশার তাগিদে শুরু হলো তার বেলেল্লাপনা…বেলেল্লাপনার চূড়ান্ত হলো সেই রাত্রে।

জীবনে আমি সেই প্রথম যৌবন-তাড়নায় নষ্ট হয়ে গেলাম!

সন্তান

[The Little One]

মঁসিয়ে লেঁমোনীর একটি সন্তান সহ বিপত্নীক রয়ে গেলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বড় ভালোবাসতেন। তাঁর সেই ভালোবাসায় ছিল আভিজাত্যবোধ, ছিল রঙিন মাধুরী, যা কখনো পুরনো হয়নি, ব্যর্থ হয়নি। তিক্ততাহীন প্রেম-পূর্ণ জীবন কাটিয়ে দিলেন তাঁরা একসঙ্গে। মানুষ হিসেবে মঁসিয়ে লেঁমোনীর শান্ত, সৎ, সহজ, অত্যন্ত সরল—সাতে নেই পাঁচে নেই, পেটে নেই কোন জটিল প্যাঁচ।

যৌবনে গরীব প্রতিবেশী-কন্যার প্রেমে পড়েছিলেন, বিয়েও করেছিলেন। তাঁর তখন ব্যবসায় উঠতির মুখ, বৃহস্পতি তুঙ্গে, কাড়ি কাড়ি টাকা আসছে। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর মনে সন্দেহ দোলা দেয়নি,—মেয়েটি তাকে ভালোবাসে, না ভালোবাসে এই টাকার স্তূপকে?

স্ত্রী তাঁকে সব সময় খুশি রেখেছে। তিনিও স্ত্রী বলতে অজ্ঞান, আর কারুর দিকে নজর দেবার সময় নেই তাঁর। জীবনের প্রতিটি ক্ষণে তখন বসন্ত-উৎসব। স্ত্রীর মুখপানে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন, চোখে চোখ, প্রেম-পূজারীর চোখের পলক পড়ে না। এমন কি, খাবার টেবিলে বসেও সেই বিহ্বলতা কমে না, সেখানে তাঁর হাজারটা ভুল হয়, তবু প্রিয়ার মুখ-চন্দ্রিকা দর্শন থেকে বিরত হন না। একভাবে চেয়ে থাকার দরুণ প্রায়ই খাবার ডিশে মদ ঢেলে ফেলেন এবং নুনের পাত্রে ঢেলে দেন জল, তারপর ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নিজেই শিশুর মতো হো-হো হাসিতে ফেটে পড়েন:

"তোমার প্রতি আমার অস্বাভাবিক প্রেমের পরিণতি কি দেখো; কত রকমের ভুল যে করছি!"

স্ত্রীর মুখে স্মিত হাসি, এমনভাবে মুখ ঘুরিয়ে নেয় যেন স্বামীর এরকম প্রেম-নিবেদনে সে বিশেষ বিব্রত; স্বামীকে অন্য প্রসঙ্গে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু ভদ্রলোক তাকে ছাড়েন না, হাত ধরে কাছে টেনে আনেন। আবেগে আশ্লেষে বলেন, "আমার ছোট্ট জেনী, আমার ছোট্ট জেনী!"

জেনী তাকে সংযত করবার চেষ্টা করে, "ইস, এখন এ সবের সময় নয়। তুমি নিজের খাবার খাও, আমাকেও আমার খাবারের থালা নিয়ে বসতে দাও।"

লেঁমোনীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন, রুটির টুকরো ছিঁড়ে মুখে পোরেন।

পাঁচটি বছর তাঁদের কোন সন্তান ছিল না। তারপর একদিন জানা গেল, জেনী মা হতে চলেছে। আনন্দে আপ্লুত হলেন দম্পতি। অন্তঃসত্ত্বাকালে লেঁমোনীর এক মুহূর্তের জন্যও তার স্ত্রীকে ছেড়ে থাকতে চাইতেন না, সব সময় কাছে কাছে ঘুর ঘুর করতেন; শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা হলো যে, সময় সময় জেনীর বুড়ি নার্স এক রকম জোর করে ভদ্রলোককে বাড়ির বাইরে পাঠিয়ে দিতেন।

লেঁমোনীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এক যুবক, নাম মঁসিয়ে ডুরেঁট্যার। জেনীর সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই তাঁর পরিচয় ছিল। প্রিকেকচ্যারের এক অফিসের দ্বিতীয় বড়বাবু ছিলেন তিনি। লেঁমোনীর বাড়িতে সপ্তাহে অন্ততঃ তিনবার ডিনার খাবার নিমন্ত্রণ থাকতো তাঁর, যখনই যেতেন মাদামের জন্য ফুল থাকতো তাঁর সঙ্গে, কখনো কখনো থিয়েটারের টিকিট কেটেও নিয়ে যেতেন; লেঁমোনীর প্রায়ই আবেগে তাঁর স্ত্রীকে বলতেন, "তোমার মতো স্ত্রী আর ডুরেঁট্যারের মতো বন্ধু যার আছে, সেই তো এই পৃথিবীর প্রকৃত সুখীজন।"

সেই জেনী বাচ্চার জন্ম দিয়েই মারা গেল। শোকে লেঁমোনীরও মারা যেতেন প্রায়। শুধু নবজাতকের মুখের দিকে চেয়ে বুক বাঁধলেন। ছোট্ট শিশুর মায়া তাঁকে এই পৃথিবীতে আটকে রাখলো। অদ্ভুত এক আবেগ ও বিষণ্ণ-ভালোবাসা তাঁকে অধিকার করে। ঐ শিশু একদিকে যেমন তাঁর প্রিয়ার মৃত্যুকে স্মরণ করায়, অন্যদিকে তার জীবন্ত স্মৃতি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। এই শিশুটি তারই স্ত্রীর শরীর দিয়ে গঠিত, তারই রক্ত-মাংস-মেদের বুঝি জীবন্ত প্রতিভূ। যেন জেনীর প্রাণ অন্য একটি দেহে সঞ্চারিত হয়েছে মাত্র। জেনী মরেনি, বেঁচে রয়েছে এই শিশুর মধ্যে···ভাবতে ভাবতে আবেগে ছেলেকে জড়িয়ে ধরেন লেঁমোনীর।···

কিন্তু—কিন্তু এ কথাও সত্যি, এই শিশু তার মাকে খুন করেছে, তার প্রাণ চুরি করেছে···মঁসিয়ে লেঁমোনীর তাঁর ছেলেকে সামনে বসিয়ে তাকিয়ে থাকেন, এই সব ভাবেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমন চলে, কখনো তাঁর মন বিষাদ-পূর্ণ। কখনো মধুর স্বপ্নময়। তারপর শিশু ঘুমিয়ে পড়লে তিনি নীচু হয়ে ওর গণ্ডদেশ স্পর্শ করেন, ওর শরীর ঢেকে দেন।···

শিশুটি বড় হয়। তার বাবা এক ঘণ্টার জন্যও দূরে থাকতে পারেন না। নার্স থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজের হাতে ওর যত্ন করেন, বেড়াতে নিয়ে যান, পোষাক পরিয়ে দেন, স্নান করান, স্বয়ং খাইয়ে দেন।

তাঁর বন্ধু মঁসিয়ে ডুরেঁট্যুরও বাচ্চাটিকে খুব ভালোবাসেন, প্রায় যেন আপত্য স্নেহে ওকে বুকে আঁকড়ে রাখেন। কখনো কখনো হাতের ওপর বসিয়ে নাচান, কখনো নিজে ঘোড়া সেজে ওকে নিয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়ান, তারপর হঠাৎ অজস্র চুম্বনে ভরিয়ে দেন শিশুটিকে—ওর কপাল থেকে শুরু করে মোটা সোটা উরু অব্দি।

"ঠিক জেনীর মতো দেখতে হয়েছে, তাই না?"—মঁসিয়ে লেঁমোনীর আনন্দে ফিস্ ফিসিয়ে ওঠেন। মঁসিয়ে ডুরেঁট্যুর সমানে নাচানাচি করছেন বাচ্চাটিকে নিয়ে,—কখনো বুকের ওপর, কখনো ঘাড়ের ওপর, কখনো দাড়ি-গোঁফ ঘষতে থাকেন শিশুর নরম গালে।···

একমাত্র বুড়ি আয়া সেলিসতের যেন কোন মায়া-মমতা নেই শিশুটির প্রতি। মুখে তাঁর বিরক্তির চিহ্নগুলি স্পষ্ট, শিশুটিকে নিয়ে দুই বয়স্কলোকের আদিখ্যেতা তার যেন আদৌ পছন্দ নয়।

"এভাবে কি কেউ বাচ্চা মানুষ করে?" তিনি ব্যাখ্যা করেন, "আপনারা আদর দিয়ে ওকে একটি বানর বানাবেন।"

বেশ কয়েক বৎসর অতীত হয়ে গেল। জঁার [ছেলেটার নাম] বয়স ন' বছর। একটি অক্ষরও সে পড়তে পারে না। আব্দার পেয়ে পেয়ে গোল্লায় গেছে—যখন যা বায়না ধরবে, তা আদায় না করে ছাড়বে না। ভীষণ এক-গুঁয়ে, বদরাগী, অপরিণত মস্তিষ্কের ছেলে। আর তার বাবা তখনো সমানে তাকে আস্কারা দিয়ে চলেছেন, ছেলের জন্য বুঝি তিনি চাঁদ পেড়ে আনতে পারেন! মঁসিয়ে ডুরেঁট্যুরও তাই,—নিত্য-নতুন খেলনা কিনে এনে দেন, রাশি রাশি কেক আর মিষ্টি কিনে এনে ওকে খাওয়ান।

এই সব ব্যাপার দেখে সেলিসতের মেজাজ আর ঠিক থাকে না, ওদের সে

সাবধান ক'রে দেয়, "দেখুন মঁসিয়ে, এটা কোন গৌরবের কথা নয়, লজ্জার কথা। বাচ্চাটাকে আপনারাই শেষ করবেন! বুঝলেন? আপনারাই ওর ইহকাল পরকাল ঝর ঝরে করে তুলছেন। এ সব থামান, আমি দিব্যি দিয়ে বলছি, এ সব থামান।"

"বেশ, তবে আমাকে কি করতে বলছেন?" মৃদু হেসে মঁসিয়ে লেঁমোনীর জবাব দেন, "আমি যে ওকে অত্যন্ত ভালবাসি, ওর কোন ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবার ক্ষমতা আমার নেই। ওকে যেটুকু মানুষ করবার আপনিই করবেন।"

জঁা বেশ দুর্বল এবং রিকেটী চেহারা! ডাক্তার পরীক্ষা করে রায় দিয়ে গেছেন, ওর রক্তাল্পতা ঘটেছে, শরীরে আয়রণের দরকার, লাল মাংস খাবে, শাক-সব্জির স্যুপ্ খাবে, মিষ্টি খাওয়া দারুণ ক্ষতিকর। অথচ, ছেলেটা কেক ছাড়া কিছুই খাবে না। যা কিছু পুষ্টিকর খাবার দিক, সে ও সব খেতে রাজি নয়। আর ওর বাবা সেই সব ভয়ানক বায়নাই মেনে নিচ্ছেন, পকেট ভর্তি নিয়ে আসছেন ক্রীম মাখানো কেক চকলেট ইত্যাদি।

এক সন্ধ্যায় খাবার-টেবিলে ছেলেকে নিয়ে বসেছেন লেঁমোনীর। দৃঢ়চেতা সেলিসত্ স্যুপের বাটিটা নিয়ে এসে রাখলেন টেবিলের ওপর। ঢাকনা তুলে ঘোষণা করলেন, "চমৎকার স্যুপ্! এত ভালো রান্না এর আগে আমি কখনো রাঁধিনি। জঁা নিশ্চয় এর খানিকটা আরাম করে খাবে।"

মঁসিয়ে লেঁমোনীর আশঙ্কায় কেঁপে উঠলেন, মাথা হেঁট করলেন। তিনি বুঝতে পারছেন, কেলেঙ্কারী একটা কিছু এখনই ঘটবে।

সেলিসত্ লেঁমোনীরের থালাটা টেনে নিয়ে ওতে অনেকটা স্যুপ্ ঢেলে দিলেন। লেঁমোনীরও সেই স্যুপ্ চাখতে চাখতে কৃত্রিম উল্লাসে বললেন, "বাঃ! চমৎকার হয়েছে! চমৎকার হয়েছে!"

সেলিসত্ এরপর ছেলেটির থালাতে বেশ কয়েক চামচ ঐ ঝোল ঢাললেন এবং থালাটা এগিয়ে দিয়ে নিজে কয়েক পা পিছিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

জঁা একটু জিভে ছুঁইয়েই মুখ বিকৃতি করে, থালাটাকে ঘৃণায় দূরে সরিয়ে দেয়, কুৎসিৎ এক আওয়াজ করে ওঠে "বাজে!"

সেলিসতের মুখ লাল, এক রকম ছুটে এগিয়ে এলেন তিনি, থালা থেকে চামচে করে স্যুপ্ তুলে জোর করে ছেলেটার মুখে তা ঢালতে থাকেন। জঁা ছটফট করে, মাথা ঝাঁকায়, থুতু ছিটায়।...সেলিসতের সর্বাঙ্গে স্যুপের দাগ থাকে। শেষে মরীয়া হয়ে তিনি জঁার মাথাটা চেপে ধরেন, জোর

করে হা করান, স্থপ ঢালতে থাকেন ওর গলা দিয়ে। জাঁও সঙ্গে সঙ্গে বমি করে দেয় এবং এমন ছটফট করতে থাকে যেন তার প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।

ছেলেটার বাবা এতক্ষণ বিস্ময়ে হতবাক নিথর হয়ে বসেছিলেন। তারপর হঠাৎ তিনি উঠে দাঁড়ান, হিংস্র তৎপরতায় ছুটে গিয়ে বুড়ি আয়াকে এক হেঁচকা টানে ছুঁড়ে মারেন দেওয়ালের দিকে!

"বেরিয়ে যা! বেরিয়ে যা! দূর হ! ডাইনি!"—লেঁমোনীর চীৎকার করতে থাকেন।

আচমকা আঘাত সামলে পাল্টা ফুঁসে উঠলেন সেলিসত্, তাঁর একমাথা চুল ফুলে ফেঁপে ওঠে, মাথা থেকে ক্যাপটা ঝরে পড়ে মাটিতে, দুই চোখ ঝলসাতে থাকে। চীৎকার করে বলেন, "কি এত বড় সাহস আপনার! বাচ্চা-টাকে স্বাস্থ্যের কারণে স্থপ্ খাওয়াচ্ছিলাম বলে আপনি আমার গায়ে হাত তুলতে উদ্যত হলেন! আপনিই ওকে খুন করবেন, আপনার এই আস্কারাই ওর মৃত্যুর কারণ হবে!"

"বেরিয়ে যা!...আমি তোকে বরখাস্ত করছি নিষ্ঠুর!"—তিনি তখনো হুঙ্কার ছাড়ছেন, পা থেকে মাথা অব্দি কাঁপছে থর থর করে।

"এ্যাঁ!...এই তবে আপনার ব্যবহার...না, কখনো নয়...কার, কার জন্য আপনার এমন চণ্ডাল রাগ?...তাও যদি নিজের ছেলে হতো! না...জেনে রাখুন ঐ ছেলে আপনার ঔরসজাত নয়...সবাই জানে, ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি আপনি ছাড়া এ তথ্য সকলেরই জানা...শহরের মুদি দোকান-দারকে জিজ্ঞেস করুন, মাংস-বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করুন, যাকে ইচ্ছে ডেকে জেনে নিন—সকলেই আঙুল তুলে ঐ এক জবাব দেবে..."

বলতে বলতে আবেগে আয়ার কণ্ঠরুদ্ধ হয়, রাগে জ্বলছেন তিনি।... তারপর এক সময় চুপ হয়ে যান, মনিবের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

এই প্রচণ্ড প্রত্যাঘাতে লেঁমোনীর আর যেন মানুষ নন, দুই হাত বাড়িয়ে ছুটে আসেন, "কি ·বলছিস?...কি বলছিস তুই?"

আয়া অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বরে বলেন, "আমি যা জানি তাই বললাম। এ তথ্য সকলেরই জানা।"

লেঁমোনীর বন্য পশুর মতো সেলিসতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলেন। কিন্তু বয়স সত্ত্বেও সেলিসতের শরীরে জোর কম নয়, লেঁমোনীরের হিংস্র আক্রমণ এড়িয়ে টেবিলের অন্যধারে গিয়ে দাঁড়ান, আয়ার

সেই রাগে ক্ষোভে চীৎকার করে বলেন, "তাকিয়ে দেখুন, ওর দিকে চেয়ে দেখুন। আপনি মহা মূর্খ। চোখ মেলে তাকালেই বুঝতে পারবেন, জাঁ কি মঁসিয়ে ডুরেঁটুারের জীবন্ত প্রতিভূ নয়? মিলিয়ে দেখুন ওর নাক, চোখ— ও সব কি আপনার মতো? আপনার চোখ? আপনার নাক? আপনার চুল? আমি যা বললাম, সকলেই তা জানে। সকলেই, শুধু আপনি বাদে। এই নিয়ে শহরে কম হাসাহাসি হয়? তাকিয়ে দেখুন ওর দিকে।..."

বলতে বলতে দরজা খুলে সেলিস্ত্ মিলিয়ে গেলেন।

দৃশ্য দেখে জাঁ ভয়ে নিশ্চল।

ঘণ্টাখানেক বাদে আয়া ফিরে এলেন ধীর পদক্ষেপে। ইতিমধ্যে ছেলেটি একডিশ কেক পায়েস ক্রীম ইত্যাদি নীরবে সাবাড় করেছে। ওর বাবা ঘর ছেড়ে চলে গেছেন।

সেলিস্ত্ ওকে কোলে তুলে নিলেন, নীরবে ওর ঘরের বিছানায় শুইয়ে দিলেন। তারপর আবার ফিরে এলেন খাবার ঘরে। টেবিল পরিস্কার করলেন, সব কিছু গুছিয়ে রাখলেন। মনে তাঁর গভীর অস্বস্তি। গোটা বাড়িতে কোন শব্দ নেই। কান পেতে শোনেন, গৃহস্বামীর ঘর থেকে কোন আওয়াজ আসে কিনা। ভদ্রলোক তাঁর ঘরে পায়চারি করছেন না। সেলিস্ত্ দরজায় চাবির ফুটোতে চোখ রেখে লক্ষ্য করছেন। লেঁমোনীর টেবিলের সামনে বসে কি যেন লিখছেন, তাঁকে বেশ প্রশান্ত দেখাচ্ছে।

সেলিস্ত্ রান্না ঘরে গিয়ে বসলেন। টের পান, কিছু যেন একটা ঘটতে চলেছে। এ বাড়ির বাতাসে ভাসছে কোন অঘটন-বার্তা।

বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়লেন সেলিস্ত্ এবং সেই ঘুম যখন ভাঙলো, তখন সন্ধ্যা ঘনিয়েছে।...রাত্রি প্রায় আটটা নাগাদ বাড়ির কর্তার জন্য কফি প্রস্তুত করলেন তিনি। কিন্তু তাঁর ঘরে ঢুকতে সাহস হচ্ছে না তাঁর, অপেক্ষা করছেন—কতক্ষণে বেল বাজাবেন। কিন্তু বেল আর বাজলো না। রাত ন'টা বাজলো, দশটা বাজলো।

সচেতন সেলিস্ত্ এবার নিজেই দুরু দুরু বুকে কফির ট্রে নিয়ে লেঁমোনীরের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ান। কান পাতেন। শব্দ নেই। দরজায় টোকা দিলেন। জবাব এলো না। সমস্ত সাহস একত্রিত করে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কে অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠেন, হাত থেকে ট্রেটা পড়ে যায় মাটিতে।

ঘরের ঠিক মাঝখানে মঁসিয়ে লেঁমোনীরের প্রাণহীন দেহটা ঝুলছে। গলায় দড়ি দিয়েছেন। শক্ত ঘাড় বেঁকে আছে, জিভ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, পা থেকে একপাটি জুতো খুলে পড়েছে, অন্যটি তখনো লটকে আছে আর এক পায়ে, একটা চেয়ার উল্টে আছে বিছানার গায়ে।

কাঁপতে কাঁপতে ছুটে বেরিয়ে আসেন সেলিস্ত্। তাঁর চীৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসে। ডাক্তার এসে বললেন, এই রাত্রেই মৃত্যু ঘটেছে লেঁমোনীরের।

টেবিলের ওপর আবিষ্কৃত হলো মঁসিয়ে ডুরেঁট্যুরকে উদ্দেশ্য করে লেখা একখণ্ড চিঠি :

"আমি বিদায় নিচ্ছি এবং ছেলেটির দায়িত্ব রইলো তোমার ওপর।"

যোশেফ

[Joseph]

তাঁরা দু'জনেই মাতাল, আকণ্ঠ মাল টেনে বেসামাল অবস্থা—ছোট খাটো চেহারার ব্যারোনেস্ এণ্ডি-দ্যঁ ফ্রেইসিরস্ এবং অনুরূপ চেহারার কমটেস্ নমি দ্যঁ পার্ডেনস্।

সমুদ্রের দিকে মুখ ফেরানো বহু জানালাবিশিষ্ট একটি প্রাতঃকালীন ঘরে বসে তাঁরা তাঁদের খানা-পিনা সারছেন। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় নরম বাতাস হুঁ হুঁ করে ঢুকছে জানালাগুলি দিয়ে, ঈষৎ উষ্ণ,—ঈষৎ শীতল, বাতাসের সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে সমুদ্রের প্রভাব। দীর্ঘ আরাম কেদারায় শায়িতা দুই যুবতী মাঝে মধ্যে পেয়ালায় চুমুক দেন, সিগ্রেট টানেন, এ্যালকহলিক্ আবেশে পারস্পরিক অন্তরঙ্গতায় তাঁরা ঘনিষ্ঠ, আলাপরত।

তাঁদের স্বামীরা অপরাহ্ণে ফিরে গেছেন প্যারিসে, আর এরা দু'জনে এই নির্জন সমুদ্র-আবাসে সময় কাটাচ্ছেন, এখানে গুনমুগ্ধ যুবকদের ভিড় ও হৈ-হল্লা নেই। সপ্তাহের পাঁচটি দিন ধরে যে হারে পিক্‌নিক্, ভ্রমণ, হৈ-হুল্লোড় করতে হয় তাঁদের, তা প্রায় অসহ্য। সেই জমাটি পরিবেশ থেকে রেহাই পাবার জন্যই সমুদ্রতীরে এই বিরাম-গৃহটি নির্মাণ করেছেন তাঁরা, গ্রীষ্মের দিনগুলি এখানে অতিবাহিত করা এক অনবদ্য অভিজ্ঞত

নেশার ঘোরে তাঁদের চিন্তাশক্তি এলোমেলো। আনন্দের বিশেষ কোন উৎস খুঁজে না পেয়ে ব্যারোনেস্ কাউন্টেসের কাছে বিশেষ ডিনার ও শ্যাম্পেনের প্রস্তাব রেখেছিলেন। নিজের হাতে খানা প্রস্তুত করতে গিয়ে তাঁরা দারুণ আমোদ পাচ্ছিলেন, খেলেনও খুব, মদ্যপানেরও আর সীমা রইল না। তারপর টান টান শুয়ে বিবিধ উদ্ভট শব্দ করতে থাকেন, সিগ্রেট টেনে মুখভর্তি ধোঁয়া ছাড়তে থাকেন। তাঁরা নিজেরাই বুঝতে পারছেন না, কি তাঁরা বলছেন !

কাউন্টেস্ তো এক পা তুলে এমন সব কথা বলছেন, যা তাঁর বান্ধবীকেও হার মানায়।

"এই রাতটা কাটাবার জন্য", তিনি বলতে থাকেন, "আমাদের দু'জনেরই প্রেমিক দরকার। যদি এটা আগে মাথায় আসতো, আমি নির্ঘাৎ প্যারিস থেকে এক জোড়া যুবককে আমদানী করতুম। তুমি ওদের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে।"

"সে আর কি কঠিন কাজ ! আমি যে কোন সময় একজনকে যোগাড় করে আনতে পারে," অপর জন জবাব দিলেন, "এমন কি এই সন্ধ্যাতেও যদি বাসনা জাগে, একজনকে ঠিক ডেকে আনতে পারবো !"

"বলছো কি ! রক্সুভেলিতে, মাইরি ? তা হলে নিশ্চয় কোন চাষা।"

"আদৌ নয়।"

"ব্যাপারটা খুলে বলো।"

"কি খুলে বলবো ?"

"তোমার ঐ প্রেমিক সম্পর্কে।"

"ও বান্ধবী, প্রেম ছাড়া আমি বেঁচেই থাকতে পারি না। যেদিন দেখবো, আমাকে কেউ প্রেম নিবেদন করার নেই, আমি মারা যাবো।"

"আমারও সে রকম অবস্থা।"

"হ্যাঁ, তাই নয় কি ?"

"সত্যি ভাই। অথচ, পুরুষরা তা বোঝে না ; আমাদের স্বামীরা তো কিছুতেই নয়।"

"বাস্তবিক ওদের যদি এতটুকু বোঝবার ক্ষমতা থাকতো। অথচ তুমি আর কি আশা করতে পারো ? আমাদের কাছে ভালোবাসা হচ্ছে রোমাঞ্চকর আনন্দদায়ক সব ঘটনা ; আমাদের প্রেমিকরা হবে দারুণ অনুগত

অথচ সাহসী। তারাই হবে আমাদের হৃদয়ের খোরাক, তাদের ঐ আনুগত্য ও সাহস আমাদের পক্ষে ভীষণ প্রয়োজনীয়।"

"হাঁ, ভীষণ প্রয়োজনীয়।"

"আমি নিশ্চয় অনুভব করবো, কেউ সর্বক্ষণ আমাকে নিয়ে ভাবছে। আমি শুনে যাই বা, উঠে বসি, নিশ্চয় টের পাবো, কেউ একজন কোথাও না কোথাও আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, আমাকে স্বপ্নে দেখছে, কামনা করছে। এ ছাড়া আমার অবস্থা তো করুণ, অস্তিত্বই অর্থহীন—সেই শূন্যতায় কান্নাকাটি ছাড়া আমার আর গত্যন্তর থাকতো না।"

"ঠিক বলছো, আমারও সেই অবস্থা।"

"এর অন্যথা হবার নয়। একজন স্বামী আর কতদিন দয়ালু থাকতে পারে?—ছ'মাস, অথবা, এক বছর বা দু'বছর; তারপর শেষ পর্যন্ত ঠিক মতের পরিবর্তন ঘটবে, শুরু হবে তার অত্যাচার।...তার ভেতর লজ্জা বলতে কিছু থাকবে না, সব কিছুতেই খুঁত ধরে বেড়াবে, তার আসল রূপটি প্রকাশ পাবে। শুরু হবে তার কঞ্জুসী, তোমার সাধ আহ্লাদ বলতে আর কিছুই থাকবে না। যার সঙ্গে সারাটা জীবন কাটাতে হবে, তাকে ভালোবাসা যায় না।"

"খুব সত্যি কথা।"

"ঠিক বলছি না? হ্যাঁ, আমি যেন কি বলছিলাম? কিছু মনে করতে পারছি না।"

"তুমি বলছিলে, সব স্বামীরাই নিষ্ঠুর।"

"আলবৎ, ওরা সব পাষাণ....সব সমান।"

"ঠিক।"

"তা হলে কি দাঁড়ালো?"

"কি দাঁড়ালো?"

"বলো তো কি হতে পারে?"

"আমি কি করে বলবো? তুমি তো কথা শেষ করোনি।"

"আমার নয়, এবার তোমাকে কিছু বলতে হবে।"

"দাঁড়াও, হুঁ, মনে পড়েছে—"

"বলে যাও; আমি শুনছি।"

"বলছিলাম, যে কোন জায়গাতেই মনমত পুরুষ আমি খুঁজে নিতে পারি।"

"কি ভাবে ?"

"বলছি। মন দিয়ে শোন। যখনই কোন নতুন জায়গায় যাই, আমি সেখানকার নাড়ি-নক্ষত্র জেনে নিই; তারপর পছন্দ করে নিই উপযুক্ত জনকে।"

"পছন্দ করে নাও ?"

"হাঁ নিশ্চয়। আগে সব খবরাখবর যোগাড় করি; নিশ্চয় ঐ এলাকায় ধনী সুপুরুষ উদারস্বভাব প্রেমিক কেউ না কেউ থাকবেই !"

"খুব সম্ভব।"

"তা হলে সে নিশ্চয় আমার পছন্দসই পুরুষ হবে।"

"নিশ্চয়।"

"তখন আমি তাঁক করবো।"

"তাঁক ?"

"হাঁ, ঠিক যেন মাছ ধরার মতো। তুমি কখনো মাছ ধরোনি ?"

"না, কোনদিন নয়।"

"দুর্ভাগ্য তোমার। এ অভিজ্ঞতা তোমার থাকা উচিত ছিল। খুব মজার ব্যাপার, এবং শিক্ষনীয়ও বটে ! হ্যাঁ, আমি তার দিকে তাঁক করবো।"

"কি উপায়ে ?"

"বোকার মতো কথা বলো না। মেয়েরা তাদের মন মতন লোককে কি ভাবে পাকড়াও করে ? এতে আবার ঘটা ক'রে বলবার কি আছে ? অবশ্যি লোকটির এ ব্যাপারে উৎসাহ থাকা দরকার। পুরুষরা বোকার মতো ভাবে, তারাই বুঝি মেয়েদের মন জয় করছে ; আসলে তো আমরা মেয়েরাই ওৎ পেতে থাকি···সব সময়ই তাই··· । আমাদের মতো বুদ্ধিমতী সুন্দরী মেয়েরা অনায়াসে যে কোন লোককে গোপনে নিজের ঘরে তুলে আনতে পারে, এখানে ব্যর্থতার নজীর কদাচিৎ !···সকাল থেকে সন্ধ্যা অব্দি আমরা শুধু ওদের যাচাই করি, তারপর রাত ঘনালে ঠিক উপযুক্ত পুরুষটিকে বিদ্ধ করে ফেলি।"

"তুমি কিন্তু এখনো কায়দাটা ঠিক মতো খুলে বলছোনা।"

"এর আবার কায়দা কানুন কি ? জলবৎ তরলং। বেশ কয়েকবার লোকটার দৃষ্টির সামনে ঘুর ঘুর করতে হবে, বার কতক দেখতে পেলেই মানুষটার মাথা যাবে ঘুরে। সে তখন তোমাকে সবচেয়ে সুন্দরী বলে ধরে

নেবে এবং ভাববে তুমিই বুঝি এই তুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণীয়া রমণীরত্ন। ফলতঃ শুরু হয়ে যাবে তার অনুরাগ-জ্ঞাপন। আমিও তখন ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেবো পাত্র হিসাবে সেও খুব একটা বেমানান নয়; অবশ্য মুখে কিছুই বলবো না। এক সময় সে আমার পায়ে এসে পড়বে। আমি তাকে পেয়ে যাবো। অবশ্য এই সাফল্যলাভে কতটা সময় লাগবে সেটা নির্ভর করছে পুরুষটির চারিত্রিক দৃঢ়তার ওপর।"

"যাদের চাও, তাদেরই কি তুমি পাও?"

"প্রায় সকলকেই।"

"তা হলে এমন তু'একজনও আছে, যারা তোমার আকর্ষণকে উপেক্ষা করতে পারে।"

"কখনো কখনো।"

"কারণ?"

"কারণ?" তিনটি কারণে একটি মানুষ এ ক্ষেত্রে যোশেফের মতো ব্যবহার করে! প্রথম কারণ, সে অন্য কোন যুবতীর গভীর প্রেমে আবদ্ধ; দ্বিতীয় কারণ হতে পারে, সে খুব নির্বিরোধ ও ভীরু স্বভাবের; আর তৃতীয় কারণটি হলো···কি ভাবে এটা ব্যাখ্যা করি?···একটি যুবতীকে জয় করেও শেষ অব্দি চূড়ান্ত স্তর পর্যন্ত ব্যাপারটাকে সে আর টেনে নিয়ে যেতে পারে না।···"

"আহ, বান্ধবী!···ঠিক বলছো?···"

"হাঁ···আমি এ সম্পর্কে নিশ্চিত।···এই শেষোক্ত দলের লোকদের সংখ্যাই প্রচুর, প্রচুর, তোমার ধারণারও বাইরে। ওহ্! তাদের দেখতে আর সকলেরই মতন···অন্য লোকদের মতোই বেশ-ভূষা···ময়ূরের মতো তাদের চাল-চলন···আমি ওদের ময়ূরের সঙ্গে তুলনা করছি···এটা ভুল···কারণ, সময়কালে তারা তাদের লেজটাকে বড় ক'রে তুলতে পারে না!···"

"তাই নাকি, সত্যি!···"

"ভীরু স্বভাবের মানুষের পক্ষে ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক। এমন লোক এই পৃথিবীতে বিরল নয়, যারা শোবার ঘরে আয়না থাকলে নগ্ন হ'য়ে বিছানায় যেতে অপারগ। এই ধরণের লোকদের সঙ্গে মহড়া দিতে হলে তোমাকে অনেক কঠিন ব্যবস্থা নিতে হবে, তোমাকে শক্ত হ'তে হবে, ওর লজ্জা ও ভয় দূর করতে তুমি তোমার চোখ ও হাত তুটোই প্রাথমিকভাবে ব্যবহার করবে। এমনকি, এতেও কাজ হয় না। ওরা যে জানেই না, কখন ও কিভাবে 'কম্ম'

টা আরম্ভ করা উচিত! তারপর তুমি যদি ছলা-কলা দেখিয়ে তার সামনে মূর্চ্ছা যাও, যেটা তোমার শেষ উপায়···সে ব্যস্ত হয়ে তোমার জ্ঞান ফেরাতেই চেষ্টা করবে···এবং যদি তোমার জ্ঞান ফিরে না আসে···সে সাহায্যের জন্ত বাইরে ছুটবে!"

"আমি আবার সেই সমস্ত পুরুষকেই পছন্দ করি, যাদের অন্ত প্রেমিকা আছে। আমি তাদের ঠিক টেনে আনবো···ঠিক যেন বেয়নেটের মুখে তাদের বিদ্ধ করে রাখবো, বুঝলে বান্ধবী?"

"সে তো খুব ভালো কথা। কিন্তু ধরো এমন এক জায়গায় গেলে যেখানে হাতের কাছে কোন পুরুষ নেই, সেখানে কি করবে?"

"খুঁজে নেবো।"

"কিন্তু কোথায়?"

"আহা, যে কোন জায়গায়। এই ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা আছে। গল্পটা বলছি। দু'বছর আগের কথা। আমার স্বামী তাঁর জমিদারী বোগ্রোলসে্ আমাকে পাঠালো গ্রীষ্মকালটা কাটাতে। জায়গাটা বিলকুল রসকষহীন, কিচ্ছু নেই। আছে শুধু কয়েক ঘর অশিক্ষিত চাষাভূষা লোক, শিকার-টিকার করে, এমন ঘরে বাস করে, যেখানে কোন বাথরুম নেই। হাজার চেষ্টা করেও তুমি তাদের উন্নত করতে পারবে না, কারণ, তারা ঐ নোংরা পরিবেশেই অভ্যস্ত। ভাবতো ঐ রকম একটা জায়গায় গিয়ে আমি কি করেছিলাম?"

"ভাবতে পারছি না।"

"হা, হা! আমি শুধু জর্জ স্যাণ্ডের একখানা উপন্তাস পড়লাম। লেখক তাঁর বইতে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, সমস্ত গ্রাম্য চাষা ও শ্রমিকরা পবিত্র স্বভাবের এবং সব ভদ্রলোকেরাই অপরাধী। এ ছাড়া শীতকালে আমি "রে বেলাস" বইখানাও পড়েছিলাম, যা আমাকে দারুণ প্রভাবিত করেছিল।

যাই হোক, আমাদের কৃষক-প্রজাদের একজনের একটি চমৎকার যুবক পুত্র ছিল; বয়স হবে তার বছর বাইশ, তাকে চার্চে পাঠানো হয়েছিল ধর্মগুরু হবার জন্ত, কিন্তু বিরক্ত হয়ে সে গির্জা ছেড়ে চলে আসে। আমি বেছে-বুছে তাকেই আমার পরিচারক হিসেবে নিযুক্ত করলাম।"

"বাঃ তারপর?"

"তারপর···তারপর তার সাথে শুরু হলো আমার চটকদার ব্যবহার।

তার দৃষ্টির সামনে নিজেকে বিরাট করে বিছিয়ে দিলাম বলতে পারো। আমি কিন্তু ঐ গেঁয়ো যুবকটিকে ঠিক তাঁক করিনি, একটুখানি খেলাচ্ছিলাম মাত্র, ঝলসে দিচ্ছিলাম ওকে !"

"ওহ্! এণ্ডি !"

"হাঁ, দারুণ মজার খেলা এটি, দারুণ মজা! লোকেরা বলে থাকে, চাকর-বাকররা এসব দেখে না। সেও দেখতো না। কিন্তু আমি তাকে রেহাই দেইনি। প্রত্যেকদিন সকালে আমার চাকরাণী যখন আমাকে কাপড় পরাতো, আমি বেল বাজিয়ে তাকে সেখানে হাজির করতাম, কিছু নির্দেশ দিতাম। আবার প্রতি রাতে যখন চাকরাণী একে একে আমার শরীর থেকে জামা-কাপড়গুলি খুলে ফেলতো, আমি ওকে আমার ঘরে ডেকে এনে নিজের নগ্নরূপ দেখাতাম "

"অহ্! এণ্ডি !"

"বান্ধবী, কি আর বলবো, লোকটা উত্তেজনায় কেঁপে উঠতো। তারপর খাবার টেবিলে বসে আমি ওকে শরীরকে পরিচ্ছন্ন রাখবার হরেক রকম উপদেশ দিতাম। পনেরো দিনের মধ্যেই সে সকালে ও সন্ধ্যায় নদীতে স্নান করতে শুরু করলে। শুরু করলে উগ্র গন্ধের সেণ্ট মাখতেও। আমি তাকে উগ্র সেণ্টের বদলে ওডি-কলন ব্যবহার করতে শিখিয়েছিলাম।"

"উঃ! এণ্ডি !"

"তারপর আমি সেখানে একটি ছোটখাটো গ্রন্থাগার গড়ে তুললাম। কয়েকশ' নৈতিক উপন্যাস এনে আমাদের চাষীদের ও সেই ছেলেটিকে পড়তে দিলাম। এই সমস্ত বইয়ের ভিড়ে দু'একটি ভিন্ন জাতের রচনাও চলে যেত···কিছু কবিতার বই···এমন বই, যা চিত্তকে উদ্বেলিত করে···স্কুলের ছাত্র বা, আণ্ডার গ্রাজুয়েটদের পক্ষে যে বইগুলি সত্যি চাঞ্চল্যকর....আমি ঐ রকম বই-ই বিশেষ পরিচারকটিকে দিতে শুরু করি। ঐ বইগুলিই তাকে জীবন চেনালে···জীবনের একটা বিচিত্র দিক।"

"ঈস্···এণ্ডি !"

"তারপর আমি আস্তে আস্তে ওর ঘনিষ্ঠ হতে আরম্ভ করি, অন্তরঙ্গস্বরে কথা বলি। তার নাম দিলাম জোশেফ। বান্ধবী, তার যে তখন কী অবস্থা— কি ভয়ানক অবস্থা—দিনের/পর দিন সে রোগা হতে থাকে—মুরগীর মতো শীর্ণ,

চোখের দৃষ্টি বন্য। ওর এই ভাবান্তর দেখে আমার দারুণ উল্লাস! অত সুন্দর মজাদার গ্রীষ্ম আমার জীবনে খুব কমই এসেছে—"

"তারপর?'

"তারপর—হাঁ, তারপর একদিন আমার স্বামীর অনুপস্থিতিতে আমি তাকে তলব করি এবং বলি, এই দারুণ গরমে সে যেন আমাকে বনে নিয়ে যায়। ব্যস্!"

"বাঃ! এণ্ড্রি! বলো, তারপর কি হলো—আমার খুব আগ্রহ হচ্ছে শুনতে।"

"—আমি তাকে খতম করে দেবার মুহূর্তে এনে দাঁড় করালাম। বনে যাবার পথে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লাম।"

"কি ভাবে?"

"তুমি কি বোকা! আমি খালি তাকে বললাম, আমি অসুস্থ বোধ করছি এবং সে যেন আমাকে কোলে করে নিয়ে ঘাসের বুকে শুইয়ে দেয়। সে শুইয়ে দেবার পর শ্বাসকষ্টের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তাকে বললাম, আমার পোশাকের ফিতাটা আলগা করে দিতে। ফিতাটা আলগা হবার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারালাম।"

"সত্যি জ্ঞান হারালে?"

"ও, না, না, আদৌ তা নয়।"

"বটে?"

"হুঁ, আমি ঘণ্টা খানেক ধরে ঐ রকম অজ্ঞানের ভান করে পড়ে রইলাম! সে কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছিল না। কিন্তু আমারও তো ধৈর্য খুব, এবং সে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে না পড়া পর্যন্ত চোখের পাতা মেলিনি।"

"ও! এণ্ড্রি...এরপর তুমি তাকে কি বললে?"

"আমি? কিছুই না। আমি তো সংজ্ঞাহীন! কি ঘটে গেল আমার ওপর, জানবো কি ভাবে? তাকে ধন্যবাদ জানালুম। আমি শুধু তাকে বললাম ঘরে নিয়ে যেতে।..."

"ও! এণ্ড্রি! এই কি সব?..."

"এই সব!..."

"তুমি শুধু ঐ রকম একবারই অজ্ঞান হয়েছিলে?"

"হাঁ, মাত্র একবার! আমি আমার প্রেমিককে আর দ্বিতীয়বার ওরকম ঠকাতে চাইনি।"

"তারপরও দীর্ঘকাল তাকে কাজে বহাল রেখেছো ?"

"নিশ্চয় ! সে এখনো আমার কাছে আছে। কেন আমি তাকে বরখাস্ত করবো ? তার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই।"

"ও, এগিয়ে ! সে কি এখনো তোমাকে ভালোবাসে ?"

"নিশ্চয়।"

"সে এখন কোথায় ?"

ব্যারোনেস্ হাত বাড়িয়ে বৈদ্যুতিক বেল বাজাল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল এবং এক দীর্ঘদেহী পরিচারক এ ঘরে প্রবেশ করে, তার শরীর থেকে ভেসে আসছে ও-ডি-কলনের কড়া গন্ধ। "যোশেফ, মাই বয়," ব্যারোনেস্ বলেন, "আমার শরীরটা খুব ভালো লাগছে না ; যাও, আমার ঝিকে খবর দাও।"

লোকটি উর্ধতনের সামনে দাঁড়ানো নিশ্চল সৈনিকের মতো দাঁড়িয়ে থাকে, তার দৃষ্টি জ্বলছে তার কর্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ! ব্যারোনেস্ আবার বলেন, "তাড়াতাড়ি করো হে ধেড়ে খোকা ; আমরা এখন আর বনে শুয়ে নেই এবং রোসেলি তোমার চেয়ে অনেক বেশী যত্ন নিতে পারবে আমার।"

সে গোড়ালি ঘুরিয়ে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

"এখন তুমি তোমার চাকরাণীকে কি বলবে ?"—বিস্মিত কাউণ্টেস্ প্রশ্ন করেন।

"বলবো, আমি ভালো আছি। কিন্তু না, আমি যেন কেমন ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছি। আমি একটু বিশ্রাম চাইছি, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আমি মাতাল···বান্ধবী···এমন মাল টেনেছি যে দু'পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারবো না, নির্ঘাৎ পড়ে যাবো।"

সুখ

[Happiness]

এখন চায়ের সময় ; এই কিছুক্ষণ আগে বাতি এনে বসানো হয়েছে। সমুদ্রের বিপরীতে ভিলা, অস্তমিত সূর্যের গোলাপী আভা ছড়িয়ে পড়ছে, যেন সোনার গুঁড়োয় মুড়ে আছে আকাশ। এবং ভূমধ্যসাগর এই পড়ন্তি বেলার

আভায় এখনো চকচকে, নিথর, শান্ত, ছোট ছোট ঢেউও ওঠেনা, যেন একেবারে গতিহীন—সামগ্রিক অবয়ব একটি বিশাল ঝক্‌মকে ধাতব পাত্রের মতন।

দূর দক্ষিণে পাহাড়শ্রেণী তাদের কালো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে পশ্চিমের ফ্যাকাশে নীল লোহিত বর্ণের বিরুদ্ধে।

তাদের গল্পের বিষয়বস্তু প্রেম, এক্‌ পুরনো প্রেমের উপাখ্যানকে নতুন করে বলা, এ গল্প এর আগে অনেক অনেক বার বলা হয়েছে, তবু সেই চর্বিত চর্বন। কেমন এক ধরনের নরম বিষণ্ণতা তাদের স্বরে, অন্তঃকরণে এক করুণ কোমলভাব। একজন মানুষের সতেজ স্বরে কয়েকবার ধ্বনিত হলো একটি বিশেষ শব্দ—"প্রেম" ; তারপর শোনা গেল এক রমণীরও পরিষ্কার উচ্চারণ—"প্রেম।" এই একটি মাত্র শব্দ ছোট্ট ঘরখানাকে যেন ভরিয়ে তুলছে, পাখির ডাকের মতন সে সুমধুর এবং প্রত্যেকে তার প্রভাবে সম্মোহিত।

কোন লোক কি বছরের পর বছর সীমাহীন ভালোবাসায় ডুবে থাকতে পারে ?

হাঁ, কেউ কেউ দাবী করে।

না, অনেকেই সায় দেয় না।

বিভিন্ন ঘটনার বিভিন্নতা নিয়ে আলোচনা করতে থাকে তারা ; উল্লেখ করে সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্য, যা একটি থেকে অপরটিকে পৃথক করে রাখে ; অনেক উদাহরণও টানে। মেয়েরা ও পুরুষরা—সকলেই তাদের প্রায় মুছে যাওয়া স্মৃতিগুলোকে হাতড়াতে থাকে, অনেক সময় ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারে না, যদিও তখন তাদের আবেগ এসে জড়ো হয় ঠোঁটের ওপর। তারা এই সাধারণ, অথচ সবচেয়ে রহস্যময় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে থাকে ; নর ও নারীর মধ্যে এই যে চিরন্তন আকর্ষক রহস্যময়তা ও আবেগ, সেটাই তাদের যাবতীয় উৎসাহকে কেন্দ্রীভূত করে রেখেছে।

হঠাৎ তাঁদের মধ্যে একজন, যার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বহুদূরে, সবিস্ময়ে বলে ওঠে, "আরে ! দেখুন ! ওখানে ওটা কি ?"

সমুদ্র পার হয়ে যেন দিগন্তরেখায় জেগে উঠেছে এক বিশাল ধূসর বিকৃত পিণ্ড।

মেয়েরা উঠে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে ঐ বিচিত্র ভূখণ্ডের দিকে চেয়ে থাকে, তাদের কেউ কখনো এর আগে ওটাকে দেখেনি।

"এ হলো কর্সিকা", কে একজন বলতে থাকে, "বিশেষ আবহাওয়াজনিত পরিবেশ থাকলে বছরের মধ্যে এটা দু'বার বা তিনবার দেখা যায়। বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকলে দূরের বস্তু স্বভাবতই নজরে আসে না।"

ঐ দূরের বিরাট বস্তুপিণ্ডের দিকে চেয়ে এদের মনে কল্পনা-বিলাস জমাট বাঁধে। অনেকেই আঙুল তুলে দেখায়, তারা যেন ওখানে পাহাড়ের শ্রেণী দেখতে পাচ্ছে! অনেকে আবার আরো এক কদম এগিয়ে বলে, পাহাড়ের শীর্ষে বরফ জমেছে। অথচ, অতখানি দেখা তাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়, সকলেরই বিস্ময় তুঙ্গে, হতচকিত, কিছুটা ভীতও বটে,—হঠাৎ সমুদ্রের বুক চিরে জেগে ওঠা ঐ ভৌতিক জগৎ অকল্পনীয়। এই বিচিত্র সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ঐ অজানা দুনিয়ায় পা রাখা কলম্বসের অ্যামেরিকা আবিষ্কারের সামিল বুঝি!

অতঃপর এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, যিনি এতক্ষণ মুখ খোলেননি, মন্তব্য করলেন, "এটা ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার যে, আমরা যখন নিখাদ প্রেমের কথা আলোচনা করছিলাম, ঠিক তখনই ঐ ভয়াল দ্বীপটা আমাদের দৃষ্টির সামনে ভেসে উঠলো! প্রকৃত প্রেম যে কি, তার নজীর আমি দেখে এসেছি ঐ ভয়ঙ্কর দ্বীপেই। এই মুহূর্তে আমার মনে আবার সেই বিচিত্র ঘটনার স্মৃতি জেগে উঠছে।

পাঁচ বছর আগে আমি কর্সিকাতে গিয়েছিলাম। ঐ বুনো দ্বীপ আমাদের কাছে যেন অ্যামেরিকার চেয়েও দূরত্বে, যেন আরো অজানা; যদিও কখনো সখনো ফ্রান্সের উপকূল থেকে ওকে দেখা যায়, যেমন আজ দেখছি।

চিন্তা করুন এক বিশৃঙ্খল জগতের কথা, যা সর্বার্থেই আদিম। ইতস্তত পাহাড় ছড়ানো, মাঝে মাঝে সংকীর্ণ উপত্যকা। সমতলভূমি বলতে কিছুই নেই। শুধু গ্রানাইট পাথরের তরঙ্গ এবং গভীর খাদ। সব ঢেকে আছে ঝোপ ঝাড়ে অথবা বিশাল বিশাল কাজুবাদাম ও পাইন গাছে। কুমারী মৃত্তিকা, অকর্ষিত, পরিত্যক্ত, যদিও কদাচিৎ দুটি একটি গ্রাম নজরে আসতে পারে। এখানে কোন সংস্কৃতি নেই, কল-কারখানা নেই, শিল্প নেই। ওখানে কেউ কখনো কারুকার্যমণ্ডিত কাঠ দেখতে পাবে না, ভাস্কর্যের সুষমাচিহ্নিত কোন পাথর এখানে আবিষ্কৃত হবে না। সুন্দর মহৎ জিনিসের জন্য এখানকার কোন পরিবারের রুচিশীল বাসনা দেখা যায় না। এটাই হচ্ছে এই কঠিন দেশের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। শিল্প ও সৌন্দর্যের প্রতি তাদের সম্পূর্ণ অনীহা।

অথচ ইতালীর কথা ভাবুন। সেখানকার প্রতিটি প্রাসাদ কী অসাধারণ সৃষ্টি। মার্বেল, কাঠ, ব্রঞ্জ, লোহা, বস্তুতপক্ষে সমস্ত রকম ধাতু ও পাথর ব্যবহার করে মানুষ তার প্রতিভার অবিস্মরণীয় সাক্ষ্য রেখেছে। মানুষের আবেগ, উল্লাস, শক্তি ও ঝোঁক তার সৃষ্টিশীল বুদ্ধিমত্তাকে এখানে সম্পূর্ণ কাজে লাগাতে পেরেছে।

আর সেই ইতালীরই মুখোমুখি কর্সিকা আদিতে যেমনটি ছিল, আজো তেমনটি রয়ে গেছে। লোকেরা বাস করে পুরনো ধাঁচের কঠিন আবাসে, যেখানে নিছক অস্তিত্ব রক্ষাই কষ্টকর। মানুষ সেখানে অসভ্য জাতির দোষ ও গুণ নিয়ে টিকে আছে। হিংস্র, ঘৃণা প্রকাশের কঠিন মানসিকতা, ভয়ানক রক্ত পিপাসু; কিন্তু আবার সেই সঙ্গে অতিথিপরায়ণ, উদার প্রকৃতি, সহানুভূতিসম্পন্ন এবং যথার্থ সরল। অতিথিদের জন্য তাদের বাড়ির দরজা সব সময় খোলা আছে, সামান্য সহানুভূতি দেখালে তারা প্রতিদানে দেবে বিশ্বস্ত বন্ধুত্ব।

একমাস ধরে আমি সেই বিচিত্র দ্বীপে ঘুরে বেড়ালাম। মনে হচ্ছিলো, যেন পৃথিবীর শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি। নেই কোন সরাইখানা, কোন বিরামগৃহ, কোন প্রশস্ত পথ। এক রোখা বুনো রাস্তা কখনো চলে গেছে গ্রামের মধ্য দিয়ে, কখনো শেষ হয়েছে কোন পাহাড়ের গায়ে অথবা উপসাগরের তীরে, যার প্রচণ্ড গর্জনে কর্সিকার সান্ধ্যকালীন নির্জনতা ছত্রাক্কাণ হয়ে যায়। ভ্রমণকারীরা গ্রামবাসীর দরজায় ধাক্কা দেয়, রাতের মতন আশ্রয় ও খাদ্য প্রার্থনা করে। নড়বড়ে টেবিলের সামনে তাকে বসতে হয়, অবনত ছাদের নীচে তার শোবার ব্যবস্থা করা হয়, পরদিন সকালে গৃহস্বামী তাকে গ্রামের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসে, প্রথাসিদ্ধভাবে পর্যটক তার প্রসারিত হাতে ঝাঁকানি দেয়।

এক সন্ধ্যায়, একটানা দশ ঘণ্টা হাঁটবার পর আমি একটি ছোট্ট বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাড়িটি একটি সংকীর্ণ উপত্যকার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যে উপত্যকা ঢালু হয়ে নেমে গেছে সোজা সমুদ্রের দিকে। পাশাপাশি দুই পাহাড়ের ঢালু শরীর আগাগোড়া ঘন বন-জঙ্গল, ক্ষয়িষ্ণু পাথর, বিরাট বিরাট গাছ-গাছালি আচ্ছাদিত; তাদের দেখে মনে হয়, যেন দুই বিষণ্ণ প্রাচীর এক নীরব শোকার্ত গহ্বরকে পাহারা দিচ্ছে।

ভাঙা বাড়িটাকে ঘিরে লতিয়ে উঠেছে দ্রাক্ষালতা, ঘিরে আছে নাতিদীর্ঘ

একটি বাগান, এবং আরো কিছু দূরে, এই দরিদ্র দেশের পক্ষে অতি মহা' গুটিকয়েক দীর্ঘ বাদাম গাছ।

এক বৃদ্ধ মহিলা দরজা খুলে দাঁড়ালেন; তাঁর পরিচ্ছন্ন সমর্থ শরীর এই দেশের পক্ষে কিছুটা অস্বাভাবিক। মোড়াতে বসে থাকা গৃহস্বামী উঠে দাঁড়ালেন আমাকে স্বাগত জানাতে এবং কিছু না বলেই আবার বসে পড়লেন।

'ক্ষমা করবেন', তাঁর স্ত্রী বললেন, 'উনি এখন কানে কালা। বিরাশি বছর বয়স হোল।'

নিখুঁত ফরাসীতে কথা বলছেন ভদ্রমহিলা। আমি বিস্মিত।

'আপনারা কর্সিকান নন?'—আমি জিজ্ঞেস করি।

'না' তিনি জবাব দেন, 'আমরা এসেছি মূলভূখণ্ড থেকে। পঞ্চাশ বছর ধরে এখানে আছি।'

পঞ্চাশ বছর ধরে এরা এই পাণ্ডব বর্জিত দেশে বাস করছেন। ভাবতে গিয়ে ভয়ে ও বিস্ময়ে আমি আঁতকে উঠি! শহর থেকে বহুদূরে, লোকালয় থেকে নির্বাসিত হয়ে কি ভাবে তারা দিন কাটাচ্ছেন এই অন্ধকারময় গহ্বরে! ...একজন বয়স-প্রাচীন মেষপালক খাবার নিয়ে এলো, আমরা 'ডিনার' খেতে শুরু করি। আলু, শূকরের পিঠের ও পার্শ্বদেশের লবনাক্ত মাংস এবং বাঁধাকপি একসঙ্গে সিদ্ধ করে ঘন 'স্যুপ' বানানো হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত আহারের পর আমি ঐ ঘর ছেড়ে দরজার সামনে গিয়ে বসি। চোখের সামনে বিষণ্ণ প্রকৃতি আমাকে বেদনার্ত করে। এইসব নির্জন করুণ সন্ধ্যাগুলি ভ্রমণকারীদের সহজেই বিচলিত করে থাকে। মনে হয়, সমস্ত কিছুই যেন শেষ হয়ে আসছে, এমন কি জীবন ও বিশাল চরাচরও।...

বৃদ্ধা আমার পাশে এসে বসলেন। প্রবাসীজনের স্বাভাবিক কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করেন:

'তাহলে, আপনি ফ্রান্স থেকে আসছেন?'

'হাঁ, ভ্রমণ-সুখে আমি বুঁদ।'

'খুব সম্ভব প্যারিসে বাড়ি?'

'না, বাড়ি আমার নানসিতে।'

আমার কথা শুনে তিনি যেন দারুণ চমকে উঠলেন। আমি বলতে পারছি না, কি ভাবে তার এই কম্পন আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

'নানসি থেকে আসছেন?'—তিনি কয়েকবার আস্তে আস্তে উচ্চারণ করেন।

ঠিক তখনই ভাবলেশহীন তাঁর স্বামী এসে দাঁড়ালেন আর পাঁচজন কানে খাটো মানুষের মতন।

'উনি এসে দাঁড়াতে বিব্রত হবেন না'; বৃদ্ধা বললেন, 'আমার স্বামী একদমই শুনতে পান না।'

আরো কয়েক মুহূর্ত পর জিজ্ঞেস করেন:

'নানসির লোকদের নিশ্চয় চেনেন?'

'হাঁ, কেন, ওদের প্রায় সকলকেই চিনি।'

'সেণ্ট-এ্যালিজ পরিবারকে?'

'হাঁ, খুব ভালো চিনি; তাঁরা আমার বাবার বন্ধুস্থানীয় ছিলেন।'

'আপনার নাম?'

আমি তাঁকে নাম বললাম। তিনি আবার কেঁপে উঠলেন; স্মৃতি হাতড়াতে হাতড়াতে মৃদুস্বরে বলেন:

'হাঁ, হাঁ, বেশ মনে পড়ছে। আর ব্রিসেনভদের খবর কি?'

'তাঁরা সকলেই মারা গেছেন।'

'আহা। আর সারমন্তরা, চেনেন তাঁদের?'

'হাঁ। ঐ পরিবারের ছোট ছেলেটি এখন একজন জেনারেল।'

অবরুদ্ধ আবেগে তিনি কেঁপে ওঠেন, এতক্ষণ তাঁর অন্তঃস্থলে যেন লুকোনো ছিল কোন রহস্য, এই মুহূর্তে বুক কাঁপিয়ে তিনি উচ্চারণ করেন:

'হাঁ, হেনরী দ্য সারমন্ত। আমি তাঁকে খুব ভালোই চিনি। তিনি আমার ভাই।'

আমি চোখ তুলে তাঁর দিকে তাকাই, এক্ষণে স্বয়ং বিস্ময়ে হতবাক। এবং সহসা আমার সব মনে পড়ে গেল।

বহুদিন আগের কথা।। গোটা দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল সেই কেচ্ছা। অভিজাত লোরেন অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে ফিরছিল সেই কথা। হুসার রেজিমেণ্টের কমাণ্ডারের রূপসী সম্ভ্রান্ত বংশীয়া যুবতীকন্যা একজন সাধারণ নন্‌কমিশনড্ অফিসারের সঙ্গে পালিয়েছে!

লোকটি অবশ্য সুদর্শন যুবক। চাষী পরিবারের ছেলে হয়ে গায়ে সামরিক পোশাক চরিয়ে বীরত্ব কম দেখায়নি। শেষ পর্যন্ত তারই কর্ণেলের মেয়েকে

নিয়ে চম্পট ! সন্দেহ নেই, মেয়েটি তাকে দেখেছিল, একাগ্রতার সঙ্গে লক্ষ্য করতো ; যখন সৈনিকরা নাচ করতে করতে বেরিয়ে যেত, সে প্রেম-পূর্ণ দৃষ্টিতে তারই দিকে চেয়ে থাকতো। কিন্তু কি ভাবে সে তার মনের কথা ওকে বলেছিল, কি ভাবে তাদের সাক্ষাৎকার ঘটতো এবং কি ভাবে তাদের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ? কিভাবে সে ঐ লোকটিকে বোঝাতে সমর্থ্য হয়েছিল, সে তাকে ভালোবাসে ? এর জবাব কারুর জানা নেই।

কাক পক্ষীতেও টের পায়নি। এক সন্ধ্যায়, যুবক সৈনিক চাকুরির মেয়াদ উত্তীর্ণ হতেই উর্ধতনের মেয়েকে নিয়ে চুপিসাড়ে পালালো। খোঁজা হলো অনেক কিন্তু তাদের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তাদের কোন খবরও শোনা গেল না, মেয়েটি মারা গেছে বলেই ধরে নেওয়া হলো।

'এবং এতকাল পরে আমি তাকে এই বন্ধ্যা উপত্যকায় আবিষ্কার করছি।'

আমি বললাম :

'হাঁ, আমি স্পষ্টই সব মনে করতে পারছি। আপনিই সেই মঁশ্যমোসিলি সুজান।

তিনি সামান্য মাথা হেলিয়ে বললেন, 'হাঁ'। তাঁর চোখ ছাপিয়ে জল নামছে। তারপর ঘুরে তাকালেন সেই বৃদ্ধ লোকটির দিকে, যিনি তখনো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ভদ্রমহিলা আমাকে বললেন : 'ঐ যে সেই মানুষ।'

এবং আমি অনুভব করলাম, আজো ওঁর প্রতি তাঁর প্রেম বিন্দুমাত্র শিথিল হয়নি ; এখনো সমান প্রেমান্ধ দৃষ্টিতে পুরুষটির দিকে তিনি তাকান।

'কিন্তু আপনি কি যথার্থ সুখী হয়েছেন ?' আমি হঠাৎ তাঁকে জিজ্ঞেস করে বসি।

হৃদয়ের গভীর হতে উত্থিত হয় তাঁর জবাব :

'ও, নিশ্চয়, আমি অত্যন্ত সুখী। উনি আমাকে যথার্থই সুখী করেছেন। আমার কোন অভিযোগ নেই।'

আমি সবিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকাই। প্রেমের শক্তিতে উদ্ভাসিত ছোট্ট বিস্মিত বিষণ্ণ মুখ ! এই ধনী মহিলা ঐ চাষী পরিবারের লোকটিকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন। ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এমন এক জীবন-প্রবাহে, যার কোন আকর্ষণ নেই, বৈচিত্র্য নেই, বিলাস নেই, কোন ধরনের উৎসব

নেই ; এক অতি সাধারণ একঘেঁয়ে পারিবারিক জীবনের সামিল হলেন তিনি। এবং তিনি আজো তাঁকে সমান আবেগে ভালোবাসেন। আজ তিনি মাথায় মেয়েদের ক্যাপ চাপিয়ে সাধারণ ক্যাম্বিসের স্কার্ট পরে এক গ্রাম্য চাষীর স্ত্রী হয়েছেন যেন। বসে থাকেন বেতের মোড়ায়, আলু-বাঁধাকপি-শূকরের মাংসের কাদা কাদা স্যুপ গেলেন একটা নড়বড়ে টেবিলের সামনে বসে। এবং রাতে খড় বিছানো শয্যায় ঐ লোকটিকে পাশে নিয়ে শুয়ে থাকেন।

তাঁর একমাত্র চিন্তা স্বামীকে নিয়ে। জীবনে তিনি কখনো দামী হীরে-জহরৎ গহনা বা, দামী জামা-কাপড় বা, কোন আধুনিক জিনিস বা, একটি হাতল-ওয়ালা চেয়ারের আরাম, বা, সুগন্ধযুক্ত সুসজ্জিত ঘর বা এমন কোন নরম গদি যেখানে তিনি বিশ্রাম নিতে পারেন—কিছুরই প্রত্যাশা করেননি। ঐ মানুষটিকে ছাড়া তাঁর আর কিছুই চাইবার ছিল না ; এবং যেহেতু তিনি তাঁকে পেয়েছেন, আর কিছুই চান না।

সেই প্রথম যৌবনে তিনি তাঁর বিলাসবহুল জীবন এবং স্নেহপ্রবণ পরিজনদের ত্যাগ করে পালিয়ে এসেছেন। একাকী প্রিয়র সঙ্গে পালিয়ে এসেছেন এই নির্জন বন্য এলাকায়। তখন থেকে স্বামীই তাঁর কাছে যাবতীয় আনন্দ ও বাসনার উৎস। এবং সেই ভাগ্যবান লোকটিও তাঁকে শুরু থেকে আজ অব্দি সুখী রাখতে পেরেছেন।

এর চেয়ে সুখ তিনি কল্পনাও করতে পারেন না।

গোটা রাত ধরে আমি বিদায়ী বৃদ্ধ সৈনিকের ঘোড়ার শ্বাস-প্রশ্বাসের মতন নাসিকা গর্জন শুনতে থাকি। ওঁরই পাশে শুয়ে আছেন সেই মহিলা। ভাবছি, সুখের জন্য তাঁর কী বিস্ময়কর অভিযান! এই সুখ পরিপূর্ণ, অথচ বস্তুত কত সামান্য।

পরদিন সকালে অথিতিবৎসল দম্পতির সঙ্গে করমর্দন করে বিদায় নিলুম।"

গল্প শেষ। একজন স্ত্রীলোক মন্তব্য করলেন, "যাই হোক, ঐ মহিলার আদর্শ বড় সহজ, সরল, তাঁর প্রয়োজনটাও বড় সেকেলে ও আদিম, জীবনে তাঁর চাহিদা অতিমাত্রায় সামান্য। খুব বোকা মেয়ে।"

আর একজন মহিলা ধীর স্বরে বললেন, "তাতে কি হয়েছে? তিনি তো সুখী।"

দূরে রাত ঘনাবার সঙ্গে সঙ্গে কর্সিকাও তার বিশাল ছায়া সহ ধীরে ধীরে আবার হারিয়ে যাচ্ছে সামুদ্রিক গহনে এবং বিদায়ক্ষণে আমাদের মনে করিয়ে দিল, এক জোড়া অকৃত্রিম প্রেমিক দম্পতি তারই বুকে আশ্রয় নিয়ে আছে আজ বহু বছর।

মাতাল

[The drankard]

॥ এক ॥

উত্তরমুখী অনতিপ্রবল ঝড় তখন বয়ে চলেছে। তারই দাপটে উড়ে এসেছে এক বিশাল কালো ও ভারী ঝোড়ো মেঘ। শুরু হয়ে গেছে পৃথিবীর বুকে দারুণ বৃষ্টি।

ক্রুদ্ধ সমুদ্রের গর্জন তীব্র। উপকূলভাগ কেঁপে উঠছে। তীরের দিকে ছুটে আসা বিশাল শ্লথ-গতি ফেনিল ঢেউগুলি যেন সমানে কামান দাগছে। তারা আসছে বেশ ধীরে-সুস্থে, একের পর এক, আয়তনে পর্বত-প্রমাণ. বালুবেলায় ভেঙ্গে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সফেদ ফেনা বাতাসে ছিটকে আসে, যেন কোন ক্লান্ত দৈত্যের মাথা বেয়ে নেমে আসছে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম।

ইপোর্টের ছোট্ট উপত্যকায় চলেছে এই ঝড়ের তাণ্ডব; বাতাসে শিঁস ও গর্জন; কত বাড়ির ছাদ থেকে উড়ে গিয়ে পড়ছে টালি, খড়খড়ি ভেঙে চুড়মার, চিমনীগুলি উপড়ে পড়ে মাটিতে, দমকা বাতাসের এমনই দাপট যে দেয়াল না চেপে ধরে রাস্তা পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়; এই ঝড়ের মুখে পড়লে শিশুরা ঝরা পাতার মতন উড়ে যাবে এবং বাড়ি টপকে আছড়ে পড়বে মাঠের ওপর।

তরঙ্গাঘাতে চূর্ণ হবার ভয়ে জেলে-ডিঙ্গিগুলিকে টেনে তুলে আনা হয়েছে জল থেকে অনেক দূরে শুকনো মাটিতে। অনেক নাবিক ডাঙ্গায় তোলা নাওয়ের পেটে আশ্রয় নিয়ে দেখছে আকাশ ও সমুদ্রের ভয়ঙ্কর রূপ। ক্রমশঃ রাত ঘনিয়ে আসায় তারা প্রায় সকলেই নিজ নিজ আবাসে ফিরে আসে।

শুধু রয়ে গেল দু'জনে। পকেটে হাত ঢোকানো, প্রবল বাত্যায় তাদের পিঠ বেঁকে আছে, উলের টুপিতে ঢাকা পড়ে আছে তাদের চোখ,—তারা দুই নর্মাণ জেলে। ঘন-সন্নিবিষ্ট চুল-দাড়ি-গোঁফ ঘাড় ও গ্রীবা অব্দি ঝালরের মতন নেমে এসেছে, লবণাক্ত সামুদ্রিক বাতাসে পোড়া তাদের চামড়া, নীল চক্ষুর মাঝখানে কালো কীলক, শিকারী পাখির জলন্ত দৃষ্টি নিয়ে তারা দিগন্তের দিকে চেয়ে আছে।

"এসো, জেরিমি" তাদের একজন বললো, "আমরা ডমিনোজ খেলে সময়টা কাটাই। আমি টাকা দেবো।"

কিন্তু অপরজনের মনে দ্বিধা ; সে জানে ঐ খেলায় মেতে ওঠার পরবর্তী পর্যায়ে তারা আকণ্ঠ ব্রাণ্ডি খাবে, মাতামাতি করবে, তরতরিয়ে সময় বয়ে যাবে , কিন্তু চিন্তা হয়, তার বউ একা ঘরে পড়ে আছে।

"সবাই জানে প্রতি রাতে তুমি আমায় বাজি ধরে মদ খাওয়াও। কিন্তু বলো তো এত খরচা ক'রে তোমার কি উপকারটা হয়?"—সে জিজ্ঞেস করে।

উত্তরে সে এমন দিলখোলা মেজাজে হেসে উঠলো যেন সে নিজেই অপরের পয়সায় নেশা ক'রে থাকে ; নর্মাণ সুলভ উচ্ছল হাসিতে সে সামান্য খরচার প্রশ্নটিকে যেন ফুঁৎকারে উড়িয়ে দেয়। তখনো খুশ মেজাজ মাথুরিন দ্বিধাগ্রস্ত জেরিমির হাত ধরে আছে।

"আরে দোস্ত, এমন একটা রাতে পেটে কিছু গরম বস্তু না নিয়ে বাড়ি যেতে নেই। ভয়টা কিসের? তোমার বুড়ি মেয়েমানুষটা কি তোমার জন্য বিছানা গরম ক'রে রাখবে না?"

"আর একদিন রাতে আমি আমার বাড়ির দরজাই খুঁজে পাইনি," জেরিমি উত্তর দেয়, "ওরা শেষ পর্যন্ত এক নালা থেকে আমাকে উদ্ধার করে।"

বুড়ো বদমাশটা ঐ দৃশ্যের কথা চিন্তা করে আর একবার হো-হো হেসে ওঠে, তারপর শান্তভাবে হেঁটে যায় পারমেলির কাফের দিকে, যার আলোকিত জানালা থেকে থেকে দীপ্তিমান। জেরিমিকে এক রকম বগলদাবা করেই নিয়ে যাচ্ছে মাথুরিন,—পিছন থেকে বাতাসের ধাক্কা এবং সামনে থেকে মাথুরিনের টান, জেরিমি নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারে না।

নীচু ঘরটায় নাবিকদের জটলা, ধোঁয়া উড়ছে, হরেক গলায় হৈ-হৈ রৈ-রৈ। উলের জার্সি পরা লোকগুলি টেবিলের ওপর কনুই রেখে চড়া গলায়

নিজেদের কথা শোনাচ্ছে। যে যত মাতাল তার তত সোচ্চারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস, সেইহেতু গমগমানি ক্রমশই তুঙ্গে ওঠে।

মাথুরিন ও জেরিমি ভেতরে ঢুকে এক কোণে বসে পড়ে এবং খেলা শুরু করে ; গ্লাসের পর গ্লাস ব্রাণ্ডি তাদের গলার ভেতর দিয়ে অদৃশ্য হতে থাকে। খেলা আরো জমে, মাল টানার বহরও বেড়ে চলে।

মাথুরিন কিন্তু ঠিক মতন মাল গিলছে না, অনেক সময়ই ঢেলে ফেলে দিচ্ছে বাইরে এবং মুচকি হেসে ইশারা করছে দোকানের মালিককে, যে লোকটা খুব আমোদ পাচ্ছে ব্যাপারটা দেখে।

আর জেরিমি তো গিলেই চলেছে, মাথা দোলাচ্ছে, বন্য পশুর ডাকের মতন ফ্যা ফ্যা করে হাসছে, রীতিমত কৃতজ্ঞ ও খুশি খুশি চোখে দেখছে তার সঙ্গীকে।

সকলেই যে যার বাড়িতে ফিরে গেল। এক একজন বাইরে যাবার জন্য দরজা খোলে আর দমকা জলীয় বাষ্প এসে ঢোকে কাফের ভেতর। সেই বাতাসে জমাট পাইপের ধোঁয়া চঞ্চল ও পাতলা হয়, মোমবাতির আলো নিভে যাবার উপক্রম হয়, এবং ঠিক তখনই তারা শুনতে পায় বাইরে প্রচণ্ডভাবে ভেঙ্গে পড়া সামুদ্রিক ঢেউয়ের গর্জন বাতাসের হাহাশ্বাস।

জেরিমির জামার বোতাম খোলা, মদের ঘোরে দুলছে, একটা পা দুমড়ে বেঁকে যাচ্ছে, একটা হাত অবশভাবে ঝুলছে, অন্য হাতে খেলার তাস।

এই ঘরে এখন তারা দু'জন ও মালিক ছাড়া আর কেউ নেই। দোকানের মালিক খুব আগ্রহ নিয়ে ওদের কাছে এসে দাঁড়ায়।

"কি জেরিমি" সে জিজ্ঞেস করে, "ভেতরটা ভালো বোধ করছো তো? এতক্ষণ ধরে যা সব পেটে ঢোকালে তাতে বেশ তাজা বোধ করছো তো নিজেকে, এঁ্যা?"

"আরো দরকার" থুথু ছিটিয়ে জেরিমি বলে, "ভেতরটা এখনো শুকিয়ে আছে।"

মাথুরিনের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মালিক তাকায় :

"আর তোমার ভাই মাথুরিনের অবস্থাটা কি?" সে আবার বলে, "এই মুহূর্তে সে কোথায়?"

"ব্যস্ত হবে না, সে এখন যথেষ্ট গরম।"—হাসির সঙ্গে নাবিক জেরিমি জবাব দেয়।

দু'জনে মিলে জেরিমিকে নিয়ে আরো কিছুক্ষণ মস্করা করে। তারপর খেলা শেষ হলে কাফের মালিক বলে, "শোন, আমি এখন এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি। তোমাদের জন্য রেখে যাচ্ছি এই বাতিটা আর কিছু মাল সমেত একটা বোতল। মাল খাওয়া শেষ হলে রোজের মতন আজো মাথুরিন দরজায় তালা দেবে এবং চাবিটা খড়খড়ির মধ্য দিয়ে ভেতরে ফেলে দেবে। কেমন ?"

মাথুরিন জবাব দেয়, "ঠিক আছে, চিন্তার কোন কারণ নেই।"

কাফের মালিক দু'জনের সঙ্গে করমর্দন করে অন্য এক ঘরে গিয়ে ঢোকে। কিছুক্ষণ তার ভারী পায়ের শব্দ শোনা যায়। তারপর সে এমন একটা আওয়াজ তোলে যাতে বোঝা যায় সে এখন বিছানায় শুয়ে পড়লো।

আর এরা দু'জন তখনো খেলে চলেছে; সময় সময় বাতাসের গর্জন ভয়ানক হয়ে ওঠে; দরজায় সেই বাতাস ধাক্কা মারে এবং চারদিকটা যেন কাঁপতে থাকে। দুই মাতাল এমন চোখে তাকায় যেন কেউ তাদের দিকে আসছে, তারপর মাথুরিন বোতল তুলে আবার জেরিমির গ্লাসে মাল ঢালে। হঠাৎ ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজলো। সেই আওয়াজের অনুরণন বহুক্ষণ ধরে টিকে থাকে।

চকিতে কাজ শেষ করে ওঠা নাবিকের মতন উঠে দাঁড়ায় মাথুরিন: "চলো জেরিমি; আমাদের এখন চলে যাওয়া উচিত।"

জেরিমি খুব কষ্টে টাল সামলে উঠে দাঁড়ায়, টেবিলটাকে চেপে ধরে কোন রকমে পতনের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে, টলতে টলতে দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়, ওটা খুলে ফেলে এবং ঠিক তখনই তার বন্ধু বাতিটা দেয় নিবিয়ে।

মাথুরিন দরজায় তালা দেয়। দু'জনে এসে পথে দাঁড়ায়।

"তোমার রাত্রি শুভ হোক; আবার কাল দেখা হবে।"

—বলেই অন্ধকারে হারিয়ে গেল মাথুরিন।

॥ দুই ॥

জেরিমি তিন পা এগোয়, টলমল করতে থাকে, শূন্যে হাত ছোঁড়ে, তারপর কপালগুণে একটা দেয়ালের সন্ধান পায়, দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে

স্খলিত পায়ে এগিয়ে চলে। ঐ সংকীর্ণ রাস্তায় কোথায় যেন একটা আর্তনাদ থেকে থেকে শোনা যায়, ভয় পেয়ে সে অনেকটা পথ এলোপাথাড়ি পা ছুঁড়ে পালিয়ে আসে। তারপর সেই শব্দ থিতিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে থমকে দাঁড়ায়, আবেগ হারিয়ে আবার তার দুই পা বেসামাল।

দিনের শেষে পাখি যেমন নীড়ে ফিরে আসে, সহজাত প্রবৃত্তির বশে জেরিমিও তেমনি তার ঘরের দিকে গুটি গুটি ফিরে চলেছে। সে তার বাড়ির দরজা চিনতে পারে। কপাটের ওপর হাতড়াতে থাকে দরজার তালা খুঁজতে। কিন্তু অনেক খুঁজেও সেই ফুঁটো খুঁজে পায় না। নীচু গলায় শব্দ করতে থাকে সে। তারপর দরজার ওপর ঘুঁষি মারতে মারতে তার স্ত্রীর নাম ধরে ডাকতে থাকে : ''মেলিনা ! এই, শুনছো ! মেলিনা !"

দরজার গায়ে হেলান দিয়ে আছে সে। হঠাৎ সেই দরজা খুল যায়, এবং টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে ভেতরে পড়ে যায় জেরিমি, মেঝেতে ঠুকে যায় তার নাক মুখ। ঠিক সেই মুহূর্তে সে অনুভব করে, ভারী চেহারার কে একজন দ্রুত তার শরীরের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

জেরিমি নিথর, ভয়ে-আতঙ্কে পাথর, শিউরে উঠছে। কে ছুটে গেল তার শরীরের ওপর দিয়ে ? শয়তান অথবা ভূত ? এই ঘোর ঘন অন্ধকারে ওদেরই তো রহস্যময় রাজত্ব ! অনেক সময় ধরে সে ঐ ভাবেই পড়ে থাকে, উঠে দাঁড়াতেও ভয় পায়। কিন্তু যখন সে দেখলো, কোন সচল প্রাণীর অস্তিত্ব আর সেখানে নেই, তার সাধারণ বুদ্ধি ও বোধ ফিরে আসে—সেই বুদ্ধি ও বোধ, যা একজন পাঁড় মাতালেরই থেকে থাকে।

আস্তে আস্তে উঠে বসে সে। ঐ বসা অবস্থাতেই বহুক্ষণ তার কেটে যায় ; অবশেষে একটু একটু করে তার সাহসও ফিরে আসে। ভাঙা গলায় হাঁক ছাড়ে :

"মেলিনা !"

তার স্ত্রীর কোন জবাব আসে না।

হঠাৎ তার অন্ধমস্তিষ্কে এক উষ্ণতার সঞ্চার হয়—এক ভয়ঙ্কর শয়তান-সন্দেহ সেখানে ঘোঁট পাকায়। সে নড়ে না চড়ে না, মেঝেতেই ঠায় বসে থাকে, চারিদিকে অন্ধকার, তার মনেও সেই আঁধি, সন্দেহটা তীব্র, কিন্তু বোধশক্তি তার দুই পায়ের মতনই এলোমেলো বেসামাল।

আবার তার তীক্ষ্ণ স্বর ধ্বনিত হয় :

"মেলিনা, লোকটা কে, বলো। বলো, সে কে। আমি তোমাকে কিছু করবো না!"

সে প্রতীক্ষা করে। অন্ধকারে কোন প্রত্যুত্তর ভেসে আসে না। তার মাথা এখন গরম, খুব গরম।...

"আমি মদ খাওয়া ছেড়ে দেবো। আমি মদ খাওয়া ছেড়ে দেবো। আমার সঙ্গে ওরা শয়তানি করেছে, যাতে সময়মতো বাড়ি না পৌছতে পারি। আমি মদ খাওয়া ছেড়ে দেবো।"

—বিড় বিড় করতে করতে জেরিমি আবার আগের মতন জ্বলে ওঠে :

"মেলিনা, শালী! বল, লোকটা কে ছিল! না বললে, তোর আমি বারোটা বাজাবো!"

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর ধীর পায়ে সে এগিয়ে যেতে থাকে।

"এই জন্যই আমাকে কাফেতে ঢোকানো হয়েছিল, এই জন্যই আমাকে এত ঘটা করে মদ খাওয়ানো। আরো অনেক রাত্রে আমাকে এভাবে বুরবক বানানো হয়েছে, মাল খেয়ে যেন আমি ঘরে না ফিরতে পারি। কারো সঙ্গে চুক্তি করে মাথুরিন দিনের পর দিন এটা করে যাচ্ছে।...ওহ্, শালা, শূয়ার কা বাচ্চা!"

অন্ধ রাগে মাতাল লোকটা এখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য।

"মেলিনা, লোকটা কে ছিল?" সে আবার হুঙ্কার ছাড়ে, "না বললে আমি তোর মাথা গুঁড়িয়ে দেবো। হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, এখনো বল!"

এ্যালকহলিক তপ্ততায় উত্তেজিত শিরা-উপশিরায় যেন আগুন ধরে যায়। সে আরো কয়েক পা এগিয়ে একটা গোটা চেয়ার দু'হাতে তুলে নেয়। ওটা নিয়েই ঘরে বিছানার কাছে গিয়ে দাড়ায়; তারপরই সবেগে ঐ চেয়ারটা আছাড় মারে বিছানার ওপর। সে টের পায়, এইখানে তার বউর তাতানো শরীর পড়ে আছে। পাগলের মতন চীৎকার করে বলে, "আচ্ছা, আমি গলা ফাটিয়ে মরছি, আর হারামজাদি এখানে মটকা মেরে শুয়ে আছে!"

প্রচণ্ড জোরে আবার সে আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে এক মর্মান্তিক আর্তনাদ ওঠে ঐ বিছানা থেকে। আরো খুন চেপে যায় জেরিমির মাথায়। চেয়ারটার একটা হাতল খুলে যায় এবং সে সেই হাতল দিয়েই সমানে মারতে থাকে। এক সময় সেই মর্মান্তিক আর্তনাদও থেমে যায়।

জেরিমিও হঠাৎ তার মার থামায়। জিজ্ঞেস করে :

"কি এবার বলবি, কে এসেছিল ?"

মেলিনার জবাব আসে না।

অতঃপর অস্বাভাবিক উত্তেজনা ও ক্লান্তিতে মাতাল নাবিক অবশ হয়ে পড়ে, মাটিতে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমের অতলান্তে ডুবে যায়।

পরদিন সকালে ঐ বাড়ির দরজা খোলা দেখে একজন প্রতিবেশী এসে হাজির হয়। সে দেখতে পায়, মেঝেতে শুয়ে হাঁ করে ঘুমোচ্ছে জেরিমি, তার চারপাশে ভাঙ্গা চেয়ারের টুকরোগুলি ছড়ানো-ছিটনো এবং বিছানার ওপর চাপ চাপ রক্ত ও থেত্‌লানো মাংস !

জোয়েত

এক

কাফে রিচি থেকে তখন ওরা নেমে এসেছে পথে। জাঁ দ্য সারাভিনি ও লিয়ঁ সেভেল। সারভিনি সেভেলকে বললো, "এখন একা থাকলেই ক্লান্তি আসবে। তার চেয়ে চলো, আমরা দু'জন হেঁটে হেঁটে যাই।"

সেভেল সায় দিলো, "সেটাই ভালো। হাঁটতে আমার ভালোই লাগে।"

"এখন মাত্র এগারোটা" সারভিনি বললো, "রাত গভীর হবার অনেক আগেই আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে যাবো। ধীরে-সুস্থেই হাঁটা যাক।"

দু'পাশে ঘন গাছ-গাছালির ছায়ায় ছায়ায় চলমান জনতার গুঞ্জন, হাসি-ঠাট্টা হৈ-হুল্লোড়। গ্রীষ্মের প্রতিটি রাতে এই এক জমাটি পরিবেশ। ইতি-উতি দু'দশ জন দল পাকিয়ে মদ্যপানের আসর গড়ে তুলেছে, দৈনন্দিন কাজ-কর্মের পর মেরামত করছে শরীর ও মনকে, এক একটা গোল টেবিল ঘিরে তাদের আসর, টেবিলের ওপর ইতস্তত ছড়ানো বোতল ও পানপাত্রগুলি। কাফের উজ্জ্বল আলো এতদূরে এসেও বিচ্ছুরিত হচ্ছে ওদের ওপর। কখনো সাঁ সাঁ ধেয়ে যায় একাগাড়ি, যার লাল-নীল-সবুজ আলো চকিতে এক রঙদার পটভূমি তৈরি করে। খটা-খট খটা-খট ছুটন্ত ঘোড়ার অপসৃয়মান ছায়া, সহিসের মুখের ভগ্নাংশ এবং চৌকো গাড়ি—ছায়াছবির মতো দেখা দিয়েই অদৃশ্য।

দুই ইয়ার হাঁটছে যেন পা গুণে গুণে। পরণে সান্ধ্য পোশাক, হাতে ঝুলছে ওভারকোট, বোতামে লটকানো ফুল, একদিকে হেলানো টুপি; তারা দুই ভোজনতৃপ্ত যুবক আয়াসে ধূমপান করে এবং অনায়াস-লঘুতায় জনতার ভিড় কাটিয়ে এগিয়ে চলে হেলতে-দুলতে।

বিদ্যালয়ের পাঠ্য-জীবন থেকেই তারা একে অপরের ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ, পারস্পরিক বিশ্বস্ততায় নিশ্চিন্ত। জাঁ দ্য সারভিনির দৈহিক গড়ন নাতিদীর্ঘ, ছিপ্‌ছিপে মাথায় ঈষৎ টাকের আবির্ভাব, পাতলা ঠোঁট, চোখের দৃষ্টি জোরদার, রাতজাগা পাখিদের মতো লঘু চটপটে। আবাস প্যারিসে, দেহ ছিপ্‌ছিপে হলেও নিয়মিত শরীর-চর্চায় মজবুত, অসিচালনায় এলেম্ আছে, হাড়কাঁপা শীতে স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করতে পারে, প্রতিদিন তুর্কী রীতিতে

স্নান সারে এবং ইত্যাকার নিয়মসিদ্ধ তত্ত্বাবধানে তার কোন স্নায়বিক দুর্বলতা নেই। কখনো কখনো বিমর্ষ হয়ে পড়লেও ক্লান্তি তাকে গ্রাস করে না, অবয়বে পাণ্ডুরতা এলেও শারীরিক সক্ষমতা তার হ্রাস পায় না। স্বভাবতই সে খুব বেপরোয়া, যদিও মন সহানুভূতিপূর্ণ। বন্ধু মহলে তার এই হাসি-খুশি মেজাজ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অর্থকৌলীন্যের সুনাম আছে। সামগ্রিকভাবে সে জনপ্রিয় ও মর্যাদাসম্পন্ন। তার চরিত্রে শহুরে আধুনিকতা লক্ষণীয়। বুদ্ধি তীক্ষ্ণ কিন্তু মন সন্দেহপরায়ণ; অস্থির কিন্তু সাহস অঢেল; বিবেচনাশক্তি আছে, যদিও খেয়ালী; সে সব কিছুই করতে পারে, আবার পারেও না; সংস্কারবাদী হয়েও বিশ্বপ্রেমিক। আয় বুঝেই সে ব্যয় করে। শরীর বাঁচিয়ে তবে ফূর্তি করে। কখনো সে অস্থির, কখনো শান্ত হিম। সুখের খোঁজে সে প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেয়; আবার জোর করে নিজের ওপর কোন কিছুকে সে আরোপ করে না। তার বন্ধু সিয়ঁ সেভেলও যথেষ্ট পয়সার মালিক, দারুণ পৌরুষদীপ্ত চেহারা, পথে বের হলে মেয়েরা মুখ তুলে তাকে দেখবেই! এমন একখানা বিশাল সুদেহ যেন প্রদর্শনীর মডেল হতে পারে। সে আবেগপ্রবণ এবং তার আবেগপ্রবণতার বহু গল্প প্রচলিত আছে। অনেক সুন্দরীর স্বপ্নভঙ্গের গৌরব সে অর্জন করেছে।

হাঁটতে হাঁটতে বঁদেভিলে পৌঁছে যাবার পর সেভেল জিজ্ঞেস করে, "মহিলাটি কি জানে, আমিও তার কাছে যাচ্ছি?"

সারভিনি হেসে বললো, "মাদ্‌সিঅনেস ওবারদিকে সেটা পূর্বাহ্ণেই জানাবার কোন দরকার নেই। সে নিজেই জেনে নেবে, তুমি কে। গাড়ির একটা বিশেষ কোণে বসবার আগে তুমি কি কখনো ড্রাইভারের অনুমতি চেয়ে নাও?"

বিস্মিত সেভেল বললো, "মেয়েটার আসল পরিচয়টা এবার দেবে কি?"

"হঠাৎ আবির্ভূত হওয়া এক রমণী", বন্ধু জবাব দেয়, "স্বভাবে ভীষণ চালাক, প্রায় বর্ষীয়সী শয়তানী অথচ ওর প্রতি লোভ জাগবেই। ঈশ্বর জানেন, কবে ও এই পৃথিবীতে এসেছিল এবং কি ভাবে নিজেকে এমন প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে! অবশ্য এসব নিয়ে আমাদের মর্মপীড়ার কোন মানে হয় না। দৈহিক সেই ব্যাপারটা বাদ দিলে এখনো সে যেন ষোল আনা কুমারী। লোকমুখে শুনেছি, তার বালিকা বয়সের নাম ছিল ওকতেভি বারদিন, বর্তমানে যাঁর সংক্ষিপ্তকরণ দাঁড়িয়েছে—ওবারদি। কামনা

চরিতার্থ করবার মতো মহিলা বটে। মনে হয় তুমি তোমার জাঁদরেল স্বাস্থ্য নিয়ে সহজেই তাকে আকর্ষণ করতে পারবে। ব্যাপারটা হবে হারকিউলিসের সঙ্গে মোনালিসার যোগাযোগের মতো তাৎপর্যপূর্ণ। অবশ্য তোমাকে যে সেখানে খদ্দেরের ভূমিকা নিয়েই যেতে হবে, এমন কোন কথা নেই। প্রবেশ সেখানে সকলের কাছে অবারিত, কিন্তু ভোগ বা, ভালোবাসায় যেতে ওঠা না-ওঠা নিজের নিজের ইচ্ছা ও রুচির ব্যাপার।

আজ ঠিক মনে নেই, কবে প্রথম তার সঙ্গে আমার মুলাকাৎ হয়েছিল। হয়তো সেখানকার জুয়ার আড্ডা আমাকে আকর্ষণ করে থাকবে। জানোই তো, পুরুষরা স্বভাবতই বদচরিত্রের হয় এবং মেয়েরা তাদের কাছে নিজেদের সহজলভ্য করে তোলে। ওখানে যে সব ডাকসাইটে মানুষের সমাগম হয়, তাদের আমার ভালো লাগে। তারা কারুর তদ্বির-তদারকের ধার ধারে না, এক একজন স্বয়ং সম্রাট; প্রায়শই তারা বিদেশী, অভিজাত পরিবারের, অবশ্য তাদের ভিড়ে জনাকয়েক ছদ্মবেশী বিদেশী গুপ্তচরও ঘুরে বেড়াচ্ছে। মামুলি উস্কানিতেই তারা নিজেদের বংশকৌলীন্য সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে শুরু করে, বুক চিতিয়ে নিজেদের পদমর্যাদা ঘোষণা করে—ওরা ধুরন্ধর দুঃসাহসী ইস্কাবনের টেক্কা, মিথ্যার ডুবড়ি ফাটাতে ওস্তাদ। . .

আমার যে শুধু ওদের ভালো লাগে, তা নয়; আমি ওদের রীতিমত সমীহ করি। ওদের সঙ্গিনী ও অর্ধাঙ্গিনীরাও এক একটি ডানা কাটা পরী, যাদের মুখে-চোখে বিজাতীয় অসংযমের ছাপ, অজ্ঞাত অতীতের হাতছানি, জীবনের অর্ধেকটাই হয়তো কেটেছে চরিত্র-সংশোধনী বিদ্যালয়ে। রূপসীদের চোখগুলি অসাধারণ, চুলের বাহার অকল্পনীয়, লিলায়িত যৌবন মনঃপূত হবেই, চাকচিক্যের বেড়াপাকে মাথা ঘুরে যায়, বুকে বাজে ঝড়ের সংকেত!

মারসিঅনেস ওবারদি এইসব শ্রীমতীদেরই একজন। এখন অবশ্য বয়স পড়তির দিকে, যৌবনের ধরেছে ভাঁটার টান, তবু যা আছে মাথা চিবিয়ে খাবার পক্ষে যথেষ্ট—মক্ষীরাণীর মতো শুষে খাবে। ওর আবাসে ফূর্তি করবার মতো অজস্র উপাদান। বসেছে সেখানে জুয়ার আড্ডা, চলছে নাচ গান, সান্ধ্যভোজের অহরহ জমাটি আসর।"

"মনে হচ্ছে, তুমি যেন ওর প্রেমে পড়েছো।"—সেভেল মন্তব্য করলো।

সারভিনি বললো, "মোটেই না। তেমন সম্ভাবনাও নেই। আমি যাই তার মেয়ের আকর্ষণে।"

"ও, তাহলে তার একটি মেয়েও আছে ?"

"আরে সে-ই তো মূখ্য আকর্ষণীয়া ! কি যে রূপ, ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায় না ! দীর্ঘাঙ্গী কিশোরী—মাত্র আঠারোতে পা দিয়েছে। তার মা ঈষৎ শ্যামলী হলেও সে কিন্তু দারুণ অগ্নিবর্ণা। হাসিতে উচ্ছ্বলা, প্রাণময়ী, নাচের আসরে অনন্যা। কোন ভাগ্যবান যে তাকে প্রথম পূর্ণভাবে উপভোগ করবে, ভগবান জানেন। আমার মতো আরো অন্ততঃ দশজন প্রার্থী ঘুর ঘুর করছে তার পিছনে।

ওবারদি জানে তার মেয়েই এখন আসল মূলধন। সামনে মেয়েকে রেখে ধনাঢ্য খদ্দেরদের পাকড়াচ্ছে সে। কিন্তু আসল বেলা ঢুঁ ঢুঁ—মেয়েকে কারুর দিকে পুরোপুরি ঠেলে দিচ্ছে না সে। মনে হয়, মস্ত দাঁও মারার মতলবে আছে—হয়তো আমার চেয়েও পয়সাওয়ালা ছোকরাকে পাকড়াবার স্বপ্ন দেখছে ! তবে আমি তোমাকে বলে রাখছি, সুযোগ যদি একবার পাই ছেড়ে দেবার পাত্র আমি নই !

রূপসী কন্যাটির নাম জোয়েত। দেখলেই আমার মাথা ঘুরে যায়। বিচিত্র রহস্যময়ী। আজো ওকে চিনতে পারলুম না। কখনো মনে হয় ওর মতো নিষ্পাপ অনাঘ্রাত কুমারী আর হয় না ! আবার কখনো মনে হয় ওর মতো ছেঁনাল মেয়েমানুষ দু'টি নেই !

নিশ্চয় কোন রাজপুরুষ একদা ওর মায়ের শয্যাসঙ্গী হয়েছিল এবং তারই ফলশ্রুতি ঐ অনুপমা ! চলো দেখবে।"

সেভেল হো-হো করে হেসে ওঠে. "তুমি দেখছি মেয়েটার প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছো।"

"না, তেমন দুরবস্থা আমার হয়নি। তবে ওর যৌবন আমাকে প্রলুব্ধ করে, নিছক কামনার তাড়নায় আমি অস্থির হয়ে উঠি। কিন্তু এটাও বুঝি—ও একটি মারাত্মক ফাঁদ মাত্র। তৃষ্ণার্ত মানুষের কাছে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল যেমন রমণীয়, আমার কাছেও জোয়েত ঠিক তাই। মোহাবিষ্ট অন্তরে ওর দিকে গুটি গুটি এগিয়ে যাই কিন্তু মন সর্বদা সন্দিগ্ধ—মেয়েটা আমাকে লেজে খেলাচ্ছে না তো ? ওর সান্নিধ্যে এলে মন গলে যায়, আবার সময় সময় নিজেকে প্রতারিত বোধ করে খুব বিরক্ত হই। কখনো মনে হয়, সুন্দরী বড় সরল, আবার পরক্ষণেই মন সন্দেহে দুলে ওঠে। এ এক অস্বাভাবিক চরিত্র, কিছুতেই মুঠোর মধ্যে আটকাতে পারছি না।"

সেভেল তৃতীয়বার তার মন্তব্য জানায়, "তুমি মজেছো দোস্ত, তোমার আর উদ্ধার নেই! জোয়েতের কথা বলতে গিয়ে একেবারে যে ত্রুবাদুরের চারণ গান গাইতে শুরু কবলে! আত্মানুসন্ধান করো, ঠিক বুঝতে পারবে, মন তোমার প্রেমে কানায় কানায় পূর্ণ।"

"বেশ তবে তাই। ওকে ভোলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এটা যদি প্রেমের লক্ষণ হয়, আমি প্রেমে পড়েছি। অহরহ জোয়েত আমাকে ঘিরে রেখেছে। সময় সময় আমার ভেতর যে ক্লান্তি নেমে আসে, তার কারণ ঐ কন্যা। কিন্তু একটা কথা সত্যি—আমি ওকে কখনো বিয়ে করবার স্বপ্ন দেখিনা।··· ব্যবহার তার প্রায়ই গণিকাসুলভ, কিন্তু ধরা দিতে রাজি নয়! দশজনের সামনে এমন ব্যবহার করবে যেন সে আমার বিবাহিতা স্ত্রী। অথচ নির্জনে যখন আমরা মুখোমুখি, যখন আমি তাকে অধিকার করতে উন্মুখ সে এমন উপেক্ষার ভাব দেখাবে যেন আমি তার অন্ত্যজ অথবা অনুগত নফর।

আমি জ্বলে উঠি। ধারণা করি মায়ের মতো জোয়েতেরও অসংখ্য নাগর জুটে গেছে। পরে মাথা ঠাণ্ডা হলে নিজেকে প্রবোধ দিই, সংসার সম্পর্কে মেয়েটি বড় অনভিজ্ঞা।

খুব গল্পের বই পড়ে। আমি আপাতত ওকে শুধু বই যুগিয়ে যাচ্ছি, আমাকে ডাকে 'লাইব্রেরীয়ান' বলে। প্যারীর প্রকাশকরা যত নতুন বই ছাড়েন বাজারে, তার প্রত্যেকটিকে আমার সংগ্রহ করতে হয় নিছক ওকে খুশি করবার জন্য। মনে হয়, যত রাজ্যের আবোল-তাবোল বই পড়েই মানসিকতাটা তার এমন উদ্ভট হয়ে উঠেছে। হাজার পনেরো উপন্যাসের মধ্য দিয়ে জীবনদর্শন গঠন করতে গেলে এ ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হবেই।

তবু ধৈর্য ধরে আছি। বিয়ে করবো না নির্ঘাৎ। অসংখ্য গুণমুগ্ধদের একজন হয়ে থাকবো। যদি বুঝি এ মেয়ের কাছে থাকা আর উচিত নয়, সবচেয়ে আগে আমি কেটে পড়বো। বিবাহিত জীবন তার নসীবে নেই। ওবারদি ওরফে ওকতেভি বারদিনের মেয়েকে আবার বিয়ে করতে যাবে কোন আহাম্মক? কেউ করবে না। প্রথমতঃ, ওর কোন সামাজিক স্বীকৃতি নেই। বনেদী গণিকার ঘরে জামাই হতে কেউ রাজি হবে না। দ্বিতীয়তঃ, মধ্যবিত্ত পরিবারের কেউও এগিয়ে আসবে না ঐ উপরচাকচিক্য কন্যাকে উদ্ধার করতে। তৃতীয়তঃ, জোয়েতের মার নজরটি উঁচু। সে খুঁজবে ধনী পাত্র, যা তার মেয়ের কপালে কোন দিনই জুটবে না।

একেবারে গরীব লোকদের কথা বলছো ? তারা আরো বেশি জন্মগত ও ঐতিহ্যগত পরিচয়টা খুঁটিয়ে দেখে। বারবণিতার মেয়েকে কখনোই স্ত্রীর মর্যাদা দেবে না।

তাই জোয়েতের পক্ষে সম্ভব একমাত্র সন্ন্যাসিনী হওয়া। কিন্তু মঠবাসিনী হবার মতো মানসিকতা তার নয়। অতএব পথ তাকে একটাই বেছে নিতে হবে এবং তা হলো পুরুষদের নিয়ে প্রেম-প্রেম খেলা। আজ না হলেও একদিন না একদিন তাকে সেখানে নেমে আসতে হবেই। এটাই তার নিয়তি। রূপসী কিশোরী একদিন ভরা যৌবন পাবে এবং তার শরীরে সেই যৌবনের ঢল নামাবো আমি।

আমি একা নই, আরো কয়েকজন সেই বাসনায় ঘুর ঘুর করছে। এক-জনের নাম মঁসিয়ে ছ্য বেলভিনো, জাতে ফরাসী ; একজন রাশিয়ান, যে নিজেকে প্রিন্স ক্রাভালো বলে জাহির করে ; অপর এক প্রণয়প্রার্থী কাভেলিয়ার ভলরেলি, ইতালিয়ান। প্রত্যেকেই প্রেমে পাগল, ছুটছে—ছুটছে, কে যে জিতবে, দৈব জানে ! এরা ছাড়াও আরো কয়েকজন অপটু খেলোয়াড়ও রয়েছে।

মারসিঅনেস্ কিন্তু খুব সতর্ক—সর্বদা চোখে চোখে রাখে মেয়েকে। তবু ওরই মধ্যে মনে হয়, আমাকে যেন সে একটু বেশি প্রশ্রয় দেয়। কেন না, সে জানে আমি ধনী , অন্যদের সম্পর্কে তার সে রকম কোন স্পষ্ট ধারণা নেই।

আর তাদের আবাসটি অপূর্ব। বিনা নিমন্ত্রণে যাচ্ছি বলে এতটুকু অসুবিধে হবে না। যত রাজ্যের অপ্সরারা নিজেদের রূপের ডালি মেলে আছে চড়া দাম পাবার আশায়। পরিবেশ কিন্তু দারুণ সম্ভ্রান্ত এবং অনভিজ্ঞ লোকেরা ঐ স্থানের মাহাত্ম্যই ধরতে পারবে না।"

বলতে বলতে ওরা এসে গেল সাঁজেলিজির মোড়ে। মৃদু বাতাস আলতো পরশ বুলিয়ে দিয়ে যায়। আবছা আবছা অন্ধকারে কারা যেন সব আলাপরত।

সারভিনি বললো, "শোন, তোমাকে কিন্তু ওখানে আমি কাউন্ট সেভেল বলে পরিচয় দেবো। নতুবা নিছক সেভেলকে কেউ পাত্তাই দেবে না।"

সেভেল সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে, "না, কখনো নয়। আমি ওসব কালতু উপাধি বয়ে বেড়াতে পারবো না, একটি দিনের জন্যও নয়। দোহাই, এ রকম কিছু বলে বসো না।"

সারভিনি হাসে, "ভয়ের কি আছে ? আমারও তো একটা মিথ্যা পরিচয় আছে ওখানে—ডিউক দ্য সারভিনি। এ উপাধি দিব্যি বয়ে বেড়াচ্ছি সেখানে, কোনদিন তো বেকায়দায় পড়তে হয়নি। বরং, এ রকম একটা পরিচয়পত্র না থাকলে ঐ আসরে স্থান লাভ করা সহজ নয়।"

তবু সেভেল খুঁত খুঁত করে, "বাপু, তুমি বড়লোকের ছেলে, তোমার ওসব ভড়ং মানায়। আমার কাছে আমার সাদামাটা পরিচয়টাই সর্বোত্তম।"

সারভিনি তখনো যুক্তি দেখাচ্ছে, "সাদামাটা মানুষটি সেজে গেলে সেখানে চলে না। ব্যাপারটা আমার ওপরই ছেড়ে দাও। তোমাকে আমি বানিয়ে দেবো উত্তর মিসিসিপির জাঁদরেল কাউন্ট। কেউ সন্দেহ করবে না। খাতির বেড়ে যাবে শতগুণ।"

"না ভাই, আমাকে এসব যাত্রাদলের রাজা হওয়ার হাত থেকে রেহাই দাও।"

"ধ্যাৎ, তোমাকে আর বোঝানো গেল না। জান তো, এমন অনেক দোকান আছে, যেখানে মেয়েরা ঢুকলেই একগুচ্ছ ভায়োলেট উপহার দেওয়া হয়? এখানেও সেটাই রেওয়াজ, তবে একটু অন্য ভাবে। আমি ঘোষণা না করলেও ওখানকারই কেউ তোমায় কাউন্ট উপাধি দিয়ে বসবে।"

ইত্যাকার আলোচনায় রত তারা দু'জনে এক সময় সেই সুন্দর বিশাল দ্বিতল অট্টালিকায় গিয়ে উপস্থিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে জনাকয়েক উর্দিপরা পরিচারক ছুটে এসে তাদের অভিবাদন জানায়, হাতের ছড়ি ও কোটগুলি তুলে রাখে। সেভেল মুগ্ধ না হয়ে পারে না। রাশি রাশি ফুল আর সুন্দরীদের হাট বসেছে যেন। সুগন্ধে বাতাস মঁ মঁ।

বাহারে দাড়িসমেত সৌম্যদর্শন বিপুলদেহী একটি লোক এগিয়ে আসে, ঈষৎ ঝুঁকে সেভেলের পরিচয় জানতে চায়, "আপনার নাম?"

জবাব দিলো সারভিনি, "মঁসিয়ে সেভেল।"

মুহূর্তে উচ্চকিত স্বরে ঘোষিত হলো: আমাদের নতুন বন্ধু মঁসিয়ে ল ব্যারন সেভেল এসেছেন মঁসিয়ে ডিউক সারভিনির সঙ্গে!

একনম্বর ঘরটিতে হরেক সুন্দরীর সমাবেশ। প্রত্যেকেই যতটা সম্ভব বুকের বাঁধন খুলে নিজের যৌবন জাহির করছে, স্বচ্ছ বসন ভেদ করে শরীরের তরঙ্গায়িত খাঁজগুলি অতিমাত্রায় স্পষ্ট।

গৃহকর্ত্রী তার মুখের সুন্দর হাসিটি ফুটিয়ে এগিয়ে এলো। চমকে দেবার মতো রূপ বটে। রাশি রাশি মেঘবরণ কুন্তল, ছোট্ট কপালে তারই কয়েকগাছি হিল্লোলিত, অটুট স্বাস্থ্য, বয়সের সামান্য ছাপ পড়লেও মাদকতা অটুট, শিল্পীর তুলিতে আঁকা যেন দুটি চোখ, বাঁশির মতো নাক, কণ্ঠস্বরে বুঝি মধু নামে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। স্বর তো নয় যেন প্রবহমান নদীর কুলু কুলু রব, শ্রোতাকে মোহাবিষ্ট করে রাখে।

সারভিন তার হস্তচুম্বন করে। সোনার শিকল জড়ানো পাখা সমেত সুন্দরী তার হাতখানা বাড়িয়ে দেয় সেভেলের দিকে। বললো, "সাদর স্বাগত। আমার প্রীতিপূর্ণ অভিবাদন গ্রহণ করুন। ডিউকের বন্ধুদের জন্য এ ঘরের দরজা সর্বদাই উন্মুক্ত থাকে।"

বিশালদেহী স্বাস্থ্যবান যুবক সেভেলের দিকে সে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। তার রাঙা ঠোঁটের ওপর খুব সূক্ষ্ম একটি কালো দাগ—সরু গোঁফের ছায়া। সম্ভবত কোন আমেরিকান অথবা ভারতীয় প্রসাধনী ব্যবহারের ফলে একটি বিজাতীয় সুগন্ধ বাতাসকে আমোদিত করে রাখছে।

বহু অভিজাত চেহারার লোকেরা ক্রমশই এসে জটলা পাকাচ্ছে হাওউতি। ওনারদি গলারস্বরে মাতৃসুলভ গাম্ভীর্য এনে সারভিনকে বললো, "পাশের ঘরে আমার মেয়ে অপেক্ষা করছে। তুমি তার সঙ্গে দেখা করো।"

বলেই সে অন্যান্য অভ্যাগতদের দিকে এগিয়ে যায় এবং যাবার আগে মর্মান্তিক কটাক্ষ ও চোরা হাসি উপহার দিয়ে যায় সেভেলকে।

সারভিন তার বন্ধুর হাত ধরে মৃদু ঝাঁকুনি দেয়, "তুমি এখনো নবাগত। দেখতেই পাচ্ছো, চারিদিকে মালে মালময়—কোনটা বাসি, কোনটা একেবারে তাজা টাটকা! তবে হাঁ, সব মেয়েরই দর এক। উনিশ-বিশ নেই। বাঁ দিকে বসেছে জুয়ার আড্ডা। পয়সার হরিরলুট।

আর ঐ কোণের ঘরটি নাচের আসর। ওখানে কোন সামাজিক বন্ধন-টন্ধনের মূল্য দেওয়া হয় না। এমনকি, বিবাহিতদেরও বিবাহিত বলে গণ্য করা হয় না। ওখানেই লালিত হচ্ছে আমাদের আশা। বাৎসল্যরসের আধিক্যেতাও দেখতে পাবে। দেখবে, মেয়ের জন্য মায়ের কত দরদ। সব ন্যাকামি। চলো, দেখবে।"

তারা তরতরিয়ে এগিয়ে চলে, সুন্দরীদের অভিবাদন জানায় প্রায়

পনেরো জোড়া নারী পুরুষ জোড় বেঁধে নেচে চলেছে···অনাবৃত দেহ-প্রদর্শনে মাতা ও কন্যাদের প্রতিযোগিতা চলেছে।

হঠাৎ এক দীর্ঘাঙ্গী রূপসী ভিড় ঠেলে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে, গলার স্বর তুঙ্গে তুলে বলে, "এই যে মাস্কেদ! কেমন আছো প্রিয়?"

সর্বাঙ্গে তার অপূর্ব দ্যুতি, গাত্রবর্ণ স্বর্ণসমান, ঈষৎ রোমশ আবরণ কামনার বহ্নিকে দ্বিগুণ করে। সহজ, স্বচ্ছন্দ তার চলার গতি, গলার স্বর মায়েরই মতো মাদকতাপূর্ণ। প্রথম দর্শনেই যেন এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা স্মৃতির দর্পণে ছাপ রেখে যায়।

"মাস্কেদ মাস্কেদ," আবেগে সে বলে, "কি খবর তোমার?"

অপরিবোধ্য আবেগে সার্ভিনি তার করমর্দন করে, "মাদাজেল জোয়েত, আলাপ পরিচয় করিয়ে দিই—এ আমার দোস্ত, ব্যারণ সেডেল।"

অপাঙ্গ দৃষ্টি হেনে নবাগতকে সে অভ্যর্থনা জানায়, বলে, "খবর শুভ তো? আচ্ছা, আপনি কি বরাবরই এমন লম্বা?"

এ অভদ্র উক্তিতে বিরক্ত হয় সারভিনি, ঝাঁঝালো গলায় বলে, "না, না, তোমার মাকে খুশি করবার জন্য ও আজ একটু লম্বা হয়ে এখানে ঢুকেছে!"

কিশোরী মিষ্টি গলায় কিন্তু উচ্ছ্বাসই প্রকাশ করে, "খুব ভালো কথা। তবে আমার কাছে যখন আসবেন, তখন একটু ছোটখাটো চেহারা নিয়েই আসবেন। আমি আবার মাঝারি চেহারার লোকদেরই পছন্দ করি কিনা! যেমন ধরুন, এই মাস্কেদ—মাথায় প্রায় আমারই সমান।" তারপর সারভিনির দিকে চেয়ে বলে, "চলো, আমরা দু'জনে জুড়ি বেঁধে নাচি!"

সারভিনি নিঃশব্দে ওর কোমর জাপটে ধরে ঝড়ের বেগে নাচের আসরে প্রবেশ করে। শুরু হলো তাদের বন্য নাচ, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি, ঐ নাচে কামনা—রক্তে আগুন ধরায়, দুটি দেহ ঘনিষ্ঠ ঘনিষ্ঠতর, দারুণ শক্তিতে—সারভিনি রূপসীকে জাপটে ধরে, নাচে তার বুকের ওপর, কিন্তু তাদের সচল পদযুগল কখনো ছন্দচ্যুত হয় না। এ নাচ যেন চলবে অনন্তকাল ধরে, ওদের ক্লান্তি নেই শ্রান্তি নেই। অন্য সকলে নাচ থামিয়ে নিথর, সবিস্ময়ে দেখছে তাদের যুগলনৃত্য। একসময় ওরা থেমে যায়। গোটা হলঘর ফেটে পড়ে সমবেত করতালিতে।

এক্ষণে লক্ষনীয়, জোয়েত যেন লজ্জায় ফাগরক্তিম, তার নীল চোখ দুটিতে সংকোচ।

আর সারভিনির রীতিমত হাঁপ ধরে গেছে, একটা কপাট চেপে ধরে দম নিচ্ছে।

প্রথম মুখ খুললো জোয়েত, "তোমার শক্তি সীমিত মাস্কেদ।"

সারভিনি হাসে, তার দৃষ্টিতে লোভ ও কামনা।

জোয়েত বললো, "পারো আবার ধূর্ত বেড়ালের মতো লাফিয়ে পড়তে? ...চলো, দেখি, কোথায় রয়েছে তোমার বন্ধু।"

সারভিনি তার হাত ধরে হলঘর পার হয়।

সেভেলের সময়টাও খারাপ যাচ্ছে না। সে উত্তাপ সংগ্রহ করছে অভিজ্ঞা মারসিঅনেস ওবারদির কাছ থেকে। পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতায় উভয়ের মাদকতা অনস্বীকার্য। যদিও তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়ে আলোচনা, সেভেল মুগ্ধ হয়ে শুনছে ওবারদির প্রতিটি কথা। কোন নারীর কণ্ঠস্বর যে এত তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে, তার ধারণা ছিল না।

সারভিনিকে দেখে ওবারদি উচ্ছল হয়ে ওঠে, "এই যে ডিউক, শোন। আমি কয়েক মাসের জন্য বোগিভাঁতে একটা বাড়ি ভাড়া নিচ্ছি। তুমি কিন্তু মাঝে মাঝে ওখানে যাবে, তোমার বন্ধুটিকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে। আগামী সোমবার আমরা যাচ্ছি, তোমাদের নিমন্ত্রণ রইলো শনিবার। কেমন? দারুণ আনন্দ করে ছুটির দিনটা কাটানো যাবে। আসছো তো?"

সারভিনি আবেগে জোয়েতের মুখের দিকে তাকায়। জোয়েত সহজ প্রত্যয়ে হেসে ওঠে, "নিশ্চয় আসবে, এ আবার মতামতের কি আছে? গাঁয়ে যাবো; দারুণ হল্লা করে সময়টা কাটিয়ে দেবো।"

মারসিঅনেস সেভেলের দিকে তাকায়, "আপনার কিন্তু আসা চাই।"

সেভেল সম্মতি জানায়, "আমি খুশিই হবো।"

জোয়েত কলকলিয়ে ওঠে, "স্থানীয় লোকেদের একেবারে হতবাক করে দেবো আমরা। আর আমার অন্যসব গুণমুগ্ধরা ঈর্ষায় জ্বলবে।"

সারভিনি বললো, "সে আর বলতে!"

সেভেল জোয়েতকে প্রশ্ন করে, "আপনি আমার বন্ধুকে সব সময় মাস্কেদ বলে ডাকেন কেন?"

সরলতার ভান করে জোয়েত, "যারা ম্যাজিক দেখায়, তারা ছোট ছোট মটর দানাকে বলে মাস্কেদ। ও ঠিক সেই মাস্কেদ। মনে হয়, এই তো হাতের মুঠোয় রয়েছে। অথচ, কোন ফাঁকে হাত থেকে টুপ্ করে গড়িয়ে পড়েছে মাটিতে।"

সেভেলের দিকে গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে ঈষৎ অন্যমনস্ক মারসিঅনেস বলে উঠলো, "ছেলেরা কি সত্যি তাই নয়?"···

জোয়েত আব্দারের স্বরে বলে, "এবার কিন্তু চট্ করে পালিয়ে যেতে পারবে না মাস্কেদ!"

সারভিনি মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, "না, অমন ভুল আর হবে না। তোমার সঙ্গে দিনরাত কাটাবো।"

সঙ্গে সঙ্গে জোয়েতের স্বরে কৃত্রিম ত্রাস, "না মশাই, সেটি হচ্ছে না। দিনের বেলা যেমন-তেমন; রাতে আমার ধারে কাছে ঘেঁষতে দেবো না।"

"কারণ?"

অকুতোভয় জবাব, "কারণ, কোন পুরুষের নগ্ন দেহ একখানা দর্শনীয় বস্তু হিসাবে গণ্য হতে পারে না।"

মারসিঅনেস্ ক্ষোভের সঙ্গে ধমকে দেয়, "এ আবার কি ধরনের কথা। সংযত হয়ে কথা বলতে শেখো।"

সারভিনিও সায় দেয়, "ঠিক বলেছেন।"

জোয়েত যেন সামান্য ভেঙ্গে পড়ে, চড়া স্বরে বলে, "ব্যাপারটা আমার সঙ্গেও রীতিমত অপমানকর হয়ে যাচ্ছে কিন্তু।" তারপরই সমবেত লোকদের দিকে চেয়ে চীৎকার করে বলে, "কাভেলিয়ার, একবার এদিকে এসো তো—আমাকে এরা অপমান করছে।"

কালো মতো ছিপ্‌ছিপে চেহারার একটি লোক এগিয়ে আসে, বোকা বোকা হাসি নিয়ে বলে, "অপরাধী কে?"

সারভিনির দিকে আঙুল তুলে বলে জোয়েত, "এই সেই লোক। অবশ্য আমি ওকে একটু বেশীই ভালোবাসি, কারণ লোক হিসেবে সারভিনি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী আকর্ষণীয়।"

কাভেলিয়ার বললো, "আমরা অবশ্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করি তোমাকে তুষ্ট করতে। হয়তো দক্ষতায় ঘাটতি আছে, কিন্তু আন্তরিকতা সন্দেহাতীত।"

মোটা ধোঁয়াটে গোঁফ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী অন্য কে একজন এই

সময় গম্ভীর স্বরে বলে ওঠে, "অনুগতের অভিবাদন নাও মাদমোজেল জোয়েত।"

উৎসাহের প্রাবল্যে চেঁচিয়ে ওঠে জোয়েত, "আরে, মঁসিয়ে যে বেলভিনো যে!"

সেভেলের সঙ্গে এর পরিচয় করিয়ে দেয়, "এ আমার অন্যতম অনুরাগী বন্ধু; যেমন চেহারার বহর, তেমনি বুদ্ধি।... রীতিমত একজন ফিল্ডমার্শাল, দড়াম করে রেঁস্তরার দরজা খুলে ফেলাতে ওস্তাদ।

কিন্তু মাথায় আপনি ওর চাইতেও উঁচুতে। সুতরাং আপনাকে আমি কি নামে ডাকবো? হুঁ, মনে পড়েছে—আপনার নাম দেওয়া হলো জুনিয়র রোদস্। বেচারা রোদস্ নিশ্চয় আপনার জনক ছিলেন।... থাক, করুন আপনাদের সব গুরুগম্ভীর আলোচনা। আমি চললুম। গুড নাইট।" জোয়েত ছুটে গেল বাজনার দিকে।

গুবাধদি ফিসফিসিয়ে বললে, "তোমরা ওকে যতসব ছাই শেখাও। মেয়েটার মেজাজও তাই হয়ে উঠেছে খিটখিটে, যতগুলো বদ অভ্যাসও গড়ে উঠেছে।"

সারাভিনি মন্তব্য করে, "তার মানে ও এখনো যথাযথ শিক্ষা পায়নি?"

এবারে মাদাম উদাসী হাসি হাসলো।

বুকে অনেকগুলি সম্মানের চাকতি ঝুলিয়ে গম্ভীরমুখ একজন লোক এই সময় এই দিকেই এগিয়ে এলো।

তাকে দেখেই মাদাম স্বাগত জানায়, "এই যে প্রিন্স, আজ আমার ভাগ্য সত্যি প্রসন্ন!"

সারভিনি লোকটিকে দেখিয়ে সেভেলকে বলে, "প্রকৃতপক্ষে এই লোকটাই আমার প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী। নাম ক্রাভালো। আর যাই হোক, জোয়েত দেখতে তো বড় খাসা।"

সেভেলের জবাব, "রূপের দিক থেকে মা ও মেয়ে দু'জনেই সমান। মা'টির নেক নজর লাভে ইতিমধ্যেই আমি সফল হয়েছি।"

সারভিনি বলে, "বোকা। মাদাম আগেই তোমার সম্পর্কে সব জেনে নিয়ে তবেই এগিয়েছে।"

এরপর দুই বন্ধু গেল জুয়ার আসরে। সেখানে টেবিলে টেবিলে দারুণ ভিড়। খেলা জমে উঠেছে। ঝনাৎ ঝনাৎ পয়সা ছুঁড়ে দেবার আওয়াজ

শোনা যাচ্ছে।···হরেক দেশের হরেক জাতের জুয়াড়ী এসে আসর জমিয়েছে। ফরাসী, আমেরিকান, স্প্যানিশ—এক একজনের মুখাবয়বে এক এক ধরনের অভিব্যক্তি।

সারভিনি সেভেলকে জিজ্ঞেস করলো, "খেলবে নাকি এক দান?"

"এমন ভিড়ে কোনদিন খেলিনি। সুবিধে করতে পারবো না। অন্য এক দিন বরং দেখা যাবে।"

"তাই ভালো, চলো, এবার ফেরা যাক।"···

দু'জনে সেই জমকালো বাড়ি ছেড়ে নেমে এলো পথে।

সেভেল জিজ্ঞেস করলো, "এই চিত্তাকর্ষক প্রাসাদটির মালিকানা কার?"

সারভিনি ঘাড় নেড়ে জবাব দিলো, "আমি ঠিক বলতে পারবো না। আগে এক ইংরেজ জমিদারের মালিকানায় ছিল। মাস তিনেক হলো তিনি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন। মারসিঅনেস অস্থির স্বভাবের। কখনো অভিজাত লোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা পাতায়, কখনো আবার নীচ ও হিংস্র জুয়াড়ীদের সঙ্গে ঢলাঢলি করে। কিন্তু আগামী শনিবার বগিভাঁতে আমন্ত্রিত হয়েছি শুধু আমরা দু'জন। শহরের চেয়ে ঐ ফাঁকা গ্রামাঞ্চলে সুযোগ অনেক বেশী পাওয়া যাবে। যাচাই করা যাবে জোয়েতের মানসিকতাটা।"

"আমার অবশ্য আশা কম," সেভেল মন্তব্য করে, "আমি নির্বিকার হয়েই থাকবো।"

আবার তারা ফিরে এলো সাঁজেলিজিতে; মাথার ওপর বিশাল আকাশে তারারা করছে মিটি মিটি। অদূরে আবছা অন্ধকারে বেঞ্চের ওপর তখনো বসে আছে এক জোড়া যুবক-যুবতী।

সারভিনি বিড় বিড় করতে থাকে, "যদিও আমাদের জীবনে প্রেম অপরিহার্য, তবু এর চেয়ে জঘন্য বস্তু আর হয় না। এ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি, যদিও একঘেঁয়ে নয়। নেহাৎ সাদামাটা ব্যাপার, তবু মানুষের কল্পনা একে করে তোলে দূর নক্ষত্রলোকের স্বপ্ন!···"

একটু থেমে সে আবার বললো, "···তবে জোয়েতের প্রথম প্রেমিক হবার সৌভাগ্যটা বড় কম নয়। একজন প্রেমিকের পক্ষে তা এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা। ···সেই সৌভাগ্যের অধিকারী আমাকে হতেই হবে···জোয়েতকে প্রথম ভোগের সক্ষমতা আমি অর্জন করবোই!"

রয়েল রোডের মোড়ে এসে তারা বিচ্ছিন্ন হলো। বন্ধুকে শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিলো সেভেল।

॥ দুই ॥

ওবারদির নতুন বাংলোর নাম ভিলা প্রিতেমস্। এক পাহাড়ী অধিত্যকায় অনুপম অবস্থান। বাংলোর চারদিকে বাগান, বাগানের চারদিকে প্রাচীর এবং যেন প্রায় প্রাচীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে প্রবহমান নদী সেন এঁকে বেঁকে হারিয়ে গেছে মার্লির দিকে। বাংলোর বিপরীতে গাছ-গাছালিতে ঢাকা সবুজ দ্বীপ ক্রেসি স্বপ্নময়। বাগানে পাতা চেয়ার-টেবিল নদীর দিকে ঘোরানো, যেখানে বসলে দ্বীপ ও ভাসমান কাফে লা গ্রেনোইল নজর কাড়ে।

এখন পরিবেশ সুমসাম্, বিচিত্র নীরবতা নেমে এসেছে মাটির বুক অব্দি। ঝুপ্ ক'রে ডুব দিলো সূর্য, নদীর জল এখনো রক্তগোলা। সূর্য হয়তো এখন অন্য কোথাও উদিত হবে। এখানে ঘুমের লগ্ন।

খাবার টেবিলে জড়ো তারা খুশিতে ডগমগ। কোন দুশ্চিন্তা নেই, বুক ভরে দম নেয়—মিষ্টি সুবাস। এমন গ্রামীন পরিবেশে স্বাধীনতার সুখ পরিমাপের বাইরে। সংখ্যায় তারা চারজন; মারসিঅনেসের হাত সেভেলের মুঠোয় এবং জোয়েতের হাত ধরা পড়েছে সারভিনির হাতে।

মেয়েদের সেই শহুরে কৃত্রিমতা এখানে লক্ষনীয় নয়। বিশেষত, জোয়েত যেন এখানে এসেই বদলে গেছে,- তার উপর ছায়া ফেলেছে অদ্ভুত বিষণ্নতা ও গাম্ভীর্য।

সেভেল ওকে প্রশ্ন করে, "আগের চেয়ে তুমি যেন অনেক গম্ভীর?"

জোয়েত বললো, "পরিবেশের গুণ বলতে পারেন। সত্যি, আমার ভেতর একটা দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে, আমি আর আগের মতনটি নেই। ঋতু বদলের মতো আমিও কি বদলে যাচ্ছি? আমি কখনো পাগলের মতো ব্যবহার করি, কখনো আবার শববাহীর মতো নিশ্চুপ হয়ে থাকি। সময়ের তাগিদে আমি যে কোন কাজ করতে পারি। হয়তো আমি খুনও করতে পারি।…

সকালে উঠেই আমি বুঝতে পারি, সারাটা দিন কেমন কাটবে। পর পর কি করবো, সব আমার মনে গাঁথা। মনে হয়, স্বপ্নে বুঝি আমি নির্দেশ পেয়েছি। কিন্তু আসলে সদ্যপঠিত কোন বইয়ের ভাব আমার ওপর সর্বাধিক প্রভাব ফেলে।"

জোয়েত নামে। আজ তার রূপে আরো মাদোকতা। সাদা উলের পোশাক, কত রকম অলঙ্কারে দেহ মোড়া। বক্ষআবরণীর কায়দায় স্তনযুগলের দৃঢ়তা পরিস্ফুট, ঘাড়ের মসৃণ ত্বক চিক্ চিক্ করছে; পোশাকের চেয়েও শুভ্র তার গাত্রবর্ণ, স্বর্নাভ কেশরাশি তরঙ্গায়িত।

সারভিনি মুগ্ধ চোখে চেয়ে থেকে বলে, "দিনের চেয়ে রাতে তুমি আরো সুরূপা। প্রতিদিন তোমার এই রূপ যেন আমি চোখের সামনে দেখতে পাই!"

জোয়েত বললো, "তাই বলে চূড়ান্ত কিছু চেয়ে বসোনা মাস্কেদ। দুর্বল মুহূর্তে হয়তো রাজিও হয়ে যেতে পারি।"

মারসিঅনেসের আনন্দ আর ধরে না। স্বচ্ছ কালো পোশাকের অন্তরাল থেকে পরিস্ফুট তার শরীরের প্রতিটি লোভনীয় খাঁজ। ভরাট স্তনের ওপর দৃঢ়বদ্ধ কাঁচুলিতে রক্তাভ আভাস, এলায়িত কৃষ্ণকুন্তলে একটি রক্তগোলাপ।

তার যত আগ্রহ সেভেলকে নিয়ে। আর সেভেলও পুলকিত এই মূল্যবান নারীর সঙ্গ পেয়ে। রক্তে তার অসংখ্য, অগুণিত আগুনের আবর্ত। চিন্তিত ব্যক্তির মতো সেভেল তার ধূসর দাড়িতে হাত বোলাচ্ছে সময় সময়।

খাবার টেবিলে মাছ আসবার পর সারভিনি বহুক্ষণ পর মুখ খুললো, "এই যে নির্জনতা, এর একটা স্বকীয় মাহাত্ম্য আছে। আমার তো মনে হয়, কথা বলার চেয়ে না বলে মানুষ মানুষের বেশী অন্তরঙ্গ হতে পারে। তাই নয় মাদাম?"

মারসিঅনেস বললো "ঠিক বলেছো। সকলে মিলে একই সুখের কথা ভাবছি। খুব ভালো লাগে।"

কামার্ত দৃষ্টিতে মারসিঅনেস আবার সেভেলের দিকে তাকায়। সেভেলও তার চোখে চোখ রাখে। টেবিলের নিচে অলক্ষ্যে তাদের দৈহিক সংস্পর্শও ঘটে যাচ্ছে সময় সময়।

সারভিনি আবার সোচ্চার হলো, "মামজেল জোয়েত, তোমার খুশি খুশি ব্যবহার দেখে সন্দেহ হচ্ছে, তুমি কারুর প্রেমে পড়েছো। কে সেই বিরল ভাগ্যবান? প্রিন্স ক্রাভালো?"

নামটা শুনতেই জোয়েত যেন রেগে লাল, "মাস্কেদ, তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো? প্রিন্স! ব্যাটা রাশিয়ার মোমে তৈরী একটা প্রাণহীন পুতুল। জীবনে ওটার একমাত্র কৃতিত্ব হচ্ছে- একবার চুল ছাঁটার প্রতিযোগিতায় প্রাইজ পেয়েছিল।"

"উত্তম। তা হলে লিস্ট থেকে প্রিন্সের নাম কাটা গেল। এবার আসছে ভাইকোৎ পিয়ারো। সেই কি তোমার স্বপ্নের পুরুষ?"

খিল-খিল হাসিতে যেন ফেটে পড়ে জোয়েত, "কেন, আমাকে কি কখনো ওর কানে কানে মধু-বর্ষণ করতে দেখেছো?"

সারভিনি বললো, "তা হলে দু'নম্বর লোকটিও বাদ গেল। বাকি থাকে কাভেলিয়ার লরেলি, যাকে স্বয়ং মাদাম একটু নেক নজরে দেখে থাকেন।"

জোয়েত এবারও হাসির ফুৎকারে উড়িয়ে দিলো, "লাসরিমোস! হা ঈশ্বর! ও তো একজন ভাড়াটে শবযাত্রী। বিখ্যাত কোন লোক মারা গেলেই তার কফিন বইবার জন্য ছুটে যায়। ও যখন আমার দিকে তাকায়, আমি নিজেই যেন শব হয়ে যাই।"

"তিন জনই বাতিল হয়ে গেলো। তবে কি তুমি এই ব্যারন সেভেলের প্রেমে মজেছো?"

"জুনিয়র রোদস্? অতবড় একটা পালোয়ানের সঙ্গে কখনো আমার খাপ খায়?"

"তা হলে ঘটনাটা দাড়াচ্ছে এই যে, তুমি এই অধমের প্রতি কৃপা বর্ষণ করেছো। কারণ, একমাত্র আমিই বাকি থাকছি। তোমায় যে কি বলে ধন্যবাদ দেবো!"

"আহ, মাস্কেদ," উচ্ছ্বসিত জোয়েত বললো, "তোমাকে আমার খুবই পছন্দ প্রিয়। কিন্তু তার অর্থ প্রেম নয়। —তবে বন্ধু হতাশ হয়ো না…অপেক্ষা করো, আরো আগ্রহ দেখাও, সবুরে ঠিক মেওয়া ধরবে গাছে।…আরো আনুগত্য চাই তোমার…"

"আমিও তো তোমাকে সবই নিবেদন করতে রাজি আছি। কিন্তু তার আগে- "

"কি তার আগে?"

"তার আগে চাই তোমার প্রেম।"

"ধরেই নাও, আমি তোমাকে ভালোবাসি·

"কিন্তু—"

"থাক, আজ আর এ প্রসঙ্গ নয়।"

"তথাস্তু।"

অস্তমিত সূর্যের আভায় নদী তখনো রক্তাভ। মারসিঅনেসের মাথায় গোঁজা গোলাপটা যেন আরো লাল। জোয়েতের দৃষ্টি হারিয়ে গেছে দূর-দিগন্তে। মারসিঅনেস সেভেলের হাতে হাত রেখে উত্তাপ উপভোগ করছে। হঠাৎ মেয়ের দৃষ্টি সেদিকে পড়তেই তাড়াতাড়ি হাত গুটিয়ে নেয়। সারভিনি সবই খেয়াল করছে। সে প্রস্তাব রাখে, "জোয়েত, যদি তোমার আপত্তি না থাকে, খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা দু'জন ঐ দ্বীপে বেড়াতে যাবো।"

জোয়েতের খুশীভরা সম্মতি, "চমৎকার প্রস্তাব। শুধু আমরা দু'জনে যাবো, আর কেউ নয়।"

"হাঁ, শুধু আমরা দু'জন।

আবার জমাট নির্জনতা। সন্ধ্যার গাম্ভীর্য তাদের দেহে, মনে। জীবনের এই অবিস্মরণীয় মুহূর্তে তাদের মুখে ভাষা নেই। পরিচারকের দলও অদ্ভুত নির্বাক। যে যার কাজ নিঃশব্দে করে যাচ্ছে। ক্রমশ আকাশের লালিম মুছে গেল, কালিমোলা রাত্রি নেমে এলো চরাচরের বুকে।

বহুক্ষণ পরে কথা বললো, "আপনারা কি এখানে বেশ কিছুদিন থাকবেন?"

মারসিঅনেস জোরের সঙ্গে বললো, "থাকবো, যতদিন ভালো লাগে।"

ঘরে ঘরে জ্বলে উঠেছে বাতি। আলোর রঙ শিথিল, বিষণ্ণ। টেবিলের বাতি লক্ষ্য করে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসতে থাকে পতঙ্গের দল। ওদের জ্বালায় আর ধীরে-সুস্থে খাওয়া গেল না, মদের গেলাসে পোকা পড়ার ভয়। তাড়াতাড়ি তাই খাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলতে হলো।

জোয়েত সারভিনিকে বললো, "চলো, এবার আমরা দ্বীপে যাই।"

মারসিঅনেস্ শান্ত গলায় বললো, "আমরা যাবো তোমাদের সঙ্গে ফেরী-ঘাট অব্দি। বেশী রাত করবে না কিন্তু।"

ওরা চলেছে অন্ধকার চিরে। অপ্রশস্ত পথ, হাঁটছে দু'জন দু'জন করে। সামনে সদ্যযৌবনপ্রাপ্তা জোয়েত ও তার সঙ্গী; পিছনে অভিজ্ঞা মারসিঅনেস

ও বিশালদেহী সেভেল। মারসিঅনেস আর সেভেলের কণ্ঠস্বর আবছা আবছা ভেসে আসছে। অসংখ্য নক্ষত্রখচিত আকাশ নদীর জলে প্রতিবিম্বিত। গোটা নদীতট জুড়ে ব্যাঙের ডাক এবং আকাশে নাইটিঙ্গেল পাখির মধুর স্বরতান।

হঠাৎ জোয়েতের খেয়াল হলো, "আরে! মা আর সেই লোকটি তো আসছে না! কোথায় গেলো ওরা?"

সারভিনি বললো, "তারা নিশ্চয় ফিরে গেছে। বোধহয় তোমার মার ঠাণ্ডা লাগছিল।"

তারা আবার হাঁটতে শুরু করে।

অদূরে সরাইখানার আলো। মারতিনেত নামে এক জেলে এই সরাই-খানার মালিক। ঘাটে একটা বড় সড় নৌকা বাঁধা ছিল। ওরা তাতে চেপে বসে, হাঁক ডাক শুরু করে দেয়। ঘর থেকে বেরিয়ে আসে মাঝি। লগির এক ঠেলায় নৌকা একেবারে মাঝ-নদীতে। জলের ছলাৎ-ছলাৎ রব। আকাশের নক্ষত্র নদীর বুকে চিক চিক করে, তলিয়ে যায়।

দ্বীপে নেমে পড়ে তারা। কী বিশাল বিশাল গাছ। গাছ-গাছালির মধ্য দিয়ে তারা হাঁটতে থাকে। অজস্র পাখিরা এসে বিশ্রাম নিচ্ছে ঐসব গাছের আশ্রয়ে। পায়ের তলায় হিমেল মাটি। এখানে অপার শান্তি—শান্তি! দূরে—অনেক দূরে কে যেন পিয়ানো বাজাচ্ছে। আশ্চর্য অর্থবহ সেই সুর-তরঙ্গ।

সারভিনি জোয়েতের একখানা হাত ধরলো, তারপর আস্তে আস্তে জড়িয়ে ধরলো ওর কোমর, মৃদু মৃদু চাপ দিতে থাকে নরম মাংসে, ফিস্‌ফিসিয়ে জিজ্ঞেস করে, "কি ভাবছো, জোয়েত?"

জোয়েত যেন ঈষৎ চমকে ওঠে, "কৈ! কিছু না তো! আমার খুব ভালো লাগছে।"

"তুমি কি আমার কথা একদম ভাবো না?"

"ভাবি মাস্কেদ, একটু বেশীই ভাবি। থাক না এখন ওসব কথা। এই বিচিত্র অরণ্যক রাজ্যে ও সব প্রসঙ্গ না তোলাই ভালো।"

সারভিনি কিন্তু নিজেকে সংযত রাখতে পারছে না। জোয়েতের ওপর ক্রমশই তার চাপ বাড়ছে।

জোয়েতকে প্রবলভাবে নিজের শরীরের সঙ্গে লেপ্টে রাখতে চাইছে।

জোয়েত বাধা দিচ্ছে, কিন্তু পেরে উঠছে না। সারভিনির তপ্ত হাত ঘুরে বেড়াচ্ছে তার মোলায়েম মসৃণ শরীরের নানা জায়গায়।

আবার সারভিনি কাঁপা গলায় ডাকে, "জোয়েত।"

"বলো।"

"আমি তোমায় ভালোবাসি, জোয়েত। আমি তোমায়—"

"ওরকম করে বোলো না মাস্কেদ—"

"কবে থেকে আমি তোমার প্রেমের প্রতীক্ষায় রয়েছি!"

জোয়েত আলাদা হয়ে যাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু সারভিনির বন্ধন কঠিনতর! কামনাতপ্ত পুরুষের বন্ধন থেকে নারীর মুক্তি পাওয়া সহজসাধ্য নয়। দু'জনে মাতালের মতো টলছে।

সারভিনি ঠিক সাহস পাচ্ছে না। এমন একটা সুযোগের প্রতীক্ষায় সে বহুদিন ধরেই ছিল।

কিন্তু জোয়েতের সম্মতি আছে কিনা, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। সে বাতুলের মতো ক্রমাগত বলছে, "কথা বলো জোয়েত, কিছু বলো।"

তারপর হঠাৎ তার ধৈর্য হারিয়ে যায়। সে জাপটে ধরে, জোয়েতের মুখখানাকে টেনে আনে নিজের মুখের কাছে, ওর কপালে চুমু খায়। জোয়েত ছটফটিয়ে ওঠে, "এই! কি অসভ্যতামি করছো!"

সারভিনি টের পায়, জোয়েত রাগ করেনি। তার সাহস ও উৎসাহ প্রবল হয়ে ওঠে, সে দু'হাতে জোয়েতের ঘাড় আঁকড়ে ধরে, গুচ্ছ গুচ্ছ সোনালী চুল সরিয়ে দিয়ে মসৃণ ঘাড়ে এঁকে দেয় দীর্ঘ চুম্বন।

এবারে কিন্তু স্পষ্ট প্রতিবাদ। এক ঝটকায় জোয়েত নিজেকে মুক্ত করে নেবার চেষ্টা করলো।

সারভিনি তবু তাকে ছাড়লো না। তার রক্তে দাবানল। জোয়েতকে একেবারে টেনে আনলো বুকের ওপর, জোয়েতের মুখের ওপর নামিয়ে আনলো নিজের মুখ, ঠোঁটের ওপর ঠোঁট—দীর্ঘ বলিষ্ঠ চুম্বন।

আনন্দে মাথা ঘুরে গেল সারভিনির। আর সেই সুযোগে নিজেকে মুক্ত করে পালালো জোয়েত। মুহূর্তে সে অনেক দূরে, চকিতে হারিয়ে গেল তার অপস্রিয়মান ছায়া। ঘটনার আকস্মিকতায় দিশেহারা সারভিনি। কিছুক্ষণ সে ওখানেই অপেক্ষা করে। কিন্তু জোয়েত ফিরে এলো না দেখে হালকা স্বরে ডাকে: জোয়েত।

কোন সাড়া নেই। নিরেট জমাট অন্ধকার। দৃষ্টির গতি সীমিত। চিন্তিত সারভিনি ঝোপঝাড় সরিয়ে সরিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারে। কোথাও জোয়েত নেই। কোথায় গেল মেয়েটা?

সারভিনি এবার স্বর সপ্তমে তুলে হাঁক ছাড়েঃ জোয়েত! মামজেল জোয়েত!

কোন প্রত্যুত্তর নেই। ভয়ঙ্কর নীরবতা। এমন কি পাখীরাও ডাকে না। অন্ধকারে চলতে গিয়ে বার বার হোঁচট খাচ্ছে সারভিনি। সমানে ডাকছেঃ জোয়েত! মামজেল!

মাঝে মাঝে থমকে দাড়িয়ে কান পেতে শোনে। না, কোথাও কোন সাড়া নেই। অদ্ভুত নিস্তব্ধ ভূতুড়ে দ্বীপ। হাঁটতে হাঁটতে সে নদীর কিনারায় এসে দাড়ায়। এখানে সে দাহুরী পাখীর করুণ কান্না শুনতে পায়। গোটা বনজ দ্বীপ সে পাতি পাতি করে খুঁজেছে। কোথাও সে জোয়েতের সন্ধান পেলো না। অন্ধকারকে সাক্ষী রেখে প্রায় বিলাপ করে ওঠে সে, "জোয়েত, সাড়া দাও। আমি আর পারছি না। আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা মাত্র করছিলাম। জোয়েত, সাড়া দাও।"

হতাশ, ম্রিয়মাণ, ঈষৎ শঙ্কিত সারভিনি নদী পেরিয়ে এ পারে চলে এলো। চোখের সামনে কাফে লা গ্রেনোইলের আলো। ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসে। রাতের বয়স এখন মধ্যযৌবন।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক সে জোয়েতের সন্ধানে ঐ জঙ্গলময় দ্বীপে চক্কর কেটেছে। নিশ্চয় জোয়েত তাকে ফাঁকি দিয়ে ফিরে এসেছে ঘরে। ভয়কম্পিত অন্তরে ভিলায় প্রবেশ করে সারভিনি।

হল ঘরে একটি চাকর টেবিলের ওপর মাথা রেখে ঝিমুচ্ছিলো। সারভিনি তাকে ঠেলে তুলে জিজ্ঞেস করে, "জোয়েত কি ফিরে এসেছে?"

"হাঁ, স্যর। রাত দশটার আগেই তো তিনি ফিরে এসেছেন।"

নিজের ঘরে গিয়ে সটান শুয়ে পড়লো সারভিনি। কিন্তু বিনিদ্র রজনী। সেই একটা তপ্ত চুম্বন সব কেমন ওলোট পালোট করে দিলো। আচ্ছা, জোয়েত কি চায়? বড় রহস্যময়ী! কিন্তু ওর জ্বালাময় যৌবন যে সারভিনিকে পাগল করে দিচ্ছে! জীবনে নারী-অভিজ্ঞতা সারভিনির এই নব তুনয়। এর

আগে বিভিন্ন ধরণের বহু নারীর সংস্পর্শেই সে এসেছে। কিন্তু জোয়েত তাদের মতো নয়, সে অনন্যা।

এমন একটি মেয়ের ভালোবাসা পাবার জন্য পৃথিবীতে বেঁচে থাকা যায়।

রাত একটা!···

রাত দুটো!···

ঘুম নেই। বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটছে কে! গুমোট গরম আর লোনা ঘাম। সারভিনি বিছানা ছেড়ে উঠে জানালা খুলে দেয়। আঃ! এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস! সে বুক ভরে দম নেয়। নিঝুম কালো রাত।

হঠাৎ সারভিনি খেয়াল করলো, বাগানে এক বিন্দু জোনাকি-আলো জ্বলছে। নির্ঘাৎ এই রাতে ওখানে বসে বসে কেউ সিগ্রেট টানছে। সেভেলই হবে।

আস্তে ডেকে সারভিনি, "লিঁয়।"

জবাব ভেসে আসে, "জাঁ?"

"দাঁড়াও, আমি আসছি।"

শরীরে একটা আবরণ চাপিয়ে বেরিয়ে এলো সারভিনি। বাগানে একটা লোহার চেয়ারে গা এলিয়ে সিগ্রেট টানছে সেভেল।

"এত রাতে এখানে?"

"বিশ্রাম নিচ্ছি" —সেভেলের মুচকি হাসি।

"তুমি আমার চেয়ে ভাগ্যবান। আমি এতক্ষণ হতাশার দেয়ালে কপাল ঠুকছিলাম।"

"কি বলছো তুমি?"

"ঠিকই বলছি বন্ধু···জোয়েত অন্য জাতের মেয়ে, ওর মায়ের মতো নয়।"

"কি হয়েছে, খুলে বলো।"

সারভিনি তার অভিজ্ঞতার কথা খুলে বলে। "···ঐ মেয়ে আমাকে নাকাল করে ছাড়ছে। আমার চোখ থেকে ঘুম চলে গেল! নারী কী রহস্যময়ী! অথচ, দেখো—সাধারণভাবে জোয়েত কত সাদাসিদে, কিন্তু আসলে মনের তল খুঁজে পাবে না। ও আমার বুদ্ধিনাশ ঘটাবে।"

সেভেল একটু নড়ে চড়ে বসে, "সাবধান বন্ধু। ও তোমাকে ঠিক বিয়ের

ফাঁদে জড়াবে। ইতিহাসের পাতা ওল্টালেই এ ধরণের বহু দৃষ্টান্ত খুঁজে পাবে। পড়োনি, সাধারণ ঘরের মেয়ে মাদ্‌মোয়াজেল দ্য ম'াতিজেল একদিন এই কৌশলেই সম্রাজ্ঞী হয়ে বসেছিলেন? তুমি আবার দ্বিতীয় নেপোলিয়ন না হ'য়ে যাও।"

সারভিনি প্রত্যয়ের সঙ্গে বললো, "না, তার ভয় নেই। আমি সম্রাটও নই, নির্বোধও নই। গণিকার মেয়েকে নিয়ে যৌবনকে তৃপ্ত করা যায়, ঘর বাধা যায় না। যাক, তোমার কি ঘুম পেয়েছে?"

"আদৌ নয়।"

"তবে চলো, নদীর ধারে একটু বেড়িয়ে আসি।"

"চলো।"

দুই বন্ধু নদীতট বরাবর মার্লির দিকে এগিয়ে চললো।

তখন গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্রাহ্মমুহূর্ত। প্রকৃতি ঘুমের অতলান্তে। নাইটিঙ্গেল আর ব্যাঙেরাও ঘুমিয়ে আছে। সারভিনি এখন দার্শনিকসুলভ ভাবনায় ভাবিত। বলতে থাকে, "এই উঠতি কিশোরী আমার মাথায় আগুন ধরিয়েছে। অঙ্ক-শাস্ত্রের নিয়মে প্রেম চলে না। অঙ্কশাস্ত্রে একের সঙ্গে এক যোগ করলে দুই হয়; আর প্রেমশাস্ত্রে একের সঙ্গে এক যোগ করলে একই হয়।

কিন্তু আমার ও জোয়েতের বেলায় উত্তর 'এক' হচ্ছে না, হচ্ছে 'দুই।' কোন এক রমণীর সত্তার সঙ্গে এক হয়ে যাবার অনবদ্য অভিজ্ঞতা কি তোমার আছে? এ শুধু দৈহিক সঙ্গম নয়, আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন। নর ও নারীর সেই সর্বাত্মক মিলনই বিধাতা পুরুষের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। তবু চূড়ান্ত মিলন বুঝি কখনোই সম্ভব নয়। কি এক সূক্ষ্ম বেদনাময় ব্যবধান থেকেই যাবে! আকাশের তারাদের কাছে হয়তো বা পৌঁছে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু ঐ ব্যবধানকে অতিক্রম করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়।"

"আমার মাথায় ওসব গভীরতা ঢোকে না," সেভেল বললো, "নারীর মনে বা, চোখে কি আছে আমি তা বুঝবার চেষ্টাই করি না। তার বাইরের টুকুতেই আমি খুশি।"

সারভিনি কিন্তু আপন মনেই বলে চলেছে, "জোয়েত—এক বিরাট প্রহেলিকা! জানি না, কাল সকালে আমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে!"

আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। উষালগ্নে প্রকৃতি স্মিত। খামার বাড়ি

থেকে মোরগের ডাক শোনা যাচ্ছে। শুরু হয়েছে পাখীদের একটানা কাকলি।

সেভেল বললো, "এবার আমাদের ফেরা উচিত।"

সারভিনি যখন তার ঘরে ফিরে এলো, পুবাকাশে তখন গোলাপী আভা। কপাট বন্ধ করে বিছানায় নিজের শ্রান্ত শরীর এলিয়ে দেয়। মহূর্তে অপ্রতিরোধ্য ঘুম তাকে অধিকার করে।

ঘুম ভাঙলো যেন কিসের শব্দে। শব্দটা হচ্ছে জানালায়। জানালা খুলতেই হতবাক,—

হলুদ পোশাক পরে জোয়েত সমানে ঢিল ছুঁড়ছে তার জানালাকে তাক করে। সারভিনিকে জানালার কাছে দেখতে পেয়েই নেচে ওঠে, "এই যে মাস্কেদ, এত বেলা পর্যন্ত ঘুম? কাল সারারাত ধরে কি কম্ম হয়েছে? কোন এ্যাডভেঞ্চার ক'রে এসেছো নাকি?"

"দাঁড়াও, আসছি। মুখে-চোখে জল দিয়ে আসছি।"

"তাড়াতাড়ি। দশটা বাজে। এগারোটায় ব্রেকফাস্ট সারবে নাকি?"

বাগানে নেমেই সারভিনি ছুটে এলো জোয়েতের কাছে। ততক্ষণে জোয়েত তার হাঁটুর ওপর একখানা বই খুলে পড়তে বসেছে। সারভিনি তার পাশে গিয়ে বসতেই এমন সহজ সরল ভাব দেখাতে শুরু করলো, যেন গত রাতে অনভিপ্রেত কিছুই ঘটেনি। বললো, "শোন মাস্কেদ, আমার মাথায় একটা পরিকল্পনা এসেছে। মা প্রায়ই বলেন, গ্রেনোইলে নাকি ভদ্রঘরের মেয়েরা যায় না। কিন্তু আজ ওখানেই যেতে চাই। তুমি আমায় নিয়ে যাবে। ওখানে গিয়ে নদীতে হুল্লোড় করবো।"

জোয়েতের প্রসাধনী গন্ধ, যা তার মায়ের মতো উগ্র নয়, আবিষ্ট করে রাখে সারভিনিকে। ওর নির্মল মুখখানা এখন সারভিনির ঠোঁটের নাগালের মধ্যে, আবার নিজের ইন্দ্রিয়কে সংযত রাখা কষ্টকর।

"তুমি আমাকে নিয়ে যাবে তো মাস্কেদ?" জোয়েত বললো, "মা আবার গরম একদম সহ্য করতে পারে না। আর আজ যা উত্তাপ, মনে হয় না দুপুরে উনি ঘর ছেড়ে বেরুবেন। তোমার বন্ধুকে মার প্রহরায় রেখে আমরা দু'জনে বন দেখার ছল করে সোজা চলে যাবো গ্রেনোইলে। কি মজা যে হবে!"

ওরা হাঁটতে শুরু করে। হাঁটতে হাঁটতে প্রাচীরের প্রান্তে, সেন নদীর কিনার অব্দি। এখন নদীর বুকে প্রখর আলোর ঝলকানি। দূরে ঝুল ঝুল কুয়াশাও লক্ষণীয়। কয়েকটি হাল্কা ও মালবোঝাই বোট জল কেটে পার হচ্ছে। স্টিমবোটগুলির সাইরেন বেজে ওঠে থেকে থেকে। ছুটির দিন রবিবারে দূর-দূরাঞ্চল থেকে রেলগাড়িতে চেপে দলে দলে মানুষ ছুটে আসে এই প্রাকৃতিক রাজ্যে খুশীর মৌতাত ভোগ করতে।

ব্রেকফাস্টের ঘণ্টা শুনে ওরা আবার ফিরে এলো। খাবার টেবিলে সকলেই কেমন নিশ্চুপ।

জুলাই মাস। নিদাঘের তপ্ততা সত্যি অসহনীয়। শিথিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। বাক্যালাপেও অনীহা। একমাত্র জোয়েতই ছটফটে। দীর্ঘ নীরবতা তার ধাতে সয়না। খাবার-টেবিল থেকে উঠেই নাটকীয় গলায় সে বললো, "এই গরমের হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় হলো গাছের ছায়ায় ছায়ায় চরে বেড়ানো।"

মারসিঅনেস বিরক্ত হলো, "কি যা তা বলছো?" সত্যি, মহিলার মুখে-চোখে গভীর অবসাদ।

জোয়েত বললো, "তোমার আপত্তি থাকলে ঘরে বসে থাকো। ব্যারণও থাকবে। মাস্কেদ আর আমি চলে যাবো পাহাড়ী বনে। ওখানে গিয়ে ঘাসের ওপর শুয়ে শুয়ে বই পড়বো।" "তারপর সারভিনির দিকে চেয়ে বললো, "কি, সাড়া দিচ্ছো না যে?"

"আমি তো তোমার ইচ্ছার দাস।"

ছুটে গেল জোয়েত তার টুপিটা আনতে।

"মেয়েটার মাথা সত্যি খারাপ হয়ে গেছে"—অবসাদে শিথিল অঙ্গ ছড়িয়ে দিলো মারসিঅনেস, তার ধবধবে ফর্সা হাতখানা সেভেলের শরীরের খুব কাছাকাছি, সেভেল নীচু হয়ে সেই হাতে আলতো চুমু খায়।

জোয়েত আর সারভিনি আবার পাশাপাশি। হাঁটছে খা খা রোদ্দুর পেরিয়ে গাছের ছায়ার দিকে। কিন্তু এখনো সময় হয়নি গ্রেনোইলে যাবার। নদীর পুল পেরিয়ে তারা তাই এলো একটি দ্বীপের অন্তরে, ঝর্ণার ধারে বেড়ে ওঠা উইলো গাছের ছায়ায় গিয়ে বসলো আয়াস করে। জোয়েতের হাতে একটা বই। মাস্কেদের দিকে সেটা এগিয়ে দিয়ে বলে, "তুমি পড়ো মাস্কেদ, আমি শুনি।"

গভীর হতাশার সঙ্গে সারভিনি বললো, "আমি পড়তে জানি না।"

"তুমি তো আদর্শ প্রেমিক মাস্কেদ, যে তার প্রেমের কোন প্রতিদান প্রত্যাশা করে না। সুতরাং তুমি পড়ে যাও, আমি কান পেতে তার মর্মার্থ উদ্ধার করি।"

বইয়ের নাম দেখেই সারভিনির চোখ চড়কগাছ। নাটক নয়, নভেল নয়, এক ইংরেজ বিজ্ঞানীর লেখা কীটতত্ত্বের বই—"পিপীলিকার ইতিবৃত্ত।" সারভিনি হাসবে না, কাঁদবে, ভেবে উঠতে পারে না।

জোয়েত তাগাদা দেয়, "কি হলো, শুরু করো।"

সারভিনি বললো, "তুমি কি বাজি ধরেছো না, নিছক আমোদ করছো?"

"সে আবার কি? আমি দোকানে গিয়ে পিঁপড়ের ওপর সবচেয়ে দামী বইখানা নিয়ে এলাম। ভাবলাম, এই দুপুরে ঘাঁসের ওপর শুয়ে ঐ ক্ষুদে বুদ্ধিমান জীবদের কথা শুনবো এবং এখানে তাদের চলাফেরাও প্রত্যক্ষ করবো। ব্যাপারটা কি মজার নয়?"

অগত্যা সারভিনি পড়তে শুরু করে।

"দৈহিক সাদৃশ্যের দিক থেকে বানরজাতীয় প্রাণীরাই হচ্ছে মানুষের নিকট আত্মীয়। কিন্তু বুদ্ধি-বিবেচনা ও প্রাত্যহিক জীবন-শৃঙ্খলার দিক থেকে পিপীলিকাদের স্থান মানুষের পরেই। মনুষ্যসুলভ নিপুণতায় তারা তাদের আবাস তৈরী করে, চলন-উপযোগী পথ প্রস্তুত করে, সুবিধার্থে দাস প্রথাকে মদত দেয়…"

একটানা পড়তে পড়তে বিরক্ত সারভিনি জিজ্ঞেস করে, "অনেকখানি তো পড়লুম, এবার ক্ষান্তি দাও।"

ইতিমধ্যে জোয়েত একটি ঘাসের ডগায় সঞ্চরণমান একটি পিঁপড়েকে নিবিষ্ট একাগ্রতায় দেখতে শুরু করেছে। তার ব্যবহারে বিস্ময়ের সঙ্গে অদ্ভুত মমত্ববোধও লক্ষণীয়। জোয়েত নীচু হয়ে ছোট্ট কীটটিকে চুমু খেতে যায়। কিন্তু পিঁপড়েটি মুহূর্তে তার গাল বেয়ে চুলের মধ্যে ঢুকে যায়। বিব্রত জোয়েত লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে একশেষ। সারভিনি হো হো করে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে জোয়েতের থোকা থোকা চুল সরিয়ে সেই কীটটাকে উদ্ধার করে এবং জোয়েতের মাথায় আবেগ ভরে চুমু খায়। বাধা দেয় না জোয়েত।

উঠে দাঁড়িয়ে জোয়েত বলে, "উপন্যাসের চেয়েও উপাদেয় এই পিঁপড়ে-উপাখ্যান। চলো এবার গ্রেনোইলের দিকে।"

সেই বিশেষ উদ্যানে গিয়ে তারা দেখলো, ইতিমধ্যেই সেখানে বহু প্রেমিক-প্রেমিকার সমাবেশ ঘটেছে। সব জোড়ায় জোড়ায় জড়াজড়ি করে বসে আছে, কেউ কেউ শুয়ে পড়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ, পরস্পর পরস্পরের ঠোঁটে ডুব দিয়েছে, পারিপার্শ্বিকতার কথা ভুলে বিলকুল দেহের সঙ্গে দেহ লেপ্টে রেখেছে। নদীতে একাধিক পালতোলা সৌখীন নৌকা বিচরণ করছে। যৌবন ডগমগ যুবক-যুবতীরা হাঁটছে পাশাপাশি, মন উজাড় করে প্রেমালাপ চলছে তাদের। একটা প্রকাণ্ড নৌকা ভিড়লো দ্বীপে। বজরা বোঝাই অসংখ্য নারী-পুরুষ, কলকলিয়ে তারা নেমে এলো দ্বীপের মাটিতে। ইতি উতি সুরা পানের আসর, পুরুষ ও নারী সমানে মদ্য পান করছে, হৈ-হুল্লোড়ে মাটি ও আকাশ কম্পমান; কে একজন ওরই মধ্যে বেহালা বাজাচ্ছে, আর একজন ক্যানেস্তারা পিটিয়ে সৃষ্টি করছে বিকট আওয়াজ। সুন্দরীরা আকণ্ঠ নেশা করে দিশেহারা,—বুকের বাঁধন আলগা ক'রে পুরুষদের দেখায় নিজেদের পুরুষ্টু স্তন, নিতম্ব দুলিয়ে দুলিয়ে পাছার বিশালতায় তাক লাগিয়ে দেয়। মাথায় জোকারের টুপি, পরণে সামান্য নেংটি—অর্ধ উলঙ্গ এক যুবক একরাশ চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান যুবতীর সঙ্গে মহড়া দিচ্ছে। তাদের হো-হো খিল-খিল হাসিতে কানে তালা লেগে যাবার যোগাড়। আর কি সব অশ্লীল খিস্তি! সাঁতারের পোশাক পরে নর-নারীর উদ্দাম জলকেলি, জাপটাজাপটি এবং খিস্তি-খেউড়!...

সারভিনির কিন্তু ভালো লাগছে না। তার গা ঘিন্ ঘিন্ করছে। কিন্তু সে অবাক হচ্ছে, এই পরিবেশে জোয়েতের স্ফূর্তি দেখে! মনে মনে সে জোয়েতের রুচির নিন্দা না করে পারছে না। জোয়েত ঐ সমস্ত মেয়ের দেহ-যৌবন ও চুলের প্রশংসা করছে! মদ্যপায়ীদের বেলেল্লাপনা, গেলাস ভাঙা, তার ভিতর খুশির শিহরণ জাগাচ্ছে! অদ্ভুত!

আনন্দে হাততালি দিয়ে নেচে উঠলো জোয়েত, "মাস্কেদ, আমার যে কি মজাই লাগছে!"

সারভিনি নির্বিকার, গম্ভীর।

জোয়েত বললো, "মাস্কেদ, আমরা নদীতে স্নান করবো।"

"যেমন তোমার অভিরুচি।"...

স্নানের পোশাক পরে তারা নদীতে নেমে সাঁতার কাটতে আরম্ভ করে। জলে যেন জোয়েত সত্যি জলকন্যা, দু'হাতে জল কেটে তর তরিয়ে এগিয়ে যায়, কখনো চিৎ সাঁতারে ভাসমান রাখে তার গোটা শরীরটাই, কখনো বা গভীর

জলের মাছের মতো দেয় ডুব। ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে বেদম সারভিনি, নিজের অক্ষমতায় রাগ হচ্ছে তার। জলের বুকে পদ্মের মতো দেহ ভাসিয়ে জোয়েত তাকিয়ে আছে নীল আকাশের দিকে। সারভিনি লুব্ধ দৃষ্টিতে দেখছে ওর সিক্ত চিক্কন তনু, জলের কৃপায় ওর দেহের প্রতিটি রেখা এখন দৃষ্টিপাত হয়। অনিবার্য কামনায় ছটফটিয়ে ওঠে সারভিনি, যদিও করণীয় কি, ভেবে উঠতে পারছে না।

সেই সময় জোয়েত বলে উঠলো, "ও প্রিয়! তোমার মাথাটি তো চমৎকার!"

বিদ্রূপে অপমানিত সারভিনি জলে ওঠে, "এই জীবনটাই বুঝি তোমার পছন্দ?"

"কোন জীবনের কথা বলছো?"—জোয়েতের সরল জিজ্ঞাসা।

"ন্যাকামি করো না। আমার কথা বুঝবার মতো বুদ্ধি যথেষ্ট আছে।… ঢের হয়েছে, এবার ফিরে চলো।"

"বিশ্বাস করো, আমি তোমার কথা বুঝতে পারিনি।"

"অনেক ফূর্তি তো হলো, এবার ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে চলো।"

"কিছুই বুঝছি না ছাই!"

"বোকার ভান করো না জোয়েত। কাল রাতেই তো টের পেয়ে গেছো, আমি কি চাই।"

"কি টের পাবো? এ মা, আমি একদম ভুলে গেছি!"

"ভুলে গেছো? ঘটনার সারার্থ হলো, আমি তোমাকে প্রেম জানাবো।"

"তুমি?"

"বিলকুল আমিই!"

"মিথ্যে কথা!"

"ভগবানের দিব্যি।"

"প্রমাণ দাও।"

"এর চেয়ে বড় প্রমাণ দিতে আমি চাই না।"

"দাও প্রমাণ।"

"কাল রাতে সেই সময় প্রমাণ চাইলেই তো পারতে।"

"কাল রাতে তো তোমার বাসনা আমি জানিনি।"

"যত সব বাজে কথা।"

"তা ছাড়া এসব কথা তো শুধু আমাকে বললেই চলবে না।"

"আর কাকে জানাতে হবে?"

"অবশ্যই আমার মাকে!"

সারভিনি বাঁকা হাসি হাসে, "তোমার মাকে! খুব একটা বড় শর্ত হয়ে যাচ্ছে নাকি?"

সারভিনির কথা শুনে বিবর্ণ হয়ে যায় জোয়েত। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সারভিনির মুখের দিকে চেয়ে বলে, "মাস্কেদ, তুমি যদি ভালবেসে আমাকে বিয়ে করতে চাও, অবশ্যই আমার মায়ের অনুমতি তোমার চাই।"

মেজাজ হারিয়ে গেল সারভিনির, "তুমি কি আমাকে তোমার আর সব চাটুকারদের মতো গর্দভ মনে করো নাকি? তোমার চালাকি আমি ঠিকই বুঝি।"

"এতে তুমি চালাকির খোঁজ কোথায় পেলে?"

তেতে লাল সারভিনি গলার স্বর আরো উঁচু পর্দায় তোলে, "জোয়েত, আর ন্যাকা সাজবার চেষ্টা করো না! যতই সরল কিশোরীটি সাজবার চেষ্টা করো না কেন, ও সব আর তোমায় মানায় না! আমি তো এক কথাতেই বলে দিয়েছি,—তোমার প্রতি আমার প্রেম অটুট। এ কথাটা তুমি বোঝ না? এও কি আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?"

তারা কথাগুলি বলছিল মুখোমুখি সাঁতার কাটতে কাটতে। সারভিনির শেষ কথাগুলির মর্মার্থ বুঝবার চেষ্টা করে জোয়েত। মুহূর্তে সে লজ্জায় লাল হয়ে যায়,—গাল থেকে কান পর্যন্ত রক্তের ধারা যেন ছলকে যায়। দ্রুত সাঁতার কেটে ছুটে গেল সে তীরের দিকে। তার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে হাঁপ ধরে যায় সারভিনির। তার অসহায় দৃষ্টির সামনেজোয়েত জল থেকেউঠে দাঁড়িয়ে সোজা চলে গেল পোশাক বদলাবার ঘরে, একবারও পিছন ফিরে তাকায় না।...

সারভিনি ভেবে পায় না, তার এখন কি করা উচিত। জোয়েত রাগ করেছে নির্ঘাৎ! সে কি গিয়ে ক্ষমা চাইবে? না, রাগ না পড়া অবধি অপেক্ষা করবে?...আশ্চর্য! জোয়েত পোশাক বদলে একাই ফিরে যাচ্ছে! ক্লান্ত সারভিনিও ব্যবধানে থেকে ফিরে চললো ভিলার দিকে।...

•

ভিলার গোলাকার বাগানে পায়চারীরত ওরা দু'জন—সেভেল ও মারসি-

অনেস, হাতে-হাত, মুখে মধু-আলাপ। গত রাত থেকেই তারা দু'জনে ক্রমশ সাহস সংগ্রহ করছে ঘনিষ্ঠতর-ঘনিষ্ঠতম হবার উদগ্র বাসনায়। সারভিনিকে আসতে দেখেও সেভেলের সংস্পর্শ থেকে সরে গেল না মারসিঅনেস। বললো. "কি ব্যাপার? রোদে ঘোরাঘুরি করে জোয়েত তো অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে। মুখচোখ লাল। বিছানায় পড়ে আছে। একটু দেখে এসো। তখনই বারণ করেছিলাম, রোদে টো টো করিস না। কে কার কথা শোনে! আর তোমারও বাপু বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পাচ্ছে!"

জোয়েত ডিনার খেতেও এলো না। জানিয়ে দিলো. তার খিদে নেই এবং সে একটু একা থাকতে চায়।

রাত দশটার ট্রেনে সেভেল ও সারভিনি ফিরে গেল। যাবার আগে জানিয়ে গেল, আগামী বৃহস্পতিবার তারা আবার আসবে। শিথিল দেহ এলিয়ে খোলা জানালার সামনে একাকী বসে রইলো মারসিঅনেস। বিচিত্র হিম-মির্জন এই রাত ক্রমশ গভীরতর। যে কোন মনকে বিষণ্ণ করে দেয়। গ্রেনোইলেরের নাচ-গানের হিল্লোলিত শব্দ-তরঙ্গ বাতাসের হাত ধরে ভেসে আসছে এতদূর অব্দি।

সারাটা জীবন ধরে প্রেম আর শরীর বিলিয়ে এসেছে যে অশ্বশক্তিসম্পন্না নারী, সেই বহুবল্লভা মারসিঅনেসের মনেও এখন একটা বিষণ্ণ শূন্যতা পাক খায়; এই মুহূর্তে সে ভয়ঙ্কর ভাবে কামনা করছে শক্তিমান পুরুষ সেভেলকে। এই রকম কামনায় যখন সে জর্জরিত হয়. মারসিঅনেস তখন আর নিজেকে স্থির রাখতে পারে না,—তখন তার পুরুষ চাই-ই!

সে জন্ম-গণিকা। নিজের অফুরাণ কাম-শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ধাপে ধাপে, উপরে উঠেছে; শুরু করেছিল সমাজের নিম্নতল লোকদের নিয়ে, ক্রমশ আকর্ষণ করতে পেরেছে সমাজের ধনী-মানী-সম্ভ্রান্তদের। এ ব্যাপারে সে পশুসুলভ শক্তি ও বুদ্ধির অধিকারিণী, বিবিধ প্রকার চুম্বন ও সঙ্গম-রীতিতে যে কোন পুরুষকে পাগল করে দিতে পারে। অজস্র পুরুষ আজ পর্যন্ত তার সঙ্গে দৈহিক মিলনে তৃপ্ত হয়েছে, অজস্র পুরুষ! কিন্তু মারসিঅনেস কখনো কারুর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েনি, আবার কারুর ওপর বিরক্তও হয়নি। এই সহজাত নির্বিকারত্ব শ্রেষ্ঠ গণিকার মানসিকতা। মুসাফির যেমন সরাইখানায় ঢুকে খাদ্যাখাদ্যের বাছবিচার করে না, মারসিঅনেসও তেমনি সঙ্গী নির্বাচনে কখনো খুঁত খুঁতে নয়; সে জানে, এটাই তার জীবিকা এবং জীবিকার জন্য

বিভিন্ন রুচির মানুষকে সম সঙ্গম-তৎপরতার সঙ্গেই গ্রহণ করতে হবে। তার চিত্ত সদাই প্রসন্ন, অসীম তার ধৈর্য।

তবু ব্যতিক্রম আছে বৈ কি! কোন কোন অতিকায় পুরুষ সময় সময় তার নিস্তরঙ্গ রক্তেও তুফানের বার্তা বয়ে আনে। সে সত্যি তখন জ্বলে ওঠে, অসহ্য সুখে সে জ্বলতে থাকে এবং কিছুক্ষণের জন্য হলেও সে স্বর্গীয় বিরহে কষ্ট পায়। তার ঐ নিরেট ব্যবসায়িক মনেও স্বপ্ন ও কল্পনার জাল বিস্তারিত হয়। তখন সে মনে মনে নিজের মৃত্যু কামনা করে, আকাশভরা নক্ষত্রদের দিকে চেয়ে সারাটা রাত জেগে বসে থাকে, তার প্রাজ্ঞ মনেও রং লাগে।

তেমনি এক পোচ রঙ লাগিয়ে দিয়ে গেল সেভেল। সেভেল এখনো তাকে বিছানার ওপর তুলে নেয়নি। কিন্তু ওর মধুর আচরণ, ব্যক্তিত্বপূর্ণ পুরুষালী চেহারা মারসিঅনেসের মনে যুগপৎ প্রেম ও কামনার আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। সেভেলের ভাবনায় মারসিঅনেস এখন বিভোর।…

পেছনে কার পায়ের শব্দ। চমকে ঘুরে তাকিয়ে মা দেখলো মেয়েকে। ঠিক যেন তারই মতো বিষণ্ন শিথিলযৌবনা জোয়েত জানালায় ভর দিয়ে উদাসী দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আকাশের পানে। ওর পোশাকগুলি কেমন যেন বহু ব্যবহারে নোংরা, দুই চোখ ক্লান্তিতে রক্তাভ।

জোয়েত মার কাছে এসে দাঁড়ালো, গম্ভীর গলায় বললো, "তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে মা।"

মারসিঅনেস অবাক। এই কন্যা তার বড় গর্বের বস্তু। কিন্তু কন্যার প্রতি তার স্নেহ তো নিঃস্বার্থ নয়। জোয়েত যে ক্রমশই তার ব্যবসায়ের মূলধন হয়ে উঠছে। এই রূপসী মেয়েকে সামনে রেখে চলছে তার নিজের পড়তি যৌবনের ছলা-কলা।

মারসিঅনেস বললো, "বলো।"

"আজ কিছুক্ষণ আগে একটা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে গেছে।"

"কি রকম?"

"মঁসিয়ে হ্য সারভিনি বললো, "সে নাকি আমার প্রেমে পড়েছে।"

মারসিঅনেসের বুকের ভেতরটা দুলে ওঠে, "কথাটা সে কি ভাবে পাড়লে?"

জোয়েত মার পায়ের কাছে বসে, নরম আদুরে গলায় বললো, "ও আমাকে বিয়ে করতে চায়।"

বিস্ময়ে টান টান মারসিঅনেস সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, "সারভিনি! সারভিনি এ কথা বলেছে? তোমার মাথা খারাপ হয়নি তো?"

জোয়েতের দৃষ্টি কঠিন হয়ে আসে, গভীর অনুসন্ধিৎসায় সে তার মায়ের মুখের ভাষা পড়তে থাকে অসহনীয় তীব্রতায়। তারপর ভীষণ গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলো, "আমার মাথা খারাপের কি লক্ষণ তুমি দেখলে? মঁসিয়ে দ্য সারভিনি কি আমার পানিপ্রার্থী হতে পারে না?"

প্রশ্নের তীব্রতায় ঈষৎ হকচকিয়ে গেলো মারসিঅনেস. "তোমার কোথাও ভুল হয়েছে জোয়েত। হয়তো তুমি শুনতে ভুল করেছো অথবা, সারভিনির বক্তব্য ধরতে পারোনি। শোন, মঁসিয়ে দ্য সারভিনি বনেদী বড়লোকের ছেলে, প্যারিসের গোঁড়া পরিবারভুক্ত। সে কখনো তোমায় বিয়ে করার প্রস্তাব দিতে পারে না।"

জোয়েত কোন রকমে উঠে দাঁড়ায়, উচ্চারণ করে, "কিন্তু ও যে বললো, আমাকে ভালোবাসে।"

মারসিঅনেসের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, "এ ধরণের অলীক রূপকথাকে বুকে পুষে রাখবার মতো অপরিণত বয়স ও বুদ্ধি নিশ্চয় তোমার নয়। সারভিনি নিজের সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। তার বিয়ে হবে সেই রকম মেয়ের সঙ্গেই, যার পারিবারিক সুনাম ও অর্থপ্রাচুর্য যথেষ্ট। আর সে যদি তোমাকে ভালোবাসার কথা বলে থাকে, তবে তার অর্থ বিয়ে নয়, তার অর্থ—"

মেয়েকে আর খোলাখুলি ভাবে বলতে পারলোনা মারসিঅনেস। একটু থেমে বললো, "মাথা গরম না করে এখন শুতে যাও। আমি একটু একলা থাকতে চাই।"

জোয়েত তার জবাব পেয়ে গেছে। সে শান্তভাবে তার মার কপালে চুমু খেয়ে বিদায় নেয়। মারসিঅনেস কিন্তু মেয়ের পিছন পিছন তার শোবার ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে, "তোমার শরীর এখন ভালো লাগছে তো?"

ভেতর থেকে জবাব এলো, "শরীর আমার সবসময়ই ভালো আছে। শুধু ঐ জিজ্ঞাসাটার কোন সদুত্তর খুঁজে পাচ্ছিলাম না।"

"এ সম্পর্কে পরে তোমাকে আরো কিছু বলবো। কিন্তু এখন থেকে আর সারভিনির সঙ্গে নির্জনে একাকী বেড়াতে যেও না।...একটা কথা নিশ্চিত জেনে

রেখো, ও তোমাকে কোন দিনই স্ত্রীর মর্যাদা দেবে না. ও যা চায়, তার তাৎপর্য ভিন্নতর।"

মেয়েকে আকারে-ইঙ্গিতে সারভিনির উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে স্বস্থানে ফিরে এলো মাদাম মারসিঅনেস।

জীবনে সব রকম দুঃখবোধকে সে দু'হাতে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে, আজো চাইছে। এই কারণেই তার অপরূপা মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে কখনো মন ভারাক্রান্ত করেনি। সে জানে, যত বড় রূপসীই হোক না কেন, জোয়েতের কোন সামাজিক স্বীকৃতি নেই - সে গণিকার মেয়ে। খুব বরাতজোর না থাকলে এই ধরণের মেয়ের কখনো ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত ঘরে বিয়ে হতে পারে না। এবং মারসিঅনেস এই ধরণের স্বপ্নবিলাসকে প্রশ্রয় দিতে ভালোবাসে না। তার কাছে সত্য অতি নির্মম। সে জানে, একদিন জোয়েতও তার মার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। জ্বালাময়ী রূপ নিয়ে সে তার গন্ধেবদের উন্মাদ করে দেবে।

তবু তবু মারসিঅনেস সরাসরি তার মেয়েকে এই কথাগুলি বলতে পারেনি। লজ্জা ও দ্বিধায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। শত হলেও সে যে মা।

জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে সারভিনির মতো পুরুষকে চিনতে তার মোটেই অসুবিধে হয় না।

মধুলোভী মক্ষিকাদের চিনতে তার ভুল হবে কেন? শয়তান! বিয়ে করবে! সেই পুরনো শহুরে চাল।

কিন্তু তার সরল মেয়েকে কি ভাবে সাবধান করে দেওয়া যায়? মনের দিক থেকে ও এখনো শিশু।

ভাবতে ভাবতে মারসিঅনেস ছটফটিয়ে উঠলো। ঠিক করলো, এদের গতিবিধির ওপর এবার থেকে সে কড়া দৃষ্টি রাখবে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। দরকার হলে সারভিনিকে দু'চার কথা শুনিয়ে দিতেও সে দ্বিধা করবে না।

কিন্তু মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন কিছুই স্পষ্ট করে ভাবতে পারলো না মারসিঅনেস। তার ক্লান্তিবোধ হচ্ছে। আবার সে ডুবে গেল সেভেলের ভাবনায়। আহ! কী সুন্দর যুবক! কবে তাকে একান্ত করে পাবে সে? তারকাখচিত আকাশের দিকে দুই হাত প্রসারিত করে মারসিঅনেস উচ্চারণ করে: আমি তোমাকে ভালোবাসি, ভালোবাসি!

॥ তিন ॥

সেই রাতে জোয়েতের চোখেও ঘুম নেই।

তার মায়ের মতো সেও খোলা জানালার সামনে উবু হয়ে বসে আছে। দু'চোখ বেয়ে টপ টপ করে জল গড়াচ্ছে। জীবনে এই প্রথম মানসিক কষ্টে চোখের জল ফেলছে সে। দুঃখ কাকে বলে এযাবৎ সে জানতো না। আজ আত্মবিশ্লেষণে বসে সে দেখতে পেলো, তার জীবনে কোন আলো নেই, সবটাই নিকষ অন্ধকার। তার মানসিক অপরিপক্কতার জন্যই এতদিন সে এই কঠিন বাস্তব সম্পর্কে অচেতন ছিল। মার আসল ভূমিকার কথা সে কখনো ভেবে দেখেনি। জন্ম থেকে সে দেখে এসেছে, তার মার সঙ্গে খাতির যতসব অতি সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য পরিবারের লোকদের, যাদের আদব-কায়দা অনন্য। তারা সসম্মানে চুমু খাচ্ছে তার মার হাতে। তারা সকলেই এমন ঢঙে কথা বলে যেন তারা প্রত্যেকেই কোন না কোন রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ওদের মধ্যে কারা যে সত্যিকারের রাজবংশের, কে তাকে বুঝিয়ে দেবে?

নেহাৎ ছেলেমানুষ বেচারি জোয়েত। গভীরভাবে কোন কিছু চিন্তা করা তার স্বভাববিরুদ্ধ। সে তার মায়ের মতো লোকচরিত্র বোঝে না। তার জীবনধারা ছিল প্রবহমান সুখে পরিপূর্ণ, নিরুদ্বেগ ও নিশ্চিন্ত।

- আর আজ সেই সুখ ও বিশ্বাসের আসন টলে গেছে! সারভিনির একটি মাত্র বিদ্রূপাত্মক কথায় সে আতঙ্কগ্রস্ত। জীবন ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রত্যয়পূর্ণ প্রতীতি ধ্বসে পড়ছে। কানের কাছে বাজছে সারভিনির সেই হিংস্র কথা-গুলি: তুমি কি আমাকে আর সব চাটুকারদের মতো গর্দভ মনে করো নাকি? ...তোমার প্রতি আমার প্রেম অটুট, কিন্তু তাই বলে তোমাকে বিয়ে করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।...

কেন?

কোন অধিকারে সারভিনি তাকে এমন অপমান করে গেল?

নিশ্চয় এর পিছনে কোন গূঢ় লজ্জাকর ইতিহাস লুকিয়ে আছে, যা জোয়েত এখনো জানে না।

কি সেই লজ্জাকর ঘটনা? নিজের সর্বাঙ্গে যেন প্রচ্ছন্ন কলঙ্কের কালিমা দেখতে পাচ্ছে জোয়েত। অনুভব করে, সারভিনি তার সঙ্গে কত বড় বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে! সন্দেহ, ভয়, দুঃখ, জ্বালা এসে বিভ্রান্ত করে, জোয়েতের

দু'চোখ বেয়ে লোনা জল গড়াতে থাকে টপ টপ করে। কাঁদতে কাঁদতে এক সময় তার বুকখানা হাল্কা হয়ে গেল। আর কোন বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি তার রইলো না। নিজেকে সে কল্পনা করলো সেই সব উপন্যাসের নায়িকাদের সঙ্গে, জীবন যন্ত্রণায় যাদের অশ্রু মুক্তাবিন্দুর মতো ঝরে পড়ে, আবার যন্ত্রণা শেষে যারা নতুন সুখের সন্ধান পেয়ে যায়।

ইত্যাকার স্বপ্নে মশগুল হয়ে পড়লো জোয়েত। সে তখন পুরোপুরি রূপ-কথার জগতে। দারুণ এক সুখানুভূতি উদ্দীপ্ত করে তুলছে তাকে। সে কি কোন রাজপুত্রী ? নিশ্চয়। সম্ভবত ইতালীর সম্রাট ভিক্টর ইমানুয়েল একদা মুগ্ধ হয়েছিলেন তার মায়ের রূপে; রাজপ্রাসাদ থেকে দূরে অন্য এক জায়গায় সরিয়ে রেখেছিলেন তার মাকে। তারপর ভিক্টর ইমানুয়েলের ঔরসেই জন্ম নিলো একদিন, ফুলের মতো ফুটফুটে শিশু—জোয়েত!

অথবা, জোয়েত হলো বিখ্যাত এক দম্পতির অনাকাঙ্খিত শিশু,—মারসি-অনেস যাকে কুড়িয়ে এনে মাতৃস্নেহে লালন করেছে। আরো অনেক অলীক কল্পনা ঝর্ণার জলের মতো সিক্ত করছে জোয়েতের মনকে।

সুখকর বিষণ্ণতায় তৃপ্তি পাচ্ছে সে। এক মহান রহস্যপূর্ণ উপন্যাসের মহিয়সী নায়িকা হিসেবে ভাবছে সে নিজেকে। সে যেন স্ক্রাইব অথবা, জর্জ সান্দ-এর উপন্যাসের নায়িকা।...

চোখ বুজলো জোয়েত। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার তার সুখস্বপ্ন অন্তর্হিত, নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন সুন্দর কল্পনাকেই সে মনের পর্দায় টেনে আনতে পারলো না। রাতের বয়স অনেক। প্রায় বাসি হয়ে গেল রাতটা। হাড় কাঁপানো হিমেল বাতাস বইছে।

পরদিন সকাল থেকেই জোয়েত খুব গম্ভীর। দারুণ সতর্কতার সঙ্গে সে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করছে। গোয়েন্দাসুলভ তার সন্দেহবাতিক। আর কোন অবাস্তব কল্পনাকে প্রশ্রয় দেয় না সে। সে যেন কোন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তামাম দুনিয়ার বিরুদ্ধে যেন চলছে তার নীরব প্রস্তুতি। মনে মনে বিড় বিড় করছে সে, "আমি একা। আমার আপন বলতে কেউ নেই!"

সারভিনি ও সেভেল এলো সকাল দশটায়।

জোয়েত এতটুকু উৎফুল্ল হলো না। শুষ্ক কণ্ঠে শুধু জিজ্ঞেস করলো সারভিনিকে, "সুপ্রভাত। ভালো আছো?"

সারভিনি মনে মনে ভাবলো,—জোয়েত আবার এখন কি খেলা দেখাবে, কে জানে। মুখে বললো, "সুপ্রভাত। তুমি ভালো তো?"

মারসিঅনেস যথারীতি এগিয়ে গিয়ে সেভেলের হাত ধরেছে। সারভিনিও জোয়েতের একখানা হাত ধরে। তারা গোলাকার বাগানে পায়চারি করতে থাকে। সময় সময় ঝোপের আড়ালে যে কোন যুগলমূর্তি আড়াল হয়ে যায়।

সারভিনি বক বক করে চলেছে, জোয়েতের মুখে কিন্তু রা টি নেই। কিছুই যেন ঢুকছে না তার কানে। হঠাৎ সে একটা বিচিত্র প্রশ্ন করে বসে, "তুমি কি সত্যিই আমার বন্ধু, মাস্কেদ?"

"নিশ্চয়, মামজেল।"

"খাঁটি বন্ধু?"

"নির্খাদ, বান্ধবী—এ নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আমার সব কিছুই তোমাতে নিবেদিত।"

"তুমি আমাকে কখনো মিথ্যা বলবে না?"

"যদি তুমি চাও, কখনোই বলবো না।"

"অপ্রিয় হলেও সত্যি কথা বলবে?"

"নিশ্চয় বলবো।"

"বেশ। প্রিন্স ক্রাভালো সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? ঠিক ঠিক করে বলবে।"

"হা ঈশ্বর!"

"এ যে মিথ্যা বলার প্রস্তুতি!"

"না, মিথ্যা আমি বলবো না।…শোন, প্রিন্স একজন রুশ, সত্যি ও রাশিয়ার লোক। ও জন্মেছিল রাশিয়াতে, বাড়িতে কথা বলে রুশ ভাষায়, বোধহয় পাশপোর্ট নিয়ে ফ্রান্সে এসেছে। এ অব্দি সবই সত্যি। কিন্তু মিথ্যা ওর নাম এবং এই 'প্রিন্স' উপাধিটি।"

জোয়েতের দৃষ্টি ধারালো হ'য়ে ওঠে, সারভিনির মুখের দিকে সোজাসুজি তাকায়, "অর্থাৎ, তুমি বলতে চাও, ও একজন—"

ঈষৎ দ্বিধার সঙ্গে বললো সারভিনি, "একজন সাধারণ ভাগ্যান্বেষী বলতে পারো।"

"ধন্যবাদ। কাভেলিয়ার ভলরেলিও নিশ্চয় ঐ দলেই?"

"ঠিক তাই।"

"আর ম"সিয়ে দ্য বেলভিনো ?"

"ওর সম্পর্কে অবশ্য কিছুটা ভিন্ন কথা খাটে। ভদ্রলোক যদিও গোঁয়ার প্রকৃতির, এসেছেন কিন্তু সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে। তবে ঐ—আগুন দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাঁর পাখা পুড়ে ছাই।"

"আর তুমি নিজে ?"

নির্দ্বিধায় সারভিনি আত্মপরিচয় দিতে থাকে, "আমার কথা বলছো ? সোজা উপমায় বলা চলে, আমি একটি স্বাধীন দিলখুস্ কুকুর। বড় ঘরের অবিবাহিত যুবক, পয়সা অঢেল, অবসরও প্রচুর। ফূর্তি-টুর্তির ধান্ধায় তার বর্তমান মগজটি ব্যয়িত হচ্ছে, হরেক রকম অপকর্মে শরীরের তাগদও অনেক কমে গেছে। তবে এ সবের বিনিময়ে সংগৃহীত হচ্ছে অভিজ্ঞতা, যার সাহায্যে আমি অনেক মিথ্যা সংস্কারের হাত থেকে রেহাই পেয়েছি। অভিজ্ঞতার জোরেই আমি স্ত্রীলোকদের বিশেষ কতগুলি একঘেয়েমিকে সহ্য করতে শিখেছি, শিখেছি অনেক বাজে লোকদেরও সঙ্গে মেলামেশা করতে। এখনো আমার ভেতর সময় সময় সততা-বোধ প্রবল হয়ে ওঠে, তুমি হয়তো খেয়াল করে থাকবে। আর এখনো কোন মেয়েকে বিশেষভাবে ভালোবাসার সক্ষমতা আমার রয়েছে, হয়তো তুমি তার পরিচয় পেয়ে থাকবে। এই সমস্ত দোষ ও গুণের মানুষ আমি আজ তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল। ব্যস, আমার আর নিজের সম্পর্কে কিছু বলবার নেই।"

এত কথা শুনবার পরও জোয়েতের মুখে হাসি নেই। গম্ভীর ভাবে সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবছে সারভিনির সদ্য উচ্চারিত কথাগুলিকেই।

হঠাৎ জোয়েত জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা কাউণ্টেস্ লামিয়েকে তোমার কেমন লাগে ?"

"কোন মেয়ে সম্পর্কে আমার মতামত জানতে চেয়ো না।"

"কোন মেয়ে সম্পর্কেই নয় ?"

"না, কারুর সম্পর্কেই নয়।"

"অর্থাৎ, ওদের সম্পর্কে তোমার ধারণা খুবই খারাপ। কিন্তু কোথাও কি কোন ব্যতিক্রম তোমার চোখে পড়েনি ?"

সারভিনি বেপরোয়াভাবে জবাব দিলো, "হাঁ, ব্যতিক্রম আছে বৈকি—আমার বর্তমান সঙ্গিনীটি হচ্ছে একমাত্র ব্যতিক্রম !"

জোয়েতের গালে ঈষৎ লালিমা লাগে, কিন্তু তার পরবর্তী প্রশ্ন স্পষ্টতর. "তবে তোমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে, আমার সম্পর্কে তোমার কি ধারণা ?"

"বলতেই হবে ? বেশ, তবে শোন। তোমার সুন্দর রুচিবোধ আছে, কোন কোন সাধারণ ব্যাপারে তুমি যথেষ্ট তীক্ষ্ণধি, তোমার সাধারণ জ্ঞান প্রশ্নাতীত। কিন্তু তুমি অদ্ভুত ছলনাময়ী। অভিনয় পটু। অপরকে অপদস্থ করে আঘাত দিয়ে তুমি আনন্দ পাও। টোপ ফেলে ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করতে তুমি সক্ষম।"

"এই সব ?"

"হাঁ, এটাই তুমি।"

জোয়েত ধীরে ধীরে সারভিনির কবল থেকে নিজের হাতখানাকে মুক্ত করে। গম্ভীর গলায় বলে, "আমার সম্পর্কে তোমার সব ধারণাগুলিকেই বদলাতে হবে, মাস্কেদ।"

বলেই সে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যায় তার মার দিকে।

তার মা তখন সেভেল-সঙ্গে তন্ময়। মধুর স্বরে হৃদয়ের যত বাষ্প উজাড় ক'রে দিচ্ছে। রঙিন চশমার অন্তরালে তার রঙিন দৃষ্টি কত কি সম্ভাবনার চিত্র আঁকছে যেন। আর সেভেল ক্রমশই উত্তেজিত হতে হতে চাপ দিতে শুরু করেছে মারসিঅনেসের নরম দেহলতায়। এক সময় খুব জোরে জাপটে ধরে।

দূর থেকে দৃশ্যটা চোখে পড়তেই এই প্রথম যেন হোঁচট খেলো জোয়েত। তার মনে একটা সন্দেহ দপ. করে জ্বলে ওঠে। তার নিজের শরীরটাই অজ্ঞাত কোন বিরুদ্ধশক্তিতে মোচড় দিয়ে ওঠে। এমন এক ধরণের তপ্ত অনুভূতিতে সে শির শিরিয়ে ওঠে, যার কোন ব্যাখ্যা ভাষায় দেওয়া সম্ভব নয়। অনুভূতিটা যেন বায়ুতাড়িত এক খণ্ড মেঘ—ঝড়ের দাপটে এসেই সব অন্ধকার করে দিয়ে বিদায় নিলো।

খাবারের ঘণ্টা যখন বাজলো, প্রকৃতি তখন ঝড়ের প্রত্যাশায় থম থমে, গুমোট। বিশাল একখণ্ড কালো মেঘে ঢাকা চরাচর। কফির কাপে চুমুক দিয়ে মারসিঅনেস তার মেয়েকে বললো, "চমৎকার আবহাওয়া। তুমি তোমার বন্ধুকে নিয়ে বেড়াতে যেতে পারো।"

স্থির দৃষ্টি মেলে কঠিন গলায় জোয়েত বললো, "না, আজ আর আমি বাইরে যাবো না।"

হকচকিয়ে যায় মারসিঅনেস, "আজ বরং একটু ঘুরেই এসো। তোমার শরীরের পক্ষে প্রয়োজন।"

অস্থির গলায় জোয়েত বললো, "না, আমি ওর সঙ্গে কোথাও যেতে চাই না। কারণটা নিশ্চয় তোমার অজানা নয়।"

মারসিঅনেসের মনে পড়লো, জোয়েতকে সে-ই নিষেধ করেছিল, সারভিনির সঙ্গে একাকী কোথাও বেড়াতে যেতে অথচ আজ এই মুহূর্তে সে নিরালা-সুযোগের প্রত্যাশী—সেভেলকে নিয়ে গোটা দুপুরটা নির্জনে মাতামাতি করবে বলে। লজ্জা পেয়ে দ্বিধার সঙ্গে বললো, "ঠিকই মনে করেছো। আমার যে আজকাল কি হয়েছে! কিছুই মনে থাকে না।"

বহুদিন পর জোয়েত কাপড়ে সুঁই-সুতো দিয়ে ফুল তুলছে। তার নিজের ভাষায় এই কাজটি হলো 'জনকল্যাণকর' এবং সচরাচর সে এ কাজ পছন্দও করে না। আজ কিন্তু সে কাপড়ে ফুল তুলতেই নিবিষ্টচিত্ত।

ইতিমধ্যে সারভিনি ও সেভেল সেখানে উপস্থিত হয়েছে। দুটো চেয়ার দখল করে সিগ্রেট টানতে থাকে তারা। নিস্তরঙ্গ অলস সময় যেন আর কাটতে চায় না। মারসিঅনেস দেখলো, জোয়েত-গোটা সম্ভাবনাকেই আজ পণ্ড করে দেবে। সেভেলের দিকে তাকিয়ে সে চোরা ইঙ্গিত করে।

তারপর সারভিনিকে বলে, "ডিউক, তোমরা কিন্তু আজকের রাতটা এখানেই থেকে যাবে। কাল সবাই মিলে লাঞ্চ খেতে যাবো শাতুর ফোরনাইজ হোটেলে।"

চতুর সারভিনি মহিলার উদ্দেশ্য বিলক্ষণ টের পায়। মাথা হেঁট করে অভিবাদন করে এবং সহাস্যে বলে, "আপনার ইচ্ছের বাইরে যাবার ক্ষমতা আমাদের নেই।"

আবার সেই নিরেট নীরবতা। ঝড়ের গুমোট সম্ভাবনায় ধুঁকতে ধুঁকতে অকালে শেষ হয়ে গেল দিনটা। ক্রমে ডিনারের সময় এলো ঘনিয়ে। কালো মেঘ মাটি ছুঁই ছুঁই। বাতাসের ছিটে-ফোঁটাও নেই। ডিনার-টেবিলেও সকলে নিঃশব্দ। কি যেন এক অস্বস্তি আচ্ছন্ন করে রেখেছে এই চারটি প্রাণীকে। কেউ কোন কথা খুঁজে পাচ্ছে না। খাওয়া হয়ে যাবার পরও তারা অনেকক্ষণ বসে থাকে বারান্দায়। চারজনই নিজ নিজ বাসনার সিদ্ধি

লাভ করতে চায়, কিন্তু মুখ খুলতে কেউই যেন সাহস পাচ্ছে না। হঠাৎ ঘুটঘুট্টি অন্ধকারের বুক চিরে বজ্রপাত হলো কাছাকাছি কোথাও, প্রচণ্ড আলোর ঝলকানিতে ধাঁধিয়ে গেল এদের দৃষ্টি। ব্রিজের ওপর দিয়ে বিশালকায় কোন যন্ত্র পেরিয়ে যাবার মতো ঘর্ঘর শব্দ ভেসে আসছে আকাশ থেকে।

হঠাৎ জোয়েত উঠে দাঁড়িয়ে বললো. "আমি চললুম শুতে। ঝড়কে আমার বড় ভয়।"

সকলকে শুভরাত্রি জানিয়ে সে চলে গেলো।

এই ভিলার তোরণদ্বার-বারান্দার ঠিক ওপরেই জোয়েতের ঘর। ঘরের দরজার ঠিক বিপরীত দিকে প্রকাণ্ড বাদাম গাছটা, যার পাতা চুঁইয়ে চুঁইয়ে সবুজ আলো নামছে। সারভিনি নীচে বসে সেই আলোতে বারান্দায় দাঁড়ানো জোয়েতের ছায়া দেখতে পেলো। অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই দপ্ করে নিভে গেলো আলো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো মারসিঅনেস।

বললো, "মেয়ে আমার শুয়ে পড়লো।"

এবার উঠে দাঁড়ালো সারভিনি, "অনুমতি করুন, আমিও শুতে যাই।"

মারসিঅনেসের হাতে চুমু খেয়ে বিদায় নিলো সে।

এখন রহস্যময় অন্ধকারে শুধু এরা দু'জন—সেভেল ও মারসিঅনেস। দু'জনেই নিজেদের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনতে আনতে এক সময় একে অপরকে স্পর্শ করে, স্পর্শ রূপান্তরিত হয় আলিঙ্গনে। সেভেলের বলিষ্ঠ বাহু পীড়ন করতে থাকে মারসিঅনেসের নরম দেহকে, মারসিঅনেসও প্রবল আবেগে জাপটে ধরে সেভেলকে ; প্রেম ও কামনার জালে আবদ্ধ তারা একেবারে বুঁদ। নাড়ীর স্পন্দন দ্রুততর, শরীর যেন উত্তাপে ফেটে পড়ছে। সেভেলের বাধা সত্ত্বেও মারসিঅনেস তার কোমর নামিয়ে সেভেলের পায়ের কাছে বসে পড়ে, ফিস্‌ফিসিয়ে বলে, "বিদ্যুতের আলোয় আমি তোমার সম্পূর্ণ রূপ দেখবো।"

অন্যদিকে বাতি নিবিয়ে দিলেও জোয়েত কিন্তু শুয়ে পড়েনি। খালি পায়ে অস্থির ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে ব্যালকনিতে। মন্দা বাতাসে তার ক্লান্তি এতটুকুও দূর হচ্ছে না। মনে পাঁকিয়ে পাঁকিয়ে উঠছে সেই দৃশ্য ও সন্দেহটা—সেভেল ও তার মা নিশ্চয় গ্যাংঘাতিক কিছু একটা করবে আজকের রাতে! সেই

সন্দেহের তাড়নায় ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সে শুনবার চেষ্টা করলো, নীচ থেকে কোন কথা বা, শব্দ ভেসে আসছে কিনা!

অবস্থানগত অসুবিধের জন্য সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না; কিন্তু টুকরো-টাকরা কিছু কিছু আলাপ ভেসে আসছিল ওপরে। কিন্তু ঐ সব কথাগুলিকে সে ঠিক ধরতে পারছে না, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে। কানের দু'পাশে ঝাঁ ঝাঁ রব। সারভিনির ঘরের কপাট বন্ধ, আলো নেই; অর্থাৎ, সে ঘুমিয়ে পড়েছে। এবং এই সুযোগে নিরালায় তার মা ও সেভেল····!

রক্ত তার চন্‌মনিয়ে উঠলো। ঠিক সেই মুহূর্তে দ্বিতীয়বার বিদ্যুৎ-চমক এবং আচ্ছন্ন জোয়েত পরিষ্কার শুনতে পেলো তার মার গলা, "ওঃ! আমি তোমায় ভালোবাসি। আমাকে গ্রহণ করো।"

না, আর কোন সাড়া নেই। শব্দ, কথা, আলাপ, আবেদন হারিয়ে গেল। জোয়েতের সর্ব শরীর থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে, এক ভয়াল দুঃস্বপ্নের সম্ভাবনা তার কাছে অনিবার্য বোধ হয়। কী অদ্ভুত নীরবতায় ধুঁকছে তামাম ব্রহ্মাণ্ড! যেন গোটা পৃথিবীটাই একটা নিথর কবরখানায় পরিণত হয়েছে। জোয়েতের নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে, তার ফুসফুসে চেপে বসেছে বুঝি কে, শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে আসছে লাভাস্রোত।

আবার আকাশ চিরে বিদ্যুতের ঝলকানি। আবার আবার আবার····। আলোয় মুহুর্মুহু চতুর্দিক আলোকিত।

তখনই শোনা গেল সেই সমর্পিতস্বর, "ইস্! দাও-দাও····আমি তোমায় কত ভালোবাসি সোনা!"

এই স্বর জোয়েতের আবাল্য পরিচিত!

এই স্বর তার জন্মদায়িনী মা মারসিঅনেসের!

একটি-দুটি করে বড় বড় জলের ফোঁটা এসে পড়ছে গাছ-গাছালির মাথায়। দীর্ঘ বৃষ্টির পূর্বলক্ষণ। সোঁ সোঁ শব্দ শোনা যায়। বহুক্ষণ পর উদ্দাম হ'য়ে উঠলো দমকা বাতাস। ঝড়। ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি। চললো প্রকৃতির সৃষ্টিছাড়া নর্তন। জোয়েত ভিজছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সর্বাঙ্গ তার চুপ চুপ।

তার কানে এলো,—ওরা দু'জনে একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলো, দরজা বন্ধ করে দিলো।

কিযে হলো জোয়েতের! তার কঠিন প্রশ্নের কঠিনতর জবাব পাবার জন্য এক ছুটে নেমে এলো নীচে, বাগানে; ঐ বিশেষ ঘরটার জানালার কাছ বরাবর

একটা ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করলো সে। এই ঘরটি তার মার শোবার ঘর। গোটা বাড়িটায় একমাত্র এই ঘরেই আলো জলছে। সেই আলোয় জোয়েতের আয়ত বিস্ফারিত আরক্ত দৃষ্টির সামনে পরিষ্কার ফুটে উঠতে থাকে ভয়ঙ্কর সত্যিটা,—দুটি মূর্তি পাশাপাশি জড়াজড়ি করতে করতে ওলোট-পালোট খাচ্ছে, তারপর একের কঠিন নিষ্পেষণে অপরজন শিথিল, সমর্পিতা। ঘর্ষণরত মূর্তি দুটি এইক্ষণে এক হয়ে গেছে! ঠিক তখনই বিদ্যুৎ চমকালো। আরো ব্যাপকভাবে সেই ভয়াল নগ্নতা প্রত্যক্ষ করলো জোয়েত। তার সমস্ত শরীর মন ঘুলিয়ে ওঠে, প্রচণ্ড আতঙ্ক ও বিস্ময়ে অবচেতন ভাবেই সে তীক্ষ্ণ গলায় চীৎকার করে ওঠে: মা-গো!

ধ্বনি আঘাত হানে। চকিতে দেহ দুটি পৃথক হয়ে যায়। তাদের অনুসন্ধানী দৃষ্টি খুঁজে বেড়ায় ধ্বনির উৎসকে।

মার কাছে ধরা পড়ার ভয়ে জোয়েত ততক্ষণে ছুটে পালাচ্ছে। তীর বেগে ছুটে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে খিল তুলে দেয়। ভয়ে, বিস্ময়ে, অবসাদে ভেঙ্গে পড়ছে তার শরীর। হাঁটু মুড়ে বসে সে বার বার ঈশ্বরের কাছে শক্তি প্রার্থনা করে,—প্রভু! আমায় আলো দেখাও। এই বিপদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করো! ভেজা সপ্ সপে জামা-প্যাণ্ট পরে বহুক্ষণ জোয়েত ঐ এক ভাবে বসে রইলো। তারপর কখন যেন থেমে গেল বৃষ্টি। কখন যেন পূবাকাশ একটু একটু করে ফর্সা হতে শুরু করেছে। ভেজা কাপড় বদলে শূন্য মন নিয়ে বিছানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো জোয়েত। মনে মনে শপথ গ্রহণ করলো, মাকে ঐ নোংরামির হাত থেকে সে বাঁচাবেই!

সকাল হ'য়েছে বহুক্ষণ। রোদে ঝলমল করছে চারদিক। জোয়েত একটি ঝিকে বললো, "মাকে বলবে, আমার শরীর ভালো নেই। ভদ্রলোক দু'জন না যাওয়া অব্দি আমি শুয়েই থাকবো। কেউ যেন এখানে এসে আমাকে বিরক্ত না করে।"

জোয়েতের ডাঁই করে রাখা ভেজা জামা-কাপড়গুলিকে দেখে বিস্মিত ঝি জিজ্ঞেস করলো, "মাদমোয়াজেল, কাল রাতে কি বৃষ্টির সময় আপনি বাইরে বেরিয়েছিলেন?"

"হাঁ, মাথাটা ঠাণ্ডা করতে ভিজতে বেরিয়েছিলাম।"

ঝি বিরক্তমুখে ওগুলি গুছিয়ে তুলে নিয়ে বিদায় নেয়। পোশাকগুলি

যেন কোন জলমগ্ন মেয়ের—এখনো জল ঝরছে টপ্‌টপিয়ে।

জোয়েত জানে, খবর পেয়ে তার মা নির্ঘাৎ আসবে। সে তারই প্রতীক্ষারত।

মারসিঅনেস কাল রাতে সেই 'মা-গো!' চিৎকার শুনবার পর থেকেই বিশ্রী একটা অনুভূতিতে মরমে পুড়ছে। এখন দাসীর মুখে খবর পেয়ে ঝটিতি এসে হাজির হয় জোয়েতের ঘরে।

"কি হায়ছে?"

জোয়েত অস্ফুটস্বরে 'আমি—আমি…' বলেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

হতভম্ব মারসিঅনেস বার বার জিজ্ঞেস করে, "কি হয়েছে? কি বলছো তুমি?"

পরিকল্পনামাফিক কিছুই করে উঠতে পারলো না জোয়েত। দুঃখ ও আত্মগ্লানিতে দু'হাতে মুখ ঢেকে ঝর ঝর কাঁদতে থাকে।

প্রথমে কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি মারসিঅনেস। কিন্তু কিছুক্ষণ চিন্তা করবার পরই ব্যাপারটা সে ধরতে পারে। নিজেকে সামলে নিয়ে ক্রন্দসী মেয়ের মাথায় হাত রাখে, "তোমার কষ্টটা কোথায়, আমায় খুলে বলবে তো!"

তোতলাতে শুরু করে জোয়েত, "মাগো…উঃ…কাল রাতে জানালা দিয়ে…আ-মি-মি…তোমাদের…দেখে ফেলেছি।"

বিবর্ণ মারসিঅনেস কোন রকমে সামাল দেবার চেষ্টা করে, "তাতে কি হয়েছে?"

ভেঙ্গে পড়া জোয়েত আড়ষ্ট গলায় বলে, "না—মা…"

ক্রমশ বিরক্তিতে পূর্ণ হ'য়ে গেল মারসিঅনেসের মন। কাঁধ ঝাঁকিয়ে তিক্ত গলায় বললো, "তোমার মাথাটি একেবারে গোল্লায় গেছে। এ রকম ছিঁচ কাঁদুনি থামলে আমার সঙ্গে দেখা করো!"

জোয়েত কান্নাভরা মুখ তুলে বললো, "না, তুমি যেও না, তোমাকে সব শুনে যেতে হবে…আমাকে তোমার কথা দিতে হবে…চলো, আমরা এই সব ইতর শহরাঞ্চল ছেড়ে দূর কোন গ্রামাঞ্চলে চলে যাই। সেখানে আমরা দরিদ্র সরল কৃষকদের মধ্যে দিনগুলি কাটিয়ে দেবো। আমাদের এইসব লোভী লোকগুলি খুঁজে পাবে না।…যাবে তো মা? মাগো! কথা দাও…আমি তোমার দুটি পায়ে পড়ি! আমাকে ক্ষমা করো, আমি আর এই পরিবেশ সহ্য

করতে পারছি না।"

মেয়ের কাছ থেকে দূরে সরে যাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ মারসিঅনেস। বুকের ভেতরটা কে যেন দুমড়ে-মুচড়ে পঙ্গু ক'রে দিচ্ছে। সন্তানের কাছে মা-র এ বড় লজ্জা! অজানা ভয় ও বিরক্তি যুগপৎ মরীয়া করে তোলে তাকে। আবার আপত্য স্নেহের ফল্গুধারাও তাকে বিচলিত করে রাখে। সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে কাঁপছে তার। এই মুহূর্তে সে রাগবে না, সহানুভূতি দেখাবে --ভেবে উঠতে পারছে না। কোন রকমে শুধু উচ্চারণ করলো, "তোমার কথা আমি এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না।"

জোয়েত ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো, "গত রাতে তোমাদের আমি ঐ অবস্থায় দেখে ফেলেছি....আর কখনো ও রকম করো না....তুমি ওদের ছেড়ে দাও...আমাকে বুকে করে পালিয়ে যাও...আমরা দু'জনে বহুদূরে চলে যাবো, পরস্পরকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসবো...অতীতের এই সব গ্লানি মুছে যাবে।"

স্খলিত স্বরে মাদামবললো, "জোয়েত, লক্ষ্মীটি, এই দুনিয়ার রহস্য অপার। সব কিছু বুঝবার মতো সক্ষমতা এখনো তুমি অর্জন করোনি। আমাদের পরিস্থিতি বুঝলে, কখনো এ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে না।...তবে আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আর কখনো এ ব্যাপারে আমাকে উপদেশ দিতে এসো না।"

কিন্তু জোয়েত এখন ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়, সে তার মাকে পঙ্ক থেকে উদ্ধার করে ছাড়বে যেন। বললো, "না, আমাকে মুখ খুলতেই হবে। আমি আর সেই শিশুটি নই। আমার চারদিকে এ সব নোংরামি চলবে, আর আমি বুঝি নীরবে তাই সহ্য করবো? সব বাজে লোক, যত পয়সাওয়ালা লোকগুলি খদ্দের হয়ে তোমার কাছে আসে। এর জন্যই আমাদের কোন সামাজিক স্বীকৃতি নেই। সব আমি বুঝি। আর আমার মুখে পাথর চাপা দিতে পারবে না। আমি এ সব সহ্য করবো না। আমরা সব ছেড়ে-ছুঁড়ে চলে যাবো---অনেক দূরে সৎ মহিলাদের মতো জীবন যাপন করবো। খরচ চালাবার জন্য তুমি তোমার গয়নাগুলো একে একে বেচে দেবে। তারপর, প্রয়োজনে, আমরা চাকরি করবো। তখন যদি আমার বিয়ে হয়, কেউ আমাদের সামাজিকভাবে অসম্মান করবে না!"

মেয়ের উত্তেজক শব্দগুলি মারসিঅনেসের মগজে আগুন ধরিয়ে দেয়; তবু

অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রাখে, "তোমার মাথায় গণ্ডগোল হয়েছে। আগে কিছুটা সুস্থ হও, আমাদের সঙ্গে খাবার টেবিলে চলো, তারপর সব শুনবো।"

মেয়ে হাত-পা ছুঁড়ে প্রতিবাদ জানায়, "না, আমি যা বলছি, অনেক ভেবেই বলছি। আমার কথার নড়চড় হবে না। ঐ লোক দুটো এ বাড়ি ছেড়ে যদি না যায়, তবে আমাকেই চলে যেতে হবে।"

"কোন চুলোয় যাবে শুনি? খাবেটা কি?"

"জানি না। ও সবে আমার কিছু আসে যায় না। আমি সৎ সুন্দরভাবে জীবন কাটাতে চাই।"

'সৎ' কথাটা মারসিঅনেসের ক্ষোভ ও বিরক্তিকে দ্বিগুণ করে। আর নিজেকে সে সংযত রাখতে পারে না। রাস্তার নীচু স্তরের মেয়েদের মতো চেঁচিয়ে উঠলো, "চোপ্‌রাও! আর একটা কথা বলবি না। যে সব মাগীদের তুই 'সৎ' বলছিস, তাদের চেয়ে আমার সততা কিছু কম নয়। হাঁ,—আমি আমার দেহ ও রূপ নিয়ে ব্যবসা করি। এটা আমার জীবিকা এবং এর সার্থকতায় আমি গর্বিত। আমি তোদের ঐ তথাকথিত একডজন 'সৎ মেয়েমানুষের' সমান। বুঝলি?"

আক্রান্ত জোয়েত শুধু উচ্চারণ করে, "ছিঃ! মা!"

মারসিঅনেস কিন্তু থামে না, "হাঁ, আমার পরিচয়—আমি গণিকা। দেহের বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহ করি। আমাদের জীবনযাত্রায় যে স্বচ্ছলতা তুমি দেখে আসছো, তার মূলে আমার এই দেহ ও যৌবন। এতে লজ্জার কি আছে? আমি যদি এ পথে নেমে না আসতাম, তাহলে আমাদের পরিণতিটা কি দাঁড়াতো? পরিণতি হতো এই যে, অপরের বাড়িতে আমাকে ঝিগিরি করতে হতো। উদয়াস্ত খাটতে খাটতে শরীর-মন ভেঙ্গে চুড়মার হ'য়ে যেতো। এঁটো বাসন ধুতে হতো, গিন্নীর ফরমাইশ মতো ছুটতে হতো কসাইখানায় মাংস আনতে। একটু ক্লান্তি এলেই হরেক রকম গঞ্জনা শুনতে হতো; ভুল হলেই ঘাড় ধরে দিতো বিদায় করে। এ রকম একটা কুশ্রী সম্ভাবনা এড়িয়ে তুমি যে আনন্দের স্রোতে স্বাধীনভাবে গা ভাসিয়ে চলেছো, তা একমাত্র আমি 'সৎ' নই বলেই। ঝিগিরি ক'রে ক' পয়সা তুমি জমাতে পারতে? বড় জোর পঞ্চাশ ফ্রাঁ। ঐ সামান্য টাকা দিয়ে ধনী হবার স্বপ্ন দেখাও বাতুলতা। এমন কোন মূলধন তুমি সারা জীবনেও সংগ্রহ করতে পারবে না, যা দিয়ে কোন

ব্যবসা ফাঁদা যায়। অর্থাৎ, আমাদের সামনে আর কোন বৃত্তি খোলা নেই,—গণিকাবৃত্তিই একমাত্র উপায়।"

নিজের বুক ও কপাল চাপড়ে মারসিঅনেস আরো বলতে থাকে, "জানো, আমাদের মতো ভাগ্যহীনা মেয়েদের কপালে কোন উপায়েই সৌভাগ্যের দীপ জ্বলে না। যে জিনিস প্রকৃতি আমাদের দিয়েছে, সেটাকেই ভাঙিয়ে খেতে হবে। নচেৎ পচে মরতে হবে অকথ্য দারিদ্র্যে। এর মাঝামাঝি কোন পথ নেই জোয়েত।"

মারসিঅনেস আরো বললো, "আর তোমার 'সৎ' মহিলাদের তুমি খুব সতী মনে করো নাকি? তোমার অভিজ্ঞতা নেই, তাই এরকম বলছো। আমি নিজের অভিজ্ঞতায় জানি, ওরা সব অতি নীচ, কীটেরও অধম! পয়সা কড়ি আছে, সামাজিক স্বীকৃতি আছে, আছে অঢেল অবসর, তবু গোপনে ওরা কি করে জানো? শুধু মাত্র বৈচিত্র্যের সন্ধানে লুকিয়ে-চুরিয়ে পরকীয়া প্রেমের ফাঁদ পাতে। আমি কি ওদের চেয়েও ইতর?"

মারসিঅনেসের প্রতিটি জ্বালাধরা শব্দ দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারিত। বিধ্বস্ত জোয়েত বড় অসহায় বোধ করে। তার ইচ্ছা হলো, চীৎকার করে বলে: আমাকে সাহায্য করো! আবার মনে হলো, এখনই এখান থেকে ছুটে পালানো দরকার! কিন্তু কিছুই সে করে উঠতে না পেরে হাউ মাউ কান্নায় ভেঙে পড়ে।

মা মারসিঅনেস পাথরের মতো নিথর। মেয়ের দুঃখ, অসহায়ত্ব তাকে স্পর্শ করে। দু'হাতে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে সেও কেঁদে ফেলে ঝর ঝর করে, "সোনামণি, কাঁদেনা, লক্ষ্মীটি। যদি একবার বুঝতে, আমারও এই বুকের মধ্যে কত ব্যথা, কত অপমানের গ্লানি বছরের পর বছর জমাট বেঁধে আছে!"

অনেকক্ষণ ধরে মা ও মেয়ে একসঙ্গে অশ্রু বিসর্জন করলো। অবশ্য মারসি-অনেসের বেদনা ক্ষণস্থায়ী। দুঃখকে সে কখনো প্রশ্রয় দিতে চায় না। এক-সময় সে বললো, "জোয়েত, আর কেঁদো না। আমাদের ফেরার কোন পথ নেই। এই জীবনকেই সহজভাবে গ্রহণ করো।"

কিন্তু জোয়েতের দুঃখ ও বেদনা গভীর। সে এই যন্ত্রণার হাত থেকে আর মুক্তির পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

মা বললো, "চলো, এবার খাবার টেবিলে—কেউ কিছু বুঝতে

পারবে না।"

মেয়ে মাথা নেড়ে বললো, "না, মা। আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। আমাকে ওদের সামনে যেতে বলো না। আমি ওদের সহ্য করতে পারবো না। আবার যদি ওরা কেউ এখানে আসে, আমি আত্মহত্যা করবো!"

মারসিঅনেস অবিচলিত স্বরে বললো, "মাথা ঠাণ্ডা রেখে আমার কথাগুলি ভেবে দেখো।...ঠিক আছে, তুমি এখন বিশ্রাম নাও। সন্ধ্যায় আবার তোমার কাছে আসবো।"

মা চলে গেলে ঘরে খিল তুলে দিলো জোয়েত। নির্জন ঘরে একাকী বসে সে আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকে। বেলা এগারোটা নাগাদ বাড়ির ঝি এসে কপাটে ধাক্কা দেয়, "মাদ্‌মোয়াজেল, লাঞ্চ করবেন না? মাদাম জানতে চাইলেন, আপনার কিছু প্রয়োজন আছে কিনা?"

ঘরের ভেতর থেকে জোয়েত জবাব দেয়, "আমার ক্ষিদে নেই। আমি একটু একা থাকতে চাই।"

বিছানার ওপর ক্লান্ত জোয়েত তার শরীর বিছিয়ে দেয়।

বেলা তিনটে নাগাদ এলো তার মা। কপালে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে।

"এখন কি একটু ভালো বোধ করছো না? ডিম খাবে একটা?"

"না, দরকার নেই।"

"আজ আর উঠবে না?"

"এখনই উঠবো," জোয়েত বললো, "সারাটা দিন আমি কেবল ভেবেছি। কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত বদলাতে পারিনি। আমার কাছে অতীত মূল্যহীন, ভবিষ্যৎটাই সব এবং সেই ভবিষ্যৎ গড়তে হবে অন্যভাবে। আমি আমার পথ বেছে নিয়েছি। থাক, এখন আর এ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে ভালো লাগছে না।"

মারসিঅনেস দেখলো, মেয়ে তার বড় গোঁয়ার। সে ভীষণ চটে গেল মনে মনে। বোকা মেয়েটা এতদিন তবে কিছুই জানতো না? মনের ক্ষোভ চেপে রেখে মারসিঅনেস বললো, "তুমি কি এখন উঠবে?"

"হাঁ, চলো।"

মারসিঅনেস নিজের হাতে মেয়েকে সব পোশাকগুলি এগিয়ে দিলো। ওর

কপালে চুমু খেলো।

"ডিনারে বসবার আগে আমার সঙ্গে একটু পায়চারি করবে ?"

"করবো, মা।"

নদীর তীর বরাবর হেঁটে বেড়ালো তারা। অতি সামান্য ও তুচ্ছ সব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করলো।

॥ চার ॥

পরদিন জোয়েত, আর কারুর সঙ্গে নয়, একাকী বেরিয়ে পড়লো ভিলা ছেড়ে। হাঁটতে হাঁটতে সে চলে গেল সেই নির্জন জায়গাটায়, যেখানে বসে সারভিনি একদা তাকে পড়ে শুনিয়েছিল 'পিপীলিকার ইতিবৃত্ত।' বসে পড়লো জোয়েত। মনে মনে শপথ নিলো, "যা আমি ঠিক করেছি, তা থেকে এক পাও পিছু হটবো না!"

নীচে বহতা নদীর ছল-ছল-কল-কল কলতান। জোয়েত ভাবতে ভাবতে নানা রকম সিদ্ধান্ত নেয়—মুক্তি তার চাই-ই চাই!

সে সব ছেড়ে-ছুঁড়ে চলে যাবে দূর-দূরান্তরে। কিন্তু কোন ঠিকানায়? তার পেটই বা চলবে কি করে? কে দেবে তাকে কাজ? ঝিগিরি করতে সে পারবে না। আত্মসম্মানে লাগবে। বরং সে অনেক উপন্যাসের চরিত্র আয়া হতে পারে। কিন্তু যে তরুণীর বংশপরিচয় নেই, তাকে আয়া রাখতে রাজি হবে কে?

সন্ন্যাসিনী হওয়াও তার পক্ষে সম্ভব নয়। তার মনে ধর্মের প্রভাব অত জোরদার নয়। বর্তমানে যে কেউ তাকে বিয়ে করে উদ্ধার করবে, এমন সম্ভাবনাও নেই। মুক্তির একটা পথও দেখতে পাচ্ছে না জোয়েত।

অগত্যা সে ঠিক করলো—আত্মহত্যা করবে!

আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে এতটুকুও কেঁপে উঠলো না জোয়েত। ব্যাপারটা যেন নেহাৎই সহজ—এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় বেড়াতে যাবার মতো।

মৃত্যুই যে চূড়ান্ত সমাপ্তি, যার কোন শুরু নেই—সরল জোয়েত এতটুকুও ভেবে দেখলো না। তার মনে হলো, পথ সে পেয়ে গেছে। সুন্দর সহজ সমাধান।

কিন্তু আত্মহত্যার উপায়? উপায়গুলি দুঃখদায়ক ও ভয়ঙ্কর। হিংস্র হয়ে

ওঠা জোয়েতের স্বভাববিরুদ্ধ। ছোরা বা, পিস্তলের কথা সে ভাবতেই পারে না। ওদের দ্বারা সে বড় জোর নিজেকে আহত করতে পারবে, খুন হতে পারবে না। কারণ, তার সেই দক্ষতাই নেই। মাঝ থেকে এমন সুন্দর শরীরটা বিকৃত হয়ে যাবে।

গলায় ফাঁস দেবে? না, না, এ বড় কদর্য ভঙ্গী! জলে ডুবে মরবে? সম্ভবই নয়, সে যে সাঁতারে তুখোড়!

হাঁ, একমাত্র একটি উপায় রয়েছে—বিষ খাওয়া। কিন্তু কি ধরণের বিষ? অধিকাংশ বিষই শরীরে যন্ত্রণার সৃষ্টি করে, বমির উদ্রেক করে। এ সব বাপু তার চলবে না! ভাবতে ভাবতে মনে পড়লো ক্লোরোফরমের কথা। একবার খবরের কাগজে সে পড়েছিল: অত্যধিক ক্লোরোফরম সেবনে জনৈকা তরুণীর মৃত্যু! মনের মতো উপাদানটি পেয়ে আত্মতৃপ্ত জোয়েত। এই মুহূর্তে নিজেকে তার সম্মান করতে ইচ্ছে হচ্ছে। ওরা বুঝবে, জোয়েত কত উঁচু স্তরের মেয়ে ছিল!

বিষ খুঁজতে জোয়েত গেল বগিভাতে। দাঁতের ব্যথার নাম করে পরিচিত-অপরিচিত বহু ওষুধের দোকান থেকে সে বিন্দু বিন্দু ক্লোরোফরম্ যোগাড় করে। লাঞ্চের আগেই ফিরে এলো বাড়িতে। এক পেট খাবার খেয়ে পরিতৃপ্তির ভঙ্গী করলো। মেয়ের ভাবান্তরে মা বেজায় খুশি, বুক থেকে পাথরখানা নেমে গেল যেন। খাবার টেবিলেই মা মেয়েকে আগাম শুনিয়ে রাখলো একটি খোশখবর, "আগামী রবিবার এখানে একটি জমাটি ভোজের আসর বসবে। আসছে আমাদের সব বন্ধুরাই, প্রিন্স ক্রাভালো, মঁসিয়ে দ্য বেলভিনো, সারভিনি, সেভেল—সব।"

খবর শুনে ঈষৎ বিষণ্ণ হলেও জোয়েত কোন জবাব দেয় না···পরদিনই সে টিকিট কেটে সোজা হাজির হলো প্যারিসে। বিকেল অব্দি দোকানে দোকানে ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করলো ক্লোরোফরম্: অনেকগুলি ছোট ছোট শিশি ভর্তি হয়ে গেলো ঐ বস্তুতে। পরদিনও চললো সেই অভিযান। একটি দোকান থেকে তো পেয়ে গেলো পুরো দশ আউন্স।

শনিবার গুমোট গরম, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; একটা বেতের চেয়ারে বসে গোটা দিন কাটিয়ে দিলো জোয়েত। আত্মহত্যার প্রতিজ্ঞাটাকে ঝালিয়ে নিলো মনে মনে।

পরদিন রবিবার, জোয়েত চমৎকার সব পোশাকে সাজলো খুব;

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরখ করলো নিজের আগুন-রূপ—'এই দেহ ও মন আগামী কাল আর দেখা যাবে না!' কথাটা উচ্চারণ করতেই কী এক শিহরণ! 'আমি একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে যাবো।' 'কোন স্বর আমার কণ্ঠ থেকে মুক্তি পাবে না, আর বই নিয়ে ডুবে থাকবো না. আর কেউ আমাকে দেখতে পাবে না। পৃথিবীর এই সব সুন্দর দৃশ্যগুলি আর আমার দৃষ্টির সামনে হিল্লোলিত হবে না!' নিজেকে অবাক হয়ে দেখছে জোয়েত! ইস্, আমি কী সুন্দরী! আয়না সামনে না থাকলে নিজেকে চিনতেই পারতুম না! ....জোয়েত যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছে, দুগ্ধফেননিভ শয্যার ওপর পড়ে আছে তার প্রাণহীন নিথর দেহখানা! প্রাণশূন্য! মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে মাটির নীচে পচে গলে ঝিম্ কালো হয়ে যাবে এই দেবস্পৃষ্ট মুখাবয়ব, এমন আয়ত চক্ষু, এমন ছোট্ট কপাল, আর এই রাশি রাশি এলায়িত কুন্তল!

ভাবতে গিয়ে বিমর্ষ বোধ করলো জোয়েত। সে ভাবলো—তাঁর মৃত্যুতে পৃথিবীর তো কোন পরিবর্তন হবে না। এমন কি, এই ঘরটারও কোন রূপান্তর ঘটবে না। এই বিছানা, খাট, আয়না, চেয়ার—সব অটুট থাকবে। শুধু থাকবে না এক অনন্যা তরুণী, জোয়েত যার নাম। একমাত্র মা ছাড়া দুনিয়ার আর কেউ তেমন নাড়াও খাবে না তার মৃত্যুতে। লোকেরা হয়তো প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করবে, 'আহ! বেচারী জোয়েত! কী চমৎকার দেখতে ছিল মেয়েটা!'...জোয়েতের সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে ওঠে, কেমন এক থমথমে বিহ্বল করে রাখে।

ঠিক তখনই বাগানে অভ্যাগতদের সমাবেশে আসর জমে উঠেছে। গমগমে আওয়াজ। হাসিতে-খুশিতে উপচে পড়ছে মারসিঅনেস। মনে হচ্ছে, যেন একজন ছাত্র স্কুল ছুটির পর ছুটে এসেছে ঐ বাগানে। উদাত্ত কণ্ঠে গান গাইছে মঁসিয়ে দ্য বেলভিনো:

"বাতায়নে বসে ছিলেম প্রিয়
তোমার অপেক্ষায়।
তুমি এলে, তুমি এলে—
লগ্নশেষে প্রায়।"

জোয়েত একবার ওখান থেকে ঘুরেও এলো। ঘৃণায় সে রি রি করে ওঠে। একগাদা পুরুষ এসেছে পয়সার বিনিময়ে তার মার শরীরটা নিয়ে ছিনি-

মিনি খেলতে।

বুকে ঘৃণা, অথচ মুখে হাসি নিয়ে জোয়েত আবার গিয়ে হাজির হলো সেই আসরে, সকলের সঙ্গে ব্যক্তিত্বপূর্ণভাবে করমর্দন করতে থাকে।

সারভিনি জিজ্ঞেস করলো, "মেজাজ শরিফ তো?"

অদ্ভুত গাম্ভীর্যপূর্ণ গলায় জোয়েত জবাব দিলো, "খুশির উচ্ছলতায় আমি তো এখন যেন প্যারিসের দিনগুলিতে ফিরে গিয়েছি। তবে তোমার ব্যবহার একটু সংযত রেখো।"

মঁসিয়ে দ্য বেলভিনোর দিকে চেয়ে জোয়েত বললো, "মলভসি, আজ তোমাকেই আমার সবচেয়ে ভালো লাগছে। খাবারের পাট চুকে গেলে আমরা সবাই মিলে মার্লির মেলায় যাবো।"

মার্লিতে গিয়ে আরো হুল্লোড়। দু'জন নবাগত এসেছে আজকের আসরে—কাউণ্ট ভামিন ও মারকুইস্ দ্য বুকেতত।

খাবার টেবিলে বসে মনের দুশ্চিন্তা চেপে রাখবার জন্য দারুণ মদ্যপান করলো জোয়েত। বেশ কিছুটা ব্রাণ্ডিও ঢাললো গলায়। ঢুলু ঢুলু চোখে চকচকে দৃষ্টি। এ্যালকহলের প্রভাবে মন আবার তরতাজা। সকলকে ডেকে বললো, "চলো, আমরা বেরিয়ে পড়ি।"

বেলভিনোর হাত ধরে নাচতে নাচতে চলেছে জোয়েত। পেছনে যেন ছোটখাটো একটি মিছিল।

জোয়েত নেতৃত্ব দেবার ভঙ্গীতে বললো, "শোন, তোমরা আমার সৈন্যদল। সারভিনি, তোমাকে আমি সার্জেণ্টের পদ দিলাম—ডান দিক দিয়ে তুমি তোমার বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যাবে। একেবারে সামনে থাকবে অশ্বারোহী বাহিনীর দুই শ্রেষ্ঠ সেনানী—প্রিন্স আর কাভেলিয়ার; তাদের পিছনের সারিতেই স্থান পাবে আমাদের নবাগত দুই বিশিষ্ট বন্ধু। মার্চ! কুইক মার্চ!..."

জোয়েতের বাহিনী এগিয়ে চললো জোর কদমে।

সারভিনি মুখ দিয়ে শব্দ ক'রে বিউগিল বাজালো। নবাগত দু'জন এমন ভঙ্গী করছে যেন তারা সত্যি সত্যি ব্যাণ্ড বাজাচ্ছে। একমাত্র বিব্রত বোধ করছে বেলভিনো, "মাদ্‌মোয়াজেল, এতটা ছেলেমানুষি করা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। আপনাকে পরে ওরা সমালোচনা করবে।"

জবাব দিলো জোয়েত, "আমি কারুর সমালোচনার ধার ধারিনা, রাইসিনা। তবে তুমি থাকবে আমার সঙ্গে। আমার মতো মেয়েকে গভীর সান্নিধ্য দেওয়া তোমার কর্তব্য।"

এই বিচিত্র বাহিনী যখন বগিভাঁর মধ্যে দিয়ে চলেছে, রাস্তার দু'পাশে কুতুহলী জনতার ভিড় জমে যায়। এমন অলীক সৈন্যদল তারা আর কখনো দেখেনি। অনেক বাড়ির দরজা জানালা খুলে যায়। প্রত্যেকটা বাড়ির ছাদে ঝুল-বারান্দায় বিস্মিত নর-নারীর ভিড। অনেক নতুন ছেলে মেয়েরাও এসে যোগ দেয় সেই অভিযাত্রী দলে। এমন কি, একটা চলমান রেলগাড়ি থেকেও ছোকরা যাত্রীরা চীৎকার করে যেন এদের অভিনন্দন জানাতে থাকে।

জোয়েত চলেছে সামরিক নিষ্ঠায়। কিন্তু ওর মুখে কোন উল্লাসের চিহ্ন নেই, কেমন যেন বিষাদময় গাম্ভীর্যে পাণ্ডুর। সারভিনি মাঝে মাঝে নানা রকম আদেশ জারী করছে তার বাহিনীর ওপর। প্রিন্স ও কাভেলিয়ার কিন্তু চাপা গলায় সমালোচনা শুরু করে দিয়েছে জোয়েতের এই খেয়ালীপনার। আর নবাগত দু'জন সমানে বাজিয়ে চলেছে কাল্পনিক ড্রাম। মেলার কে একজন মোটামতো লোক আক্ষেপের সঙ্গে বললো, "জীবনটাকে এরাই উপ-ভোগ করতে শিখেছে।"

এরপর মেলায় গিয়ে নাগরদোলায় দারুণ পাক খেতে লাগলো জোয়েত। সে তার পাশের কাঠের ঘোড়াটিতে বসালো বেলভিনোকে। কিন্তু বেলভিনোর সেই শারীরিক সক্ষমতা নেই—বার পাঁচেক পাক খেয়েই জগৎ অন্ধকার দেখছে। প্রচুর পুতুল কিনলো জোয়েত। সকলের হাতে হাতে একটি করে পুতুল ধরিয়ে দিলো সে। এইসব উদ্ভট কাণ্ড-কারখানায় সকলেই প্রায় ক্লান্ত, বিরক্ত প্রিন্স ও কাভেলিয়ার।

একমাত্র সারভিনি আর নবাগত দু'জন সমানে পাল্লা দিয়ে চলেছে জোয়েতের সঙ্গে।

এলো মেলো ছুটতে ছুটতে দলটি একসময় নদীর কিনারে এসে দাঁড়ালো।

জলের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে জোয়েতের দৃষ্টিতে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ফুটে ওঠে। তার মাথায় তখন আর এক উদ্ভট খেয়াল। সকলকে ডেকে আনে নদীর তীরে। চীৎকার করে বলে, "কে আমাকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে? সে যেন এই মুহূর্তে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে!"

সকলে নিশ্চুপ। চারদিক থেকে পিল পিল করে লোক আসছে রগড় দেখতে। সাদা এ্যাপ্রন পরা দু'জন মহিলার মুখ থমথমে। দু'জন সেপাই বোকার মতো হেসে উঠলো ফিক্-ফিক্ করে।

জোয়েত আবার বললো, "তবে কি আমার জন্য নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো কেউ নেই তোমাদের মধ্যে?"

ঠিক তখনই 'ধ্যাৎ...' বলে সারভিনি নিপুণ তৎপরতায় ঝাঁপিয়ে পড়লো নদীতে, খানিকটা জল চল্‌কে এসে ভিজিয়ে দিলো জোয়েতের সুন্দর পদযুগল।

নদীর পাড়ে সারবদ্ধ জনতার মৃদু গুঞ্জন। এতেও রেহাই নেই। জোয়েত একখণ্ড কাঠ নদীতে ছুঁড়ে দিয়ে সারভিনির উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলে, "ঐ কাঠের টুকরোটা নিয়ে এসো দেখি।"

সারভিনি সাঁতরে টুকরোটা দাতে করে নিয়ে আসে, জোয়েতের পায়ের কাছে নামিয়ে দেয় হাঁটু গেড়ে।

জোয়েত সারভিনির ভেজা মাথায় সেই কাঠ ছুঁইয়ে বলে ওঠে, "কি চমৎকার আমার পোষা কুকুরটি!"

ভিড়ের মধ্যে কে যেন টিপ্পনি কাটে, "চমৎকার!"

জনৈকা স্থূলাঙ্গী নাশা কুঞ্চিত করে, "রামোঃ! এমন নোংরা অপমান সহ্য করা যায় না।"

কে একজন চড়া গলায় নিজের অভিমত জানালো, "একটা মেয়েমানুষের জন্য এতটা হেয় হবার চাইতে নরকে যাওয়া অনেক ভালো।"

জোয়েত বেলভিনোর হাত ধরে ঝাঁকুনি দেয়, "মূর্খ! তুমি যে কি সুযোগ হারালে, তা জানোনা।"

এবার ফেরার পালা।

পথের দু'পাশে যত লোক, সকলের ঘৃণা ও বিরক্তি জোয়েতের ওপর। কে যেন বললো, "একপাল হ্যাংলা হাবা-গোবাকে চরাতে এসেছিল মেয়েটা।" তারপর ফিরে তার বন্ধুকে বললো, "তোর চরিত্রটাও ঠিক ঐ রকম।"

ইতিমধ্যে গোটা দলই কেমন যেন শিথিল। অনেকেই দূরে দূরে বিচ্ছিন্ন। সারভিনির চলাফেরায় অপমানিতের গ্লানি, তার সর্বাঙ্গ বেয়ে জল গড়াচ্ছে।

জোয়েত বললো, "কি ব্যাপার! তোমরা সব যে একেবারে ঝিমিয়ে পড়লে। তোমরা তো একেই 'মজা' বলো, তাই নয়? আমি একাই তোমাদের

পয়সার দাম অনেকটা মিটিয়ে দিলুম।"

বলতে বলতে জোয়েত মুখ নীচু করে, তার পর ভেঙ্গে পড়ে। বেলভিনো সবিস্ময়ে লক্ষ্য করে, জোয়েতের চোখে জল।

"একি! তুমি কাঁদছো?"

"চুপ। আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবার অধিকার তোমার নেই।"

কিন্তু বেলভিনো নির্বোধের মতো পীড়াপীড়ি করতে থাকে, "নিশ্চয় কিছু হয়েছে! না হলে তোমার চোখে জল! ভাবাই যায় না!"

জোয়েত ধমকের সুরে বলে, "তুমি চুপ করবে কি না?"

বলেই আর নিজেকে রাখতে পারে না জোয়েত। পাহাড় ভাঙ্গা নদীর মতো দু'চোখ বেয়ে জল গড়াতে থাকে। যে তিক্ত বেদনাকে এতক্ষণ সে প্রচ্ছন্ন রেখেছিল, এই মুহূর্তে তা ফেটে পড়ে। কান্নার আবেগে ফুলে ফুলে উঠছে তার দেহ।

বেলভিনো তখনো বকে চলেছে, "কি যে হলো তোমার জোয়েত, কিছুই বুঝতে পারছি না।"

ছুটে এলো সারভিনি। জোয়েতের কাঁধে হাত রেখে মধুর স্বরে বললো, "ছিঃ! এরকম পথের মাঝে দাঁড়িয়ে কাঁদতে নেই। লোকে কি বলবে? চলো ঘরে ফিরে চলো। এ রকম আমোদ-ফূর্তি যদি ভালোই না লাগে, তবে তুমি যোগ দাও কেন?"

সারভিনি জোয়েতের হাত ধরে একরকম হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলে। ভিলাতে ঢুকেই জোয়েত তার হাত ছাড়িয়ে নেয়, ছুটে পালায় নিজের ঘরে।

ঘর থেকে যখন সে ফিরে এলো, তখন ডিনারের আসন পাতা হয়েছে। অদ্ভুত বিষণ্ণতায় সে বুঝি বিধ্বস্ত। চোখের দৃষ্টি জাগতিক নয়। এরা সকলে কিন্তু জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। সারভিনি কোত্থেকে একটা মজুরের কালি-ঝুলি মাখা পোষাক পরে দেহাতী ভাষায় গেঁয়ো রসিকতা করছে।

নীরবে খাওয়া শেষ করলো জোয়েত। কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়েই ফিরে গেলো নিজের ঘরে।

নীচ থেকে তাড়া করে আসছে ওদের সমবেত হুল্লোড়। সস্তা আলোচনা, স্থূল মন্তব্য অথবা, অশ্লীল খিস্তি।

সারভিনিটা আকণ্ঠ পান করে মাতলামি শুরু করে দিয়েছে। মারসি-অনেসকে ডাকছে 'মিসেস ওবারদি' বলে। আর সেভেল্লকে বলছে মিষ্টার ওবারদি।'

আর তখন মৃত্যু-আলিঙ্গনে প্রতিজ্ঞ জোয়েত প্যাডের একটি পৃষ্ঠ ছিঁড়ে লিখছে :

'বগিভঁা

রবিবার, রাত ন'টা।

গণিকা হবার পরিণতি এড়াতে আমি বেছে নিলুম আত্মহননের পথ।

জোযেত.

খামে লেখাটা পুরে খামের উপর লিখলো—'মাদাম লা মারসিঅনেস ওবারদি।'

তারপর চেয়ারটাকে টেনে আনলো জানালার কাছে। চেয়ারে শায়িত তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ শিথিল, হাত জোড়া টেবিলের ওপর, হাতের কাছে তুলোর ছিপি আঁটা ক্লোরোফরমের বড় শিশিটা। একটা মস্ত গোলাপ গাছ উঁকি মারছে এ ঘরের জানালা দিয়ে। বাতাস গোলাপ-গন্ধে ম ম। মিশকালো আকাশে এক চিলতে বাঁকা চাঁদ. পাতলা মেঘের লুকোচুরি চলেছে কখন থেকে।

জোয়েত মনে করবার চেষ্টা করলো, এই তার জীবনের অন্তিম মুহূর্তগুলি. ...এরপর সে নেহাৎ স্মৃতি হয়ে যাবে। গভীর বেদনাবোধ. বুক ফাটে। ভীষণ কান্না পাচ্ছে। আহ! এ সময় কেউ কি তাকে অকৃত্রিম ভালোবাসা উপহার দিতে পারে না? এই দুনিয়ায় কেউ কি তাকে দয়া করতে পারে না?

সারভিনির বকবকানি ভেসে আসছে। বস্তাপচা রসের গল্পে সব মশগুল। হো-হো খিল-খিল। মারসিঅনেস তো একেবারে আত্মহারা, সারভিনিকে তারিফ জানিয়ে বলছে. "তোমার মতো এমন সুন্দর করে কেউ বলতে পারবে না।"

শিশি থেকে খানিকটা তরল পদার্থ তুলোতে ঢাললো জোয়েত। তীব্র মিষ্টি ঝাঁঝালো গন্ধ এসে লাগে নাকে।

সেই তুলোটা জিভে ঠেকাতেই বিজাতীয় স্বাদ. জোয়েতের বুক ঠেলে কাশি এলো।

জোরে শ্বাস নিয়ে সেই গরল গিলে ফেললো জোয়েত। এবার মৃত্যু

আসবে, অত্যন্ত সন্তর্পণে ঘটবে তার আবির্ভাব—জোয়েত নিজেই টের পাবে না কখন সে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

দুঃখ নেই, বেদনা নেই—সব উবে যাচ্ছে। সুখকর অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে। সে এখন কল্পলোকের যাত্রিনী।

হঠাৎ সে সচেতন হয়ে উঠলো—আশ্চর্য! এখনো যে আমি মরিনি এবং তুলোটা শুকিয়ে গেছে। তার ইন্দ্রিয়গুলি আদৌ বিকল হয়নি, বরং সে আরো অনুভূতিপ্রবণ হয়ে উঠেছে। নীচ থেকে ভেসে আসা প্রতিটি শব্দ তার কাছে এখন স্পষ্টতর। ফ্রিল ক্রাভালোর নানা উপমায় ব্যাখ্যা করছে, একদা সে কিভাবে ডুয়েলে খতম করেছিল এক অস্ট্রিয়ান জেনারেলকে।

দূরে কোথায় ঢং ঢং করে পেটা ঘড়ি সময় জানায়। রাস্তার কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ডেকে ওঠে। ভেকবৃন্দের ঐক্যতান শ্রুত হয়। বাতাসে ঝরা পাতার খস্ খস্ রব।

আর এক টুকরো তুলো ভিজিয়ে সে নাকের সামনে ধরলো। আবার সেই মিষ্টি ঝাঁজালো গন্ধ। আবার মাথার ভেতরে ঝিম ঝিম। দু'বার এরকম ওষুধ্‌ঢালা তুলোতে ঘ্রাণ নিলো সে। এবার সত্যি সে তলিয়ে যাচ্ছে ঘুমের অতলান্তে। তার দেহ থেকে খসে খসে পড়ছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-হীন দেহে কেবল তার চৈতন্য জীবিত, যার দ্বারা অনুভূতি বুঝি অতি প্রবল।

অতীতের স্মৃতিগুলি ক্রমশই জীবন্ত। ছেলেবেলার ফেলে-আসা দিনগুলিকে দেখতে পাচ্ছে জোয়েত। বড় ভালো লাগছে।...

তখনো বারান্দায় ওদের আসর জমজমাট। জোয়েতের কাছে এমত বর্তমান এখন অর্থহীন। নীচ থেকে ভেসে আসা শব্দগুলি তার মর্মস্থলে প্রবেশের পথ খুঁজে পায় না।

মনে হচ্ছে, সে যেন একটা বিশাল নৌকায় চেপে ভাসমান। তরণী চলেছে এক ফুলের দেশের কিনার ঘেঁষে। তীরে কত লোকজন তাকে দেখে উল্লাস প্রকাশ করছে। হঠাৎ জোয়েতের মনে হলো, সে ঐ পুষ্পিত দেশের মধ্য দিয়ে একাকী আপন সুখে হেঁটে বেড়াচ্ছে। আচমকা কোত্থেকে এসে হাজির হলো সারভিনি—সে নাকি তাকে ষাঁড়ের লড়াই দেখাবে। সারভিনির পোশাক রাজপুত্রের মতো জমকালো! কোথা থেকে আবার ভিড় জমিয়েছে

গাদা গাদা লোক। বক-বক-বক-বক। হাঁ, এরা সকলেই তার পরিচিত।...

কিছুক্ষণ একেবারে চেতনাশূন্য অন্ধকার। তারপর আবার চৈতন্যের উন্মেষ। অর্থাৎ, এই উজ্জ্বল পৃথিবী ছেড়ে এখনো সে অচেনা দুনিয়ার উদ্দেশ্যে নৌকা ভাসায়নি। অদ্ভুত স্বস্তি ও সুখ! যদি এমন জবুথবু স্থবির দেহে চনমনে কল্পনা বহুকাল জীবিত থাকে, বড় ভালো হয়! বুকের এই কল্লোলধ্বনি চির-জীবি হোক। দম নিয়ে মাথাটা ঈষৎ ঘুরিয়ে আকাশের দিকে তাকালো জোয়েত। আধখানা চাঁদ আটকে আছে ঝাকড়া গাছের মাথায়। আর তো কোন জ্বালা-যন্ত্রণা, দুঃখবোধ তাকে পীড়িত করছে না। না, সে মরবে না! তিল তিল সংগৃহীত নীরবতায় সে বেঁচে থাকবে।

কেন সে বাঁচবে না? কেন সে ভালোবাসা পাবে না? সুখে বেঁচে থাকতে তার বাধাটা কোথায়?

জীবন, আহ্, জীবন বড় মূল্যবান, মধুর, রমণীয়! আরো খানিকটা তরল মিষ্টি গন্ধ গ্রহণ করলো জোয়েত। এই দ্রব্যটির গুণে স্বপ্ন তার দীর্ঘতর হবে, কিন্তু মৃত্যুর ভয় থাকবে না।

ক্রমশ চাঁদের গায়ে ফুটে উঠছে কোন এক সুন্দরীর মুখাবয়ব, যে আপনমুখে গান গাইছে।

ঐ সুন্দর মুখ তার আবাল্য পরিচিত,—ঐ মুখ তার মা মারসিঅনেসের।...

নীচে, আসরে, তখন মারসিঅনেস পিয়ানোয় বসে গান ধরেছে।...

জোয়েতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই, কিন্তু দুটো ডানা পেয়েছে সে। নীরব নিকষ রাতে বনাঞ্চলের ওপর দিয়ে দূর দূরান্তরে উড়ে যাচ্ছে সে। নিঃসীম মহাশূন্যে সুখ—সুখ। বাতাসের স্নেহ পরশে দেহ পুলকিত, ঘুমন্ত বুকের কাছে কোন দুঃস্বপ্ন নেই। সে মহানন্দে এত জোরে পাক খাচ্ছে যে, নীচের কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।...হঠাৎ দেখলো, সে যেন একটা পুকুরে ছিপ ফেলে বসে আছে। ছিপ্ তুলতেই দেখলো, বঁড়শিতে গাঁথা রয়েছে তার বড় প্রিয় আকাঙ্খার বস্তু একছড়া মুক্তোর মালা। কখন যেন তার পাশে ছিপ্ হাতে বসে পড়েছে সারভিনিও। সারভিনির বঁড়শিতে গেঁথে উঠলো একটা কাঠের ঘোড়া।...

স্বপ্নটা মিলিয়ে গেল।

আবার একটু একটু করে বর্তমানে ফিরে আসছে জোয়েত।

নীচে তার নাম ধরে হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি।

ম্যারসিঅনেস বলছে, "জোয়েত, বাতি নিভিয়ে দাও!"

সারভিনির সোচ্চার রসিকতা, "মামজেল জোয়েত, তোমার আলোটা নেভাও।"

সঙ্গে সঙ্গে সকলের মিলিত সরস ধ্বনি, "মামজেলজোয়েত, এবার তোমার আলোটা নেভাও।"

জোয়েত ঘরময় মাদক গন্ধ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিতে থাকে। তারপর এক বিশেষ লোভনীয় ভঙ্গীতে দেহটিকে গুটিয়ে নেয়। মৃত্যুর ইচ্ছা তার মৃত। এখন শুধু প্রতীক্ষা করছে ওদের।

মারসিঅনেস বলছে, "মেয়েটা আমার আচ্ছা বোকা। শিয়রে মোমবাতি জ্বালিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

চিন্তার কথা। বারান্দার দিকের জানালাটাও খোলা। ক্লিমেন্স, তুমি যাও তো উপরে—ও ঘরের জানালা বন্ধ করে বাতি নিভিয়ে চলে আসবে।"

ঝি ক্লিমেন্স ওপরে গিয়ে জোয়েতের ঘরের দরজায় ধাক্কা দেয়, "মাদ্‌-মোয়াজেল মাদমোয়াজেল..."

কোন সাড়া নেই।

ক্লিমেন্স আবার চড়া গলায় বললো, "মাদ্‌মোয়াজেল, মাদাম লা মারসিঅনেস আপনাকে বাতি নিভিয়ে জানালা বন্ধ করে শুতে বলেছেন।"

এবারও উত্তর নেই।

এবার সে চীৎকার করে ডাকলো, "মাদ্‌মোয়াজেল, মাদ্‌মোয়াজেল!"

এখনও সেই নিরেট নীরবতা।

ঝি নীচে নেমে গিয়ে বললো, "মাদ্‌মোয়াজেল দারুণভাবে ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিছুতেই জাগানো গেল না।"

মা মন্তব্য করলো, "এভাবে ঘুমানোটা ঠিক নয়।"

সারভিনির নেতৃত্বে সকলে মিলে জোয়েতের জানালা বরাবর দাঁড়িয়ে হল্লোড় তোলে, "হিপ্‌, হিপ্‌, হুররে, মামজেল জোয়েত!"

সেই সমবেত হৈ-হৈ রৈ-রৈ রব রাত্রির স্তব্ধতা চিরে খান্‌ খান্‌ করে।

তবু তো জোয়েতের সাড়া নেই।

মারসিঅনেসের মুখে দুশ্চিন্তার রেখা, "ওর কিছু হয়নি তো?"

অনেকগুলি গোলাপের কুঁড়ি যোগাড় করে সারভিনি একটার পর একটা ছুঁড়তে থাকে খোলা জানালা দিয়ে। প্রথমটা গায়ে পড়তেই দারুণ আতঙ্কে উঠেও নিজেকে সামলে নেয় জোয়েত। এরপর অনেকগুলি ফুল এসে পড়তে থাকে তার উপর। নিশ্চল জোয়েত নিশ্চুপই থাকে।

মারসিঅনেস আতঙ্কে উচ্চারণ করে, "জোয়েত, সাড়া দাও।"

গম্ভীর সারভিনিও, "ব্যাপার সুবিধের মনে হচ্ছে না। বারান্দার পাঁচিল বেয়ে আমাকে ঐ ঘরে নামতে হবে।"

সঙ্গে সঙ্গে বাধা দেয় কাভেলিয়ার, "না, তা হবে না। ব্যাপারটা তোমাদের সাজানো। আমাদের ফাঁকি দিয়ে তোমরা দু'জনে এভাবে মিলিত হবে! এ চক্রান্ত চলবে না!"

প্রতিধ্বনি দিয়ে ওঠে আরো অনেকে, "এ চক্রান্ত চলবে না! সব সাজানো ব্যাপার।"

বিব্রত মারসিঅনেস্ বললো, "কিন্তু একজনকে তো ঢুকে দেখতেই হবে ব্যাপারটা কি?"

প্রিন্স নাটুকে গলায় ক্ষোভের সঙ্গে বললো, "বুঝেছি বুঝেছি। আমি হলপ করে বলছি, মাদাম ডিউককেই দুর্লভ সুযোগটা দিতে চায়। আমাদের সঙ্গে তঞ্চকতা করা হলো।"

কাভেলিয়ার পকেট হাতড়ে একটা স্বর্ণমুদ্রা বের করে লটারির প্রস্তাব দেয়, "টস্ করে স্থির করতে হবে, কে সুযোগ পাবে, আর কারা পাবে না।"

প্রথমেই এগিয়ে এলো প্রিন্স ক্রাভালো। বললো, "টেল।"

কিন্তু মুদ্রা-উৎক্ষেপনের ফল জানা গেলো—'হেড'।

এলো সেভেল। তার বাজি 'হেড।' কিন্তু ফল এলো বিপরীত। একে একে সকলেরই ভাগ্য পরীক্ষিত হলো। কেউই উত্তীর্ণ হলো না। বাকি রয়েছে শুধু সারভিনি। কিন্তু সে নিজের হাতে মুদ্রা ছুঁড়েও প্রার্থিত ফল লাভে ব্যর্থ হলো।

হঠাৎ সারভিনি প্রিন্সকেই প্রস্তাব দিয়ে বসলো, "প্রিন্স, তুমিই যাও!"

এই আকস্মিক সুযোগ পেয়ে হতবুদ্ধি এদিক ওদিকে তাকাতে থাকে।

কাভেলিয়ার জিজ্ঞেস করলো, "কি খুঁজছো তুমি, প্রিন্স?"

"আমি, আমি......মানে যদি একটা ইয়ে—মানে যদি একটা মই পেতাম—"

প্রিন্সের ভীরুতা ও আমতা-আমতা জবাবে অন্য সকলের সম্মিলীত কলকাকলি।

বিপুলদেহী সেভেল এগিয়ে এসে প্রিন্সকে বললো, "ঠিক আছে, আমি আপনাকে সাহায্য করছি।" বলেই প্রিন্সকে মাটি থেকে সোজা উপরে তুলে ধরে বলে, "ধরুন এবার বারান্দার কার্নিশটা শক্ত করে।"

প্রিন্স দু'হাতে আঁকড়ে ধরে কার্নিশ, সেভেল তখনই তাকে ছেড়ে দেয়। সে এক বিচিত্র দৃশ্য!

হাতে ভর দিয়ে শূন্যে দোদুল্যমান প্রিন্স বাতাসে খাবি খাচ্ছে! মজাটা আরো জমলো, যখন সারভিনি প্রিন্সের ঝুলন্ত ঠ্যাং দুটো চেপে ধরে নিজেও দুলতে লাগলো! প্রিন্সের বিপদ বুঝে তেড়ে-ফুঁড়ে ছুটে আসছিল বেলভিনো; কিন্তু ঠিক তখনই আর সামলাতে না পেরে প্রিন্স একেবারে হুড়মুড়িয়ে পড়লো বেলভিনোর গোলগাল ভুঁড়িটির ওপর।

সারভিনির চকচকে ধারালো দৃষ্টি সকলের মুখের ওপর। তার তেজী জিজ্ঞাসা, "এবার কে যেতে চায়?"

সকলের মুখ চুপ। রাটি নেই।

বেলভিনোর দিকে চেয়ে সে বললো, 'মঁসিয়ে বেলভিনো, তুমি তোমার সাহস ও কসরৎ দেখিয়ে যাও।"

"আরে না, না! তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। পৈতৃক প্রাণের প্রতি আমার একটু-আধটু মমত্ব এখনো আছে।"

"কাভেলিয়ার তুমি একবার চেষ্টা করে দেখবে নাকি? প্রায়ই তো উঁচু-উঁচু দুর্গ পার হবার গল্প বলে থাকো।"

"বাছা ডিউক, দায়িত্বটা আমরা তোমাকেই দিচ্ছি।"

"উত্তম, চেষ্টা করে দেখি। অবশ্য আমি কখনো তোমাদের মতো নিজের দক্ষতা সম্পর্কে বড় বড় কথা বলি না।"

অতঃপর সারভিনির সামগ্রিক সপ্রতিভ আচরণে যথার্থ পৌরুষের ছায়াপাত। সে পিলারটার চারপাশে বারেকের জন্যে চক্কর কাটে, পরখ করে, তারপর একলাফে বারান্দার কার্নিশে। সেখান থেকে বরগা ধরে ধরে এগুতে থাকে সারভিনি।

নীচের দর্শকরা বাহবা না দিয়ে পারলো না। যেন সার্কাসের খেলা দেখাচ্ছে লোকটা!

সারভিনির গতি কিন্তু ক্রমশ শ্লথ, কেমন যেন উদ্বিগ্ন চরণে সে এগিয়ে গেলো সেই জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরে এবং পরক্ষণেই ছিটকে সরে এসে আর্তনাদ করে ওঠে, "তোমরা শীগ্‌গির এসো! শীগ্‌গির। জোয়েতের জ্ঞান নেই!..."

ডুকরে কেঁদে উঠে মারসিঅনেস ছুটতে থাকে সিঁড়ি বেয়ে। তামাসাপ্রিয় মতলববাজ লোকগুলিও উদ্বিগ্নচিত্তে ছুটে আসে উপরে।

ঘরে ঢুকে কপাট খুলে দিয়েছে সারভিনি।

আকুল মারসিঅনেস্‌ ঝাঁপিয়ে পড়ে মেয়ের বুকের ওপর, "তোর কি হয়েছে, আমাকে বল। মা, তুই মুখ খোল।"

ক্লোরোফরমের শিশিটি তুলে সারভিনি বললো, "স্বেচ্ছায় অজ্ঞান হবার ওষুধ ব্যবহার করেছে জোয়েত।"

তারপর নীচু হ'য়ে জোয়েতের বুকে সে কান পাতে, বলে, "এখনো শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে। এখুনি ওকে সুস্থ করে তোলা দরকার। একটু এ্যামোনিয়া পাওয়া যাবে এই বাড়িতে?"

ঝি ব্যাকুল গলায় জিজ্ঞেস করে, "কি চাইছেন স্যর, আমাকে বলুন।"

"সলভোলেতাইল জাতীয় কোন ওষুধ?"

"হাঁ আছে।"

"এক্ষুনি ছুটে নিয়ে এসো। আর এই ঘরের জানালা-দরজা সব খুলে দাও, বাতাস খেলুক।"

মারসিঅনেস্‌ ভেঙে পড়েছে কান্নায়: "জোয়েত—জোয়েত, সোনা, মা-মণি আমার, এ তুই কি করলি! ওহ্‌! ঈশ্বর! তুমি আমায় এ কী শাস্তি দিচ্ছো, ঠাকুর!..."

হতভম্ব হতচকিত আর সকলে কে কি করবে, ভেবে উঠতে পারছে না। কেউ টেনে আনছে বালতিতে করে জল, কেউ এনে রাখছে তোয়ালে, কেউ আবার গেলাস ও ভিনিগার নিয়ে দিশেহারা। তারই মধ্যে কার যেন সুযুক্তি শোনা গেল, "মেয়েটার গা থেকে জামা খুলে নেওয়া দরকার।"

কাঁপা হাতে মারসিঅনেস্‌ চেষ্টা করলো জোয়েতের জামার ফিতে খুলতে কিন্তু বিহ্বল হাতে এটা-ওটা টানাটানিতে গিঁট আরো কষে যায়। ভাঙা গলায় ডুকরে কেঁদে ওঠে মারসিঅনেস্‌, "আমি পারছি না—ওগো, আমার

আর শক্তি নেই।"

ঝি ওষুধ নিয়ে এলো।

ধীরে সুস্থে সেই ওষুধ রুমালে ঢেলে জোয়েতের নাকের কাছে চেপে ধরলো সারভিনি।

তৎক্ষণাৎ জোয়েতের শরীরটা নাড়া-চাড়া খেয়ে ওঠে। খুশিতে ঝলমল করে সারভিনির চোখ, "আচ্ছা। ভয়ের কোন কারণ নেই। জোয়েত স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন বলে!"

সারভিনির নির্দেশে ঝি জোয়েতের বসন খুলতে থাকে। স্বচ্ছ অন্তর্বাসটি ছাড়া জোয়েতের শরীরে আর কোন আবরণই থাকে না। প্রাণৈশ্বর্যের ও রূপৈশ্বর্যের রাণী যেন তার যৌবনের শেষ সুপ্ত স্থানটিও এই মুহূর্তে মেলে ধরবে। সারভিনি ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়ে দেয়। জোয়েতের স্বল্পাবৃত দেহের নিবিড় স্পর্শে সারভিনির শিরা উপশিরা চঞ্চল হয়ে ওঠে। মারসিঅনেসের দিকে তাকিয়ে বলে, "চিন্তার কোন কারণ নেই। জোয়েত সুস্থ হয়ে উঠছে।"

হঠাৎ তার খেয়াল হলো, জোয়েতের অর্ধাবৃত দৈহিক সুষমাকে অনেকেই যেন চক্ষু দিয়ে গিলে খাচ্ছে।

এই প্রথম রেগে উঠলো সারভিনি, ঈর্ষায় জ্বলে উঠলো সে, "এই যে মশাইরা, দয়া করে আপনারা আর অসুস্থের ঘরে ভিড় জমাবেন না। যান, আপনারা—যান আপনারা এখান থেকে। শুধু আমি, সেভেল আর মারসিঅনেস থাকবো এখানে।"

সারভিনির ধমকে পিছু হটে গেল তারা। জোয়েতকে ঘিরে রইলো শুধু তিনজন—মারসিঅনেস, সারভিনি ও সেভেল।

মারসিঅনেস সেভেলকে জড়িয়ে গালে গাল ঘঁষতে ঘঁষতে বলে, "ওকে বাঁচিয়ে তোলো প্রিয়, ও যে আমার প্রাণের অধিক!"

পিছনে ফিরে সারভিনি আবিষ্কার করলো জোয়েত-লিখিত চিঠি দুটি:

'গণিকা হবার পরিণতি এড়াতে আমি বেছে নিলুম আত্মহননের পথ'

'আমায় বিদায় দাও মাগো, আমায় ক্ষমা করো।'

'জোয়েত।'

চিঠি দু'টি পকেটে পুরে সারভিনি মনে মনে ভাবলো, 'ঠিক আছে, এ ব্যাপারে আমি পরে ভাববো।'

মারসিঅনেস তখনো হাঁপুস নয়নে কাঁদছে, "একজন ডাক্তার ডাকা দরকার।"

"না, তার দরকার নেই," দৃঢ়স্বরে সারভিনি বললে, "শুধু এক মিনিটের জন্য বাইরে যান। আপনার মেয়েকে আমি পরিপূর্ণ সুস্থ করে তুলছি।"

মারসিঅনেস ও সেভেল ঘর ছেড়ে চলে যায়।

সারভিনি জোয়েতের একখানা হাত তুলে নিয়ে মধুর স্বরে বলে, "মামজেল, চোখ মেলে আমার দিকে তাকাও, কথা বলো।'

সুমিষ্ট স্বপ্নের সৌরভ নিয়েই জোয়েত তার আশ্চর্য আয়ত চক্ষু দুটি মেলে ধরে।

সারভিনি বললো, "এবার উঠে বসো। কেন এমন বোকামি করতে যাচ্ছিলে?"

জোয়েত ক্ষীণস্বরে উচ্চারণ করে, "আমার বড় কষ্ট মাস্কেদ!"

সারভিনি ওকে আদর করতে থাকে, "ছিঃ! এরকম বোকামি করতে নেই। প্রতিজ্ঞা করো—আর কখনো এরকম বিপজ্জনক পরীক্ষা চালাবে না।"

জোয়েত নিঃশব্দে সম্মতি জানায়। সারভিনি ওর অন্তরসম্পদের স্পর্শ অনুভব করছে। জোয়েতের চিঠিটা বের করে জিজ্ঞেস করে, "দেখাবো নাকি এটা তোমার মাকে?"

জোয়েত মাথা নাড়িয়ে নিষেধ করলো।

সারভিনি ওকে বলতে থাকে, "প্রিয়া, পৃথিবীতে যখন এসেছি, আমাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। শত দুঃখেও ভেঙে পড়লে তো চলবে না। আমি বুঝতে পেরেছি কোথায় তোমার দুঃখ। আমি শপথ করে বলছি—"

সারভিনি কথা শেষ করবার আগেই জোয়েত বলে ওঠে, "তোমার দয়ার অন্ত নেই।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ। সারভিনি একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সেই অপরূপার দিকে। জোয়েতের চোখে মুখে এখন সমর্পণের নির্ভুল ইঙ্গিত। হঠাৎ দু'হাত বাড়িয়ে সারভিনিও বিপুল আগ্রহ ও আবেগে সাড়া দেয়। দীর্ঘ—দীর্ঘ চুম্বনে দুটি সত্তা একাকার।

অনেকক্ষণ কেটে গেল ঐ আচ্ছন্নভাবে। সারভিনি অনুভব করে, শরীর তার ক্রমশ উত্তেজিত হচ্ছে।

তবু নিজেকে সংযত রেখে সে উঠে দাঁড়ায়।

জোয়েতের মুখে পরিতৃপ্ত প্রেমের হাসি।

সারভিনি বললো, "তোমার মাকে ডেকে আনি।"

জোয়েত মদির স্বরে বললো, "আর একবার আমার একান্তে এসো। বড় ভালো লাগছে।"

তারপর জিজ্ঞেস করলো, "তুমি আমাকে সারাজীবন প্রেম জানাবে তো?"

সারভিনি হাঁটু মুড়ে বসে জোয়েতের হাতে চুমু খায়, শপথ নেয়, "তোমাকে আমি শ্রদ্ধাও করি জোয়েত।"

মারসিঅনেসকে ডেকে আনলো সারভিনি। মা ঝাঁপিয়ে পড়লো মেয়ের বুকে। দু'জনের চোখেই জল।

সারভিনি এখন এসে দাঁড়িয়েছে খোলা বারান্দায়। অমল বাতাসের আনাগোনা। বুক ভরে শ্বাস নেয় সে। তার দেহ-মন অনাস্বাদিত এক আনন্দে ভরপুর।

স্বপ্ন ?

[Was it a dream ?]

স্নায়বিক যন্ত্রণায়, গাঁটে গাঁটে উৎক্ষিপ্ত জ্বালায় আমার ঐ একটি অনুভূতিই স্পষ্ট হয়ে আছে, —আমি তার প্রেমে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম, তাকে আমি পাগলের মতো ভালোবাসতাম। আচ্ছা, মানুষের মনে ভালোবাসার উন্মেষ ঘটে কেন? কখন সেই ভালোবাসা বেওয়ারিশ অন্তরটাকে কুক্ষিগত করে ফেলে? কেন?

বিচিত্র এক শিহরণ সেই ক্ষণে, ভয়-ভাবনা কোথায় উবে যায়, প্রেমিকের দৃষ্টিতে তামাম দুনিয়ায় একটি মাত্র সত্তাই সত্যি, সমগ্র হৃদয় তোলপাড় করে একটি মাত্র বাসনা এবং বারংবার উচ্চারিত হয় একটি মাত্র নাম, পারিপার্শ্বিক অন্য সবের হদিশ মেলে না তখন।

আপনাদের কাছে স্বীকারোক্তি দিচ্ছি, আমাদের গল্প আপনাদের শোনাবো। কিছুই বাদ দেবো না, জরু গরু সমেত হুবহু। জানেন তো, প্রেম জীবনে একবারই আসে, কিন্তু তার প্রতিধ্বনি সারাজীবন ধরে বেজে চলে।

তাকে দেখলাম। তার রূপে সোহাগে আমি আলোকিত ও সতেজ হয়ে উঠলাম। তার উদ্ধত যৌবনে, বাচালতায়, সুকণ্ঠস্বরে আমি তন্ময় ও আচ্ছন্ন।

পৃথিবীর বয়স বাড়ে, দিনের পর রাত আসে, জীবনের শেষ হয় মরণে—কিন্তু আজো সেই কল্পতরু প্রেমের প্রভাবে আমি চৈতন্যহীন।

মৃত্যু, যা অনিবার্য, যার উন্মত্ততা কেউ রোধ করতে পারে না, একদিন তাকে এই দুনিয়া থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। কি ভাবে? আমি বলতে পারবো না। হন্যে হয়ে খুঁজলেও, এর জবাব পাবো না।

এক ভুলকালাম বৃষ্টির দিনে ভিজতে ভিজতে সে ঘরে ফিরলো। পরদিন থেকে সর্দি-কাশিতে দারুণ অসুস্থ, বিছানায় সেঁটে রইলো সপ্তাহখানেক। দুর্যোগের সান্নিধ্যে কি কি ঘটনা ঘটেছিল, মনে নেই। মনে আছে, ডাক্তারের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং তিনি ওষুধের নাম লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন। অবিশ্রান্ত তৎপরতায় নিশ্চয় সেই সব ওষুধ আনা হয়েছিল এবং একটি নার্স সুচারুহাতে তাকে তা খাইয়েও দিয়েছিল।

অসুস্থের দুই হাত অসম্ভব গরম, কপালের চামড়া পুড়ে যাচ্ছে বুঝি, দুই চোখ দারুণ রক্তাভ, কমনীয় চেহারা রোগ-যন্ত্রণায় ক্রমশই পাথুরে চেহারায় রূপান্তরিত। তখনো সে আমার প্রশ্নের অমায়িক জবাব দিচ্ছিলো, যদিও আমরা কি বলছিলাম, মনে নেই।

সব ভুলে গেছি। উদ্বিগ্ন কথাবার্তার একটি শব্দও আজ মনে নেই। শুধু এখনো কানে বাজছে তার অন্তিম ক্ষীণ নিঃশ্বাসের মৃদু শব্দ; নার্স বলে উঠেছিল অস্ফুটস্বরে, 'ইস্!' সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝলাম, সব শেষ হয়ে গেল, আসক্তিপূর্ণ এই জগৎ থেকে চির বিদায় নিলো সে।

এর বেশি কিছু আমার জানা নেই, আর কিছুই আমি বলতে পারবো না।

একজন যাজক আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনার প্রিয়া ?'

মুহূর্তে মনে হয়েছিল, একান্ত অনধিকার প্রশ্ন, মৃতের প্রতি এ একান্ত অপমানসূচক শব্দ, যা উচ্চারণ করবার অধিকার এই দুনিয়ায় কারুর নেই; আমার মগজে বিস্ফোরণ ঘটলো, আমি তাঁকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিলাম।

এরপর যে পাদ্রী এলেন, তিনি প্রাচীন ও অভিজ্ঞ, তিনি মৃতের গুণাবলী মধুর স্বরে বলতে লাগলেন; এবার আর আমি বাজখাই গলায় চীৎকার করে উঠলুম না, বরং আমার দু'চোখ বেয়ে লোনা জল ঝরতে থাকে।

গির্জার লোকেরা আমার সঙ্গে সমাধিস্থ করার ব্যাপারে কিছু আলোচনাও করেছিলেন, কিন্তু আমার স্মৃতি থেকে সেই সমস্ত শব্দ মুছে গেছে। কিছু একটা হুলুস্থুলু কাণ্ড তো বটেই! আমার দৃষ্টির সামনে আজো শুধু ভাসছে সেই বীভৎস শবাধারটি। কফিনের ওপর পেরেক ঠোকার শব্দ এখনো কানে এসে লাগছে।

ওহ্, ঈশ্বর!

বাড়বাড়ন্ত এই পৃথিবীর সাড়ে তিন হাত জমির তলায় সমাধিস্থ হলো সে। চারপাশে আরো কত কবর! কবরে কবরে ছয়লাপ। অন্ধকার বিবরে চিরশয়ানে শায়িতা সে। কিছুক্ষণ পর টিমটিমে মোমবাতিটাও নিভে যাবে। সব অন্ধকার।

ওর কয়েকজন বান্ধবী এসেছিল। তাদের আয়ত সজল দৃষ্টির মুখোমুখি হবার আগেই আমি কবরখানা থেকে পালিয়েছিলাম। তারপর হাঁটতে হাঁটতে বাড়িতে। পরেরদিন বেরিয়ে পড়লাম ঘর ছেড়ে উদ্দেশ্যহীন যাত্রাপথে।

গতকাল প্যারিতে ফিরে নিজের ঘরে পা দিতেই আবার সেই হারানো যন্ত্রণা আমাকে পেয়ে বসে। এই আমাদের সেই ঘর, আমাদের শয্যা, আমাদের আসবাবপত্র, অলস মুহূর্তগুলিতেও যাদের আমরা ব্যবহার করেছি—একটি প্রাণ নিঃশেষিত হয়ে যাবার পরও ওরা সব যথাযথ রয়েছে, ঠিক তেমনি একোণে ওকোণে নিখুঁত সাজানো, যেন কোন দক্ষ কারিগর এই কিছুক্ষণ আগে ওদের সাজিয়ে রেখে গেছে। দুঃসহ বেদনায় ইচ্ছে হলো, এখনই একটা জানালা দিয়ে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করি। চোখের সামনে যেন থৈ থৈ অন্ধকার এবং অতীতের স্মৃতিগুলি ক্রমশই দুঃসহ বোঝা হয়ে উঠছে, সাধ্য নেই দু'পায়ে স্থির হ'য়ে দাঁড়াবার। ঘরের এই চার-দেয়াল একদিন তাকে আশ্রয় দিয়েছিল; আজ সেই চার দেয়ালের আবেষ্টনীতে দাঁড়িয়ে রিক্তমুখ আমি তার নিঃশ্বাসের স্পর্শ পাচ্ছি—সে এখানে রয়েছে, এখানেই!

সহ্য করতে না পেরে টুপি হাতে নিয়ে পালিয়ে এলাম ঐ ঘর থেকে। কিন্তু হলঘরে ঢুকতেই আমার বিভ্রান্ত দৃষ্টি ঈষৎ কৌতূহলী হয়ে ওঠে —সামনেই একটি বিশাল আয়না। প্রসাধনের উদ্দেশ্যে সে-ই এই আয়নাটা এখানে এনে রেখেছিল, প্রতিদিন বাড়ি থেকে বের হবার আগে আমি এই আয়নায় নিজেকে আপাদমস্তক দেখে নিতাম। সেই বিশ্বস্ত বস্তুটি আজো অটুট।

থমকে দাঁড়ালাম ওর সামনে। এটিও বহন করে চলেছে টুকরো টুকরো অজস্র স্মৃতি।

কতবার কতভাবে এই মুকুরে সে প্রতিবিম্বিত হয়েছে, চিন্তা করতে গিয়ে কেঁপে উঠলাম এবং পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইলাম। ঐ কাঁচটাকেই আমার তাই ভালোবাসতে ইচ্ছা করছে, হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করলাম, চকচকে কাঁচের চারপাশে পোড়ামাটি রং কাঠামোটিকে আঙুল দিয়ে ছুঁতে থাকি। হিম বরফ! ওহ! স্মৃতি! চোয়াল ঝুলে পড়ছে আমার।

বড় কষ্টদায়ক এই আয়না, বুঝি এক অগ্নিদগ্ধ দর্পণ, ভয়ানক চক্রান্তকারী, দারুণ জেদ—কোন মানুষকে এতো কষ্ট দিতে পারে! বেইমান!

যে মানুষ চটপট সব ভুলে যেতে পারে, সে-ই তো সুখী। স্নেহ, প্রেম, মমতা ইত্যাকার যাবতীয় স্মৃতিকে যে মুক্তি দিতে পারে, তার সুখ অনাবিল। হায়, কেন যে দুঃখ আমায় তাড়িয়ে বেড়ায়।

অভীষ্ট না থাকলেও কখন যেন প্রবল আচ্ছন্নতায় আক্রান্ত হয়ে উপস্থিত হলাম গোরস্থানে। স্বভাবতই পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় তার সাদামাটা সমাধি স্থানটি খুঁজে নিলাম; সাদা মার্বেল পাথরের ক্রুশচিহ্নে লেখা রয়েছে:

"সে ভালোবেসেছিলো এবং ভালোবাসা নিয়েই মৃত্যুবরণ করেছে।"

সে ঐ গন্ধমাদন মাটির স্তূপের নীচে লীন হয়ে গেছে। কী ভয়ানক! সমাধিতে কপাল ঠেকিয়ে আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। চারদিক থেকে নির্জনতা তথা শূন্যতা যেন তেড়েফুঁড়ে আসছে, অনেক-অনেকক্ষণ রয়ে গেলাম ঐ অবস্থায়। অন্ধকার ঘনিয়ে এলো এবং সেই নির্জন অন্ধকার একটা বিচিত্র বাসনাকে আমার দিকে আকৃষ্ট করতে থাকে—আমি আজ সারা রাত ধরে প্রিয়ার সমাধিতে চোখের জল ফেলবো। কিন্তু কাজটা সহজ নয়, ধরা পড়ে যেতে পারি এবং আমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে অপমান করে সমাধিক্ষেত্র থেকে বের করে দেবে। কি ভাবে সম্ভব!

হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল।

আমি নির্জন গোরস্থানে, সেই নিস্তব্ধ মৃতের রাজ্যে হাঁটতে শুরু করে দিলাম। পায়ের তলায় কখনো ভেজা নরম ঘাস, কখনো শুকনো শিকড়, কখনো বা নিরেট পাথর—আমি হাঁটছি তো হাঁটছিই, সর্বশক্তি ব্যয় করে চলছে বুঝি আমার এই পদচারণা!

যে তাতানো জীবন্ত নগরীতে আমাদের বাস, তার তুলনায় এই সমাধিস্থ জগতের পরিধি কত ক্ষুদ্র; কিন্তু আশ্চর্যের এই, জীবিতের তুলনায় মৃতের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি। চারপুরুষ ধরে বসবাসের জন্য আমরা গড়েছি আকাশস্পর্শী অট্টালিকা, অতি সাবধানে সাজিয়েছি রকমারি প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, তৈরী করেছি চওড়া রাস্তা এবং প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা সুষ্ঠু রাখবার জন্য চারপাশে ছড়িয়ে রেখেছি প্রচুর ফাঁকা জায়গা। পানীয় জলের জন্য ঝরণার জল তির তিরিয়ে ওঠে, দ্রাক্ষাকুঞ্জ

রয়েছে সুরা প্রস্তুতের জন্য, আর চাষবাসের জন্য সমতল উর্বর ভূমি। অথচ, এখানে আমাদেরই গতায়ু পূর্বপুরুষরা সামান্য উপকরণ নিয়ে পরম শান্তিতে শায়িত, কোন চাহিদা নেই, প্রতিবাদ নেই, নেই কোন বিপজ্জনক মুহূর্তসৃষ্টির প্রয়াস। মা ধরণী তার সন্তানদের কোলে ফিরিয়ে নেন, কালের বিবর্তন তাদের স্মৃতিকেও মুছে দেয়। ওহ্‌ ঈশ্বর!

ইতস্তত পদচারণায় বৃত্ত রচনা করে একসময় আমি গোরস্থানের প্রান্তিক রেখায় এসে দাঁড়ালাম। যদিও চরাচর ঝাপসা, আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, এ দিকটার বয়স অনেক প্রাচীন, বহুযুগ আগেই এখানকার মৃতদেহগুলি মাটির সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে গেছে, কালের প্রত্যাখ্যানে কবরের পাথর টুকরো টুকরো, ক্রুশ চিহ্নগুলি ভেঙ্গে চুরমার, হয়তো আর কিছু-কালের মধ্যেই নতুন মৃতেরা স্থানাভাবে এখানেই নতুন করে সমাধিস্থ হবে। মানবদেহের ওপর গজিয়ে উঠেছে এক বিষণ্ণ ও মনোরম উদ্যান—অযত্নে বিকশিত গোলাপ, বেপরোয়া বেড়ে ওঠা সমর্থ বিশাল সাইপ্রেস গাছ......।

এক ধরণের অস্ফুট শব্দ উঠছে এই শবাকীর্ণ এলাকায়, যে শব্দ নিরেট নৈঃশব্দেরই ফলশ্রুতি। আমি একা, একদম একা। একটি সবুজ ঝাঁকড়া গাছের নিচে যথাসম্ভব আত্মগোপন করে থাকি, ডুবন্ত জাহাজের আরোহী যেমন একটু টুকরো কাঠকে অবলম্বন করেই ভেসে থাকবার চেষ্টা করে, আমিও তেমনি গাছের একটা ডালকে অবলম্বন করে অনেকটা যেন জিজ্ঞাসু চোখে সামনের দিকে চেয়ে আছি। বিব্রত দিন শেষ হয় এবং সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নামে, ক্রমে অন্ধকার ঘণ হয় এবং রাত তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মেজাজ ফিরে পায়। তখন আমি আড়াল থেকে বেরিয়ে এলাম, নাটকীয় সন্তর্পণে কবরখানার ওপর ইতস্তত হাঁটতে থাকি।

অনেকক্ষণ পরিবেশজনিত প্রতিকূলতা গ্রাহ্য না করে আমি আমার বাঞ্ছিত কবরটি খুঁজতে থাকি। কিন্তু পেলাম না। একাধিক স্মৃতিসৌধে আমার মাথা, হাত, বুক, জানু ঠোক্কর খেতে থাকে; কিন্তু কোথায় সেটি? কোন অজুহাত দেখাবো আমার এই ভ্রান্তির? অন্ধের মতো পথ হাতড়াচ্ছি, ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছি পাথরের ফলক, ক্রুশ, লোহার রেলিং, ধাতুর তৈরি কৃত্রিম মালা এবং ফুলের অকৃত্রিম স্তবক। ব্যস্ততায় বুকের ভেতরটা মোচড়

দিয়ে দিয়ে উঠছে। ফলকে ক্ষোদিত অক্ষরগুলোর ওপর আঙুল বুলিয়ে মৃতের নাম ধাম পরিচয় জানবার চেষ্টা করছি। গিজ গিজ করছে কবরের পর কবর। এই থৈ থৈ অন্ধকার রাতে আমি আর তাকে খুঁজে পাবো না।

চাঁদহীন ভয়াল অন্ধকার রাত, এক ঝলক দমকা বাতাসও বয় না, সারিবদ্ধ কবরের মধ্য দিয়ে আগুয়ান আমি যেন কোন গলিপথ অতিক্রম করছি। আতঙ্কে শিহরণ জাগে, চারিদিকে খালি কবর আর কবর, একটির সঙ্গে অপরটি ঠেশ দিয়ে শুয়ে আছে। ডান হাতে, বা হাতে, সামনে, পিছনে কেবল মৃতের ভূমিশয্যা, বাতাসে একই ধরণের বিজাতীয় সুবাস, যা আমাকে ক্রমশই দুর্বল কাতর করে তুলছে, এখনকার প্রতিটি পদক্ষেপ শক্তির দ্রুত অপচয়, পা কাঁপছে থর থরিয়ে, স্নায়ুর ওপর চাপ পড়ছে প্রচণ্ড, ফলতঃ অন্যমনস্কও হতে পারি না। দু'পায়ের ওপর আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে একটা পাথুরে সমাধির ওপর বসে পড়লাম, ভয়ার্ত চোখে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকি সামনের দিকে, নিজের হৃদস্পন্দন শুনতে পাচ্ছি।

হঠাৎ মনে হলো, কি সব ধ্বনির ঔজ্জ্বল্য এসে আঘাত করছে আমার কর্ণকুহরে। এ কিসের শব্দ? শব্দ ক্রমশ চীৎকারে রূপান্তরিত। এমন আওয়াজ, যার কোন জাগতিক ব্যাখ্যা চলে না, নামহীন এলোমেলো হট্টগোল। তীক্ষ্ণ অথবা, সকুণ্ঠ বুদ্ধি দিয়ে এই মুহূর্তে এর উৎস খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। উৎস হয় নিছক আমার মস্তিষ্ক, নচেৎ অজাগতিকভাবে ঐ সব কবরের অন্তঃস্থল। চারপাশে আমার দৃষ্টি ঘূর্ণায়মান, ক্রমশ আমি অবশ হিম, বিষণ্ণ চিত্তে যেন মৃত্যুর প্রতীক্ষায়, অবসন্ন স্বরে চীৎকার করে উঠতে চাইলুম, পারলুম না। আমার হাত-পা ইত্যাকার জাগতিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি আর কোন প্রেরণা সঞ্চার করতে পারছে না।

আমি যে পাথরখণ্ডের ওপর বসেছিলাম, অকস্মাৎ মনে হলো ওটা যেন জীবন্ত হয়ে উঠছে, নড়ে চড়ে উঠলো সেটা। হাঁ, নিশ্চয় নড়ছে, এতক্ষণের নিরাসক্ত বস্তুপিণ্ডে নির্ঘাৎ প্রাণসঞ্চার ঘটছে। আস্তে আস্তে ঠেলে উঠছে তার মাথা। এক ধাক্কায় আমি পাশের একটা কবরে ছিটকে এসে পড়লাম।

বিস্ময় ও আতঙ্কের প্রান্তে পৌঁছে গিয়ে দেখলাম, ঐ পাথরটাকে সরিয়ে

কবর ঠেলে ধীরে ধীরে আবির্ভূত হচ্ছে এক উলঙ্গ কঙ্কাল। কঙ্কাল তার পিঠ দিয়ে পাথরের খণ্ডটাকে ঠেলে দিলো আমার দিকে। সেই জমাট অন্ধকার রাতেও আমি পাথরটার গায়ে উৎকীর্ণ লিপিগুলিকে পরিষ্কার দেখতে পেলাম :

"জাক আলভাঁ এখানে শুয়ে আছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল একান্ন। পরিবারের সকলের প্রতি তিনি সমান যত্নে তদারকি করতেন। তিনি মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের চরণে স্থানলাভ করেছেন।"

কঙ্কালটিও লেখাগুলি পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে যেন তার ভাবান্তর ঘটে। পথ থেকে এক টুকরো ধারালো পাথর তুলে নিয়ে হিংস্র ক্ষিপ্রতায় ঐ প্রতিটি অক্ষর সে খুঁটে খুঁটে তুলে ফেলতে থাকে। তারপর পাথর জোড়াতালি দিয়ে কমবয়সী ছেলেরা যেমন আঁক কাটে, কঙ্কালটিও তেমনি পাথরখণ্ডে নতুন কতকগুলি শব্দ সাজিয়ে ফেলে, যেগুলি আমি অনায়াসে পড়ে ফেললাম :

"এখানে, এই কবরের তলায় আলভাঁ নামক একজন লোক, যে একান্ন বছর বয়সে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে শেষ ঘুমে ঘুমিয়ে রয়েছে। তার লোভ ছিল নিদারুণ, সম্পত্তির লোভেই সে তার বাবার অকালমৃত্যু ঘটিয়েছিল। স্ত্রীর প্রতি তার বেআব্রু অত্যাচারের সীমা ছিল না, নিজের ছেলে মেয়ের প্রতি তার ব্যবহার একটানা জঘন্য পীড়নের ইতিকথা। প্রতিবেশীদের প্রতি রূঢ় আচরণ ও তঞ্চকতা ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ; লোভনীয় কোন বস্তু আঁচ করতে পারলেই সে প্রায় দস্যু হয়ে উঠতো। পরিণামে ঘটেছিল তার অভ্রান্ত করুণ মৃত্যু।"

নিজের বৃত্তান্ত নিজেই রচনা করে প্রেতান্বিত চরিত্রটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। চারদিকে তাকাতে আমি আরো প্রাণান্তকর দৃশ্য দেখতে পেলাম! ছড়ানো-ছিটানো খাপছাড়া এলোমেলো কবরগুলি ঠেলে ঠেলে আবির্ভূত হচ্ছে এক একটি বিচলিত কঙ্কাল। ওরা প্রত্যেকেই আত্মীয় পরিজনের মিথ্যাস্তুতি মুছে ফেলে নিজের নিজের আসল চরিত্র ও কীর্তি লিখে ফেলতে ব্যস্ত। মিথ্যার স্তর লোপাট করে অসহনীয় বাস্তব সত্য ফুটে উঠেছে।

এবং আমি প্রতিটি লেখাই পাঠ করছি। দেখছি, এরা সকলেই ঠগ, প্রতিবেশীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে ; তারা ঈর্ষাপরায়ণ, বিদ্বেষপরায়ণ, লোভী, সততার ধার ধারে না, মিথ্যার বেসাতিতে মশগুল, আনুষঙ্গিক চারিত্রিকস্খলন তাদের পুরামাত্রায়। সুযোগ পেলেই ওরা চুরি

করেছে, অপরের ঘাড়ে কাঁঠাল ভেঙেছে, বশংবদ থাকবার ভান করে উপকারীর সর্বনাশ করেছে। কবরের লিপিতে যারা কর্তব্যপরায়ণ পিতা, সাধ্বী পত্নী, অনুগত পুত্র, নিষ্পাপ কন্যা, সৎ ব্যবসায়ী,—তারা সকলেই পার্থিব জগতে ছিল ধুরন্ধর প্রবঞ্চক।...

ঠিক তখনই আমার মনে হলো, আমার প্রিয়াও নিশ্চয় এই সময় কবর থেকে উঠে এসে জবানবন্দী লিখছে! ছুটে চললাম তার কবর লক্ষ্য করে এবং তক্ষুনি দেখতে পেলাম তাকে—চাদরে মুখ ঢেকে মার্বেলের গায়ে আঁক কাটছে।

যে ফলকে এর আগে লেখা ছিল, "সে ভালোবেসেছিল এবং ভালোবাসা নিয়েই মৃত্যুবরণ করেছে," এখন সেখানে ফুটে উঠছে এক নির্মম সত্য-ভাষণ:

"প্রেমিককে ফাঁকি দিয়ে অবৈধ অভিসারে গিয়েছিল সে এবং
ফিরবার পথে বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লেগে মারা যায় সে।"

পরের দিন সকালে ঐ কবরখানায় আমাকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছিল।

আমাদের বন্ধু ইংরেজরা
[Our friends the English]

চামড়ায় বাঁধানো ছোট খাতাখানা, যা ট্রেনের উঁচু আসনে পড়েছিল, তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে থাকি। এক ভ্রাম্যমানের রোজনামচা, ভুলক্রমে ফেলে গেছেন।

এই ডায়েরির শেষ তিনটি পৃষ্ঠা এখানে তুলে ধরলুম।

১লা ফেব্রুয়ারী। শহরের নাম মেনটন, যেখানে যত ক্ষয়রোগীদের আবাস। এ সেই মাটির নীচে পুষ্ট হওয়া আলুর ক্ষয়রোগ নয়। আমার এক বিদ্বান ডাক্তার বন্ধু এ সম্পর্কে আমাকে ওয়াকিবহাল করেন।...

হোটেলের সন্ধানে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়িয়েছি। রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, নেদারল্যাণ্ড ইস্তক দেশের সেরা সেরা হোটেলগুলিতে চষে বেড়ানো অভিজ্ঞ লোক আমি অবশেষে ঘর পেলাম একটা, যা আয়তনে এত বিশাল যে মনে হয় এক বিকট শূন্যতা সতত বিরাজমান।

অতঃপর শহরময় ঘুরে বেড়ালাম; একটি উন্নত পাহাড়ের সানুদেশে এর

অবস্থান [গাইড-বুক দ্রষ্টব্য]। মুলাকাৎ হলো অনেকেরই সঙ্গে, এরা প্রায়শই রুগ্ন, দুর্বল, মুখে চোখে তাদের বিরক্তি ও হতাশা। অধিকাংশেরই গাল-গলা মাফলারে ঢাকা [সেই সমস্ত প্রকৃতি-বিশারদদের স্মরণ করছি, যাঁরা এই পোশাকটির অন্তর্ধান নিয়ে চিন্তিত হ'য়ে পড়েছিলেন !]

সন্ধ্যা ছ'টা। ডিনার খাবার জন্য শহর থেকে ফিরে এসেছি হোটেলে। লম্বা লম্বা টেবিল বড় ঘরখানি জুড়ে; এক লহমায় আন্দাজে বলতে পারি, এখানে অন্ততঃ শ' তিনেক লোক খানা-পিনা সারতে পারে। কিন্তু তিন শ'র বদলে খানার আসরে মজুদ মোটে বাইশজন। আর ঐ বাইশজনই এ ঘরে ঢুকলেন বেশ সারবন্ধ হয়ে—একের পিছনে অপরে। প্রথম যিনি ঢুকলেন, তিনি এক দীর্ঘদেহী ইংরেজ, দাড়ি-গোঁফ নিখুঁত কামানো। পরণে তাঁর ফ্রক কোট, লম্বা ঝুলের শার্ট কোমর অব্দি, একখানা হাত পকেটে এমনভাবে ঢোকানো যেন একটা গুটিয়ে রাখা ছাতা। ওঁর এই বাহারে পোশাক দেখে আমার এক কশাক পুরোহিতের কথা মনে পড়ে অথবা সাদৃশ্য খুঁজে পাই কোন অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন বা, পেনসানভোগী সৈনিকের অভিনব বেসামরিক পোশাকের সঙ্গে। কোটে লম্বালম্বি আগাপাস্তালা বহু বোতামঘর এবং সারবন্ধ ক্ষুদে ক্ষুদে বোতামগুলি যেন একদল বুনো উকুন। ওয়েস্টকোটেরও দশা ঐ রকম। এমন মানুষ নিজের জিন্দেগী আর ভালাইয়ের জন্য আর যাই করুন, তিনি যে খুব চটপটে নন, এ সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ।

তিনি আমাকে দেখে ঈষৎ ঝুঁকলেন; আমিও সৌজন্য জ্ঞাপন করি।

এরপর নজর কাড়ে তিন ইংরেজ ললনা,—মা এবং তার দুই মেয়ে; তাদের চুল মাথার ওপর লক্ষণীয়ভাবে ডিম্বাকৃতিতে আঁট করে বাঁধা। মাঠাকুরণের মতো তাঁর মেয়েরাও যেন প্রবীণা; অথবা, বলা যায়, মেয়েদের মতো তাদের মাও বয়স্কা। বিধিদত্ত শারীরিক গঠনে তারা একই ছাঁদের —চিমসে হাড়সর্বস্ব চেহারা, পাণ্ডুর মুখ-চোখ এবং সামনের দাঁতগুলি উৎকট উঁচু হয়ে যুগপৎ খাবার প্লেট ও মানুষকে যেন ভয় দেখায়।

দেখতে দেখতে আরো অনেকে এলেন। সব আলাদা আলাদা। কেউ কারুর সাকরেদি করছেন না, সুনিশ্চিত। জাতে সব ইংরেজ। পুরুষদের মধ্যে মাত্র একজন স্থূলকায় ও রক্তাভ। মহিলাদের সংখ্যাও বেড়ে দাঁড়িয়েছে চৌদ্দতে, তাদের মধ্যে জনা কয়েক যুবতী, কেউ কেউ দেখতেও হয়তো মন্দ নয়, কিন্তু কোন মাদকতা সৃষ্টি করে না।

দু'জন যুবক সংসারী পাত্রীকে দেখতে পেলাম, নিজেদের স্ত্রী ও বাচ্চা-কাচ্চাদের সামলাচ্ছেন। আমাদের পরিচিত পাত্রীদের চেয়েও তাঁরা যেন আরো বেশী গম্ভীর, ঋজু ও মমত্বহীন।

সকলেই খাবার টেবিলে সমবেত হবার পর প্রধান পাত্রী বিড় বিড় করে মন্ত্র পাঠ করেন।—অর্থাৎ আমার ডিনার, আমার নামে নয়, ইস্রায়েল ও আলবেনিয়ার দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত হলো। প্রার্থনার পর সুপ, নিয়ে যে যার ডিনার শুরু করে দিলেন।

বিশাল ঘর জুড়ে অখণ্ড অস্বাভাবিক নীরবতা; মনে হয়, যেন পবিত্র ভেড়ার পাল এক ছাগলের অভিযানে বিব্রত, গম্ভীর। বিশেষতঃ ঐ মহিলারা, যারা স্পষ্টতই ভীত সন্ত্রস্ত, হয়তো তারা তাদের চুল ও প্রসাধনের বাহার অটুট রাখতে এমন অনড়।

পার্টির যিনি বড় কর্তা, তিনি ধর্মপ্রাণ পুরুষ, চাপাস্বরে সমবেত সকলকে কি সব ধর্মগাথা শোনালেন। দুর্ভাগ্য আমার, ইংরেজি বুঝি না। শুধু তাঁর হাবভাব দেখে অনুমান করতে পারি, তিনি দেবতা ও দৈব সম্পর্কেই কথঞ্চিৎ বক্তব্য রাখছেন এবং সকলে যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে তাঁর কথা শুনছেন।

পছন্দ করি বা না করি, অনেক অবিশ্বাস্য উক্তির মধ্য দিয়ে আমাকে খাবারে হাত দিতে হলো। যথা, ওঁদের মধ্যে এক ধার্মিক উক্তি করলেন, "তৃষ্ণার্থীর জন্য আমি জল রেখেছি।"

এ কথায় সারমর্ম আমি অনুধাবনে অসমর্থ। আমি এই পবিত্র মানুষগুলির একটি উক্তিও বুঝি না, যদিও তাঁদের উচ্চারিত শব্দগুলি আমার কানের কাছে মৌমাছির মতন গুন্ গুন্ করে, মস্তিষ্কের স্নায়ুকে করে পীড়িত।

"ক্ষুধার্তকে খাদ্য প্রার্থনা করতে দাও।"

"বায়ুর অধিকার পক্ষীকুলের, যেমন মৎসদের অধিকার সমুদ্রে !"

"ডুমুর গাছে ডুমুর ঝোলে, খেজুর গাছে খেজুর !"

"যে শোনে না, তার জ্ঞান জন্মায় না !"

এইগুলিই এঁদের খুব জ্ঞানগর্ভ বাণী !

অথচ, আমাদের হেনরী মনিয়ার এঁদের চেয়ে কত মূল্যবান ও মর্মস্পর্শী সত্য অল্প কথায় বলে গেছেন। সমুদ্রের দিকে চেয়ে তিনি বলেছিলেন, "সমুদ্র কী সুন্দর ! কিন্তু কত ভূমি গ্রাস করে তবেই এর বিভূতি !"

জগতের চিরায়ত সত্যকে তিনি এইভাবে উপমাসিদ্ধ করেছেন, "এই

তরবারিটিই হলো আমার জীবনের আলো। আমি এর সাহায্যে এরই দেওয়া শক্তিকে প্রতিহত করি এবং প্রয়োজনে একেই আক্রমণ করি।"

যদি সমবেত ইংরেজদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেতাম, তবে নিশ্চয় তাঁদেরকে শোনাতাম আমাদের ফরাসী মহাপুরুষদের আশ্চর্য সব বাণী!

ডিনার শেষ হলো, সকলে ফিরে গেলাম লাউঞ্জে।

আমি এক কোণে একাকী এবং বৃটিশ নাগরিকরা লাউঞ্জের অন্যত্র নিজেদের জমায়েতকে জমাটি রাখবার চেষ্টায়।

হঠাৎ একজন মহিলা এগিয়ে গিয়ে পিয়ানোর সামনে বসলেন

'ব্যস', আমি মনে মনে উচ্চারণ করি, 'এবারে তবে গানবাজনার পর্ব। ভালোই হলো।'

সঙ্গীতের প্রারম্ভিক প্রস্তুতিতে মহিলার একাগ্রতা যেন দুই ভুরুর মাঝখানে স্থাপিত, তিনি পিয়ানোর ডালা খুললেন এবং সমবেত নর-নারীরা সৈন্যবাহিনীর মতো ঐ মহিলাকে ঘিরে বূহ রচনা করেন—প্রথম সারিতে মেয়েরা, পিছনে পুরুষরা

ওঁরা কি এখন পালা গান গাইবে নাকি?

দলের যিনি পাণ্ডা, সেই ঈশ্বরপ্রেমিকই প্রথম স্বর তুললেন এবং অন্য সকলে কোরাসে সেই স্বরের সামিল হলেন। আর সুরসাধনার সে কী বীভৎস অভি-প্রকাশ! উদ্ধতমস্তক পাণ্ডার যে গলা, এঁদেরও তাই,—গলা চিরে বেরিয়ে আসছে এক ঘিন্ ঘিনে সুরতরঙ্গ। এঁরা ধর্মসংগীত গাইছেন!

মহিলারা আর্তনাদ করছেন, পুরুষদের গলায় কুকুরের ডাক, এমন অভূতপূর্ব কোরাস গানের দাপটে ঘরের জানালাগুলিও বুঝি কাঁপছে থর থরিয়ে। হোটেলের পোষা কুকুরটা হঠাৎ ঘাবড়ে গিয়ে ডাকতে শুরু করে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে ভেসে আসতে থাকে প্রতিবেশী সারমেয়দের সপ্রতিভ প্রত্যুত্তর।

আমি আর পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল থাকতে পারি না, পরিবেশ আমার কাছে অসহ্য মনে হয়, চিন্তা ও ভাবনায় আগুন জ্বলছে যেন দাউ দাউ, ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে বেরিয়ে আসি হোটেল ছেড়ে। শহরময় কয়েক চক্কর পাক খেলাম। এটা এমন এক বিশ্রী নিরস জায়গা, যেখানে থিয়েটার নেই, জুয়ার আসর নেই, প্রমোদের কোন বন্দোবস্ত নেই। সুতরাং বিরস বদনে আবার সেই হোটেলেই ফিরে যেতে হলো।

তখনো ইংরেজদের গান থামেনি।

আমি বিছানায় শুয়ে পড়ি। ও'রা গাইছেন। মধ্যরাত অব্দি চললো ঐ ঈশ্বর-বন্দনা। আমি জীবনে অত বিরক্তিকর কুৎসিৎ গান আর কখনো শুনিনি। রেগে মেগে স্বয়ং শুয়ে শুয়ে বিকৃত গলায় উদ্ভট গানের মাধ্যমেই ও'দের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাই :

করুণা আমার সেই ইংরাজ-ঈশ্বরকে,
এমন ভয়াল স্তোত্র ধ্বনিত যাঁর প্রতি!
থাকে যদি তাঁর শ্রবণশক্তি
বোঝেন যদি রসের গতি,
সুন্দর মুখ, গান এবং জীবনের প্রতি
থাকে যদি তাঁর বোধ,
নিতেন প্রতিশোধ!
করুণা করি ঈশ্বর তাই!
করুণা করি অন্তঃস্থল হ'তে।

এক সময় ঘুমিয়ে পড়লুম; কিন্তু ঐ সব উত্তেজিত ক্রুদ্ধ মুহূর্তের পর সুনিদ্রা আশা করা ভুল; সারাটা রাত নানারকম দুঃস্বপ্ন দেখে কেটে গেল। ভয়াবহ রক্তজলকরা সব দুঃস্বপ্ন।

২রা ফেব্রুয়ারী :—

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই হোটেল-মালিককে চেপে ধরলাম, জানতে চাইলাম—ঐ সমস্ত অভব্য নর-নারীরা প্রতিদিনই কি এমন কুৎসিৎ গানের আসর বসায় নাকি?

"না, না, স্তার", তিনি মৃদু হেসে বললেন, "কাল যে ছিল র'ববার এবং নিশ্চয় জানেন, র'ববার ওঁদের কাছে একটি পবিত্র দিন।"

আমি উত্তরে বললাম :

নিদ্রা ও বিশ্রামে ব্যাঘাত
এই বুঝি ধর্মাচারণ?
যদি চলে এমন—
ছুটে গিয়ে ধরবো ট্রেন;
ধর্ম! আ মরণ!

গৃহস্বামী ঈষৎ বিস্মিত হলেন আমার জবাব দেবার বাহারে, অবিশ্যি কথা

দিলেন, আমার নিদ্রা ও বিশ্রামে যাতে ব্যাঘাত না হয়, তা তিনি দেখবেন।

গোটা দিন ধরে পুলকিত আমি এ পাহাড় সে পাহার ঘুড়ে বেড়াই। তারপর রাত্রে আবার সেই সব নর-নারীর জটলা। আজকে আর লাউঞ্জে নয়, ড্রয়িং রুমে। আজ কি করবেন তাঁরা ?

হঠাৎ গত রাত্রের সেই 'গায়িকা' মহিলাই আবার পিয়ানোর ডালা খুলে বসলেন। স্তম্ভিত অস্বস্তিতে আমার শরীরে কাঁটা দেয়।

তিনি বাজাতে শুরু করলেন ওয়ল্‌স্ নাচের সুর।

মেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে মেতে উঠলো ঘুরন্ত নাচে।

এবং ধার্মিক পুরুষরা, প্রাত্যহিক অভ্যাস বশতঃ, প্রার্থনার ভঙ্গীতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। ওয়ল্‌স্ এর পর জোড়ায় জোড়ায় নৃত্য; নর-নারীর যৌথ নর্তন।

· যদিচ আমি বিস্মিত বিমূঢ়, আজকের পরিবেশ আমার কাছে অনেক সহনীয়। অপরিচিত জন, তাই এক কোণে একাকী বসে আছি।

৩রা ফেব্রুয়ারী :—

আমি আবার সেই পাহাড়ী দুর্গের ধ্বংসস্তূপ দেখতে চলেছি। ঐ অব্দি হেঁটে যাওয়ায় অনস্বীকার্য আনন্দ। ছবির মতন সুন্দর, গোটা পাহাড়টা জুড়েই ছিল দুর্গটা, এখনো প্রতিটি চূড়োয় প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ। এর চেয়ে সুন্দর দৃশ্য হয় না। চমৎকার দেশ!

মনের উৎফুল্লতায় খাবার টেবিলে বসে পার্শ্ববর্তিনী মহিলাকে স্বয়ং নিজের পরিচয় দিলুম। কিন্তু তিনি কোন উত্তরই দিলেন না,—ইংরেজী ভদ্রতা!

সন্ধ্যায় আর এক প্রস্থ বলনাচ।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী :—

মোনাকো [গাইড-বুক দ্রষ্টব্য] ঘুরে এলাম। রাতে ইংরেজদের বলনাচ। নীরব নিথর ধাতু মূর্তির মতন আমার উপস্থিতি।

৫ই ফেব্রুয়ারী :—

আজ গিয়েছিলাম সান রেমোতে [গাইড-বুক দ্রষ্টব্য]। রাতে যথারীতি ইংরেজদের বলনাচ। আমার ভূমিকা পূর্ববৎ।

৬ই ফেব্রুয়ারী :—

গিয়েছিলুম নিসে [গাইড-বুক দ্রষ্টব্য]। রাতে ওঁদের বলনাচের আসর। আমি বিছানায়।

৭ই ফেব্রুয়ারী :—

আজ ঘুরে এসেছি ক্যানেসে [গাইড-বুক লক্ষনীয়]। রাতে ইংরেজদের বলনাচ। আমি তখন এক কোণে বসে চা খাচ্ছি।

৮ই ফেব্রুয়ারী :—

রবিবার। প্রতিশোধ নেবার দিন। ওঁদের ঐ কেলেঙ্কারির জন্য অপেক্ষা ক'রে আছি। ওঁরা রবিবাসরীয় ব্যাপারের জন্য মুখ ঘষছেন এবং ঠোঁটে রঙ মাখছেন ধর্মসংগীত গাইবার জন্য। সুতরাং, ডিনার খাবার আগেই আমি চুপি চুপি ড্রয়িং রুমে অনুপ্রবেশ করি, পিয়ানোতে তালা মেরে চাবিটা পকেটস্থ করি এবং হোটেল বয়কে বলি, "ধর্মভীরু লোকগুলি যদি পিয়ানোর চাবি খোঁজে, বলবে বস্তুটা আমি নিয়ে গেছি এবং তারা যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।"

খাবার টেবিলে বসে তাঁরা বাইবেল ও ধর্মীয় ব্যাখ্যা নিয়ে হরেক বিতর্কের ঝড় তুললেন। তারপর অনুমান অনুযায়ী তাঁরা প্রবেশ করলেন ড্রয়িং রুমে। পিয়ানোর কাছে দাঁড়িয়ে হতবাক। এক ধরণের শিহরণ খেলে যায় তাঁদের ওপর দিয়ে। মৃদু গুঞ্জন। মনে হয়, ওঁরা বুঝি বজ্রাহত। মেয়েদের মাথার পরিপাটি চুল খুলে যায় আর কি! দলের প্রধান হন্ হনিয়ে ঘর ছেড়ে চলে যান, ফিরেও আসেন। আবার গুঞ্জিত আলোচনা। সকলের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি এবার আমার দিকে। তিনজন পুরুষ বিচিত্র কায়দায় ঝুঁকে আমার কাছে তাঁদের দাবি জানালেন ফরাসী ভাষায়।

আমি বললাম, "মশাই, আমি আপনাদের ঐ মেয়েদের অনুরোধ বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সেই অনুরোধ মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

দলের প্রবীণতম লোকটি আমার মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন।

আমি বলতে থাকি, "আপনি যেমন ধার্মিক লোক, আমিও তাই। বরং ধর্মের ব্যাপারে আমি আরো একনিষ্ঠ এবং সেই কারণেই ধর্মের নামে এমন হুল্লোড় বরদাস্ত করতে পারি না।"

আরো বলি, "ধর্মের দোহাই পেড়ে পিয়ানো বাজাবেন এবং মেয়েরা ধেই ধেই করে নাচবে,—এমন জিনিস আপনি সহ্য করতে পারছেন! আমরা মশাই কখনো গির্জায় নাচানাচি করি না বা, ঈশ্বরস্তোত্রের নামে অর্গান বাজিয়ে জুটি বেঁধে নাচি না। যে উদ্দেশ্যে আপনার এই যন্ত্রটার ব্যবহার করছেন, তা আমার ধৈর্যচ্যুতির পক্ষে যথেষ্ট। আপনি আমার এই বক্তব্য মহিলাদের বুঝিয়ে বলতে পারেন।"

হতমান তিন পুরোহিত ফিরে গেলেন। মেয়ারাও বিমর্ষ, ক্ষুব্ধ। তবু তাঁরা গাইলেন এবং পিয়ানো ছাড়াই।

৯ই ফেব্রুয়ারী :—

দুপুর। এই মাত্র হোটেল-মালিক আমাকে হোটেল ত্যাগের নির্দেশ দিলেন। ঐ সমস্ত ইংরেজ খদ্দেরদের দাবিতেই আমি এখন এখানকার অবাঞ্ছিত জন। যাবার আগে সেই তিন পুরোহিতকে ডেকে বাইবেল ও ধর্মীয় নির্দেশ সম্পর্কে অনেক যুক্তিপূর্ণ কথা আমি শুনিয়ে দিলুম। প্রত্যুত্তরে তাঁরা তিনজনই এক সঙ্গে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করলেন, পালিয়ে গেলেন।

দুপুর দুটোয় ট্রেনে চেপে বসলুম নিসের উদ্দেশ্যে।

ডায়েরি এখানেই শেষ। যদিও লেখক বেশ কৌতুক এবং কোন কোন জায়গায় আদি রসের সঙ্গে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন, আমার মনে হয়, তাঁর এই রচনা যে কোন মুসাফিরের কাছে শিক্ষাপ্রদ,—অন্ততঃ, প্রবাসে ইংরেজদের বিচিত্র মানসিকতা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ও সতর্ক থাকতে পারেন। পরিশেষে আমার বক্তব্য, এই দুনিয়ায় চিত্তাকর্ষক ইংরেজ নর-নারীর অভাব নেই এবং তাঁদের অনেকের সঙ্গেই আমার পরিচয় ঘটেছে। তাঁরা ঐ হোটেলের এক পাল ইংরেজ নর-নারী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর।

নামকরণ

[The Christening]

খামারের কপাটের সামনে রবিবাসরীয় পোশাকে লোকগুলি দাঁড়িয়েছিল। মে মাসের অবিম্বিত সূর্য অতি উজ্জ্বল ; আলোর বন্যা পুষ্পিত আপেল গাছগুলিতে এবং আপেল গাছগুলির মিষ্টি ছায়াপাত ঘটেছে গোটা খামার বাড়িটার ওপর। বেগনি ও সাদা রঙের ভগ্নাংশগুলি লক্ষনীয় ; আলো-অন্ধকার, অন্ধকার আলো। ফুলের পাপড়ি ঝরে অনলস ঝর্ণার মতন, ঘন দীর্ঘকায় ঘাসের বুকে তারা বুঝি ঘুলঘুলি, ড্যাণ্ডিলিয়ন ফুলগুলি আগুনের শিখা এবং পপিস্ গুলি ফোঁটা ফোঁটা রক্ত। এমন দৃশ্যে মন খাঁচা থেকে পালানো পাখি।

একটি শূকরী স্তূপাকৃতি সারের ওপর সন্তর্পণে নিদ্রা যায়, এবং ওর ক্ষুদে ক্ষুদে বাচ্চাগুলি যার বিশাল উদরের সমৃদ্ধ স্তনের কাছে কুৎ কুৎ ঘুরে বেড়ায়।

অনেক দূরে, খামারের গাছ-গাছালির ভেতর দিয়ে দেখা যায় যে গির্জা, হঠাৎ সেখানে ঘণ্টা বাজতে শুরু করে। ধাতব শব্দ আর্তি পৌঁছে দেয় কিরণ-বিকাশী স্বর্গের কেন্দ্রে। ঠিক তখনই সোয়ালো পাখির ঝাঁক ধনুক বাঁকা ছন্দে উড়ে চলেছে বৃক্ষস্পর্শিত বিশাল নীলাকাশ চিরে। আস্তাবলের মৃদু গন্ধের সঙ্গে আপেল-গাছের মিষ্টি ঘ্রাণের মাখামাখি।

ওদের মধ্যে একজন কপাটের সামনে দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে মুখ তুলে চিৎকার করে :

"মিলিনা, এখনই চলে এসো ; ঘণ্টা বাজছে।"

বয়স তার ত্রিশের কাছাকাছি, দীর্ঘদেহী চাষী, ক্ষেতে খামারে কঠিন পরিশ্রম সত্ত্বেও শারীরিক লালিত্য নষ্ট হয়নি। তাঁর বুড়ো বাপ, গ্রন্থিযুক্ত ওক্ গাছের গুঁড়ির মতন শরীর, হাতময় ক্ষতচিহ্ন, বাঁকা বাঁকা দুই পা, ঘোষণা করে : "মেয়েরা! ওরা কোনদিনই চটপট তৈরী হয়ে নিতে পারে না।"

অপর দুই ছেলের মুখে হাসি ; তাদের একজন ঘুরে তাকায় সবচেয়ে বড় ভাইয়ের দিকে, যে এই কিছুক্ষণ আগে স্বর সপ্তমে তুলেছিল, বললো, "তুমি বরং একটু এগিয়ে দেখো ; ওরা দুপুরের আগে আসছে না।"

যুবকটি বাড়িতে ঢুকে পড়ে।

এক ঝাঁক পাতিহাস ডাকতে শুরু করে, পাখা ঝাপটায়, ঝাঁপিয়ে পড়ে খামারের পুকুরে। তখন বাড়ির দরজা খুলে আবির্ভূত হলো এক সমর্থদেহী স্ত্রী-লোক, কোলে তার মাস দুয়েক বয়সী একটি শিশু। তার টুপির সাদা সুতা-তন্তু পিঠ অব্দি ঝুলন্ত এবং গায়ের শালটার রং এত রক্তাভ যে মনে হয়, বুঝি বাড়ির ঐ জায়গায় আগুন লেগেছে। বাচ্চাটিকে সাদা পোশাকে মুড়ে রাখা হয়েছে, সে এই নার্সের তপ্ত উদরের কাছাকাছি নিরাপদ শান্ত।

এরপর দেখা গেল শিশুটির মাকে। বয়স খুব বেশী হলে আঠারো, সুঠাম শরীর, ঝক মকে হাসি হাসি মুখ, স্বামীর হাত ধরে আগুয়ান। তারপর দুই বৃদ্ধা ঠাকুরমা, বুড়ো আপেল যেন দুটি। একজন বিধবা ; সে তার ঠাকুরদার হাত ধরে সকলের আগে আগে চলতে থাকে, পিছন পিছন আর সকলে, মিছিলের শেষে ছোটরা মিষ্টির প্যাকেট হাতে গুটি গুটি এগিয়ে চলে।...

ছোট ঘণ্টাটি সমানে বেজে চলেছে ; শিশুরা হামাগুড়ি দিয়ে টিলার ওপর উঠছে ; দরজার আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে অনেকের মাথা ; গোয়ালিনীরা তাদের পাত্র নামিয়ে রেখে দেখছে, নামকরণের এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

এবং শিশুটিকে কোলে নিয়ে বিজয়িনী ভঙ্গীতে নার্স কাদা ও বালিময় পথ বেয়ে এগিয়ে চলে। বয়স্ক বয়স্করাও চলেছে ; তাদের চলন, বয়স হেতু, খানিক আঁকা-বাঁকা। যুবকদের ভিতর এসে গেছে নাচের উন্মাদনা, ঘুরে ঘুরে তারা তাকায় পথের দু'ধারে দাঁড়িয়ে থাকা কৌতূহলী যুবতীদের দিকে।

শিশুর বাপ-মার মুখে গম্ভীর প্রত্যয় ; তাদের এই সন্তান 'দেঁন্ত' বংশের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখবে। আজ তারই শুভ সূচনা।

তাড়াতাড়ি গির্জায় পৌঁছবার জন্য পথ ছেড়ে তারা মাঠ পার হতে থাকে। ক্রমশ চোখের সামনে ভেসে ওঠে গির্জাটা, তীক্ষ্ণমুখ চূড়াগুলি স্পষ্টতর।...এবং ঘণ্টাটি বেজে চলেছে, এখনো সমানে বেজে চলেছে নবজাতকের প্রথম ঈশ্বরের আবাসে পদার্পণকে স্বাগত জানাতে।

শোভাযাত্রার অনুগামী একটি কুকুরও ; ওরা তার দিকে মিষ্টি ছুঁড়ে দেয়, সে ওদের পায়ের কাছে গিয়ে লেজ নাড়ে।

চার্চের দরজা খোলা। বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন পুরোহিত। দীর্ঘকায়, শীর্ণ অথচ, মজবুত, একমাথা লাল চুল। তিনিও 'দেঁন্ত' পরিবারের সন্তান, বর্তমান শিশুটির কাকা। ভাইপোর মুখে প্রতীকী পবিত্র লবন খণ্ড ছোঁয়াতেই বাচ্চাটি কেঁদে ওঠে।

উৎসব সাঙ্গ হবার পর গোটা পরিবারটা গির্জার সিঁড়ির ওপর গিয়ে দাঁড়ায়, যাজকও তাঁর সাদা বহির্বাস খুলে দলের সঙ্গে যোগ দেন। তারপর আবার সেই চলমান শোভাযাত্রা—এবার গৃহাভিমুখে। ফিরে যাবার গতি দ্রুততর, কেননা ভোজসভার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাস্তার একদল ফচকে ছোঁড়াও চলেছে তাদের পিছন পিছন, এবং যখনই ওদের দিকে একমুঠো মিষ্টি ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে, সাংঘাতিক কামড়া-কামড়ি মারামারি শুরু হয়ে যাচ্ছে। রীতিমত হাতাহাতি চুলোচুলি যুদ্ধ। এমনকি কুকুরগুলিও ছুটে এসে সামিল হচ্ছে সেই লড়াইয়ের এবং ছোকরাদের চেয়ে তাদের সাফল্যই লক্ষনীয়।

নার্স ক্লান্ত ; পুরোহিতের দিকে ঘুরে রাগত ক্লান্ত স্বরে বলে, "আমি আর পারছি না। আপনার ভাইপোকে বয়ে বয়ে আমার পেটে খিল ধরে গেলো।"

নার্সের কোল থেকে শিশুটিকে তুলে নেন পুরোহিত ; কিন্তু শিশু বহনে তাঁর অনভ্যাস ও অপটুত্ব ফুটে ওঠে। তাঁর অবস্থা দেখে সকলেই হেসে ওঠে ; বুড়ি ঠাকুরমাদের একজন বলে ওঠেন, "তোমার নিজের তো কোন সন্তান নেই ? তাই বাচ্চা কি ক'রে কোলে নিতে হয়, জানো না।"

পুরোহিত জবাব না দিয়ে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে চলেছেন, মাঝে মাঝে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছেন শিশুর আশ্চর্য নীল চোখ। তাঁর অদম্য ইচ্ছা, শিশুটিকে চুম্বন করবার। এক সময় করলেনও।

সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চার বাপ মজাদার গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, "আরে, তোমার যদি বাচ্চার সখ থাকে তো একটিবার মুখ ফুটে বললেই পারতে! উপায়টা আমি বাতলে দিতাম।"

গ্রাম্য রসিকতায় আর এক দফা তারা ফেটে পড়ে।

খাবার টেবিলে আবার হুল্লোড়। পরিবারের বুড়ো কর্তা খুব ফূর্তি করছেন। তাঁর ছেলেরা ও পুত্রবধূরাও কম যায় না। আমন্ত্রিত অতিথিরা নবজাতক ও এই বংশের ঐতিহ্যময় শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে। পুরোহিত কিন্তু এই কোলাহল থেকে সামান্য ব্যবধানে, নার্সের পিছনে বসে ভাইপোকে আদর করছেন। তিনি এই শিশু-মুখ দর্শনে বিস্মিত; মুখে এক ধরণের অদ্ভুত স্বপ্নময় আচ্ছন্নতা, তীক্ষ্ণ অথচ, অস্পষ্ট বিষণ্ণতা তাঁকে ক্রমশই অভিভূত করে ফেলছে।

তিনি কিছুই শুনছেন না, কিছুই দেখছেন না, শুধু চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে শিশুর মুখের ওপর। নার্স তাঁর কাছ থেকে বাচ্চাটিকে নিয়ে নেবার পর মানসিক আকুলতা আরো বৃদ্ধি পায়। আর নার্সও বাচ্চা কোলে খাবার খেতে খুব অসুবিধে বোধ করছে।

"ওকে আমারই কোলে দাও," পুরোহিত বললেন, "আমার খিদে পায়নি।"

এবং শিশুটিকে তিনি ফিরিয়ে আনলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মন থেকে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ মুছে গেল, অপলক চোখে তিনি চেয়ে রইলেন শিশুটির মুখের দিকে। ক্রমশ ঐ ছোট্ট দেহের উত্তাপ তার সর্বাঙ্গে যেন পরশ বুলিয়ে দিতে থাকে—কী নরম, কী পবিত্র, কী মধুর! তাঁর দু'চোখ জলে ভরে যায়। ভোজনতৃপ্ত নর-নারীদের হট্টগোল তখন তুঙ্গে। ঐ চিৎকারে নবজাতক ভয় পেয়ে কেঁদে ওঠে। কে যেন রসিকতা করলো, "পুরোহিত, আপনার বাচ্চাকে দুধ দিন!"

হো-হো অট্টহাসিতে গোটা ঘরটা কেঁপে ওঠে। কিন্তু শিশুর মা উঠে দাঁড়ায়; সে তার সন্তানকে বুকে জড়িয়ে পাশের ঘরে চলে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে সে ফিরে এসে ঘোষণা করে, বাচ্চাটা দোলনায় শুয়ে চট পট ঘুমিয়ে পড়েছে।

ভোজন পর্ব তখনও চলেছে। কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর পুরুষ ও মেয়েরা বাগানে যাচ্ছে, তারপর আবার ফিরে এসে টেবিলের সামনে বসে পড়ছে। মাংস,

তরিতরকারি, আপেলের রস এবং মদ অনবরত তাদের গলা বেয়ে নামছে, পেটগুলি ফুলে জয়ঢাক, স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত।

রাত ঘনাবার পর কফি এলো। অনেকক্ষণ আগেই এই ঘর ছেড়ে পুরোহিত বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতি নিয়ে এদের কোন মাথাব্যথা নেই।

অবশেষে যুবতী মা উঠে দাঁড়ায়, এগিয়ে যায় সেই ঘরের দিকে, যেখানে তার সন্তান ঘুমিয়ে আছে। অসম্ভব অন্ধকার সেই ঘর। তাই সন্তর্পণ তার গতি—কোন আসবাবপত্রে ধাক্কা লেগে বাচ্চার ঘুম না ভেঙে যায়!

হঠাৎ সেই অন্ধকারে তার মনে হলো, ঘরে কে যেন ফিস্ ফিসিয়ে কথা বলছে। দারুণ ভয়ে আঁতকে ওঠে সে। ছুটে এসে এ ঘরে খবর দেয়। সঙ্গে সঙ্গে এক রাশ মাতালের ক্রুদ্ধ হুঙ্কার। এখনই তারা সেই অন্ধকারের জীবকে শাস্তি দেবে। সন্তানের বাবা এক হাতে বাতি নিয়ে সকলের আগে হন্ হনিয়ে সেই ঘরে ঢুকে পড়ে। তখনই তারা দেখতে পায় এক বিচিত্র দৃশ্য!—

দোলনার পাশে হাঁটু মুড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন পুরোহিত, শিশুর পাশে আর একটা বালিশে কপাল চেপে চোখের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছেন নিজেকে।

স্বীকারোক্তি
[The Confession]

ভেজিরস-লা-রেথেলের সকল অধিবাসীরাই মঁসিয়ে বেদন লারেমিনসের শবানুগমন করেছিলেন। সেই স্মরণীয় পারলৌকিক অনুষ্ঠানে একটি সত্যই উচ্চারিত হলো:

"আমাদের মধ্য থেকে একজন সম্মানীয় ব্যক্তি বিদায় নিলেন।"

সত্যিই, জীবনের প্রতিটি প্রত্যক্ষ ঘটনায় তিনি ছিলেন বিশিষ্ট ও অনন্য। তিনি তাঁর ভাষণে, উপমা-নির্বাচনে, আবির্ভাবে, আচরণে, চলন ভঙ্গিতে, দাড়ির বাহারে, টুপির গঠনে ছিলেন বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন। কখনো এমন কোন কথা উচ্চারণ করেননি, যার তাৎপর্য নেই; দান-খয়রাতের সময় প্রার্থীর প্রতি তাঁর উপদেশ ছিল অনিবার্য; বিশাল দুই বাহু প্রসারিত করে তিনি ঈশ্বরের কাছে মানুষের মঙ্গল কামনা করতেন।

মৃত্যুকালে তিনি রেখে যান দুটি সন্তান. এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলেটি

টাউন কাউন্সিলে প্রতিষ্ঠিত এবং মেয়েটি মঁসিয়ে পোরিল ছ লা ভসতে নামক এক আইনজীবিকে বিয়ে করে সুখী ও সুনামের অধিকারী।

বাবার মৃত্যুতে তারা শোকাহত ; বাবার প্রতি ভালোবাসায় তাদের কোন খাঁদ ছিল না। কবরস্থ করবার অনুষ্ঠান শেষ হলেই তারা মৃতের আবাসে ফিরে আসে। তারা মানে এই তিনজন—ছেলে, মেয়ে এবং জামাই। ঘরের দরজা বন্ধ করে প্রথমেই তারা মৃতের দলিল খুলে বসে। জামাই মসিয়ে পোরিল, যেহেতু আইন-ব্যবসায়ী, সর্বপ্রথম সীল খুলে দলিলটা বের করে। চোখে চশমা এঁটে সে তার উকিলসুলভ নিরস গলায় দলিলের বয়ান পাঠ করতে আরম্ভ করে :

"আমার বাছারা, আমার সন্তানরা, আমি কবরে শুয়েও শান্তি পাবো না, যদি এই মুহূর্তে তোমাদের কাছে এই স্বীকারোক্তি ব্যক্ত না করি। এ এক পাপের স্বীকারোক্তি,—যে পাপ দুঃসহ তিক্ততায় আমার জীবনকেই বিষময় করে তুলেছিল। হাঁ, আমি অপরাধী, জঘন্য পাপে পাপী !

"তখন আমার বয়স ছাব্বিশ। প্যারিতে এসে সবে মাত্র আইনের জগতে যোগ দিয়েছি। প্যারিতে আগত আর পাঁচজন ভিন্ প্রদেশীয় যুবকের মতন অবস্থা আমার—পরিচয়শূন্য, পরিজন বিহীন, নির্বান্ধব।

"আমি আমার দিন ও রাত গুলিকে আকর্ষণীয় করবার মানসে একটি মেয়েমানুষ যোগাড় করে ফেললুম। জানি, দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষই আমার এই রুচিকে ঘৃণা করবে। কিন্তু আমি তাদেরই একজন, যারা একা থাকতে পারে না। নিঃসঙ্গতা আমার স্নায়ুকে উত্তেজিত করে, আতঙ্ক ধরায় ; রাতে সেই একাকীত্ব ভয়াল, দিনে একাকী আগুনের সামনে বসে বিশাল শূন্যতা অনুভব করি। অনুভব করি, যদিও আমি এই পৃথিবীতে একা, দারুণ একা, তবু ভয়ের অনেকগুলি অদৃশ্য উৎস আমায় ঘিরে যেন নাচছে।…কেমন যেন একটা জ্বর জ্বর ভাব ; ভয় ও অস্থিরতার কারণে এই শারীরিক তাপ। নিরেট নীরব দেয়ালগুলিও বুঝি আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। নির্জন কক্ষের নীরবতা কত গভীর ও বিষন্ন নিঃসঙ্গ মানুষের কাছে ! শুধু দেহকে ঘিরে এই নীরবতা নয়, এই নির্জনতা আত্মাকেও ঘিরে, সেই কারণে কোন একটু সামান্য শব্দেই, আসবাবপত্রে সামান্য ঠোকাঠুকিতেও প্রচণ্ড চমকের সৃষ্টি হয়, মন আঁতকে ওঠে, মেরুদণ্ড বেয়ে হিমেল স্রোত নামে।

"প্রায়শই আত্মগতভাবে আমি নির্জনতার দ্বারা আক্রান্ত, বে-এক্তেয়ার ;

তখন যে বেঁচে আছি, তা প্রমাণের জন্য একা একাই কথা বলে উঠি ; ঠিক কথা নয়, কতকগুলি শব্দের উত্থান মাত্র। নিরেট নির্জনতাকে মাড়িয়ে নিজের সাহস ও প্রত্যয়কে মেরামত করবার সে এক প্রাণান্ত প্রয়াস ; শব্দের তরঙ্গ বুজবুজিয়ে ওঠে, যদিচ তাদের কোন ব্যুৎপত্তিগত অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে না ; কেবল একটা বিজাতীয় আওয়াজ—চার দেয়ালের আবদ্ধ আবেষ্টনীতে আছাড়ি-পিছাড়ি খায় ; তখন আমার মুখের ভয়ার্ত বিষন্ন ছাপ আরো পরিস্ফুট, কেন না আমি নিজের স্বরকেই সনাক্ত করতে পারছি না। শূন্য ঘরে একাকী নিজের সঙ্গে অর্থহীন প্রলাপ বকার চেয়ে ভয়াবহ দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে ? এ রকম পরিস্থিতিতে, বিশেষতঃ কোন যুবকের পক্ষে, বেচেবর্তে থাকা দুঃসাধ্য।

"সুতরাং, এই অসহনীয় অবস্থার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য, স্বস্তিতে বেচেবর্তে টিকে যাবার জন্য, আমি একটি মেয়েমানুষ আমদানী করলুম। বয়স যথেষ্ট কম। সে প্যারির সেই সব কমবয়সী মেয়েদেরই একজন, যাদের অল্প কিছু পয়সার বিনিময়ে নিজের কাছে ধরে রাখা যায়। বেশ মিষ্টি উপাদেয় যুবতী ; ওর বাপ-মা থাকতো পয়েজিতে এবং কখনো-সখনো সে কিছুদিন তার বাপ-মার কাছে কাটিয়ে আসতো।

"একটি ঘটনাশূন্য বছর আমি ওকে নিয়েই কাটিয়ে দিলুম। যখনই কোন উপযুক্ত মেয়ের সঙ্গে আমার স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে উঠবে, তখন নিশ্চয় ওকে ত্যাগ করবো। দৃঢ় ও স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত। সামান্য কয়েকটা টাকা আমি ওকে দিতাম পারিশ্রমিক হিসেবে। কারণ এটাই রেওয়াজ,—মেয়েমানুষকে সর্বদাই তার প্রেমের পরিবর্তে কিছু মূল্য ধরে দিতে হয় ; দরিদ্র হলে অর্থ, ধনী হলে উপহার-সামগ্রী।

"কিন্তু একদিন সে আমাকে এমন একটি খবর জানালো, যাতে আতঙ্কে আমার শরীর ছম্ ছমিয়ে ওঠে,—সে নাকি আমাদের সহবাসের পরিণতিতে মা হতে চলেছে ! অত্যন্ত দুঃসংবাদ ! আমার কল্পিত আয়োজনগুলি এক লহমায় ভেঙে পড়লো। চকিতে নিজের সর্বনাশা ভবিষ্যৎকে দেখতে পেলাম যেন ! ঘেন্নায় গা ঘোলায়। আমার দিব্য-দৃষ্টিতে এক অজগর-শৃঙ্খল, যা আমৃত্যু আমাকে নিস্তার দেবে না। এই মেয়েমানুষটা আমার ভবিতব্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে চলেছে তার জঠরে বহন করা এক শিশুকে দিয়ে, যে শিশু ভূমিষ্ঠ হলে অনেকগুলি প্রথাসিদ্ধ কর্তব্য এসে হাজির হবে,—নিশ্চয় ওকে বড় ক'রে তুলবার দায়িত্ব আমার, ওর প্রতি নজর রাখতে হবে আমাকে, বিপদ-

আপদ অসুখ-বিসুখ থেকে রক্ষা করতে হবে, যদিও ওর জন্ম-রহস্য যথাসাধ্য গোপন রাখবার প্রয়াসকেও অস্বীকারের ক্ষমতা আমার থাকবে না।

আমি ভেঙে পড়ছি; সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়াবহ পরিকল্পনাও মগজে ঘুরপাক খাচ্ছে,—এমন একটা বাসনা, যা আমি কোনদিন প্রকাশ করিনি, কিন্তু মনের গহনে লালন করেছি, যেন কপাটের আড়ালে লুক্কায়িত একটা শয়তান; ভয়ানক পাপচিন্তা আমার মানসিক জগতকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখলো। আমি একটি দুর্ঘটনার কথা কল্পনা করছি। বহু শিশুই তো ভূমিষ্ঠ হবার আগে খতম হয়ে যায়।

"না, না, আমি আমার রক্ষিতার মৃত্যু কামনা করিনি। ভাগ্যহীনাকে আমি ভালোবাসতাম নিশ্চয়। কিন্তু, সম্ভবত, মৃত্যু কামনা করছিলাম অপর জনের —নিজের চোখে তাকে দেখবার আগেই!

"তবু সে জন্মালো। এক রত্তি শিশু। অবিবাহিত তরুণের ঘরে অকস্মাৎ এক পরিবার—একটি শিশু সহ নকল পরিবার। অস্বাভাবিক। গোপনীয়।

শিশুটি কিন্তু আর পাঁচটা নবজাতকের মতনই দেখতে। আমি ওকে ভালোবাসতে পারলুম না। তোমরা জানো, পিতৃস্নেহ প্রথম অবস্থাতেই প্রবল হ'য়ে ওঠে না। এটা সময়ের ব্যাপার। কিন্তু মাতৃস্নেহ অফুরাণ, নিঃস্বার্থ। সন্তান জঠরে আসবার লগ্ন থেকেই। সন্তানের প্রতি পিতার স্নেহ গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে, তারপর পিতা আবদ্ধ হয়ে পড়ে সেই দৃঢ় মানবিক বন্ধনে, যা পরিবারকে দৃঢ় ভিত্তিভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে।

"আর একটি বৎসর অতীত হয়ে গেল; আমি এখন আমার তিক্ত আবাস ছেড়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়াই, আর বর্তমানে আমার ঘরের অবস্থা এই রকম,— এখানে সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে মেয়েমানুষের অন্তঃপরিচ্ছদ, নানারকম কাপড়ের পটি, মোজা, বিভিন্ন আয়তনের গ্লাভস্, আরো হাজারো রকমের টুকরো-টাকরা, কোনটা টেবিলের ওপর, কোনটা চেয়ারের হাতলে, সর্বত্র—সর্বত্র! সর্বোপরি, আমি যথাসম্ভব ঘরমুখো হইনা পাছে কোন শিশুর কান্না শুনতে হবে বলে! আর ওটা কাঁদেও থেকে থেকে, পোশাক বদলাবার সময় কাঁদবে, স্নান করাবার সময় চিৎকার তুলবে, ঘুমোবার সময় গলা ফাটাবে,—সব সময় ঐ কান্না!

"এ সময় বাইরের জগতে আমি কিছুটা সামাজিক। আমার কতিপয় বন্ধু জুটেছে এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, একদিন এক পরিচিত জনের ড্রয়িং রুমে

প্রথম পরিচিত হলাম তোমাদের মার সঙ্গে। আমি তার প্রেমে পড়ে যাই এবং তাকে বিয়ে করবার বাসনা অনিবার্যভাবে প্রবল হ'য়ে ওঠে। একদিন নিজের প্রার্থনা তাকে জানালুম,—আমি তোমার পাণিপ্রার্থী। সে সম্মতি দিলো।

"কিন্তু তখন তো আমি ফাঁদে আটকানো প্রাণী! নিজের প্রেম ও আকুলতা নিয়ে নিশ্চয় এই মহিলাকে আমি বিয়ে করবো! অথচ, আমার ঘরে অন্য একটি স্ত্রীলোক আমারই ঔরসজাতকে নিয়ে বাস করছে! আমি যদি সব সত্য অকপটে খুলে বলি, পরিণতি কি দাঁড়াবে? আমার প্রেমিকার পিতা-মাতা যথেষ্ট অভিজাত ও কঠিন স্বভাব, এমন লোকের সঙ্গে তাঁদের মেয়ের বিয়ে দিতে কখনোই রাজি হবেন না!

"গোটা মাস ধরে চললো আমার মানসিক অস্থিরতা, নৈতিক অবনতি! হাজার হাজার ভয়ঙ্কর সমস্ত পরিকল্পনা কামড় মারে। আমি আমার নিজের সন্তানের প্রতি তিতি-বিরক্ত, ওর ঐ বেঁচে থাকার ও বড় হয়ে ওঠার লক্ষণগুলি আমার চোখে বিষ, ওর ঐ নরম নরম মাংসল চেহারা অসহনীয়,— ও আমার জীবনের পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক, আমার যৌবনের সমস্ত সুখ ও আনন্দ শুষে নিয়েছে!

"হঠাৎ মেয়েমানুষটাই অসুস্থ হয়ে পড়লো। সুতরাং, শিশুটিকে দেখবার ভার আমারই ওপর বর্তালো।

"তখন ডিসেম্বর মাস, তীব্র শীত। আর কী বিচিত্র সেই রাত্রি! এই মাত্র আমার রক্ষিতাটি ঘর ছেড়ে গেছে। আমি একা একা ডিনার খেলুম। তারপর সন্তর্পণে প্রবেশ করলুম সেই ঘরে, যেখানে শিশুটি ঘুমন্ত।

"আগুনের সামনে চেয়ার টেনে বসে পড়ি। শুকনো, হিমেল বাতাস বাইরে ঝড় তুলেছে, জানালায় ওদের আছাড়ি-পিছাড়ি, জানালার কাঁচ দিয়ে আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি শীতের বিশাল আকাশ, অজস্র নক্ষত্রের জ্বল জ্বল চোখ।

"তখন, ক্রমশঃ, আমার মগজকে আক্রমণ শুরু করে গত এক মাস ধরে লালিত বিকট আচ্ছন্নতা। এই নিশ্চুপ বসে থাকা মুহূর্তগুলিতে শয়তানটা আমাকে সম্পূর্ণ অধিকার করে ফেলে। কর্কট রোগ যেমন মাংসে পচন ধরায় ও স্ফীতি ঘটায়, অস্বাভাবিক ভাবনাটাও তেমনি আমার সমস্ত শুভবুদ্ধিতে ক্ষয় ধরাচ্ছে। আমার মগজে, হৃদয়ে, গোটা শরীর জুড়ে এই বিপর্যয়কর পরিকল্পনা একটা বন্য পশুর মতন তা আমাকে অহরহ কামড় মারছে।

আমি অবশ্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি এর হাত থেকে রেহাই পেতে, মনের গতি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করছি, নতুন কোন আশার আলো খুঁজছি, যেন কেউ জানালা খুলে রাত্রিকালীন আবদ্ধ বাতাসকে বের করে দিতে চাইছে প্রথম বেলার মুক্ত আকাশে! কিন্তু একটি মুহূর্তের জন্যও এর হাত থেকে মুক্তি পেলাম না, পাচ্ছি না। ব্যাখ্যার অতীত যন্ত্রণা। শরীর ও মনে আমি সেই অদৃশ্য শয়তান দ্বারা সম্পূর্ণ প্রভাবিত।

"আমার জীবন শেষ! এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের হাত থেকে মুক্তির কি উপায়? কি ভাবে এই বাধা অতিক্রম করি?

"এবং আমি তোমাদের মায়ের প্রেমে সেসময়ে অন্ধ; প্রেমের আকুতি, বাসনা-পূরণের ইচ্ছা আমাকে আরো ভয়ানক ও বেপরোয়া করে তুলছে।

"ভয়ানক ক্ষোভ ও হিংসা মস্তিষ্কে দাপাদাপি রত···আমাকে পাগল করে দেবে···পাগলামি! হাঁ, আমি পাগল, সেই রাতে আমি পাগলই!

"শিশুটি ঘুমিয়ে আছে। উঠে দাঁড়াই, এগিয়ে যাই, ঘুমন্ত মুখের উপর ঝুঁকে দেখতে থাকি। এই তো সে, ছোট্ট অবাঞ্ছিত, আমার সুখ-সঙ্কল্পকে যে কাজে পরিণত হতে দিচ্ছে না, যার কারণে প্রাণটি আমার বিষময়।

ঘুমিয়ে আছে, ঠোঁট দুটি ঈষৎ উন্মুক্ত; একরাশ বালিশ দিয়ে ঘেরা এই বিছানা, যেখানে শুয়ে ইদানীং আমার ঘুম আসে না। ··আমি কি করতে যাচ্ছি? মস্তিষ্কের উত্তপ্ত মালমশলা আমার ভেতর কোন শপথের জন্ম দিচ্ছে? আমি কি সেই শপথের গুহ্য তাৎপর্য অনুভব করতে পারছি? . নাকি, এই হিংস্র চিন্তা খামকা আমাকে নাড়িয়ে দিয়ে বিদায় নেবে?···শুধু বুঝতে পারি, বুক কাঁপছে, ভীষণ রকম কাঁপুনি লেগেছে; মনে হচ্ছে, হাতুরি ঠুকে ঠুকে কে বুঝি দেয়াল ভাঙছে! কিছুই আর অবিকৃত অবস্থায় নেই! অনুভূতি বলতে এই টুকুই, অন্য সব তো আমদানী করা হিংস্র আচ্ছন্নতায় বিলুপ্ত। মগজ তখন অদ্ভুত এলোমেলো—পরিকল্পনাহীন, কোন কিছু নিয়ে আগাপাস্তলা ভাববার শক্তি আমার নেই, সাধারণ বোধ-বুদ্ধি বিলকুল লোপ পেয়েছে। এমন বিপর্যয়কর ফ্যাসাদে মানুষ কদাচিৎ নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। নিজের ইচ্ছা ও কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা আর আমার নেই!

"শিশুটির শরীর 'যথোচিত ঢেকে রাখা হয়েছিল যে চাদরে, আমি সন্তর্পণে সেটি তুলে ফেলি। আমি আমারই সন্তানের উলঙ্গ রূপ দেখলাম। সে তখনো নিশ্চুপ, ঘুম থেকে জেগে উঠবার কোন গরজ' তার নেই। আমি

তখন ফিরে গেলাম জানালার কাছে, গতি পূর্ববৎ মন্থর ও শব্দহীন ; এবং জানালার কাছে পৌঁছে নিঃশব্দে জানালার কপাট খুলে ফেললাম।

"সঙ্গে সঙ্গে ঝলকে ঝলকে ঠাণ্ডা হিম বাতাস খুনীর মত এ ঘরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ; এত ঠাণ্ডা যে নিজেই কুঁকড়ে পড়ছি ! মোমবাতিটা নিভে গেল। সেই হিম-উৎস জানালার সামনে আমি মূর্তিবৎ, ফিরে তাকাবার সাহস নেই। আমার পিছনে এই মুহূর্তে কি প্রতিক্রিয়া ঘটছে, যাচাই করবার মানসিক বল হারিয়ে ফেলেছি। আমার কপাল, বুক, হাত, পা—সর্বত্র মৃত্যুর শীতলতা বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ঐ বাতাস। বহুক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে থাকি।

"আমি তখন কিছু ভাবতে পারছি না। চিন্তাশক্তি উবে গেছে। হঠাৎ শ্লেষ্মাজড়িত একটা আওয়াজ শুনতে পেয়ে চকিতে সক্রিয় হয়ে উঠি। আমার মাথা থেকে পা দারুণ কেঁপে ওঠে এবং তৎপরতায় জানালার কপাটগুলি বন্ধ করে দিই। তারপর ঘুরে তাকালাম, ছুটে গেলাম শিশুটির দিকে।

"সে তখনো ঘুমিয়ে আছে। মুখ হা। নিরাভরণ। আমি কাঁপা হাতে ওর পা দুটো স্পর্শ করি। একেবারে বরফ। চাদরটা টেনে দিই।

"ঠিক তখনই আমার মন দুর্বল হয়ে পড়ে। বিবেক মাথাচাড়া দেয়। দুঃখ ও অনুতাপ প্রভাব বিস্তার করে। আমার কষ্ট হলো, মায়া জাগলো ঐ ছোট্ট শিশুটির প্রতি, যাকে হত্যার নীরব ষড়যন্ত্র এঁটেছিলাম আমি। তার পাতলা চুলে গভীর চুম্বন এঁকে দিয়ে আবার এসে আসন গ্রহণ করি আগুনের সামনে।

"ভয় ও বিহ্বলতা নিয়ে তখন আমি নিজেকে বিচার করছি—আমি কি করেছি ! উত্তেজনার বশে মানুষ কত সহজে তার বিবেক ও কর্তব্যকে বিসর্জন দেয়। ঝড়ের মুখে পতিত জাহাজের মতন দিশেহারা অবস্থা !

"আর একবার শিশুটির শ্লেষ্মা জড়ানো কাশি শোনা গেল। ঐ শব্দে আমার বুক বিদীর্ণ ! যদি ও মারা যায় ! হা, হা ঈশ্বর ! ভগবান ! আমার কি হবে ?"

"আবার একটা মোমবাতি ধরিয়ে বিছানার কাছে চলে গেলাম। ওর স্বাভাবিক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দেখে খানিকটা নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু তৃতীয়বার সে যখন বিশ্রী ভাবে কেশে উঠলো, আমি এমন আঁতকে উঠলাম যেন কোন ভয়ানক বস্তু দর্শন করছি। উত্তেজনায় আমার হাত থেকে মোমবাতিটা খসে পড়ে।

"নীচু হয়ে মোমবাতিটা তুলে নেবার পর বুঝতে পারি, যন্ত্রণা ও অনুশোচনার ঘামে আমি স্নান করে উঠেছি ! এ এক অকথনীয় গোপন-অত্যাচার, যা

আমাকে বস্তুত আগুনের মতন পুড়িয়ে মারছে এবং বরফের মতন হিম করে রাখছে; ত্বকের গভীরে এবং স্নায়ুমণ্ডলীর আধার মস্তিষ্কে এই একই বিপর্যয়!

"পরদিন ভোর হওয়া অব্দি আমি সেই শিশুর শিয়রে।··· সকালে সে জেগে ওঠাতে দেখা গেল, তার তুই চোখ দারুণ লাল, গলার ভেতরে গর গর আওয়াজ, পরিষ্কার অসুস্থতার লক্ষণ।

"বাড়ির ঠিকা ঝি আসা মাত্রই তাকে পাঠালাম ডাক্তার ডাকতে। ঘণ্টাখানেক পরে ডাক্তার এলেন; শিশুটিকে পরীক্ষা করার পর বললেন:

"ওকে কি ঠাণ্ডা লাগানো হয়েছিল?"

"না, সে রকম তো মনে হয় না"—আমার জবাব বৃদ্ধ মানুষের মতন কাঁপা কাঁপা অস্পষ্ট।

"তার পর জিজ্ঞেস করি:

"আপনার কি মনে হয়? সাংঘাতিক কিছু?"

"আমি এখনই বলতে পারছি না", ডাক্তার বললেন, "সন্ধ্যার সময় আর একবার এসে দেখে যাবো।"

"সন্ধ্যার সময় ডাক্তার আবার এলেন। আমার শিশুটি সারাটা দিন "ধুঁকলো, সর্দি ও কাশিতে বুক-গলা জমে আছে যেন, থেকে থেকে কাশছে।··· রাত্রে শ্বাসযন্ত্রের অবস্থার আরও অবনতি ঘটলো।

"তারপর মাত্র দশটি দিন। ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারবো না, এই দশটি দিন আমি কি তুঃসহ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছি। খুনী যখন অনুতপ্ত হয়, তখন তার এমনটিই হয়ে থাকে।···

"সে মারা গেল।···

"এবং সেই থেকে আমি একটা ঘণ্টাও, না, একটি মুহূর্তও স্বস্তিতে কাটাতে পারিনি। প্রতি ক্ষণে, শয়নে-জাগরণে সেই স্মৃতি আমাকে যন্ত্রণা দিয়ে চলেছে! যেন সর্বক্ষণ আমার বুকে বাঁধা রয়েছে একটা ভীত পশু।

"হায়! আমি যদি পাগল হয়ে যেতে পারতাম!"

মঁসিয়ে পোরিল ছ লা ভল্‌তের দলিল পাঠ শেষ। উকিলসুলভ গাম্ভীর্যে তিনি তাঁর চশমাটাকে আর একটু ঠেলে দিলেন। তিনজনই একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে নীরব, নিশ্চল।

মুহূর্তখানেক পর উকিল মন্তব্য করলো, "এটা অবশ্যই নষ্ট করে ফেলতে হবে!"

অপর তু'জন সায় দিলো। দলিলের স্বীকৃতি-পৃষ্ঠাটি ছিঁড়ে আগুন ধরানো

হলো। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, কি-ভাবে সেই স্বীকারোক্তি পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে! তবু কয়েকটা অক্ষর যেন দেখা যাচ্ছিলো। মেয়েটি মরিয়া হয়ে সেই অংশটি পায়ে দলিয়ে গুঁড়ো ক'রে ফেলে। তারপর পোড়া ছাইগুলি চিমনির মধ্যে ফেলে দেয়।

এরপরও কিছুক্ষণ তারা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। যেন ওদের আশঙ্কা, এখনই চিমনির ভেতর থেকে গোপন সত্য বেরিয়ে এসে আত্মপ্রকাশ করবে!

দানবদের মাতা

[The Mother of Monsters]

সেই ভয়ানক কাহিনী, যা বিলকুল রেওয়াজ-বহির্ভূত, আমার মনে আছে; মনে আছে, বিস্ময়ের উদ্বোধক সেই ভয়ানক মহিলার কথাও, যাকে একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে স্পষ্ট লক্ষ্য করতে পারছিলাম—সে দাঁড়িয়েছিল সমুদ্রের সামনে, প্যারির সর্বমহলে তার পরিচিতি, বয়সে যুবতী, রূপে কিন্নরী লাস্যময়ী, সার্বজনীন প্রেম ও সম্মানের পাত্রী।

আমার এ গল্পের বয়স অনেক। কিন্তু কালের কলহ-কচকচিতে, সুখে বা, দুঃখে নেহাৎ ভুলে যাবার নয়।

আমার এক বন্ধুর আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম তার শহরতলির আবাসে দিনকতক কাটিয়ে আসতে। বন্ধু তার জিলা-শহরের গৌরব বৃদ্ধির আশায় তামাম শহর জুড়ে আমাকে নিয়ে চক্কর কাটতে শুরু করে। অপরিমিত উৎসাহে সে আমাকে দেখালো স্থানীয় সব সেরা সেরা বস্তু—মস্ত মস্ত জমিদার-প্রাসাদ, বয়সপ্রাচীন বিশাল দুর্গ, স্থানীয় শিল্পকেন্দ্র এবং ঐতিহাসিক ধ্বংসস্তূপগুলি, যাদের আঁটাল আকর্ষণীয় ক্ষমতা অস্বীকার করা যায় না; শহরময় সফরকালে সে আমাকে দেখিয়েছিল আরো অনেক কিছু, যথা—দু'টি একটি স্তম্ভ, গির্জা, ঝুল ঝুল মাকড়সার জাল সমেত গথিকরীতির কারুকার্যমণ্ডিত প্রাচীন দরওয়াজা, অপেক্ষাকৃত নির্জনে বেড়ে ওঠা পল্লবিত, বনস্পতি, নিছক পর্যবেক্ষণে যার বয়স নির্ণয় দুঃসাধ্য…।

আমি আমার সাধ্যানুসারে জোরালো উৎসাহ দেখালাম ইত্যাকার দ্রষ্টব্য দর্শনে, যদিও পরিশেষে বন্ধুবর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে স্বীকার করলো, এইগুলি বাদ দিলে আর কিছুই দেখবার নেই সেই জায়গায়। আমি বুক ভরে দম নিই।

চোখের সামনে যে ছায়ানিবিড় বনস্পতি, তারই ছায়ায় দু'দণ্ড বিশ্রাম নিতে উদ্যোগী হই ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ত্রস্তে বন্ধু আমাকে বাধা দেয়, "কেন, না, ওর নীচে কেউ যায় না ! ওটা যে দানবের মাতার আস্তানা !"

"সে আবার কে ?" আমি প্রশ্ন তুলি, "দানবের মাতা আবার কে ?"

সে উত্তর দেয়, "সে এক ভয়ানক মেয়েমানুষ, সাক্ষাৎ রাক্ষসী ! প্রতি-বৎসর ওখানে সে স্বেচ্ছায় একরাশ বিকৃত চেহারার ভয়ানক রাক্ষস-সন্তানের জন্ম দেয় এবং তাদের বিক্রী করে দেয় মুরগী-শাবক-ব্যবসায়ী যাযাবরদের কাছে।

"আর ঐ বেদুইনদের চাল-চলনও স্বাভাবিক সমাজে বরদাস্ত করবার নয়, সবকিছুই ভূতুড়ে। তারা দানবমাতার প্রসবকালে এসে হাজির হয় এবং বাচ্চাগুলিকে কিনে নেয়।

এ পর্যন্ত এরকম এগারোটি বাচ্চার জন্ম দিয়েছে দানবমাতা এবং তাদের বিক্রী করে যথেষ্ট পয়সাও সে কামিয়েছে।

তুমি হয়তো ভাবছো, আমি ঠাট্টা করছি বা, অতিরিক্ত রং ফলিয়ে বলছি। না, বন্ধু, আমি সত্যি কথাই বলছি, নির্ভেজাল অঙ্গীকারসিদ্ধ সত্যি কথা।

এসো আমার সঙ্গে, সেই মেয়েমানুষটাকে তোমায় দেখাবো। তারপর শোনাব সেই গল্প, কি ভাবে সে দানব-সৃষ্টির এক কারখানায় পরিণত হলো !"

এই অব্দি বলেই বন্ধু রহস্যের উৎস দেখাতে আমাকে নিয়ে চললো শহর-তলীর প্রান্তিক অঞ্চলে।

মেয়েমানুষটি বাস করে রাস্তার ধারে একটি ছোট্ট সুন্দর বাড়িতে। বেশ সাজানো গুছানো আবাস। বাহারে বাগান, দেখলে রোমাঞ্চ জাগে, অজস্র ফুল, বাতাসে সুগন্ধ। বাগানে ঘেরা এমন একটি মনোরম বাড়ি দেখলে যে কেউ ভাবতে পারে, হয়তো এখানে কোন অবসরপ্রাপ্ত আইন ব্যবসায়ী বসবাস করেন !

এক পরিচারক আমাদের এনে বৈঠকখানায় বসায় এবং কিছুক্ষণের মধ্যে সেই দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবটির আবির্ভাব ঘটে।

তার বয়স আন্দাজ চল্লিশ, দীর্ঘাঙ্গী, পেশীবহুল সমর্থ শরীর, যেন কোন চাষী পরিবারের প্রচণ্ড কায়িক পরিশ্রমে অভ্যস্তা স্ত্রীলোক, অত্যধিক কাঠিন্য তাকে যেন অর্ধ-পশু অর্ধ-নারী করে রেখেছে। তার রূপ-দর্শনে মানসিক প্রতিক্রিয়া

সম্পর্কে সে নিশ্চয় সচেতন, সেই কারণেই তার বিদ্রূপাত্মক কর্কশ স্বর ধ্বনিত হয়, "মশাইদের উদ্দেশ্যটা কি ?"

আমার বন্ধু জবাব দেয়, "শুনলাম, আপনার শেষ সন্তানটি নাকি আর পাঁচটা স্বাভাবিক শিশুর মতনই দেখতে হয়েছে, অন্ততঃ তার ভাইদের মতন নয়। ব্যাপারটার সত্যতা যাচাই করতে আমরা উৎসুক।"

আমাদের বায়নায় দানবমাতার মেজাজ নিশ্চয় আরো খিঁচড়ে গেল, তার চোখে ক্রোধ ও ঘৃণামিশ্রিত বিস্ময় ; বললো, "আরে না-না ! বরং সে আমার অন্যান্য সন্তানদের চেয়েও দেখতে কুৎসিত ও ভয়ানক হয়েছে।... জানি না, ঈশ্বর আমার মত হতভাগিনীর প্রতি আর কত নিষ্ঠুর হবেন !"

বলতে বলতে তার স্বর পরিবর্তিত হয়, কান্না-ভেজা আওয়াজ ; সে নতমুখী, যদিও বন্য পশুর মতন দেখাচ্ছে তাকে। এক বিশাল হাড়-প্রধান শরীর থেকে নির্গত ঐ করুণ আর্তি কেমন যেন অস্বাভাবিক ও গোলমেলে মনে হয়।

"আমরা আপনার শিশুটিকে দেখতে ইচ্ছুক।"—বন্ধু বললো।

ওর গালে যেন ঈষৎ লজ্জাজনিত রক্তিমাভা দেখা গেল। অথবা আমারই কি দেখবার ভুল ?

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর অপেক্ষাকৃত চড়া স্বরে সে প্রশ্ন করে, "বাচ্চা দেখে কি হবে ?"

প্রশ্নটা করেই দানবমাতা মাথা নাড়ায়, দুই চোখ যেন চকিতে জ্বলে ওঠে।

"কেন, আপনি কি আপনার বাচ্চাকে আমাদের দেখাতে চাইছেন না ?" আমার বন্ধু নির্দয় ভাবে বললো, "অন্য অনেককেই তো প্রসবের পরে বাচ্চা তুলে দেখান। নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, আমি কাদের কথা বলছি।"

বন্ধুর বক্তব্যে যেন দানবমাতার ভেতর সন্ত্রাসের সঞ্চার ঘটে, কেঁপে ওঠে তার শরীর, গলার স্বরও পৌঁছে যায় সপ্তমে, "এই জন্যই বুঝি এই জাহান্নামে আসা ? শুধু আমাকে নিয়ে মস্করা করবার বদ মতলব ? কারণ, আমার মাথায় মানুষের মগজ নেই, পশুর, এ্যাঁ ? বেশ, আমি আমার আত্মজনদের দেখাবো না, দেখাবো না, না, না, না, ! বেরিয়ে যান এখান থেকে। আমি আপনাদের সকলকে চিনি, জানি, কিসের ফিরিস্তি নিয়ে আমার কাছে আসেন ! আমাকে এইভাবে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যন্ত্রণা দেওয়া !"

জানুর ওপর হাত রেখে অতি জীবন্ত বিভীষিকার মতন সে আমাদের দিকে এগিয়ে আসে। তার ঐ তপ্ত সপ্তম-আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই পাশের ঘর থেকে

আর একটি বিজাতীয় স্বর ভেসে আসে—মনে হয়, যেন পাগলের গোঙানি অথবা, কোন অসুস্থ বিড়ালের ডাক। আমার মজ্জায় মজ্জায় কাঁপুনি লাগে।

আমরা ওর সামনে থেকে ফিরে চলি।

বন্ধু ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে আমাকে বলে, "একটু সাবধানে থেকো, ওটা তো একটা ডাইনী! সুযোগ পেলেই ক্ষতি করবে!"

বন্ধুর উক্তি শুনে মেয়েমানুষটি তেলে-বেগুনে আরো জ্বলে ওঠে, দুই হাত শূন্যে নাড়াতে নাড়াতে চিৎকার করে, "বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান বলছি! আমি ডাইনী! অসভ্য, ইতর, পশু কোথাকার!"

সে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিল আমাদের ওপর। তার আগেই অবশ্য আমরা সরে পড়ি। রীতিমত আতঙ্কগ্রস্থ অবস্থা।

বাড়ির বাইরে আসার পর বন্ধুর প্রথম জিজ্ঞাসা, "এবার তো দেখলে। কি ধারণা হলো ওর সম্পর্কে?"

বললাম, "আমি ওর নিষ্ঠুর ইতিহাস জানতে চাইছি।"

তারপর সাদা উঁচু পথে পায়চারি করতে করতে, রাস্তার দু'ধারের পাকা শস্যের ঘ্রাণ নিতে নিতে আমি শুনলাম এক ভাগ্যহীনার বিচিত্র ইতিহাস।

আজ যার পরিচিতি 'দানবের মাতা', এককালে সে যখন বালিকা ছিল, কাজ করতো এক খামারে। দারুণ কাজের মেয়ে, ব্যবহার চমৎকার, নিয়ম মাফিক সাবধানে দায়িত্ব পালন করে। তার কোন প্রেমিক ছিল বলে শোনা যায়নি; বা, সে-ধরণের কোন দুর্বলতাও তার ছিল না।

তবু শস্যকাটার এক মরশুমী রাতে, এই সব ভাগ্যহীনা অসহায় মেয়েদের কপালে যা ঘটে থাকে, তারও তেমন এক অভিজ্ঞতা হলো। আকাশে তখন ঝড়ের পূর্বাভাষ, নিথর বাতাসে হলকা, মেয়েটিকে শুইয়ে ফেলা হয়েছে পাকা শস্যের গাদায় এবং সে প্রথম অসহ্য যৌনস্বাদ অনুভব করছে; তার এবং পুরুষটির ঘন ঘন আন্দোলিত শরীর ঘামের বন্যায় টস্ টসে।

ঐ একটি রাতের অভিজ্ঞতার পর সময় পেরিয়ে গেল জোর কদমে। একদিন সে অনুভব করলো, তার জঠরে সন্তান। ভয়ে ও লজ্জায় সে দিশেহারা হয়ে পড়ে। তার তখন একমাত্র লক্ষ্য, যেমন করেই হোক এ কলঙ্ককে ধামা চাপা দিতেই হবে! লজ্জা ও কলঙ্ককে ঢাকতে সে এক মারাত্মক উপায় উদ্ভাবন করলো,—কাঠ ও দড়ির সাহায্যে সে তার পেটটাকে প্রচণ্ড শক্তিতে বেঁধে রাখে। যত দিন যায়, ততই বাঁধন কঠিনতর হয়—তার উদরের স্ফীতি যেন কারুর

নজরে না আসে। এই উপায়েই সে তার অনাগত সন্তানের ভবিষ্যৎ-নির্দেশ করলো।

যন্ত্রণা অনুভব করতো। কিন্তু সে তা সহ্য করতো সাহসের সঙ্গে। সে তখন জোর করে আরো চটপটে, আরো নিপুণ। এমন চাল-চলন দেখাতো, যেন কেউ সন্দেহ করতে না পারে, কী যন্ত্রণা তার জঠরে। অনেক কষ্টে মুখের ভাব শান্ত ও নিরুদ্বেগ রাখে, যদিও শরীরের ভেতর আর একটা শরীর ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠতে চায় এবং সে ওর বৃদ্ধি-নাশ করবার জন্য ঝাঁকানি দিয়ে আরো কষে পেট বাঁধে দড়ি ও কাঠে। পোশাকের নীচে সে এক অভিনব মারণাস্ত্র, যার হদিশ অন্য কেউ বুঝতে পারছে না। মা হবার মাদকতাকে নিষ্ঠুরভাবে খতম করবার এ এক অভাবনীয় প্রয়াস! সে পরিকল্পিত উপায়ে তার সন্তানকে ধ্বংস করছে,—শিশুটির চেহারা গঠিত হচ্ছে বিকৃত ভাবে, অমানুষ কল্পিত দানবের যেন জন্ম দিতে চলেছে সে। মাথাটা সম্পূর্ণ চ্যাপ্টা, কপালটা ভেঙ্গে একটা বিন্দুতে এসে ঠেকেছে, দুটো বিরাট চোখ সেই কপাল ঠেলেই বেরিয়ে আসতে চায়। হাত-পা ভেঙ্গে গেছে এবং দ্রাক্ষালতার মতন ঝুলছে; আঙুল এবং পায়ের পাতা মাকড়সার মতন। ধড়টা খুব ছোট ও একটা সুপারির মতন গোলাকার।

বসন্তকালের এক সকালে খোলা ময়দানে সে ঐ আজব জীবটিকে প্রসব করলো। আশে-পাশের অনেক মেয়েরা তাকে সাহায্য করতে ছুটে এসেছিল। কিন্তু নবজাতকের বীভৎস রূপ দেখে তারা ভয়ে পালিয়ে যায়। লোকের মুখে মুখে গল্প ছড়ায়,—ঐ মেয়েটা এই পৃথিবীতে একটা দানবের জন্ম দিয়েছে! তখন থেকেই তার পরিচিতি 'দানবমাতা' বা 'ডাকিনী'।

তার কাজ গেল। পাঁচজনের দয়ার ওপর তাকে বেঁচে থাকতে হলো। অথবা, তার গোপন প্রেমিকরাই তাকে বাঁচিয়ে রাখলো। কারণ, আর যাই হোক, তার যৌবন ও রূপ ছিল, যার আকর্ষণে অনেক-লোকই নরকে যেতে ভয় পায় না!

মার তীব্র লোভ ও বন্য ঘৃণা সত্ত্বেও দানবটির কিন্তু বয়স বাড়তে থাকে। মেয়েমানুষটার মনে তখন অন্য এক ভয় ঢুকেছে,—সে হয়তো আইনের চোখে অপরাধী সাব্যস্ত হবে।

অবশেষে একদিন একদল চলমান যাযাবর ঐ দানব-জন্মের গল্প শুনে তার কাছে এসে হাজির হয় এবং শিশুটিকে দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। শিশুটিকে

দেখে তাদের পছন্দ হয় এবং অমন এক আজব প্রাণী দেখিয়ে প্রচুর কামাবার মতলবে বাচ্চাটিকে পাঁচ শ' ফ্রাঁ দিয়ে কিনে নেয়।

সে কিন্তু প্রথমে লজ্জায় বাচ্চাকে দেখাতে চায়নি। কিন্তু পরে সে আবিষ্কার করলো, তার পক্ষে এই দুনিয়ায় স্বচ্ছলতার সঙ্গে বেঁচে থাকবার এটাই সর্বোত্তম উপায়। যাযাবরদের সঙ্গে সে রীতিমত দরাদরি করেছিল, একটি পেনিও কম নিতে রাজি হয়নি। উপরন্তু, ওরা তাকে কথা দিতে বাধ্য হলো, এই শিশুটিকে প্রদর্শনীতে রেখে তারা যে টাকা কামাবে, তার থেকে বাৎসরিক চার শ' ফ্রাঁ শিশুর মাকে দিয়ে যাবে।

হঠাই এই সৌভাগ্যের চমক মেয়েমানুষটার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে; সে আবার নতুন করে জন্ম দিতে আগ্রহী হয়,—অপরিসীম উৎসাহে সে একের পর এক দানবের জন্ম দিতে চায়। এই তো সেই পথ, যার দ্বারা উচ্চশ্রেণীর লোকদের মতন সেও নির্দিষ্ট আয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে!

যেহেতু বার বার গর্ভবতী হবার মতন অঢেল উর্বরতা তার ছিল, তার উচ্চাকাঙ্খা অদ্ভুতভাবে সফল হলো। সন্তান গর্ভে আসবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় তার উৎকট পীড়ন; অত্যাচারের নতুন নতুন পদ্ধতি বের করে সে নবজাতকের চেহারাতেও তারতম্য ঘটাতে শুরু করে। গুটিকয়েক সন্তান মারাও গেল এবং লোকসান হওয়ায় সে খুব দুঃখিতও হয়েছিল।

তার জীবিত সন্তানদের সংখ্যা বর্তমানে এগারো, যারা তার বাৎসরিক আয়কে এনে দাঁড় করিয়েছে নিদেনপক্ষে দু' হাজার ফ্রাঁতে। শুধু একটি শিশুকে সে এখনো প্রদর্শকদের হাতে তুলে দেয়নি, যাকে আমরা দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বেশীদিন নিজের কাছে রাখবে বলেও মনে হয় না, কারণ ইতিমধ্যেই দুনিয়ার যত সার্কাস-মালিক তার আস্তানার সন্ধান পেয়ে গেছেন। তাঁরা এসে সময়ান্তরে খোঁজ নিয়ে যায়, মেয়েমানুষটা নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারলো কি না! প্রতিযোগিতার বাজারে ক্রমশই ওর বাচ্চাদের দাম বাড়ছে এবং এর পুরোপুরি সুযোগ নিতে তার কোন ভুল নেই।

বন্ধু নীরব হলো। আমার অন্তর জুড়ে ঘৃণা। শুধু ঘৃণা কেন, ক্রোধ ও ক্ষোভ। ইচ্ছে হচ্ছে, ঐ শয়তানীটাকে ধরে উত্তম-মধ্যম দিই!

"কিন্তু ওদের জনকটি কে?"—আমি জিজ্ঞাসা করি।

"কেউ বলতে পারে না," বন্ধু জবাব দেয়, "একজনও হতে পারে, আবার একাধিক নাগর থাকাও বিচিত্র নয়। তবে সে বা, তারা লুকিয়ে-চুরিয়ে দিব্যি কম্মটি করে যাচ্ছে। হয়তো বখরাও পায়।"

আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে আর মাথা ঘামাইনি।

কিন্তু অন্য একদিন অন্য এক ঘটনা দেখে আবার আমার মাথায় রক্ত চড়ে যাবার উপক্রম। সমুদ্র-তটে সুন্দর এক পরিবেশে আমি সেদিন দেখলাম, এক অপূর্ব রূপসীকে, যাকে ঘিরে ধরে আছে বহুলোক এবং যার প্রতি সম্ভ্রম জানাতে প্যারির একাধিক লোক উদ্‌গ্রীব!

আমি আমার এক ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে হাত ধরাধরি করে সেই জমায়েতের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। দশ মিনিট পর লক্ষ্য করলাম, একজন নার্স বালু বেলায় গড়াগড়ি যাওয়া তিনটি শিশুকে আগলাচ্ছে। এক জোড়া খঞ্জের যষ্টি করুণ ভাবে পড়ে আছে বালিতে। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, শিশু তিনটির গড়ন—ওদের মানুষ বলে সনাক্ত করা দায়, ভাঙ্গা-চোরা দেহ, কুঁজো ও খোড়া! বিচিত্র তিনটি জীব।

ডাক্তার আমাকে বললো, "ঐ তিনটি শিশু হলো সুন্দরী মহিলাটিরই সন্তান।"

শুনে আমার করুণা হলো বাচ্চাগুলো এবং তাদের মার জন্য।

"ভাগ্যহীনা মা!" আমি বিষণ্ণ বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করে উঠি, "কি ভাবে তিনি এখনো হাসতে পারেন?"

"অত দুঃখে কাতর হয়ো না বন্ধু," ডাক্তার বললো, "দুঃখ জানাবে শুধু হতভাগ্য শিশু তিনটির জন্য। নিজের শরীরের জেল্লা বজায় রাখবার জন্য ওদের মা তার সন্তানদের জঠরেই অমন বিকৃতি সাধন করেছে। এর জন্য এই মুহূর্তে তার কোন অনুতাপ নেই, কারণ এখনো সে তার অটুট সৌন্দর্য নিয়ে সমান আকর্ষক!"

এবং তখনই আমার মনে পড়লো সেই দানবমাতা ডাইনীর কথা, যে তার সন্তানদের বিক্রী করে পয়সা কামাচ্ছে।

বৃদ্ধ জুডাস

[Old Judas]

গোটা শহর জুড়ে বিস্ময়ের হিল্লোল। কারণ, দুর্লক্ষণ বিনাশার্থে প্রায় এক ধর্মীয় আড়ম্বরের সামিল এরা।

চারিদিকে নিরলংকার উজল পর্বতশ্রেণী, যেখানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দুটি একটি ওক গাছ ছাড়া আর কিছুই জন্মায় না, বাতাসের দাপটে সেই সব খামখেয়ালী গাছগুলি হেলছে-দুলছে; আর লক্ষণীয়, পাড়ার ঘেরা একটি ছোট্ট হ্রদ, যার কালো নিথর জল চুম্বন করে হাজার হাজার নল-খাগড়ার ঝাঁড়।

এই বিষণ্ণ-হ্রদের ধারে একটি ছোট্ট নীচু বাড়ি তামাম দুনিয়া থেকে যেন বিচ্ছিন্ন; বাড়ির মালিক বৃদ্ধ যোশেফ জাতে মাঝি, পেশায় জেলে। প্রতি সপ্তাহে সে তার মাছ নিয়ে নেমে আসে কাছাকাছি গ্রামগুলিতে এবং যা উপায় করে, তাতে এই পৃথিবীতে কোন রকমে তার অস্তিত্বটুকু বজায় আছে।

আমার বাসনা ছিল, একদিন এই সন্ন্যাসীকে দেখতে যাবো। ইচ্ছাপূরণেও অবশ্য বিলম্ব ঘটেনি। একদিন সে নিজে আমাকে আমন্ত্রণ জানালো তার সঙ্গে জাল টানতে। আমন্ত্রণ গ্রহণ করলুম।

তার নৌকাটি পোকায় কাটা জীর্ণ ও গোলাকার। হাড়পুষ্ট শীর্ণ দেহে আশ্চর্য শান্ত তন্ময়তায় সে দাঁড় টানছে এবং তার ঐ ছন্দবদ্ধ প্রয়াস আমার মনের গভীরতাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়; বিশাল চরাচর ও ঝুলন্ত আকাশের বিষণ্ণতা আচ্ছন্ন করে রাখে। এই প্রাচীন হ্রদে তরঙ্গরিয়ে এগিয়ে যাওয়া জীর্ণ বোট, দাঁড় হাতে এক গম্ভীর বয়স্ক রহস্যময় লোক,—মন আমার সুদূর পিয়াসী হয়ে ওঠে; ভাবি, আমি বুঝি আদিম পৃথিবীতে ফিরে গেছি।

বাইবেলে বর্ণিত মৎস্যশিকারীর মতন সে জাল টেনে তোলে, মাছগুলিকে এনে রাখে পায়ের কাছে। তারপর আমাদের ডিঙ্গী চললো বিলের অন্য প্রান্তে। হঠাৎ নজরে এলো, হ্রদের অন্য তীরে একটি ধ্বংসস্তূপ, ভাঙ্গাচোরা কুটীরের শূণ্যতা এবং তার দেয়াল ঘেঁষে একটা ক্রুশ, বিশাল রক্তবর্ণ ক্রুশ; অস্তমিত সূর্যের আভায় মনে হচ্ছে, ক্রুশের সর্বাঙ্গ বেয়ে রক্ত ঝরছে।

"ওটা কি?"—জিজ্ঞাসা করি।

সঙ্গে সঙ্গে ক্রুশ আঁকে, জবাব দেয়:

"ঐ সেই জায়গা, যেখানে জুডাস মারা গিয়েছিলেন।"

জবাব শুনে অবাক হলাম না; এমনই কিছু একটা শুনতে পাবো, আশা করেছিলাম।

কিন্তু আমি পিড়াপিড়ি করতে শুরু করি:

"জুডাস? কে জুডাস?"

সে বললো, "স্যর, তিনি ছিলেন এক ভ্রাম্যমান ইহুদি।"

আমি তার কাছে পুরো উপকথাটি শুনতে চাইলুম।

কিন্তু না, এটি উপকথার চেয়ে মহত্তর, এটি ইতিহাসের এক খণ্ডাংশ—প্রায় সমসাময়িক কালের ইতিহাস, কারণ বুড়ো যোশেফ তাকে চিনতো।

একসময় ঐ কুটীরে বাস করতো এক দীর্ঘাঙ্গী ভিখারিণী। লোকের অনুগ্রহের ওপর তাকে নির্ভর করতে হতো। ঠিক কার কাছ থেকে সে যে ঐ কুটীরের মালিকানা পেয়েছিল, বৃদ্ধ যোশেফ মনে করতে পারছে না।

এক রাত্রে সেখানে এক বিচিত্র বৃদ্ধের আবির্ভাব ঘটলো ; তার চুল-দাড়ি ধব ধবে সাদা, বয়স যেন দু'শতাব্দী পার হয়ে এসেছে, ঠিক মতন পা ফেলে ফেলে চলতে পারে না ; ঐ কুটীরের পাশ দিয়ে যাবার সময় সে ভিখারিণীর কাছেই ভিক্ষা চাইলো।

মেয়েমানুষটি বললো, "বাবা, আপনি বসুন। এখানে যা কিছু দেখছেন, তাতে এই পৃথিবীর সকলের অধিকার। এবং এইগুলি পৃথিবীরই দান।"

বৃদ্ধ কুটীরের সামনে একখণ্ড পাথরের ওপর আসন নেয়। তারপর ভাগ বসায় ভিখারিণীর রুটি, তরকারি এবং বাসস্থানের ওপর।

সে আর কখনো ওকে ছেড়ে যায়নি। তার পরিভ্রমণও তখন সমাপ্ত।

বৃদ্ধ যোশেফ আরো বললো :

"স্যর, ঐ ভিখারিণী আর কেউ নয়, যীশু খ্রীষ্টের মাতা, যিনি জুডাসের জন্য তাঁর কুটীরের দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন।"

কারণ, আগন্তুক জুডাস ছিলেন ভ্রাম্যমান ইহুদি।

ধারে-কাছের লোকেরা ব্যাপারটা প্রথমে খেয়াল করেনি। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তাদের সন্দেহ হলো ; কারণ, আগন্তুক প্রচণ্ড অভ্যাসের বশে অহরহ পায়চারি করতেন। আরো সন্দেহ হলো, আগন্তুক ও ঐ স্ত্রীলোক —দু'জনেই ইহুদি, কারণ কেউ কোনদিন তাদের চার্চে যেতে দেখেনি।

সকলেই এমনকি শিশুরাও ওদের দেখলে যিয়ুস্' বলে চিৎকার করে উঠতো।

সারাটা দিন ধরে ভিখারিণী ও বৃদ্ধ দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে বেড়াতেন, পথচারিদের সামনে হাত পেতে দাঁড়াতেন। কখনো তাঁদের দেখা যেত নির্জন পথে, কখনো গ্রাম্য ময়দানে ; কখনো তাঁরা গাছের ছায়ায় বসে রুটি চিবুচ্ছেন ; কখনো বা প্রচণ্ড দাবদাহে হেঁটে চলেছেন।

লোকটিকে সকলে ডাকতে শুরু করলো 'বৃদ্ধ জুডাস' বলে।

একদিন তিনি থলিতে ভরে নিয়ে এলেন পাঁচটি শূকর-ছানা। একজন খামার মালিককে রোগের হাত থেকে রক্ষা করায় এইগুলি লাভ করেছিলেন তিনি।

শীঘ্রই ভিক্ষায় যাওয়া বন্ধ করলেন তিনি। তখন তিনি ব্যস্ত শূকর-ছানাদের রক্ষণাবেক্ষণে। স্ত্রীলোকটি কিন্তু সারাদিন ভিক্ষা করছেন। সন্ধ্যার পর অবশ্য তাঁরা একসঙ্গে মিলিত হন।

তাঁদের সঙ্গে গির্জার যেন কোন সম্পর্কই নেই। এমনকি, তাঁরা কখনো ক্রুশও আঁকেন না। এই নিয়েই সাধারণ মানুষদের ভেতর যত জল্পনা-কল্পনা।

একদিন বৃদ্ধ জুডাসের সঙ্গিনী হঠাৎ অসুস্থা হয়ে পড়লেন, বাতাসে কাঁপতে লাগলেন ঠক ঠকিয়ে। অবস্থা ক্রমশই আয়ত্তের বাইরে চলে গেল। বৃদ্ধ ওঁকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করলেন। শেষে কুটীরের দরজা বন্ধ করে দু'দিন একটানা পড়ে রইলেন সঙ্গিনীর শিয়রে।

স্থানীয় পাদ্রী, ঘটনাটা শুনবার পর, স্থির করলেন, মৃত্যুপথের যাত্রিনীকে তিনি অন্তিমে ধর্মের বাণী শোনাবেন। কিন্তু ঐ কুটীরে উপস্থিত হওয়া মাত্র বৃদ্ধের দু' চোখে তিনি যেন আগুন দেখতে পেলেন। জুডাসের গালি-গালাজ ও অভিশাপ শুনে ফিরে আসতে হলো তাঁকে।

সঙ্গিনী মারা গেলেন।

জুডাস একাই কুটীরের সামনে তাঁকে কবর দিলেন। তাঁরা এত গরীব ছিলেন যে, এ নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামাতে এলো না।

এবার শুরু হলো তাঁর একক সংগ্রাম। তিনি শূকর-ছানা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, আবার ভিক্ষে করতেও বের হন। কিন্তু পাদ্রীর প্রতি তাঁর ব্যবহারের জন্য লোকেরা তখন তাঁর প্রতি বিমুখ। ভিক্ষে বিশেষ জোটে না।...

পবিত্র ইষ্টার মানডেতে একদল বালক বালিকা ঘুরতে ঘুরতে হ্রদের এ ধারটাতে চলে আসে। হঠাৎ তারা শুনতে পায়, কুটীরের ভেতর থেকে ভেসে আসছে কেমন একটা বিশ্রী চিৎকার। তারা কপাট ভেঙ্গে ফেলতেই হরিণের মতন লাফাতে লাফাতে এক জোড়া শূকর ছুটে পালিয়ে আসে ঘরের ভেতর থেকে। পলায়নপর ঐ চারপেয়ে পশু দুটোকে আর দেখা গেল না।

এরা সকলে ঘরে ঢুকে দেখলো এক বীভৎস দৃশ্য। বৃদ্ধ জুডাসকে তাঁর শূকররাই হত্যা করেছে! পড়ে আছে তাঁর খুলি ও টুকরো-টাকরা হাড়, রক্তে রক্তময়।

গল্প শেষে বৃদ্ধ যোশেফ মন্তব্য করলো:

"ঘটনাটা ঘটেছিল গুড ফ্রাইডেতে, ঠিক দুপুর তিনটের।"

জিজ্ঞেস করি, "আপনি কি করে জানলেন?"

সে বললো, "এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ প্রকাশ করা উচিত নয়।"

আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম না, ব্যাপারটা খবই স্বাভাবিক একটা ঘটনা। এতে অলৌকিকত্ব কি আছে?

আর ঐ অ.শের রক্তবর্ণ? নিশ্চয় কেউ ওখানে রঙ বুলিয়েছিল।

কর্ণেলের চিন্তাধারা

[What the Colnel thought]

"আমি এখন বৃদ্ধ," কর্ণেল লেপোর্ট কবুল করলেন, "বাতের ব্যথায় ভুগছি, পা দুটো বেড়ার কাঠির মতন শক্ত। তবু, এখনো যদি কোন সুন্দরী আমাকে একটা ছুঁচের ফুঁটোর মধ্য দিয়ে যেতে বলে, অসম্ভব জেনেও সঙ্গে সঙ্গে সার্কাসের জোকারের মতন গোলাকার ঘাগরা পরে ঝাঁপিয়ে পড়বো। মৃত্যু আমার এ ভাবেই হবে; এ মশাই রক্তের দোষ! মেয়েমহলে আমি পুরনো খেলোয়াড়, সারাটা জীবন ধরে মেয়েদের প্রীতিই চেখে এসেছি। সুন্দরী কাউকে দেখলেই আপাদ-মস্তকে শিহরণ খেলে যায়। হলপ্ করে বলছি, এমন হবেই!

"আমরা ফরাসীরা, মশাই, চরিত্রে এমনটিই হয়ে থাকি। আমৃত্যু আমরা মহাবীর এবং আমাদের এই বিশাল বীরত্ব অফুরাণ প্রেম ও অনুরাগের। কাম ও প্রেমের দেবতার দেহরক্ষী আমরা।

"আমাদের অন্তঃকরণ থেকে মেয়েদের কেউ সরিয়ে নিতে পারে না। নারীর উপস্থিতি চিরায়ত। আমরা তাকে ভালোবাসি, বাসতে থাকবোও চিরকাল। যতদিন য়ুরোপের মানচিত্রে ফ্রান্সের অবস্থিতি থাকবে, যে-কোন ধরণের পাগলামি করতে আমরা পিছু পা নই। এবং, এমন কি, ফ্রান্স যদি ধুয়ে মুছেও যায়, জাতি হিসাবে ফরাসীরা বেঁচে থাকবেই!

"নিজের কথাই বলছি, যদি কোন সুন্দরী মেয়ে আমার দিকে যৎকিঞ্চিৎ নেক নজর দেয়, আমি অসাধ্যসাধন করতে পারি। তার টানা টানা আশ্চর্য চোখ আমার স্নায়ুতে আগুন ধরিয়ে দেয়। আর তখন আমি এক প্রচণ্ড ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী, যে শক্তির তাগিদে আমি দিশেহারা—যুদ্ধ করতে চাই, সংগ্রাম

করতে চাই, সমস্ত আসবাবপত্র চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে ফেলতে চাই ; এ ভাবেই প্রমাণ করতে চাই, আমি সবচেয়ে বলবান পুরুষ, সবচেয়ে সাহসী লোক, সবচেয়ে বেপরোয়া প্রাণী এবং মানবতার সবচেয়ে বড় পূজারী।

"আর এ শুধু আমার একার কথা নয়, তামাম ফরাসী বাহিনীর বৈশিষ্ট্য এখানেই। সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ করে বাঘা বাঘা জেনারেল অব্দি সকলেরই মানসিকতা এরকম—নারী, সুন্দরীদের জন্ত তারা চূড়ান্ত সীমা অতিক্রম করতে রাজি। মনে করুন, অতীতে জোয়ান অফ্ আর্কের ডাকে আমরা কি না করেছি! বাজি ধরে বলতে পারি, সেডানের যুদ্ধে মার্শাল ম্যাক মোহন আহত হবার পর যদি শুধু সেই রাতের জন্ত ফরাসী বাহিনী কোন নারীর অধিনায়কত্ব পেতো, তবে যুদ্ধের ফলাফল অন্তভাবে লেখা হতো ইতিহাসে—অনিবার্য ভাবেই আমরা প্রুশিয়ানদের ব্যূহ ভেদ করে ফেলতাম এবং তাদের স্তব্ধ কামানের মুখে দাঁড়িয়ে আকণ্ঠ পান করতাম।

"এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে যুদ্ধকালীন একটি ছোট ঘটনা, যা প্রমাণ করে,—নারীর উপস্থিতিহেতু আমরা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারি।

"সে সময় আমি একজন সাধারণ ক্যাপ্টেন। মুষ্টিমেয় সৈন্তদের নিয়ে মরণপণ লড়াই চালাচ্ছি এমন একটা জিলা-শহরে, যার অধিকাংশই কার্যতঃ প্রুশিয়ানরা বেদখল ক'রে নিয়েছে। মূল বাহিনী থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন এবং প্রচণ্ড চাপ এসে পড়ছে আমাদের ওপর। শরীরে ও মনে গভীর অবসাদ, আহতদের সংখ্যা বাড়ছে, খাদ্যের যোগান নেই, অথচ, অমানুষিক পরিশ্রমে মৃত্যুর হাতছানি।

"যাই হোক, পরের দিন আমাদের বার-সুর-টেনে পৌঁছাতে হবেই! যদি তা সম্ভব না হয়, আমরা একেবারে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়বো এবং আমাদের ধ্বংস অনিবার্য হ'য়ে উঠবে। কি ভাবে যে এতদিন টিঁকে আছি, সেটাই আশ্চর্য। সারাটা রাত ধরে সমানতালে হাঁটছি তো হাঁটছিই। হাঁটতে হাঁটতে বারো লীগ পথ অতিক্রম করলাম। পেটে দানা নেই, হাঁটছি পুরু বরফের মধ্য দিয়ে, যেদিকেই তাকাই মাটির চিহ্ন নেই, মাথার ওপর সমানে ঝমঝম তুষারপাত। ভাবলাম: 'এই আমাদের শেষ। আমার এই বাহিনীর একজনও আর ফিরে যেতে পারবে না!'

"গতকাল থেকে নির্জলা উপবাস। দিনের আলো ফুটতেই আমরা একটা শস্যগোলার আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম। এটা একটা খামার বাড়ি, যেখানে

সারাটা দিন একটুখানি উষ্ণতার জন্য আমরা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে পড়ে রইলাম নির্জিব, নিথর হয়ে; নড়া-চড়ায় অনীহা, কথা বলার ক্ষমতা নেই, মাঝে মাঝেই অশেষ ক্লান্তিতে ঝিমুনি আসছে।

"পাঁচটা বাজতে না বাজতেই অন্ধকার। বরফ ঝরা দিনের নিরেট অন্ধকার। আমি আমার লোকদের ধাক্কা দিয়ে দিয়ে তুলতে থাকি। অনেকেই উঠে বসতে নারাজ অথবা, দু'পায়ে উঠে দাঁড়াবার মতন শক্তিও তাদের নিঃশেষিত। প্রতিটি অস্থিসন্ধি প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কঠিন ও অক্ষম হ'য়ে পড়েছে। সামনেই আদিগন্ত চরাচর বরফে আচ্ছাদিত। একেই বলে নরক। বরফ পড়ছেই। মনে হয়, যেন একটা সীমাহীন সাদা পর্দা আকাশ থেকে নেমে ঢেকে ফেলছে সবকিছু। মৃত, মসৃণ, নিঃশব্দ। পৃথিবীর এটাই বুঝি প্রান্তরেখা।

"বেরিয়ে এসো ছেলেরা। ঝাঁপিয়ে পড়ে।"

"তারা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখলো, বরফের ধুলি-ঝড়। আকাশের উৎস-মুখ থেকে তুষারের অন্তহীন শোভাযাত্রা। সৈন্যরা বোধহয় ভাবলো: 'অনেক হয়েছে; মরতে হয় এখানে বসেই মরবো। তবু—'

"ওদের মনোভাব বুঝতে পেরে উপায়হীন ক্ষিপ্ততায় আমি কোমর থেকে পিস্তল টেনে বের করি, হুঁশিয়ার করে দিই:

"ভয়ে যে পালাবার চেষ্টা করবে, তাকেই গুলি করবো।'

"উদ্ধত পিস্তলের মুখে তারা চলতে শুরু করে। এ যেন এক বিষণ্ন শবযাত্রা। অতি মন্থর গতি, পা যেন আর ওঠে না, নামে না।···

"মনে হচ্ছে, বরফের নীচে আমাদের জীবন্ত সমাধি অনিবার্য। টুপিগুলি কুচি কুচি বরফে ভিজে, সাদা ও ভারী। দেখলে মনে হবে, কতকগুলি ক্লান্ত তুষার-ভূত চলেছে সারবদ্ধ।

"আমি সংগোপনে অনুভব করি: 'মুক্তি নেই। কোন অলৌকিক কিছু না ঘটলে এর হাত থেকে নিস্তার পেতে পারি না।'

"সময় সময় কয়েক মিনিটের জন্য আমাদের থমকে দাঁড়াতে হয় পিছিয়ে পড়া জোয়ানদের জন্য। তখন আদিগন্ত উপত্যকা জুড়ে কোন শব্দ নেই, কেবল তুষারপাতের ফিস্ ফিসানি। কখনো কখনো সেই ফিস্ ফিসানি গোঙানো কান্নার রূপ নেয়।

"জোয়ানদের কেউ কেউ তখন কেঁপে ওঠে; অনেকের সে ক্ষমতাও নেই।

"সেই অবস্থাতেই আমার হুকুমে তারা কদম কদম এগিয়ে চলেছে; কাঁধের

ওপর আকাশমুখো রাইফেল, অবশ একজোড়া পায়ের এলো মেলো পদক্ষেপ।

"হঠাৎ ওরা থমকে দাঁড়ায়, সামান্য পিছিয়ে আসে, কিসের এক উত্তেজনায় ও সন্দেহে ঋজু হ'য়ে ওঠে তারা। সামনে কিসের যেন একটা আওয়াজ শুনতে পেয়েছে তারা। আমি দু'জন জোয়ান সহ একজন সার্জেন্টকে পাঠালুম পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে। তারপর অপেক্ষা করতে থাকি।

"অকস্মাৎ তুষারময় উপত্যকা জমাট স্তব্ধতাকে চিরে ভেসে আসে তীব্র তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠের আর্তনাদ এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার সামনে এনে হাজির করা হলো একজোড়া বন্দীকে —তাদের একজন বৃদ্ধ, অপরজন যুবতী।

"চাপা গলায় আমি জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিই। গত সন্ধ্যায় দুশমন প্রুশিয়ানরা তাদের এলাকায় ঢুকে পড়েছে, অনেকের ঘর বাড়ি বেদখল করেছে, জয়ের আনন্দে তারা প্রচণ্ড মদ্যপান করছে এবং এরা দুটিতে সেই মাতালদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য কোনক্রমে পালিয়ে এসেছে। বাবা ভয় পেয়েছিল তার যুবতী মেয়ের পরিণতি সম্পর্কে এবং চাকর-বাকর কাউকে না জানিয়ে সোজা ওর হাত ধরে সাঁ সাঁ ছুটে এসেছে এই মৃত্যুপুরী বরফ-উপত্যকা অব্দি।

"মুহূর্তে আমার সনাক্তকরণে ভুল হয় না, এরা মধ্যবিত্ত বা, আরো বিত্তশালী পরিবারের সদস্য-সদস্যা।

"আসুন আমাদের সঙ্গে"—আমি তাদের বললাম।

"আবার সেই ধুঁকতে ধুঁকতে হাঁটা। বৃদ্ধ লোকটি এ দেশের পথ-ঘাটের সঙ্গে পরিচিত। কাজেই সে এখন আমাদের পথপ্রদর্শক। ক্রমে তুষারপাত বন্ধ হয়। আকাশের বুকে দেখা যায় নক্ষত্রদের। শীত আরো ভয়ঙ্কর। বাবার হাত ধরে যুবতীটি কোনক্রমে বরফের গভীরে পা তুলে তুলে পথ অতিক্রমের চেষ্টা করছে। বার কয়েক তাকে বিলাপ করতে শোনা গেল: 'আর পারছি না এভাবে হাঁটতে!' একটি মেয়ের ওরকম শারীরিক কষ্ট দেখে আমি বিচলিত।

"এক সময় সে দাঁড়িয়ে পড়ে।

"বাবা,' গভীর অবসাদের সঙ্গে সে জানায়, 'আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আর হাঁটতে পারছি না।'

"বৃদ্ধ তাকে কোলে তুলে নেবার বৃথাই চেষ্টা করে, সে ক্ষমতা তার নেই। হঠাৎ মেয়েটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারায়।

আশ্চর্য বিপত্তি। আমরা ওকে ঘিরে দাঁড়িয়েছি। আমি হাত ঘড়িতে সময়

দেখে নিলাম। এই মুহূর্তে কি যে করণীয়, ভেবে উঠতে পারছি না। সকল্পা বৃদ্ধকে এই ভয়ঙ্কর স্থানে ত্যাগ করে যেতেও মন সায় দেয় না।

"তখন আমাদের মধ্যে একজন, যার ডাক নাম স্লিম জিম, হঠাৎ উদ্যোগী হয়ে বলে :

"আসুন, আমরা এই মেয়েটিকে কাঁধে তুলে নিয়ে এগিয়ে যাই। নচেৎ আমরা ফরাসী নামেরই অযোগ্য।'

"বিচিত্র এক প্রীতিকর অনুভূতি আমাকে স্পর্শ করে যায়। বললাম :

"উত্তম প্রস্তাব। আমিও তোমাদের সঙ্গে কাঁধ মেলাতে রাজি আছি।'

"অন্ধকারে অদূরের এক বনভূমি নজরে এলো। আমাদের মধ্যে জনাকয়েক সেখানে গিয়ে এক বোঝা কাঠ নিয়ে আসে এবং তৎপরতার সঙ্গে একটা মাচা তৈরী করে ফেলে।

"কে রাজি আছো, মাথার টুপি খুলে দিতে?" স্লিম জিম আহ্বান জানায়, 'এই সুন্দরীর জন্য কে করবে এই আত্মত্যাগ?'

"সঙ্গে সঙ্গে স্লিম জিমের পায়ের কাছে টপা টপ দশটি টুপি এসে জমা পড়লো। মুহূর্তের মধ্যে ঐ টুপিগুলি সাজিয়ে একটি বিছানা প্রস্তুত হয়ে গেল মেয়ের জন্য। তারপর সেই যুবতীকে কাঁধের ওপর তুলে দু'জন সৈনিকের বলদর্পী পদযাত্রা। সবচেয়ে বিস্ময়কর, আমি স্বয়ং ডান দিকের হাতলটি কাঁধের ওপর এনে বসিয়েছি। এমন একটি বোঝা বইবার সুযোগ পেয়ে মন খুশিতে ভরপুর।

"এমন উৎসাহে হাঁটছি, যেন এই মাত্র এক পাত্তর টেনে উঠলাম। নেশাখোরের মতন গরম শরীরে নতুন প্রাণশক্তি। এমনকি, জোয়ানরা নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা-ইয়ার্কি, ইস্তক রসালাপ জুড়ে দিয়েছে। আপনি জানেন, উৎসাহের প্রাবল্যে উজ্জীবিত হ'য়ে উঠবার জন্য ফরাসীদের প্রয়োজন কেবল নারী।

"জোয়ানরা তখন যথার্থই তাদের বৈশিষ্ট্য ফিরে পেয়েছে। তেমনি সাহসী, হৃদয়বান। কে বলবে, এই কিছুক্ষণ আগেও তারা ছিল অভুক্ত ও অবসাদে অসমর্থ। একজন বৃদ্ধ সৈনিকও সেই মাচায় কাঁধ পাতবার জন্য রীতিমত লড়াই করছে যেন। আমি তার মন্তব্য শুনতে পেলাম, 'হতে পারি বুড়ো, তবু তো পুরুষ। মেয়েমানুষের জন্য বয়স ও সাহস দু'টারই পুনরুদ্ধা'র সম্ভব।'

"প্রায় এতটুকু বিরাম না দিয়ে সকাল তিনটে অব্দি সমান তালে হেঁটে এলাম। তারপরই এলো সেই মুহূর্ত। আমরা একটা কালো ছায়াকে যেন এগিয়ে আসতে দেখলাম। ব্যবধান কমলে দেখা গেল, একদল অশ্বারোহী প্রশিক্ষণ। দুশমন।

"আমি চিৎকার করে উঠলাম : 'চালাও গুলি !'

"একসঙ্গে পঞ্চাশটা রাইফেলের অগ্নিস্রাবী গর্জন রাতের স্তব্ধতাকে খান্ খান্ করে ফেলে।

"ধোঁয়ার আস্তরণ সরে গেলে দেখলুম, বারোটি মানুষ ও ন'টি ঘোড়া খতম ! তিনটি আহত ঘোড়া দিশেহারা হ'য়ে লাফাচ্ছে পা তুলে।

"আমার পিছনে এক জোয়ান অট্টহাসি হেসে ওঠে। অন্য একজন মন্তব্য করে : 'কয়েকজন বিধবা হলো।'

"সম্ভবত সে বিবাহিত। তৃতীয় একজন বলে : 'কত অল্প সময়ে ফয়সলা হ'য়ে গেল।'

"ঠিক তখনই মাচা থেকে একটি মুখ ঝুঁকে পড়ে জানতে চায় : 'ব্যাপার কি ? যুদ্ধ-টুদ্ধ চলছে বুঝি ?'

"এমন কিছু নয়', উত্তরটা দিলুম আমি, 'মাত্রডজনখানেক প্রুশিয়ানের একটা গতি করে ফেললাম।'

"বেচারি'—সে মন্তব্য করে। কিন্তু ঠাণ্ডায় বেশীক্ষণ মাথা তুলে রাখা সম্ভব না হওয়ায় মেয়েটি আবার শুয়ে পড়ে সৈনিকদের টুপি পাতা বিছানায়।

"আবার আমাদের পদযাত্রা। দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত। অবশেষে আকাশে গোলাপী আভা দেখা যায়। ক্রমশ বরফের চাকচিক্য নজরে আসে, পূবাকাশ সেই ঔজ্জ্বল্যের উৎস।

"দূর থেকে চিৎকার শোনা যায় :

"আসছে কারা ?'

"আমাদের দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। এবং আমি এগিয়ে গিয়ে সেন্ট্রিকে নিজেদের পরিচয় জ্ঞাপন করি। আমরা 'ফরাসী লাইন'-এ পৌঁছে গেছি !

"কাঁধে বয়ে আনা মাচাটির দিকে নজর পড়তেই একজন উচ্চপদস্থ অশ্বারোহী ফরাসী জেনারেল আওয়াজ তুললেন :

"ওটার মধ্যে কি নিয়ে যাচ্ছো তোমরা ?'

"প্রশ্নটি উচ্চারিত হওয়া মাত্র, মাচাটা ঈষৎ দুলে উঠলো ; একমাথা এলো-মেলো চুল সমেত একটি ছোট্ট খুশি খুশি মুখ মুহূর্তে সুরেলা গলায় বলে উঠলো :

"মঁসিয়ে, মাচার ওপর শুয়ে আছি আমি।'

"সকলেই হো হো ক'রে হেসে ওঠে। আমাদের মন অনাবিল আনন্দে ভরপুর।

"তখন স্লিম জিম, যে এতক্ষণ ধরে মাচাটার পাশে পাশেই ছিল, চিৎকার করে উঠলো :

"'ফ্রান্সের জয় হোক !'

"কেন জানি না, ঐ ধ্বনিতে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। মনে হলো, সত্যি যেন আমরা আমাদের জন্মভূমিকে রক্ষা করেছি ! এমন কিছু একটা করেছি, যা অপরে এখনো পারেনি। এমন কিছু একটা করেছি, যা সরল হলেও প্রকৃতই দেশাত্মবোধক।

"আমি তার ছোট্ট খুশি খুশি মুখখানার কথা কোন দিন ভুলব না। এবং আমাকে যদি ক্ষমতা দেওয়া হতো, আমি প্রতিটি রেজিমেণ্টে যুদ্ধের উত্তেজক বাজনা ড্রাম ও বিউগুলের বদলে একটি করে সুন্দরী যুবতীকে নিয়োগ করতাম। এর প্রতিক্রিয়া জাতীয় সংগীতের চেয়েও সক্রিয়। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সেদিন সেই ভয়াল মুহূর্তগুলিতে কর্ণেল ও তাঁর দলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল একজন জীবন্ত নিখুঁত ম্যাডোনা ! তাই তো আমরা অনায়াসে অমন প্রতিকূলতাকে জয় করতে পেরেছি।"

একটু থেমে এক মুখ বাতাস টেনে নিয়ে কর্ণেল তাঁর মাথা ঝাঁকালেন :

: "হাঁ, আমরা, ফরাসীরা নারীর মহান প্রেমিক।"

প্রত্যাবর্তন

[The return]

ছোট ছোট আশ্রিত জীব যেন সমুদ্রের ঢেউগুলি, সীমাহীন অনলস, ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে ও ভূমিক্ষয় করে। উপরে নীলাকাশ বিশাল, যেখানে বায়ুতাড়িত খণ্ড খণ্ড মেঘ আশর্য উড়ন্ত পাখির ঝাঁক বুঝি। উপত্যকাটা ঢালু হতে হতে একেবারে সমুদ্রগর্ভে, উপত্যকায় গড়ে ওঠা গ্রাম সূর্যের আলো গায়ে ঢুলুনি ঢুলছে। গ্রামে ঠিক ঢুকবার মুখে, রাস্তার ধারে মার্টিন-লেভাসি্কিউসদের আবাস নির্জনতায় একক। জেলের পর্ণকুটীর, মাটিলেপা দেওয়াল, খড়ের ছাউনী দিগন্তজোড়া রামধনুর বাহারে ঝুঁটি হয়েছে যেন।

পকেটে গোঁজা রুমালের মতন বাড়ির সামনে এক চিলতে পরিস্ফীত বাগান, যার নিগড়ে থোকা থোকা পেঁয়াজকলি, ইতস্তত: বাঁধাকপি, বর্ণময় গুচ্ছ গুচ্ছ

শাকসব্জি,—রাস্তার ধারে এমন একটি সবুজের হাট ঠিকরে সরে এসেছে, রাস্তার সঙ্গে এর ব্যবধান—দায়িত্বে একটা বুনো ঝাড়।

কর্তা গেছে মাছ মারতে। কর্ত্রী বাড়ির সামনে বসে মস্ত খয়েরী জালটার ফুঁটো-ফাটা মেরামতে মগ্ন। আর জালটা যেন অতিকায় মাকড়সা,—চার পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চৌদ্দ বছরের একটি মেয়ে বেতের চেয়ারে বসে অনুরূপ কায়দায় শনের কাপড়-মেরামতিতে নিজের কারিকুরি দেখাচ্ছে, কাপড়ের ফুঁটোগুলো প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে।

এর চেয়ে বছর খানেকের ছোট আর একটি মেয়ে, চালচলনে স্বাভাবিক চাপল্য, ছোট ভাইকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভাই এখনো কথা বলতে বা, হাঁটতে শেখেনি। আরো জনা দুই-তিন এই পরিবারের শিশু সদস্য স্বকীয় বন্দোবস্ত অনুযায়ী মাটিতে মুখোমুখি খেলা করছে, নখ দাবিয়ে মাটি খুঁড়ছে এবং মাটির অন্দরমহল থেকে তুলে আনা মুঠো মুঠো ধুলো এনে অপরের মুখে ছুঁড়ে মারছে!

কিন্তু এরা অদ্ভুত নিঃশব্দ। শুধু শব্দ তুলছে ঐ শিশুটি। চাপা রুগ্ন স্বরের কান্না। চিক টাঙানো জানালার ওপর একটা বিড়াল কুণ্ডলী পাকিয়ে; খড়ের ছাউনীর ওপর এক ঝাঁক মৌমাছির মৌরব।

ছোট মেয়েটা পায়ে পায়ে বাড়ির সীমানা পার হতে যায়, কিন্তু পরক্ষণেই আচমকা সে তীক্ষ্ণ গলায় ডেকে ওঠে:

"মা গো!"

"কি হয়েছে রে?"—মা প্রশ্ন করে।

"ঐ লোকটা আবার এসেছে।"

সকাল থেকেই বিস্ময় ও অস্বস্তি। তক্তাপোশ ছেড়ে মাটিতে পা রাখলেই ভয়টা আরো বাড়ে। ঘটনাটা হলো, আজ সাত সকালেই একটা অপরিচিত মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে, যে মানুষটা ইতিমধ্যেই বার কয়েক পাক খেয়েছে বাড়িটার চারপাশে। বুড়ো মানুষ, চেহারায় আদৌ শাঁসালো নয়, বরং ভিখেরী-ভিখেরী। বাবাকে নৌকায় তুলে দিতে যাবার সময় এ বাড়ির ছেলে-মেয়েরা প্রথম দেখেছিল ওকে। ফিরবার পথে আবার দেখলো। সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন একটা থর থর ভয়। বাড়ির দরজার বিপরীতে একটা গর্তের মধ্যে গুটিসুটি মেরে বসেছিল সে। বসে বসে নিষ্পলকে চেয়েছিল এই বাড়ি, বাগান ও পাচিলের দিকে। কি যে দেখছিল অমন মশগুল হ'য়ে, খোদায় মালুম।

রুগ্ন দীন জবুথবু আকৃতি। একঘণ্টা যাবৎ নিদারুণ একাগ্রতায় সে নিথর। তারপর এক সময় বোধহয় তার খেয়াল হয়েছিল, ঐ বাড়ির লোকেরা সকলেই তার বেঢপ চেহারা ও হ্যাংলাপনা তাকিয়ে থাকাকে সন্দেহের চোখে দেখছে।

মনে হতেই সে উঠে দাঁড়িয়েছিল, খোঁড়া পা টানতে টানতে অদৃশ্য হয়ে যেতে চেয়েছিল সকলের দৃষ্টির সামনে থেকে—সেই অপস্রিয়মান দেহ বীভৎস দুঃখের সাকার রূপ মাত্র।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাঙ্গা পা টানতে টানতে সে আবার ফিরে আসে। বাচ্চারা তখন নতুন করে খেলায় মেতেছে, গিন্নী জাল বোনার তোড়জোড় করছে। সে তার নির্বিচারে অত্যাচারিত দেহটাকে ত্রিভুজের আকারে ভেঙ্গে-চুড়ে সেই গর্তের মধ্যে স্থাপিত করে এবং এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এদিকে তাকিয়ে থাকে, যেন এই ভিলা ও তার বাসীন্দাদের ওপর গোয়েন্দাগিরিই তার উদ্দেশ্য।

বাচ্চাদের বিস্ময়জনিত হট্টগোলে ওদের মা চমকে ওঠে, অস্বস্তিতে তার শরীর শির শির করে। স্বভাবে সে নম্র ও ভীরু—কোন রকম মানসিক চাপ সহ্য করতে পারে না। এই মুহূর্তে এক ধরণের অসহায়ত্ব তাকে অধিকার করে। তার স্বামী যে রাত আসবার আগে সমুদ্র থেকে ফিরছে না!

ঘটনা যতই তুচ্ছাতিতুচ্ছ হোক, এক ধরণের ভয়মিশ্রিত অধিরতা তাকে অধিকার করে।...শ্রীমতীর জীবনে একাধিকবার আঁধার ঘনিয়েছে, অল্পেতেই তাই সে অধীর হ'য়ে পড়ে।

বিয়ের আগে তার এই স্বামীর উপাধি ছিল লেভাসকিউস্ এবং তার নিজের উপাধি ছিল মার্টিন,—দুয়ে মিলে বিয়ের পর তাদের পারিবারিক পরিচিতি দাঁড়ালো মার্টিন-লেভাসকিউস্। এর পিছনে আরো একটা ইতিহাস আছে, যা প্রকৃতই ভয়ানক। আদতে মার্টিনের এটা দ্বিতীয় বিয়ে। তার প্রথম স্বামী ম'সিয়ে মার্টিন ছিল সমর্থ সমুদ্র-মানুষ, দুনিয়াসুদ্ধ মৎস্য শিকারীদের মধ্যে তার পরিচিতি, প্রতি গ্রীষ্মে জাহাজে চেপে সে যেতো নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে কড মাছ শিকার করতে। দু'বছরের বিবাহিত জীবনে স্ত্রী তাকে উপহার দিয়েছিল ছোট্ট একটি মেয়ে এবং জঠরে ছ'মাসের অন্য একটি শিশু বেড়ে উঠবার কালেই ঘটলো সেই সর্বনাশ!

তার স্বামীর পাল তোলা পোত 'টু সিস্টারস্' দেইপি বন্দর থেকে সেই যে নোঙর তুললো, আর ফিরে এলো না।

সমুদ্রের তরফ থেকে এমন বিপর্যয় প্রায়শই স্বাভাবিক। 'টু সিস্টারস্' সম্পর্কে কোন খোঁজই পাওয়া গেল না।

এমন কি জাহাজের একজন নাবিকও ফিরে আসেনি। সলিল সমাধিই নিশ্চিত পরিণতি।

দীর্ঘ দশ বছর ধরে মাদাম মার্টিন প্রতীক্ষা করেছিল তার স্বামীর জন্য। তেতে ওঠা সজল দিন, জীবন তখন আরো কঠিন, দারিদ্র্য নির্মম, ভাগ্যের কাছে কোন বক শিসই মেলেনি মার্টিনের, কোন রকমে বড় করে তুলেছিল তার সন্তান দুটিকে।

অতঃপর দশ বছর ব্যবধানেও যেহেতু সে সমর্থ যৌবনবতী সুন্দরী, স্থানীয় এক বিপত্নীক মৎস্যশিকারী লেভাসকিউস্, যার একটি ছেলেও বর্তমান, মাদাম মার্টিনকে বিয়ের প্রস্তাব করে। অপরের ফরমাস খাটতে খাটতে ক্লান্ত মার্টিন এক কথাতেই সম্মতি দেয়। তিন বছরের মধ্যে আরো দুটি সন্তানের জন্ম দিয়ে সে এখন লেভাস্কিউসের দায়িত্বসচেতন গৃহিণী।

নতুন করে সংসার নামক আখড়ায় প্রবেশ করেও স্বচ্ছলতার মুখ কিন্তু দেখতে পেল না মার্টিন। সেখানেও দারিদ্র্যের জটিলতা, প্রাণান্ত পরিশ্রম। অভাবের মহিমায় রুটি তাদের কাছে অতি প্রিয় এবং মাংসের স্বাদ তো ভুলেই গেছে। দিন আনে দিন খায়, অন্য কিছুতে মনোনিবেশের অবসর কোথায়? তদুপরি নিষ্ফলা শীতে ও ঝড়-জলের মাসগুলিতে নিয়ম মাফিক তাদের সুদে টাকা ধার করতে হয়। তবু এমন দুঃখময় খরিদ আর খয়রাতির অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তারা সবিনয়ে সহনশীল এবং তাদের ক্রমশঃ বড় হ'য়ে ওঠা সন্তানরা যথার্থ বলিষ্ঠ, তাদের মধুর ব্যবহার প্রতিবেশীদের মনঃপুত, জীবন-সংগ্রামের কঠিন ধাপগুলি যেন সতর্ক সন্তর্পণতায় অতিক্রম করে যাচ্ছে তারা; সে কারণেই প্রতিবেশীরা এই পরিবারটি সম্পর্কে বলে থাকে:

"চমৎকার মানসিকতা মার্টিন-লেভাসকিউস্ পরিবারের। মার্টিন গৃহিণী হিসেবে একটি পেরেকের মতন স্থির কঠিন; আর লেভাসকিউসের মতন দক্ষ জেলে সচরাচর দেখা যায় না।"

ছোট মেয়েটা দুঃসহ কৌতূহল ও উত্তেজনায় তার মাকে আরো জানায়:

"মা, লোকটা এমন ভাবে তাকাচ্ছে, যেন আমাদের চেনে। মনে হচ্ছে, এপ্রিভিলা বা, এজবক্সের কোন ভিখেরী-টিকেরী হবে!"

কিন্তু তাদের মা ঠিকই বুঝতে পেরেছে, লোকটা স্থানীয় নয়। কোন স্থানীয় লোকের দৃষ্টি অমন অপার্থিব, ক্ষুধার্ত হবে কেন?

মাদাম উঠে দাঁড়ায়। লক্ষ্য করে, লোকটার দৃষ্টি কেমন নিষ্পলক! মাদাম মার্টিনের পক্ষে আর মেজাজ ঠিক রাখা সম্ভব হলো না। আপাদ-মস্তক শিউরে ওঠে তার। অস্বস্তি ও ভয়ই তার স্বরকে সপ্তমে পৌঁছে দেয়: "তুমি কি জ্যান্ত মানুষ না কি হে? করছোটা কি?"

"বাতাস নিচ্ছি," ভাঙা কর্কশ গলায় সে বলে, "আমি কি তোমাদের কোন ক্ষতি করছি?"

"তুমি কি এই বাড়ির ওপর গোয়েন্দাগিরি চালাচ্ছো?"—তৎক্ষণাৎ পাল্টা প্রশ্ন করে মাদাম।

"আমি কারুর ক্ষতি করতে আসিনি," লোকটা বলে, "রাস্তার পাশে কি বসে থাকতে পারি না?"

এ প্রশ্নের কোন জবাব খুঁজে পায় না মার্টিন; মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে, কুঁকড়ে যায় দেহ, টলমল করতে করতে ঘরে ফিরে যায়।

ক্রমে দিনের বয়স বাড়ে। দুপুরে লোকটার প্রবৃত্তিতে ঈষৎ পরিবর্তন দেখা গেল। জায়গাটা ছেড়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেল সে। অবিশ্যি বিকেল পাঁচটা নাগাদ তাকে আর একবার দেখা গিয়েছিল তবে এবার আর মাথা গুঁজে বসে থাকবার গরজ নেই। এক চক্কর পাক খেয়েই চলে গেল, আর পাত্তা নেই সেই রাতে।

লেভাসকিউস্ ফিরে এলে জানানো হলো ঘটনাটা।

"নোংরা লোক-টোক হবে, দুর্ভাগ্যের হাত থেকে যাদের পরিত্রাণ নেই।"—লেভাসকিউস্ মন্তব্য করে।

রাতে দুর্ভাবনাহীন লেভাসকিউসের ঘুমের কোন ব্যাঘাত হলো না। কিন্তু যত দুশ্চিন্তা ও দুঃস্বপ্ন মাদাম মার্টিনের,—একজোড়া পলকহীন চোখের অগ্নি-শিখা তাকে যেন বিদ্ধ করছে!

পরদিন সকাল থেকেই ঝড়, দমকা বাতাসের শানিত আছাড়ি-পিছাড়ি। এই প্রবল প্রতিকূলতায় সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া অসম্ভব। লেভাসকিউস্ তাই আর সেই হাঙ্গামায় না গিয়ে বসে গেল তার স্ত্রীর সাহায্যে—দু'জনে মিলে মিশে জাল মেরামত করা।

সকাল ন'টায় মার্টিনের সবচেয়ে বড় মেয়েটি, যে রুটি আনতে বাইরে গিয়েছিল, ছুটে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে আসে। উত্তেজনায় প্রায় কণ্ঠরোধ,

মুখ রক্তাভ, চোখে বিস্ময়, ঝপ্ ক'রে বসে পড়ে বলে, "মা, লোকটা—আবার এসেছে!"

মাদামের সর্বাঙ্গ উত্তেজনায় থর থরিয়ে ওঠে; মুখ-চোখ বিবর্ণ, স্বামীকে বলে, "যাওনা, ওকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে বারণ করো! আমার আর ভালো বোধ হচ্ছে না।"

লালমুখো লেভাসকিউস্ উঠে দাঁড়ায়, তার চেহারা বিশাল, মাথার চুল লাল, চোখের রঙ নীল, সামুদ্রিক ঝড় ও বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পেতে ঘাড় অব্দি উলের জামা। সে শান্ত ভাবে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় লোকটার দিকে।

তারপর তাদের দু'জনকেই দেখা গেল আলোচনারত অবস্থায়। ব্যবধানে দাঁড়িয়ে বাচ্চাদের নিয়ে মাদাম মার্টিন স্বচক্ষে দেখছে যেন কোন রোমহর্ষক ঘটনা।

হঠাৎ অজানা লোকটা গর্ত ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, লেভাসকিউসের পিছন পিছন বাড়ির দিকেই আসতে থাকে। লোকটার বিবর্ণ ক্লিষ্ট মুখে যেন কোন দূরাগত আশা-আকাঙ্খার ছায়াপাত। ভয় ও উত্তেজনায় কেঁপে উঠছে মাদাম মার্টিন। কেন যে তার বুকে এমন ভূকম্পন শুরু হয়ে গেল এই মুহূর্তে!

অথচ তার স্বামী স্বাভাবিক মেজাজী দরাজ গলাতেই বললো, "শুনছো, একে সামান্য রুটি, আর এক মগ মদ এনে দাও। মানুষটা গত পরশু থেকে অভুক্ত রয়েছে।"

বলতে বলতে দু'জনে ছাউনীর ভিতরে। পিছন পিছন বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে মার্টিন। খাবারের থালার সামনে বসে পড়ে লোকটা, ধীরে ধীরে রুটিতে কামড় লাগায়। সপরিবারে লেভাসকিউস্ দেখছে ওর ভোজনতৃপ্তি। কিন্তু লোকটার মাথা সব সময়ই হেঁট হ'য়ে আছে, মুখের ভগ্নাংশ মাত্র দেখা যায়।

মাদাম মার্টিন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। তার দুই বড় মেয়ের চোখেও যৎপরোনাস্তি বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা।

লেভাসকিউস্ ওর সামনে আসন নেয়, জিজ্ঞেস করে:

"তা হলে, অনেক দূর থেকে আসছেন?"

"কিট থেকে।"

"এ ভাবে পায়ে হেঁটে?"

"হাঁ।"

"মর্মান্তিক।"

"আপনার যদি টাকা না থাকে, আপনি তো হেঁটে আসতেই বাধ্য।"

"যাচ্ছিলেন কোথায়?"

"এখানেই।"

"পরিচিত কেউ আছে নাকি এখানে?"

"বোধহয়।"

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ তারা।

খুব আস্তে আস্তে রুটি চিবুচ্ছে; ক্ষুধার্ত হলেও জলদি তাড়া নেই, অবশ্য মাঝে মাঝেই এক মুখ রুটি সহ মদের গেলাসে চুমুক লাগাচ্ছে সে। শিরাময় বলিরেখাচর্চিত তার প্রাচীন মুখে একাধিক ক্ষতচিহ্ন, সাড়া-শব্দ হীন এই ঘরে তার শ্বাসকষ্টের চাপা আওয়াজ স্পষ্ট অনুভূত।

লেভাসকিউস্ আচমকা তাকে জিজ্ঞেস ক'রে বসে:

"কি নাম আপনার?"

মাথা না তুলেই সে জবাব দেয়:

"আমার নাম মঁসিয়ে মার্টিন।"

চকিতে এক প্রহেলিকাময় ভাবান্তর প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয় মাদাম মার্টিনকে। বিস্ময়ের দমকে বেশ কয়েক পা এগিয়ে আসে সে, ঝুঁকে পড়ে দেখবার চেষ্টা করে ঐ আশ্রয়হীন হতভাগ্যকে, তার হাত দুটো ঝুলে পড়ে, মুখ হা হ'য়ে যায়।

কারুর মুখে কোন রা নেই।

আবার লেভাসকিউস্‌ই মুখ খোলে:

"তার মানে, আপনি—এখানকারই মানুষ।"

"হাঁ, এখানকারই।"

এবার লোকটা মুখ তুললো। মুখ তুলে দেখলো মাদামকে এবং তার সন্তানদের।

হঠাৎ মাদামের স্বরভঙ্গ ঘটে, প্রায় ফিস্ ফিসিয়ে ওঠে সে:

"তুমি—তুমি—আমার সেই স্বামী?"

"হাঁ, আমিই তোমার প্রথমজন।"—ধীর গলায় উত্তর আসে। এতটুকু উত্তেজনা নেই তার, তখনো রুটি চিবুচ্ছে।

লেভাসকিউস্, উত্তেজনার চেয়ে বিস্ময় যার বেশী, বলে :

"আপনিই তবে সেই নাবিক মার্টিন !"

"হাঁ, আমিই !"

"কি করে এবং কোথা থেকে এলেন ?"—দ্বিতীয় স্বামী বিস্তৃত জানতে চায়।

সে তার গল্প শোনাতে আরম্ভ করে :

"আফ্রিকার উপকূল। আমাদের জাহাজ আছড়ে পড়লো এক প্রবাল প্রাচীরের ওপর। অলৌকিকভাবে প্রাণে বাঁচলাম আমরা মোটে তিনজন—পিকার্ড, ভাতিনেল এবং আমি। প্রাণে বাঁচলেও ভয়ের কালো ছায়াটা আমাদের ছাড়লো না। মনোবল ফিরে পাবার আগেই কয়েদ হলাম একদল বুনো অধিবাসীর হাতে। বারোটা বছর ওরা আমাদের আটকে রেখেছিল। ত্রিসীমানায় উদ্ধার পাবার কোন সম্ভাবনা দেখতে পাইনি। পিকার্ড ও ভাতিনেল তো মারাই গেল। তারপর এক ইংরেজ পর্যটক আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে কিটে। কিট থেকে পায়ে হেঁটে সোজা এখানে।"

কাপড়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে মাদাম মার্টিন।

"কি এখন আমাদের করণীয় ?"

—কপাল কুঁচকে প্রশ্নকে শূন্যে ছুঁড়ে দেয় লেভাসকিউস্।

"আপনি নিশ্চয় ওর স্বামী ?"

—নাবিক মার্টিন জানতে চায়।

"হাঁ, আমি ওর বর্তমান স্বামী।"

—লেভাসকিউস্ জবাব দেয়।

দু'টি পুরুষ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর নাবিক মার্টিন আড়চোখে একবার মাদামকে দেখে নিয়ে চারধারে দাঁড়িয়ে থাকা বাচ্চাদের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নেয়। তার দৃষ্টি এসে স্থির হয় বড় দুই মেয়ের মুখের ওপর ; সে জানতে চায় :

"এই দু'জনই কি আমার ?"

"হাঁ, ওরা আপনার।"

—লেভাসকিউস্ মাথা নেড়ে সায় দেয়।

সে কিন্তু উঠে দাঁড়ায় না ; বা ওদের চুম্বন করতে এগিয়ে যায় না ; কেবল উচ্চারণ করে :

"ঈশ্বর! এরা কত বড় হয়ে গেছে!"

"কি এখন আমাদের করণীয়?"

—দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লেভাসকিউস্ আর একবার বললো কথাটা।

এ প্রশ্নের জবাব নাবিক মার্টিনেরও জানা নেই। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সে তার সিদ্ধান্ত জানায়:

"আপনি যা বলবেন, তাই হবে। আমি আপনার কোন ক্ষতি করতে আসিনি। কিন্তু এই বাড়িটার কথা ভাবতে গেলেই মনটা আমার কঠিন হ'য়ে ওঠে। আমার ঔরসজাত দুটি সন্তান রয়েছে, আপনার রয়েছে তিনটি। ওদের মা অতঃপর কার কাছে থাকবে, সেটা আপনিই স্থির করুন। কিন্তু এ বাড়িটা—এটা সম্পূর্ণ আমার! আমার বাবা এটি আমাকে দিয়ে গিয়েছেন। আমি এখানেই জন্মেছিলাম। আমার অধিকার সম্পূর্ণ আইনসিদ্ধ।"

মাদাম মার্টিন তখনো কাঁদছে। চোখের জলে ভাসছে তার বুক, জামা-কাপড়। আর বড় দুই মেয়ে ঘনিষ্ঠ হয়েছে মায়ের, অস্বস্তিভরা দৃষ্টিতে দেখছে তাদের জনককে।

তার ভোজনপর্ব সমাপ্ত। এবার সে পাল্টা প্রশ্ন করে:

"এখন আমাদের কি করণীয়?"

লেভাসকিউস্ উপায় বাৎলায়:

"আমাদের উচিত কোন পুরোহিতের কাছে যাওয়া। তিনিই সিদ্ধান্ত দেবেন।"

নাবিক মার্টিন উঠে দাঁড়ায়, স্ত্রীর কাছে যেতেই মাদাম তার বুকের ওপর ভেঙে পড়ে:

"তুমি—সেই তুমি এলে! আমার মার্টিন, আমার সেই তুমি প্রিয়!" মাদাম তাকে জড়িয়ে ধরে রাখে। এই মুহূর্তে তার মন অতীতের সুখস্মৃতিতে অবগাহন করে। মনে পড়ে, অতীতের প্রেম-প্রীতি, প্রথম চুম্বনের সলজ্জ উষ্ণতা!

আবেগে আপ্লুত মঁসিয়ে মার্টিনও। দীর্ঘ বিরহের পর স্ত্রীর টুপিতে ঘন ঘন চুমু খেতে থাকে। ঐ দিশেহারা দৃশ্য দেখে বাচ্চারা কেঁদে ওঠে, বিশেষতঃ কনিষ্ঠতম শিশুটি চিৎকার করতে শুরু করে দেয়।

লেভাসকিউস্ তখন উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "আসুন, আমরা ব্যাপারটা স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিই।"

নাবিক মার্টিন তার স্ত্রীর কাছ থেকে সরে আসে, তাকায় নিজের মেয়ে দু'টির দিকে। তাদের মা বলে, "বাবাকে চুমু খাও।"

হতবাক মেয়ে দুটি ভয়ে ভয়ে এসে একের পর এক তাদের অপরিচিত জনকে চুম্বন করে।

তারপর দুই কর্তা একসঙ্গে বেরিয়ে আসে বাড়ির বাইরে।

তারা গিয়ে দাঁড়ায় একটা কাফের সামনে। লেভাসকিউস্ জিজ্ঞেস করে, "একটু পান করবেন?"

"অল্প স্বল্পে আপত্তি নেই।"—মার্টিন বলে।

দু'জনে গিয়ে কাফের একটা টেবিলের সামনে বসে। ঘরটা এখনো শূন্য। লেভাসকিউস্ চড়া গলায় ঘোষণা করে:

"ওহে, চিকট, এদিকে একবার এসো। দু'বোতল ব্রাণ্ডি চাই! সেরা জিনিস হওয়া চাই!...ইনি হলেন মার্টিন, ফিরে এসেছেন। মার্টিন গো, আমার স্ত্রীর প্রথম স্বামী। সেই যে 'টু সিসটারস্' জাহাজ ডুবে গিয়েছিল, তার নাবিক মার্টিন!"

বার-ম্যান মালের গেলাস হাতে টেবিলের কাছে আসে। লাল-মুখ, ঘটির মতন পেট, লোকটা শান্তস্বরে বলে: 'আশ্চর্য! আপনিই সেই মার্টিন?"

মার্টিন জবাব দিলো:

"হাঁ, আমিই সে-ই!"

স্রোতের বিরুদ্ধে

(Against the Tide)

তরঙ্গহীন ঝলমলে সমুদ্র, অবিশ্যি মৃদু বাতাস একটু বইছে এবং সমুদ্রের গভীর প্রশান্তিতে ঈষৎ হিল্লোল। হাভর শহরের যত লোক, সকলেই যেন সমবেত জাহাজঘাটায়, অধিকাংশরই দৃষ্টি নোঙরপাতা জাহাজগুলির দিকে, অনেকে আবার জাহাজের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যান্ত্রিক কলাকৌশল দেখছে।

দূরে অনেকগুলি জাহাজ, ক্রম আগুয়ান। ওদের মধ্যে কিছু কিছু ষ্টীমার, যাদের স্নায়বিক চাঞ্চল্য অনেক বেশী—গলগলিয়ে ধোঁয়া আকাশকে অন্ধকার

করছে। কিছু আবার গাধাবোট, অদৃশ্য দড়ির বাঁধনে ভাসছে, তাদের ন্যাড়া মাস্তুল চেয়ে আছে আকাশের দিকে নিষ্পলক চোখে।

আবছা দিগন্তের মোহ ছেড়ে এই সব জলযানগুলি জেটিতে আশ্রয় পেতে উন্মুখ। আর সংকীর্ণ মুখগহ্বর বিশিষ্ট জেটি অনায়াসে তাদের চালান দিচ্ছে নিরাপদ উদরে। ধরাছোঁয়া দেবার পূর্বলগ্নে প্রতিটি জলযানের তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদ সমুদ্রের সুপ্রশস্ত হৃদয় কাঁপিয়ে তোলে। শব্দ ওঠে হুস্ হাস্ ফুস্ ফাস্—ঝলকে ঝলকে বাষ্পের থুথু ছিটকে যাচ্ছে চারদিকে। মনে হয়, যেন কতগুলি শ্বাসরুদ্ধ পশুর বেপরোয়া মানসিকতা ঐ সব জলযানের—সম্পূর্ণ ভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বার আগে বাঁচবার আপ্রাণ প্রয়াস।

জাহাজ ঘাটে যাত্রী সাধারণের ওঠা-নামার ঢালুপথে অসাধারণ ভিড়। যে জাহাজটি আবার পুনর্জীবন লাভ করতে চলেছে, তার পাটাতনে কালো মাথায় গিস গিস, ফুলে ফলে ভরা ভাসন্ত বাগান যেন একটি।

সবশুদ্ধ কত লোক যে চলেছে, আন্দাজে বলা মুশকিল; তবে ওদের মধ্যে অমায়িক নমস্কার বিনিময় করতে করতে এগিয়ে চলেছে যে দু'জন তরুণ অফিসার, তাদের সহজেই সনাক্ত করা যায়। পরিচিত জনের সঙ্গে চাক্ষুষ সাক্ষাৎ লাভের ক্ষণে কখনো কখনো সৌজন্যতায় তারা ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দু' দণ্ড কথাও বলে নিচ্ছে।

দু' জনের মধ্যে যে দীর্ঘতর, তার নাম পল ড আঁরিকল। হঠাৎ পল তার বন্ধু জঁা রেনলদির হাতে মৃদু চাপ দিয়ে সংশয়হীন চাপা স্বরে বললো, 'আরে দোস্ত, একটুখানি ঐ মাদাম পয়কতের দিকে চোখ ফেরাও। ভদ্রমহিলা যে ভাবে বার বার তোমাকে দেখছেন।' সাকরেদের কথায় চকিতে দৃষ্টি ঘোরায় জঁা রেনলদি।

হাঁ, মাদাম তার গুম্ মেরে থাকা স্বামীর হাত ধরে পথ পার হচ্ছে। বয়স যথেষ্ট হয়েছে,—চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। কিন্তু এ বয়সেও আশ্চস্ত হবার মতো শারীরিক বাঁধুনি ও সৌন্দর্য তার রয়েছে। একটু যেন কমনীয়তা হ্রাস পেয়েছে, দেহের কোন কোন অংশ যেন ঈষৎ শক্ত অনড়। তবু ঐ আকর্ষক দেহ দেখলে নিজের দৃষ্টিকে সামলে রাখা দুঃসাধ্য; বিশ বছর বয়সী তন্বীর ব্যাকুল যৌবন এখনো যেন ওর সর্বাঙ্গে, কামনার ঘোর সহজেই লাগে। গভীর কালো টানা টানা চোখ, চাল-চলনে পুরোদম অহমিকা, নিজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্বের গুণে বন্ধু মহলে সে দেবী হিসেবে মাননীয়া, অহেতুক কারুর মগজ বিগড়ে দেবার মতো

কাজ সে করে না। তার কোন নিন্দুক নেই, স্তুতি করবার জন্য অসংখ্য,—এমন মনোরম চরিত্রের নারী নাকি বিরল। সৎ ধার্মিক অবিকৃত নির্মল চরিত্র। এ রকম একজন ভদ্রমহিলাকে নিয়ে প্রেম ও কামনার কথা স্বপ্নে ভাবাও অনেক মেহনতের ব্যাপার। তবু গত একমাস ধরে পল ও আরিকল বলে বলে তার বন্ধুর কানকে প্রায় অবসন্ন ক'রে তুলেছে,—মাদাম পয়কত নাকি রেনলদির প্রেমে পড়েছে এবং এর সত্যতা সম্পর্কে সে নিশ্চিত, নিরুদ্বেগ!

"কোন নারী-চরিত্র সম্পর্কে আমার ধারণা ষোল আনা নির্ভুল। দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি, সে তোমায় সাংঘাতিকভাবে ভালোবাসে। তোমার প্রেমে রীতিমত খাবি খাচ্ছে। আমার বক্তব্য পরে মিলিয়ে নিও। তোমার প্রতি তীব্র আকর্ষণে বেচারির বাস্তব অবাস্তব খেয়াল অব্দি নেই, ঠিক প্রথম বয়সের অনভিজ্ঞা কুমারীরা কামনার তাড়নায় যেমনটি অস্থির হয়ে ওঠে! আসলে কি জানো, মেয়েদের পক্ষে এই চল্লিশ বছর বয়সটা বড় মারাত্মক, তথাকথিত সতী সাধ্বীদের পক্ষেও এ সময় নির্বিকার পদস্খলন খুবই সম্ভব। এই একটা বয়স, যখন নারীরা অসাবধানী হয়, কাম বাড়ে, বয়সজনিত আশঙ্কায় বিচলিত বোধ করে, লুকিয়ে-চুরিয়ে এমন সমস্ত অপরাধে প্রবৃত্ত হয়, যা কল্পনাতীত। কামনা-বাসনা তখন তুঙ্গে, শরাহত পাখির মতোই নিম্নগামী। এই মেয়ে মানুষটির বর্তমান অবস্থা ঠিক তাই এবং ওর নজর এসে পড়েছে তোমার ওপর। তুটি হাতের পেষণে নিজেকে পিষে ফেলতে চায়। এমন কাম যতক্ষণ না তৃপ্ত হচ্ছে, ততক্ষণ ওর মগজ স্বাভাবিক ভাবে কাজ করবে না। শান্ত মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে ওঠে, হিসেবে গরমিল হয়।... তাই বলছি, ওর দিকে একটু দৃষ্টি ফেরাও।"

বন্ধুর ওকালতিতে দৃষ্টি ফেরাতেই হলো।

সুগঠিত দীর্ঘাঙ্গী, আগে আগে চলেছে তার তুই মেয়ে—একজনের বয়স বারো, অন্যজন পনেরো। হঠাৎ চোখাচোখি হতেই মহিলার মুখ বিবর্ণ আকার ধারণ করে; যাবতীয় নির্লিপ্ততা উবে গিয়ে ভেসে ওঠে একধরণের চাঞ্চল্য। দৃষ্টি আর নামিয়ে নিতে পারছে না। কামনা-রূপ বিষের হলকায় চিত্রার্পিত। স্বামী এবং কন্যাদ্বয় যে ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে, সেদিকেও খেয়াল নেই। এ এক বিদ্ঘুটে মানসিক অবস্থা।

যুবক তুট নমস্কার করে। প্রত্যুত্তর দেবার ক্ষমতাও যেন ঐ নারী হারিয়ে ফেলেছে। তু' চোখের ঐ দিশাহারা ভাব দেখে তৎক্ষণাৎ বন্ধুর কথায় প্রত্যয়

খুঁজে পায় রেনলদি। কানের কাছে মুখ নিয়ে আবার তার বন্ধু বলে, "কি, এবার দেখলে তো ? ...ঈশ্বর, মেয়েটি সুন্দরী বটে !"

কিন্তু জাঁ রেনলদি একটি অন্য ধাতুর মানুষ। জবরদস্ত নীতিসিদ্ধ। অবৈধ গোপন প্রণয়ে তার অনীহা। প্রেম-ট্রেমকে সে কোন দিন গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। তবে, হাঁ, মাঝে-মধ্যে একটু আধটু আমোদ আহ্লাদ. নাটকীয় স্ফূর্তিতে মেতে উঠতে কোন যুবক না একেবারে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে ভালোবাসে ? আসলে রেনলদি ঝামেলা পছন্দ করে না। শিক্ষিতা মেয়েরাও যখন চাপা আওয়াজে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে, অতিরিক্ত কমনীয়তা প্রদর্শন করে, নানা রকম ফষ্টি নষ্টির মাধ্যমে নিজের যৌনজ পরোয়ানা জারি করে, জাঁ রেনলদি তখন বিরক্ত হয়, অস্বস্তি বোধ করে। দুঃসাহসিক প্রেমে তার বড় ভয়—এই বুঝি জীবনের সুখ, শান্তি, সম্মান ভেস্তে গেল ! তার ধারণা, ভালোবাসার নামে এ একজাতের মতলব হাসিল করা, এবং এর সামিল হওয়া মানেই ফাঁদে পা দেওয়া। বৃহৎ না হোক, ক্ষুদ্র কোন না কোন বন্ধন এসে হাজির হবেই, তার শক্তি ক্ষয় পাবে, খুব অল্প দিনের মধ্যেই সে কাবু হয়ে পড়বে। সে তাই যুক্তি দেখায়, "এক মাস যেতে না যেতেই দেখতে পাবো, কত রকমের বাঁধন এসে আমাকে জড়িয়ে ফেলছে ! তখন শত বিচলিত হলেও মুক্তির উপায় থাকবে না, বিনয় ও ধৈর্যের সঙ্গে আরো মাস ছয়েক প্রতীক্ষা করতে হবে।"

ঐ অবস্থায় সর্বনাশের কারণ বুঝতে পেরেও নারীর ঘনিষ্ঠ সঙ্গ সে ত্যাগ করতে পারবে না, ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় অহরহ উত্তেজিত হবে, নিজের অস্তিত্ব সম্বল খুইয়ে বসবে।...

এমত পর্যালোচনা করে জাঁ রেনলদি মাদাম পয়কতের কাছ থেকে দূরে দূরে সরে থাকে। সে কখন কোথায় থাকে, তার কোন হদিস ঐ পরস্ত্রীকে দিতে চায় না।

কিন্তু এক সন্ধ্যায় এক পার্টিতে ডিনার টেবিলে বসে হঠাৎ সে আবিষ্কার করে ফেললো, মাদাম পয়কত ঠিক তার পাশের চেয়ারটিতে বসে আছে। ঘুণাক্ষরেও এই বিপর্যয়ের পূর্বাভাষ টের পায়নি রেনলদি। অথচ এখন সে ক্রমশই শক্তিহীন হয়ে পড়ছে। সুন্দরী স্বল্প ব্যবধানে বসে তাকে দেখছে। কখন যে দু'জন দু'জনের হাত চেপে ধরেছে. রেনলদির তা খেয়ালও নেই। শুধু প্রবল আচ্ছন্নতায় শরীর গরম হ'য়ে ওঠে এবং সে মাদামের করতল সমানে টিপতে

থাকে। সেই থেকে যাবতীয় ভয় ও বিভীষিকাকে একপাশে সরিয়ে রেখে শুরু হলো তার নতুন অভিজ্ঞতা লাভ—পরকীয়া প্রেম!

তবে এ ব্যাপারে পাঁয়তাড়া কষতে রেনলদি মনের দিক থেকে কখনোই সায় পায় না। অনেকটা যেন দৈব নির্দিষ্ট পথেই তাদের মিলন, সাক্ষাৎ, মজলিশ। মহিলার ভালোবাসায় কোন খাদ নেই, কামনা অতি উষ্ণ! রেনলদি তাকে করুণা করতে শুরু করে—ওর অতিরিক্ত ও দুর্বোধ্য প্রেম নিবেদনের প্রত্যুত্তর সে দিতে থাকে। ঘটনাটা সে গ্রহণ করলো নিছক ভাবাবেগ হিসেবে, তার ব্যক্তিগত অনুরাগ ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

কোথায় দেখা হবে এবং মিলন ঘটবে, সেই সমস্ত স্থান মাদাম পয়কতই ঠিক করে রাখতো। গোপনে দেখা হওয়া মাত্র সোৎসাহেসে ঝাঁপিয়ে পড়ে রেনলদির ওপর, তখন প্রেমের অভিনয় করা ছাড়া সামরিক অফিসারটির উপায় থাকে না।

দেখতে দেখতে দু'মাস অতীত হ'য়ে গেল।

দু'মাস ধরে নারীর সোহাগ চুটিয়ে উপভোগ করলো রেনলদি। কামতপ্ত অভিজ্ঞ নারীকে সম্ভোগে যে আনন্দ, তা সে পূর্ণ ভাবে পেলো। আর মাদামও তাকে পাকড়িয়েছে পাকা ঘুঁটি হিসেবে—যেন এই ব্যাপারটা চিরদিনই বজায় থাকবে! দাহকালে মানুষের যেমন যথাসর্বস্ব আগুন গ্রাস করে, উৎকট কামনার তাগিদে মাদামও তেমনি তার যথাসর্বস্ব ত্যাগ করে বসেছে! দেহ-মন, যশ-মান, ইহকাল-পরকাল—সব যেন অতলে তলিয়ে যাচ্ছে! এই বিপুল সমর্পণ দেখে স্বয়ং রেনলদি বিমূঢ়, বিস্মিত। এক সময় তার নিজেরই ক্লান্তি আসে, ঈষৎ বিরক্তিও। মগজে আত্মাভিমান ঘুরপাক খায়—আমার মতন একজন প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তরুণ অফিসারের উচিত হয়নি ঐ বয়স্কা পরস্ত্রী নিয়ে মাতামাতি করাটা। ওকে প্রথম থেকেই পাত্তা না দেওয়াটা উচিত ছিল। ভাবতে গিয়ে মন বিষিয়ে ওঠে, নিজের জন্য অনুতাপ হয়। কিন্তু উপায় নেই, নারীর অতুলনীয় সোহাগের কাছে সে একরকম বন্দী, এখন আর পেছপাও হবার সামর্থ্য নেই। বড় বেয়াড়া এই সম্পর্ক! অবৈধ প্রেমের বাঁধন অনেক জটিল ও কঠিন। অনিচ্ছুক রেনলদি শুনতে পায়, মাদাম যেন তাকে বলছে: "তোমাকে তো আমি আমার যথাসর্বস্ব দিয়েছি। বল, আর কি তুমি চাও?"

"আমি তোমার কাছে কিছুই চাইনি। না চাইতেই যা দিয়েছো, সব ফিরিয়ে নাও।"

প্রতিটি সন্ধ্যায় মাদামের স্বৈরিণী আবির্ভাব অনিবার্য। আর তার প্রেমের খিদমদগার হ'য়ে মুখ বুজে সহ্য করতে হয় রেনলদির। মাদাম বেপরোয়া হিতাহিত জ্ঞানশূন্য; এই কল্লোলিত শহরে চূড়ান্ত হতে পারে, সে সম্পর্কে বিলকুল উদাসীন। কামনায় জোরালো দাবীর কাছে পারিবারিক বন্ধনও ম্লান হয়ে গেছে। প্রেমাস্পদের সামনে দাঁড়িয়ে সে দিশাহারা—রেনলদির বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, প্রাণপণে তাকে নিজের শরীরের সঙ্গে লেপ্টে রাখে, অজস্র চুম্বনের ঘোরালো পরিস্থিতিতে মাদামের গভীরতায় আস্তে আস্তে ডুব দেয় রেনলদি। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্বিত্ ফিরে পেয়ে রিঁ রিঁ ক'রে ওঠে রেনলদির সর্বাঙ্গ। ক্লান্ত অবশ স্বরে সে তখন বলে, "তুমি বড় অবুঝ হ'য়ে পড়ছো।"

জবাবে সে বলে, "আমি যে তোমায় ভালোবাসি।"

বলেই আবেগের সমারোহে সে রেনলদির পায়ের কাছে বসে পড়ে, তন্ময় হ'য়ে প্রেমিকের মুখের দিকে চেয়ে থাকে বহুক্ষণ। ঐ দৃষ্টির একাগ্রতা রেনলদি ঠিক সহ্য করতে পারে না, ওকে তোলার চেষ্টা করে, "উঠে বসো। এসো, পাশাপাশি বসে কথা বলি।"

কিন্তু সে ফিস্ ফিসিয়ে বলে, না, আমাকে বসে থাকতে দাও।

তপস্যাসফল কোন ঋষির আত্মা যেন সে যোগাড় করেছে। একভাবে সমাহিত থাকে বহুক্ষণ।

রেনলদি তার বন্ধু পলত্ত আঁরিকলকে বললো,···"এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে ব্যাপারটা। আমার বদ্ধমূল ধারণা, ওকে খুন না করলে নিস্তার নেই। দিনের পর দিন অমন বিগলিত সোহাগ পেয়ে পেয়ে ঘেন্না ধরে গেল। আমি এর এখনই পরিসমাপ্তি চাই। কি করি বলো?" বন্ধু জবাব দিলো, "সম্পর্ক ছিন্ন করো।"

"তুমি তো বেশ দরাজ গলায় বিধানটি দিয়ে দিলে! নিশ্চয় ভাবছো, খুব সহজ কাজ। যে মেয়ের যত্নে এতো অত্যাচার, ভালোবেসে যে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে, তাকে এড়িয়ে যাবার সংকল্প নেওয়া কি সম্ভব?"

হঠাৎ এ সময় উপর থেকে রেনলদির বদলির হুকুম চলে এলো। তার মন আনন্দে উদ্বেলিত—মাদামের হাত থেকে রেহাই পাবার এই স্বর্ণ সুযোগ! এর জন্য রূঢ় হতে হলো না, অভিমানের ঝড়ও তুলতে হলো না,

তল্লাসি করতে হলো না কোন অপ্রীতিকর রিক্তভায়। এখন শুধু দু'টি মাস আত্মস্থভাবে অপেক্ষা করা। তারপর মুক্তি—সেই পূর্বকার বন্ধনহীন টান টান নির্বিরোধ জীবন।

সেই সন্ধ্যাতেই কিন্তু মাদাম পয়রকত ছুটে এলো। দুঃসংবাদ চাপা থাকেনি। মন দারুণ চঞ্চল। মাথা থেকে টুপি না খুলেই ঘাড় টান রেখে এক দৃষ্টিতে রেনলদির মুখের দিকে চেয়ে থাকে, বিশেষ কোন বিশেষণ না টেনেই তার কঠিন বক্তব্য শুরু হয়:

"আমি খবর ঠিকই পেয়েছি, তুমি এ জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছো। স্বভাবতই আঘাতটা খুবই মর্মান্তিকভাবে বিঁধেছিল আমাকে। নানান সম্ভাবনা ও উঁকি ঝুঁকি মারছিল মনে। অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই ধাতস্থ হয়েছি—আমি আমার লক্ষ্যে স্থির। মনে কোন দ্বিধা নেই, ভয় নেই, পরিপূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য। প্রেমের জন্ত একটি মেয়ে যতদূর যেতে পারে, আমি ততদূরই যাবো। সাধারণ অবস্থায় অন্তের কাছে যা অলৌকিক, আমার কাছে সেটাই বাস্তব। প্রেমের কারণে আমি চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করবো। তোমার সঙ্গে পালাবো। সমস্ত রকম ধিক্কার-ধ্বনি উপেক্ষা ক'রে তোমার হাত ধরে হারিয়ে যাবো। পড়ে থাক পিছনে আমার স্বামী, এতদিনকার সংসার, সন্তান। হয়তো অলক্ষিতে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলছি। তবু এতেই আমার সুখ। তুমি করুণাময়, আমায় গ্রহণ করো, আবার নতুন ক'রে অশেষ আনন্দে তোমার জীবন আমি ভরিয়ে তুলবো। জীবন পরিক্রমায় নারী যে সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার দিতে পারে, তুমি তাই পাবে। তোমার অন্তর থেকে সমস্ত সংশয় অন্তর্হিত হোক। এই আমি চিরদিন তোমার!"

লাবণ্যময়ীর বক্তব্য শুনে কেঁপে ওঠে রেনলদি, তার মেরুদণ্ড বেয়ে যেন একটা শীতল স্রোত নামছে। এতক্ষণের পরিপাটি পরিকল্পনা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। দারুণ ক্ষোভ আর খেদ তার স্নায়ুগুলিকে যুগপৎ অবসন্ন ও উত্তেজিত ক'রে তুলছে। তবু সে ধৈর্যচ্যুত হয় না, বুকটান করে মুখে মোলায়েম হাসি টেনে নিরস্ত করবার চেষ্টা করে মাদামকে, ওকে বোঝাবার চেষ্টা করে,—অনন্তকাল ধরে এ সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব নয়। এই নির্ভর-নির্ভর আবেগ এক ধরণের বাতিকমাত্র।

মাদাম পয়রকত রেনলদির যুক্তিগুলি চুপচাপ শুনতে থাকে। কিন্তু তার মুখ দেখলে বোঝা যায়, এ সব কথায় সে কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না।

রেনলদির বলা শেষ হলে মাদাম শুধু বললো, "তুমি কি এতখানি কাপুরুষ হতে পারবে? তুমি কি সেই সবদেরই একজন, যারা মেয়েদের নানাভাবে পটিয়ে এনে ভোগ করে এবং তারপর একদিন ছুঁড়ে ফেলে দেয়?"

পাণ্ডুর বিবর্ণ মুখে রেনলদি আরো কিছুক্ষণ বোঝাবার চেষ্টা করলো মাদামকে। ঝোঁকের বশে তারা যা করতে যাচ্ছে, তার পরিণতি ভয়ংকর, সুখকর তো নয়ই। এ সম্পর্ক চিরদিন জগদ্দল পাথর হ'য়ে বসে থাকবে দু'জনেরই বুকের ওপর। দুনিয়ার যেখানেই তারা মোতায়েন হোক না কেন, সামাজিক সম্মান তারা পাবে না। একটা কুৎসিৎ ইতিকথার নায়ক-নায়িকা হয়ে বেঁচে থাকতে হবে। হেয় করবে সকলে। আগামী দিনগুলিতে কোন সুখ তারা অবলোকন করতে পারবে না।

কিন্তু মাদামের সেই নির্বিকল্প জবাব, "ভালোবাসার কাছে ও সমস্তই মূল্যহীন! প্রেমে আবদ্ধ নর-নারী সামাজিক বিধি-নিষেধের ভয়ে তটস্থ থাকে না।"

তার জোরালো যুক্তিগুলিকে এভাবে উড়িয়ে দিচ্ছে দেখে রেনলদির এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, "ওসব কথা বাদ দাও। আমি কিছুতেই তোমাকে নিয়ে সরে পড়তে পারবো না। কিছুতেই নয়! তুমি যাতে ঝোঁকের বশে নিজের সর্বনাশ না করে বসো, সেটা দেখাও আমার কর্তব্য।"

রেনলদির কথা শুনে মাদাম এই প্রথম চমৎকৃত। কিন্তু তার বেজার মুখ আরো বিষণ্ণ হবার আগে রেনলদি তার স্বরে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত বিতৃষ্ণাকে আর চেপে রাখতে পারে না, আচমকা সে ফুঁসে ওঠে, "না তোমার কি হলো না হলো, তার জন্য আমার কোন মাথাব্যথা নেই। আমার কোনদিনই ইচ্ছে ছিল না, তোমাকে নিয়ে নাচানাচি করবার। তুমিই তোমার একতরফা কামনার ভয়াবহতা নিয়ে আমার ওপর এসে ভর করতে। এখন বাপু দয়া করে সরে পড়ো। তোমার কুঅভিসন্ধির ফাঁদে আমাকে আর জড়াবার চেষ্টা করো না।"

মাদাম নিঃশব্দ। মাথা হেঁট করে মাটির বুকে কি যেন নিরীক্ষণ করছে। অকথ্য যন্ত্রণার প্রতিফলন তার মুখাবয়বে, মুখের ও কপালের শিরাগুলি দপ্‌দপ্‌ করছে, স্নায়ু ও মাংসপেশীর অব্যক্ত জালায় সে যেন এখন নিজের জীবনকেই নস্যাৎ ক'রে ফেলতে পারে।

কোন রকমে সে উঠে দাঁড়ায়, প্রথাসিদ্ধ বিদায় না জানিয়ে হারিয়ে যায়।

সে রাতেই মাদাম পয়কত বিষ খেলো।

সাতদিন ধরে চললো যমে-মানুষে টানাটানি। এই আশ্চর্য ঘটনাটা তখন জানাজানিও হয়ে গেছে শহরবাসীদের মধ্যে। সকলের আলোচনার পাত্রী মাদাম পয়কত। কিন্তু কেউ তাকে নিন্দা করছে না; বরং প্রেমের কারণে তার যে এই আত্মত্যাগ, গণ-মানসে সেটাই জল জল করছে। সকলেরই বক্তব্য, যে মেয়ে ভালোবাসার জন্য আত্মহত্যায় উদ্যোগী হতে পারে, সে আর যাই হোক, উচ্ছৃঙ্খল নয়। মন তার মণি-মুক্তার খনি, জঞ্জালের পাহাড় নয়।

লোকের যত বিরক্তি ও ঘৃণা লেফ্‌টেন্যান্ট রেনলদির ওপর,—লোকটা এত ছোট মন যে, মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর মাদাম পয়কতকে একবার দেখতে পর্যন্ত গেল না! সকলেই ছি-ছি করছে।

ক্রমশ রটে গেল, রেনলদি লোকটা নির্ঘাৎ অসৎ চরিত্রের, ভুলিয়ে ভালিয়ে মেয়েদের সর্বনাশ করে, প্রতারণা করে, মধু খাবার পর সেই ফুলের আর মর্যাদা দেয় না।

উপরওয়ালা অফিসার কর্ণেল অব্দি রেনলদিকে অনুরোধ করলেন, ভদ্রমহিলার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হতে। অবিকল ঐ একই উপদেশ দিলো বন্ধুবর পল, "ক্ষতি যদি হয়ও, তবু তুমি ওকে গ্রহণ করো রেনলদি। একটা মেয়ে এভাবে মারা যাবে, ভাবতে কেমন যেন খারাপ লাগে। তুমি নিজের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারো না। এ একটা জঘন্য লজ্জার ব্যাপার। খুব অন্যায় হবে, খুব অন্যায় হবে।..."

রেনলদি ক্ষিপ্ত হ'য়ে পলকে গালাগাল দিলো। পলও দিলো তপ্ত প্রত্যুত্তর। শেষ অব্দি দুই বন্ধুতে 'ডুয়েল'। ইচ্ছে করেই ডুয়েলে আহত হলো রেনলদি, জখমী শরীর নিয়ে পড়ে রইলো বিছানায়।

খবর পেয়ে মাদাম পয়কত আকুল। তার ভালোবাসা যেন আরো তীব্র হয়ে ওঠে। তার কল্পনা, নিশ্চয় রেনলদি তার জন্যই ডুয়েল লড়েছিল। কিন্তু তার নিজের শরীর এত দুর্বল যে রেনলদিকে দেখতে যাবার শক্তি নেই।

এরই মধ্যে বদলির জায়গায় আর সকলের সঙ্গে চলে গেল রেনলদি। দেখতে দেখতে নিরবচ্ছিন্ন কাজের মধ্যে তিনটি মাস অতীত হ'য়ে গেল।

একদিন সকালে মাদাম পয়কভের এক বোন এলো রেনলদির সঙ্গে দেখা করতে। পয়কভের রূপের সেই ঝাঁঝ নাকি আর নেই, দীর্ঘদিনের রোগভোগ ও হতাশায় এখন তার গলা চিরে শুধু মৃত্যুর গোঙানি,—অন্তিমে মাত্র একটিবারের জন্ম তার প্রেমাস্পদ রেনলদিকে দেখতে চায়!

সময়ের বিবর্তনে রেনলদিও আর আগের মতো শঙ্কাকুল বা, উৎকণ্ঠিত নয়; অতীত সম্পর্ক নিয়ে তাকে যে আর ধকল সইতে হবে না, এ সম্পর্কে সে নিশ্চিন্ত। মন ত্রাসহীন, বিরাগশূন্য। বরং এই মুহূর্তে তার নিজেকে অতি অপরাধী বলে মনে হচ্ছে। বেদনায় দু'চোখ বেয়ে জল গড়াতে থাকে। পয়কভের বোনকে মদত দিতে তখনই সে রওনা দিলো হ্যাভয়ের উদ্দেশ্তে।

ততক্ষণে সমস্ত প্রশ্নেরই প্রায় ফয়সালা ক'রে ফেলেছে মাদাম,—মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত। কোন লোক তার শিয়রে বহাল নেই। একাকী ছুটে গেল রেনলদি। হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলো সে। অপ্রত্যক্ষভাবে সে-ই এই মৃত্যুর জন্ম দায়ী হতে চলেছে!

রেনলদি কান্না ভেজা গলায় ওর কানের কাছে ফিস ফিসিয়ে উচ্চারণ করে, "না, তুমি মরবে না। তোমাকে আমি মরতে দেবো না। ভাল হয়ে ওঠো, তারপর চিরকাল আমরা গভীর ভালোবাসায় আবদ্ধ থাকবো।"

মাদাম ক্লিষ্টমুখে চিকন হাসি হাসে, "তুমি তবে ভালোবাসো?"

অনুতপ্ত রেনলদি ভালোবাসার নামে শপথ কাটে। মাদাম পয়কভকে অজস্র চুম্বনে ভরিয়ে দিয়ে একসময় বিদায় নেয়। অসুস্থ মাদাম একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার প্রাণাধিকের অপসৃয়মাণ ছায়ার দিকে।

আশ্চর্যের ব্যাপার, দেড়মাসের মধ্যে রোগশয্যা থেকে উঠে দাঁড়ালো মাদাম পয়কভ এবং প্রথমেই ছুটে এলো রেনলদির কাছে। কিন্তু দীর্ঘ রোগ-যন্ত্রণা ইতিমধ্যে শুধু ওকে দুর্বল করে দেয়নি, যৌবন ও রূপ বরবাদ করে দিয়ে গেছে। এ যেন সেই মাদাম নয়। কিন্তু প্রেমাবেগ যেন আরো বেশী।

সহানুভূতির সঙ্গে ওকে গ্রহণ করলো রেনলদি। এমনভাবে তাদের যৌথ জীবনযাত্রা শুরু হলো, যেন তারা সত্যি স্বামী-স্ত্রী। ক্রমশ এই নিয়েক

সমালোচনার ঝড় উঠলো। যে কর্নেল একদা রেনলদিকে তার ব্যবহারের জন্ত দায়ী করেছিলেন, তিনিও বিরক্ত হয়ে উঠলেন—কোন সৈনিকের পক্ষে নাকি এ ধরণের অবৈধ সম্পর্ক টেনে বেড়ানো উচিত নয়। উপরমহলে রেনলদির বিরুদ্ধে নালিশ গেল। সৈনিকদের ব্যারাকে রেনলদির পক্ষে সেঁটে থাকাই মুস্কিল হ'য়ে দাঁড়ালো। শেষ অব্দি চাকরিই ছেড়ে দিলো সে।

প্রেমিকদের কাছে যা স্বর্গ, সেই ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী এক গ্রামে তারা নীড় বাঁধলো।

আরো তিনটি বছর অতীত হ'য়ে গেল। রেনলদি এখন এক পরাজিত ব্যক্তিত্ব, একঘেয়ে নারীর ভালোবাসা তার কাছে এখন অনুভূতিশূন্ত ব্যাপার; চুলেও তার পাক ধরেছে। জীবনে যেন তার আর কিছুই করার নেই। এক বিশাল শূন্ততা দৃষ্টির সামনে ভাসছে।

হঠাৎ এক সকালে তার নামে একখানা কার্ড এলো। লেখা রয়েছে :—

"জোসেফ্ পয়কত
জাহাজের মালিক, হাভর।"

এ যে পয়কতের সেই স্বামীর পাঠানো কার্ড! সেই লোক, যে নিজের স্বৈরিণী স্ত্রীকে বেঁধে রাখবার বৃথা প্রয়াস পায়নি। কিন্তু এতকাল পরে কি সে চায়?

পয়কতের প্রাক্তন স্বামী বাগানে অপেক্ষা করছে। ঘরে ঢুকতে রাজি হলো না। এমনকি বাগানের বেঞ্চিতে বসতেও নয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুস্পষ্ট সংযত গলায় বললো, "মঁসিয়ে, এতকাল বাদে আপনার সঙ্গে আমি বিবাদ করতে আসিনি। আমি জানি, কেন এমনটি হলো। দুর্ভাগ্য আমাদের দু'জনেরই। যাক, একটি বিশেষ কারণে আমাকে আসতে হলো। আমার দুটি মেয়ে আছে, আপনি নিশ্চয় জানেন। বড় মেয়েটি এক যুবককে ভালোবাসে। যুবকটি ওর প্রতি অনুরক্ত। কিন্তু মেয়ের মায় কেচ্ছা-কাহিনী শুনে ছেলেটির পরিবারের লোকেরা বেঁকে বসেছে। মঁসিয়ে, আমার ভেতর কোন বিদ্বেষ নেই, স্ত্রীর প্রতি কোন টানও এখন নেই। কিন্তু আমি আমার সন্তানদের স্নেহ করি এবং তাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি। আশাকরি, মাদাম আমার বাড়িতে যেতে আপত্তি করবে না এবং আমিও সন্তানদের মুখ চেয়ে সব ভুলে থাকবার আপ্রাণ চেষ্টা করবো।"

লোকটির প্রস্তাব শুনে আনন্দে রেনলদি যেন নেচে উঠলো। সে যেন তার যাবতীয় অপরাধের ক্ষমা পাচ্ছে। প্রায় তোতলাতে থাকে সে, হাঁ—হাঁ—খুবই ঠিক কথা—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মঁসিয়ে—মাদাম পয়কত আপত্তি করবে না।"

এবার মঁসিয়ে পয়কত বসলো, রেনলদি একছুটে তার প্রেমিকার দরজায়, গুছিয়ে বলবার জন্য মুখখানা যথাসাধ্য গম্ভীর করে নিলো, বললো, "তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য এক ভদ্রলোক নিচে অপেক্ষা করছেন। উনি তোমার মেয়েদের সম্পর্কে কিছু বলতে চান।"

মাদাম বিস্ময়ে উঠে দাঁড়ায়, "আমার মেয়ে? তারা এখনো বেঁচে আছে তো!"

রেনলদি বললো, "আছে; কিন্তু মেয়েরা একটি গুরুতর সমস্যার মধ্যে পড়েছে, যার সমাধান একমাত্র তোমার হাতে।"

মাদাম আর কথা না বাড়িয়ে চকিতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

রেনলদি একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দেয়, কান কিন্তু সজাগ রাখে ওদের কথা শুনবার জন্য। বেশ কিছুক্ষণ পর সে মাদাম পয়কতের উত্তেজিত স্বর শুনে নিচে নেমে আসে, দেখতে পায় এক বিচিত্র দৃশ্য।—

মাদামের স্কার্টের প্রান্ত ধরে টানছে লোকটি এবং দারুণভাবে অনুনয় করছে, "...আমাদের মেয়ে দুটোর এ ভাবে সর্বনাশ করো না। ওরা তোমারই গর্ভজাত সন্তান।"

রেনলদি নিজেও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে, হাঁপাতে হাঁপাত বলে, "সে কি, ও কি যেতে আপত্তি করছে?"

মাদাম রেনলদির মুখের দিকে চেয়ে কেমন যেন লজ্জাকুল, "জানো, ও আমার কাছে কি প্রস্তাব নিয়ে এসেছে? বলছে, আবার নাকি আমাকে ওর সঙ্গে সহবাস করতে হবে! এও কি সম্ভব?"

স্বামী বেচারি হতাশায় প্রায় ভেঙে পড়ছে, আর রেনলদির মুখের দিকে চেয়ে মাদামের মধুর প্রেমময় স্মিত হাসি।

রেনলদির কাছে গোটা দৃশ্যটাই অসহ্য। সে প্রায় মরিয়া হয়ে মাদামকে বোঝাতে থাকে, তার গর্ভজাত কন্যাদের বিষয় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়। কিন্তু সবটাই কাকস্য পরিবেদনা। স্বামী বেচারিও কণ্ঠস্বরে যথাসাধ্য দরদ ঢেলে অতীতদিনের মতো প্রেমপূর্ণভাবে বলে,

"দেলফি, একটিবার আমার মুখের দিকে তাকাও। তোমার মেয়েরা তোমার জন্তে অধীর হয়ে বসে আছে। ফিরে চলো, সোনা।"

মাদামের দু'চোখে ঠিক তখনই ঝিলিক দিয়ে ওঠে, একলাফে সিঁড়ির উঁচু ধাপে গিয়ে দাঁড়ায়, রেনলদিও নিজের স্বামীকে সমভাবে ধিক্কার দেয়, "তোমরা দু'জনেই শয়তান।" বলেই সটান নিজের ঘরে।

আর নিচে এরা দু'জনে সেই মুহূর্তে পরস্পরের সমব্যথী। মঁসিয়ে পয়কত হাত বাড়িয়ে নিজের টুপিটি তুলে নেয়, পোশাক থেকে ধুলো ঝাড়ে। রেনলদি তাকে দরজা অব্দি এগিয়ে দেয়। ভারি পায়ে বিদায় নেবার আগে মঁসিয়ে পয়কত রেনলদি বলে যায় :

"আমার মতো আপনার বরাতও খুব খারাপ!"

আদর্শ

[Ideal]

ভিয়েনায় আমার বন্ধুর সংখ্যা অনেক, তাঁদের মধ্যে একজন সাহিত্যিক। সরল আদর্শবাদী লোক, এবং তাঁর আদর্শের ঘটা আমার কাছে শিশুসুলভ, হাস্যকর মনে হয়। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, আমি আদর্শবাদী নই। নিজে আদর্শবাদী বলেই অন্যের আদর্শ নিয়ে মস্করা করি না। কিন্তু আমার এই বন্ধুর আদর্শ বড় উদ্ভট।

আমার বন্ধু সাহিত্যিক ক্ষমতাসম্পন্ন, চিন্তাশক্তি কম নয়, কিন্তু অভাব হলো অভিজ্ঞতার। সমালোচক হিসেবে তার যুক্তি ক্ষুরধার, স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ। নির্মোহ—সমাজ, রাষ্ট্র বা সাহিত্য তাকে পক্ষপাতদুষ্ট করতে পারেনি। নারীরাও তার মনে কোনরকম আলোড়ন আনে না।

ব্যতিক্রম কেবল একটি বিষয়ে। কোন অভিনেত্রীর প্রসঙ্গ উঠলেই তাকে বিচলিত হতে দেখা যায়। সে তখন উচ্ছ্বসিত, উন্মাদের মতো আশাবাদী, নাট্যামোদী হেকলাঁদ্র যেন, যিনি রঙ্গমঞ্চকে দুনিয়ার একমাত্র পবিত্রস্থান বলে মনে করতেন।

স্বভাবতই বন্ধুট আমার সর্বদাই কোন না কোন অভিনেত্রীর প্রেমে

হাবুডুবু খাচ্ছে। যে কোন এক উঠতি তারকা-সুন্দরীর একনিষ্ঠ প্রেমিক বলে সে নিজেকে মনে করতো।

তার পকেটে থাকে তার মানস প্রেমিকার ছবি ; কখনো-কখনো একাধিক সুন্দরীর ছবি। মেজাজ খুশ থাকলে, আমাকে একটির পর একটি ছবি দেখিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। ছবিগুলি দেখে বারেকের জন্যও মনে হয়নি, এদের কেউ বিন্দুমাত্রও আমার বন্ধুর অনুরক্ত হতে পারে।

একদিন প্রথমবেলায় আমরা দু'জনে চায়ের টেবিলে বসে আছি, বন্ধু ফস্ করে পকেট থেকে একখানা ছবি বের করে টেবিলের ওপর রাখে। এক লাস্যময়ী সুন্দরী। নিখুঁত সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি, প্রথমেই নজর আটকে যায় সাদা দুই চোখের ওপর।

আমি বললাম, 'ওর চুলের রঙটা জীবন্ত না হলে আমি ধরে নিতাম এ কোন মূর্তির ছবি।' লেখক উৎসাহিত হয়, 'ঠিক ঠিক। প্রকৃতই জীবন্ত ভেনাস বলতে যা বোঝায়।'

'এ কে?'

'একজন উদিয়মান অভিনেত্রী।'

'সে তো আমি বুঝতেই পারছি। নামটা কি?'

জবাবে ঝাড়া বক্তৃতা। এ নামটি এখন জার্মানী অষ্ট্রিয়ার বাতাসে-বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে, লোকের মুখে মুখে ফিরছে, ভিয়েনার রঙ্গমঞ্চে তার আবির্ভাব-লগ্নকে অভিনন্দন জানাতে হাজার হাজার নর-নারীর সমাবেশ ঘটে ...ইত্যাদি গুণগাথা।...

হয়তো মেয়েটির সৌন্দর্যের সঙ্গে ভেনাসের নাম নির্দোষ উচ্ছ্বাসে উচ্চারিত হতে পারে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, ঐ অভিনেত্রীর নাম আমি এই প্রথম শুনছি।

বন্ধুর বক্তব্য অনুযায়ী এই তরুণী বিরল প্রতিভা এবং চরিত্র অতি নির্মল। আমি হয়তো প্রথম কথাটি মেনে নিতে পারি, কিন্তু দ্বিতীয় প্রশংসাপত্রে স্বাক্ষর দিতে রাজি নই। এই চরিত্রগত ব্যাপার-ট্যাপারে অপরের মুখে ঝাল খেতে আমি নারাজ।

এরই দিন বয়েক বাদে আমি এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে তার ব্যক্তিগত এ্যালবামের পৃষ্ঠা উল্টাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা ছবিতে চোখ আটকে যেতেই চমকে উঠি—আরে, এ যে সেই লেখকের মানস প্রেমিকার ফটো!

বর্তমান বন্ধুটি আমার চারিত্রিক শুচিতা-টুচিতার ধার ধারে না। রীতিমত ইন্দ্রিয়াসক্ত ভিয়েনীজ, বহু নারীর সঙ্গ-লাভে অভিজ্ঞ।

আমি জিজ্ঞেস করি, 'এই ভেনাসসুন্দরীর ছবি তোমার এ্যালবামে এলো কেমন করে?' বন্ধুর সুপ্রতিভ জবাব, 'হাঁ, রূপে ভেনাসপ্রায়, তবে দরে বড় সস্তা। *গ্রাবে গিয়ে কিছু খরচা করলেই এ মাল চাখতে পারবে।'

'অসম্ভব।'

'দিব্যি কেটে বলছি, কথাটা আমার মিথ্যে নয়।'

আমার আর কি বা বলবার আছে! লেখকবন্ধুর জন্য কষ্টে বুকটা ভরে যায়,—তার বিরল-প্রতিভা নির্মল চরিত্রের ভেনাসসুন্দরী একটি গণিকা-মাত্র!

কিন্তু আমার সাহিত্যিকবন্ধুর একটি উক্তি কিন্তু বিস্ময়করভাবে সত্যে পরিণত হলো। মেয়েটির সত্যি অভিনয়-পারদর্শিতা অসাধারণ। খুব অল্প দিনের ভেতরেই নাট্যজগতের প্রাদপ্রদীপে স্থান পেলো সে। শহরতলীর নগণ্য রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে ভিয়েনার প্রধান থিয়েটারে এসে স্বকীয় দক্ষতায় সকলকে মুগ্ধ করে রাখলো। দু'বছরের মধ্যেই সহ-নায়িকার ভূমিকা থেকে উন্নতি হলো মুখ্য নায়িকায়।

তার এই অভাবনীয় উন্নতির মূলে আমার বন্ধুর যথেষ্ট হাত ছিল। সে-ই থিয়েটার-মালিকের ওপর প্রভাব ঘটিয়ে মেয়েটিকে প্রথম নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ করে দেয়। থিয়েটারের পরিচালকও পরীক্ষা করে দেখলেন, মেয়েটি উপযুক্তা বটে।

ক্রমশ দূর-দূরাঞ্চলেও অভিনয়ের জন্য তার ডাক আসতে থাকে। সঙ্গে যেত লেখক। সর্বদাই তার নজর থাকতো, সুন্দরীর অভিনয়-খ্যাতি ক্রমশই প্রশংসা যেন বৃদ্ধি পায়। সবচেয়ে বেশী সে পেলো 'মেরী স্টুয়ার্ট' বইতে প্রধান চরিত্রে অবতীর্ণ হয়ে। ভ্রাম্যমান অভিনয়ের জগৎ ছেড়ে ভেনাসসুন্দরী এরপর উত্তরাঞ্চলের এক সুবিশাল রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন মোটা টাকার বিনিময়ে। খ্যাতির একেবারে তুঙ্গে আরোহণ করলো সে। বছর ঘুরতে

* ভিয়েনার সুন্দরী গণিকাদের পাড়া।

না ঘুরতেই কোর্ট থিয়েটারের মালিক এসে হাজির হলো তার কাছে টাকার থলি নিয়ে। সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে কোর্ট থিয়েটারের প্রধান নায়িকা হয়ে গেল সে। এক খ্যাতিমান লেখকের চটকদার নাটকের নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে সে একেবারে কিস্তিমাৎ ক'রে দেয়,—শহরের তাবৎ ক্ষমতাবান পুরুষরা, ধনকুবেররা একরাতে যেন তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে; তাকে ঘিরে এইসব উপরতলার মানুষরা চক্কর কাটতে শুরু করে,—রাজধানীর মক্ষীরাণী বলতে তখন এই রূপসী অভিনেত্রীকেই বোঝায়।

স্বচ্ছলতা ও বিলাসিতায় আকণ্ঠ ডুবে আছে রাণী। প্রাসাদোপম অট্টালিকা, অজস্র স্তাবকদের পর্বত প্রমাণ উপহার, স্বর্ণ ও রৌপ্যের সীমানাহীন স্রোত।

নায়িকা যত ওপরে ওঠে, আমার লেখকবাবু ততই পিছিয়ে পড়ে। শেষে আর নাগাল না পেয়ে হতাশ হ'য়ে আর এক নতুন প্রতিভার পিছনে ছুটলো সে।

ইতিমধ্যে একটি করুণ ঘটনার সূত্রপাত হলো। ভেনাসসুন্দরীর অসংখ্য স্তাবকদের মধ্যে একজন ছিল এক যুবক ছাত্র। তার না আছে রূপ, না আছে রূপো। খুবই সাধারণ পরিবারের ছেলে। কিন্তু তার নিষ্ঠা ও ভাবপ্রবণতা অপরিমিত। 'মেরী স্টুয়ার্ড' অভিনয় দেখবার পর থেকেই এই নায়িকার প্রেমে সে বদ্ধ পাগল।

প্রেয়সীকে পূর্ণভাবে দু'চোখ ভরে দেখবার উচ্চাশায় সে প্রায় উপবাসী থেকে একটি একটি করে পেনি জমাতে থাকে। প্রতিটি নাটকের শো দেখবার জন্য সে সবচেয়ে দামী টিকিট কিনতো, যাতে একেবারে সামনের সারিতে বসে তার মানসসুন্দরীকে প্রত্যক্ষ করতে পারে। পাছে পছন্দসই আসনটি বেদখল হয়ে যায়, এই ভয়ে শো আরম্ভ হবার অন্তত ঘণ্টা তিনেক আগে থেকে সে থিয়েটারের দরজায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতো।

মঞ্চের ওপর যে মুহূর্তে উদ্ভাসিতা, তরুণটির মুখাবয়ব উত্তেজনায় রক্তাভ বর্ণ ধারণ করে, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুততর হয়। নায়িকার হাসিতে তার মুখেও হাসি, নায়িকার কান্নায় সেও বুক ভাসায়, তারপর এক সময় মন্ত্রমুগ্ধ উল্লাসে সজোরে হাততালি দিতে থাকে।

কিছুদিনের মধ্যেই কোর্ট থিয়েটারের দর্শকরা এই বিশেষ আবেগপ্রবণ তরুণটিকে চিনে ফেললো। ওর আচরণ নিয়ে হাসি মস্করা, মুখরোচক গাল-

পর শুরু হয়ে গেল। এমনকি স্বয়ং নায়িকার কানেও এলো কথাটা।

কিন্তু যুবক স্তাবকটি বয়সে যতই তরুণ হোক, সামর্থ্য নেই একেবারে— নায়িকাকে দামী কিছু উপহার দেওয়া তার সাধ্যাতীত। এমন কি একটি সুদৃশ্য ফুলের তোড়াও উপহার দিতে পারছে না। সুতরাং নায়িকার খাসমহল থেকে কোন তলব এলো না তার জন্য।

তবু ঘটনাক্রমে তরুণটি নায়িকার দৃষ্টি আকর্ষণে একদিন সক্ষম হলো।

নায়িকা যখন হল থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠতো, যুবক বরফে-কাদায় ভিজে তার গাড়ির সামনে রোজ দাঁড়িয়ে থাকতো। বেশ কিছুদিন পর নায়িকার পরিচারিকা ব্যাপারটি লক্ষ্য ক'রে জানায়। বড় বড় চোখ মেলে সুন্দরী তাকায় তার গুণগ্রাহীর দিকে।

সেই অনুপম দৃষ্টির প্রসন্নতায় যেন গলে যায় যুবক। তার পবিত্র উচ্চাশা— স্বপ্নের হাত ধরে আরো স্ফীত হয়ে ওঠে।

নীরবে চোখে চোখে যেন তাদের ভাববিনিময় ঘটে। প্রতিদিনই যুবকটির মুখের দিকে তাকায়, স্মিতহাস্যে তাকে প্রীত করে। গাড়ি ছুটতে শুরু করলে ব্যাকুল প্রেমিক পড়ি-কি-মরি সেই গাড়ির পিছনে অনেকটা পথ ছুটে আসে। এক সময় গাড়িটা মিলিয়ে যায় দৃষ্টিপথ থেকে, হাঁপাতে থাকে অবসন্ন প্রেমিক।

সেদিন গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ঝড় উঠলো। প্রেমিক ভিজতে ভিজতে কাঁপতে কাঁপতে এসে দাঁড়ায় নায়িকার বাড়ির কপাটের সামনে। এলিয়ে পড়েছে তার দেহ। গোঙানো বাতাসের তীক্ষ্মমুখ ঝাঁপটা এসে লাগছে তার গায়ে।

হঠাৎ মৃদু শব্দের সঙ্গে দরজা খুলে গেল। এক বিচিত্র দৃশ্য দেখতে পেলো যুবক। একজন বলিষ্ঠদেহী সরকারী লোক অভিনেত্রীকে এমন ভাবে আদোর করছেন যেন তিনি পৌরানিক প্লুটোর বহুমস্তক বিশিষ্ট যমদ্বাররক্ষী কুকুরকে সোহাগ জানাচ্ছেন। সুন্দরী ফুঁ দিয়ে বাতি নিভিয়ে দেয় এবং ঠিক তখনই অফিসারের পা এসে লাগে লুক্কায়িত যুবকের শরীরে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর তলোয়ার টেনে বার করেন এবং আতঙ্কে তরুণ ছুটে পালায়।

সেই রাত্রির অভিজ্ঞতার পর যুবকটি আর কখনো নিরস্ত্র অবস্থায় ওখানে যায় না।

সে তার কোমরে লটকে রাখে একটা ছোরা এবং মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয়, ঐ লোকটাকে খুন করে সে নিজে আত্মহত্যা করবে।

অবশ্য সে রকম কোন ভয়াবহ ঘটনা ঘটলো না।

ঘটলো যা, তার বিস্ময়ও কম নয়।

সেই সন্ধ্যায় বেশ একটু রাত করেই হল ছেড়ে গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালো নায়িকা। কপাল কুঁচকে দেখলো, যথারীতি অদূরে দাঁড়িয়ে আছে সেই ছেলেটি। গাড়ির মধ্যে উঠেও দরজা বন্ধ করে না ভেনাস। হাতের ইশারায় আদর্শবান গুণমুগ্ধকে ডাকে।

বিস্ময় ও আনন্দের আতিশয্যে টলে ওঠে যুবক। নিজেকে আর স্থির রাখতে পারে না, ছুটে এসে পায়ের কাছে বসে, আবেগে তার প্রতিভাময়ীর হস্ত চুম্বন করে।

ভেনাসরূপসী ওর আনুগত্য ও শ্রদ্ধা প্রকাশের বাহার দেখে মনে মনে বেশ খুশী হয়। প্রসন্ন চিত্তেই গাড়িতে তুলে নেয় ওকে।

প্রেমান্ধ যুবক গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করে নায়িকাকে, তারপর ঐভাবে হাতে হাত রেখেই নায়িকার খাসমহলে উপস্থিত হয়।

বাড়ির পরিচারিকা যুবককে নিয়ে একটি বিলাসবহুল সুসজ্জিত ঘরে এসে বসায়।

একটু পরেই ঘরোয়া পোশাকে নায়িকা এসে দাঁড়ায় তার নতুন প্রেমিকের সামনে। অনায়াসে তরুণটিকে পাশে নিয়ে একটা আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দেয়।

বিহ্বল যুবকের চোখে চোখ রেখে বললো, 'কি গো, আমাকে বুঝি তোমার খুব মনে ধরেছে?' ছাত্রটি আবেগে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'তুমি আমার স্বপ্নের দেবী!'

রঙ্গমঞ্চের রাজকুমারী সকৌতুকে মিষ্টি হাসি হাসে, 'বেশ। আমি তোমার স্বপ্নকে সার্থক করবো, তা সে যেভাবেই হোক। তোমাকে আমি বঞ্চিত করবো না। তোমার এই নবীন বয়স, প্রচণ্ড আবেগ—কামনা—এ সবকে আমি উপেক্ষা করবো না। কোন আক্ষেপ তুমি করতে পারবে না। এসো, আজ আমি তোমার।'

ভয়াবহ পুলকে যুবকের জীবনীশক্তি যেন এখনই নিঃশেষ অথবা, সে এ'কবারে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে নায়িকার পদযুগল।

তার মানসপ্রেমিকা খিল খিলিয়ে হেসে ওঠে, 'এই দুষ্টু! একটু থামো! আমার আরো কিছু বলার আছে। দেখো, আমি তাদের কাছেই ধরা দিই,

যারা আমাকে অনেক-অনেক দামী-দামী বিলাস-উপকরণ যোগাতে পারে। যতদূর খবর পেয়েছি তোমার অর্থনৈতিক অবস্থা আদৌ ভালো নয়। তবু আজ প্রথাবিরুদ্ধ ভাবেই আমি তোমাকে সুখ দেবো—কেবলমাত্র আজকের রাতটার জন্য। কিন্তু এর বদলে তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, কাল সন্ধ্যা থেকে তুমি আর আমার পিছনে ঘুরবে না। আমার সম্পর্কে আবোল তাবোল গল্প করে বেড়াবে না। কি রাজি?'

হতভাগ্য যুবকের পাঁজরগুলি যেন ভেঙে ভেঙে পড়ছে। বুকের রক্তশূন্য বিবর্ণ মুখে সে নায়িকার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

সুন্দরী আবার জিজ্ঞেস করে, 'কি, রাজি?'

যুবক প্রায় কঁকিয়ে ওঠে, 'রাজি।'

রাতটা কাবার হয়ে গেল। পরদিন সকালে দেখা গেল, এক হতভাগ্য তরুণ তার আদর্শকে কবর দিয়ে বিখ্যাত অভিনেত্রীর বাড়ি থেকে টলতে টলতে ফিরে আসছে। তার রক্ত তথা, প্রাণশক্তিকে যেন শুষে খাওয়া হয়েছে, বিধ্বস্ত যৌবনের করুণ প্রতিমূর্তি, বিভ্রান্ত দৃষ্টি, মড়ার মতো সাদা চোখ। তবু এখনো সে বেঁচে আছে। এবং বেঁচে আছে বলেই যদি তার কোন স্বপ্ন এখনো থেকে থাকে, তবে তা নিশ্চয় কোন রঙ্গমঞ্চের নটীকে নিয়ে নয়।

গহন বনে
[Under the wood]

মধ্যাহ্ন ভোজের পর মাত্র দিবাকালীন আমেজটুকু উপভোগ করছেন, এমন সময় মেয়র সাহেব খবর পেলেন, বন-বিভাগের রক্ষী অপরাধী ঠাহর ক'রে দু'জনকে পাকড়াও করেছে এবং তাঁর জন্য টাউনহলে অপেক্ষা করছে।

বিশ্রাম মাথায় উঠলো, টাউনহলের দিকে ছুটতে হলো মেয়রকে। গিয়ে দেখলেন, চৌকিদার হোচেচুর খুব হম্বিতম্বি করছে, তার কঠিন কব্জায় ধরা পড়েছে এক গ্রাম্য দম্পতি, যাদের বয়স যথেষ্ট হয়েছে। পুরুষটি মোটাসোটা, বেগুনে রঙের নাক, চুল সাদা। দেখলেই বোঝা যায়, চৌকিদারের বাঁধের

মুখে পড়ে সে খুব বিচলিত। মহিলাটি বেঁটে, প্রায় গোলাকার, গায়ের রঙ লালচে, পরনে রবিবাসরীয় চটকদার পোশাক, জবরদস্ত অভিযোগের মুখেও দৃষ্টি তার উদ্ধত।

মেয়র জিজ্ঞেস করলেন, "ঘটনাটা কি ?"

হোচেত্তর ঘটনাটা খুলে বলে। প্রাত্যহিক নিয়মে আজো সে টহল দিচ্ছিলো। আর্জেনাতিউলে গিয়ে মিশেছে যে শ্যামপিয়ক্রা বন, তার যাত্রাপথ ছিল সেদিকেই। মনোরম পরিবেশ, প্রকৃতি সকলকেই আপ্যায়ন করছে যেন, মাঠে অফুরাণ সোনালী গমের গাছ, সবই স্বাভাবিক। ক্ষেতের মালী ছোকরা-বয়সী ব্রাদেল আঙুর ক্ষেতে কাজ করছিল, হোচেত্তরকে দেখে কাছে গিয়ে বললো :

"হোচেত্তর, ব্যাপার গুরুতর। ছুটে যাও, তোমার বনে কমসে কম একশ' তিরিশ বছরের একজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা কী কাণ্ডটাই না করছে !"

চকিতে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হোচেত্তর চোখের দৃষ্টি সাফ রেখে নির্দেশিত বনে হন্‌হনিয়ে এগিয়ে চলে। কিছু দূর যেতে না যেতেই বনের গহন থেকে গুন-গুন আলাপ এসে কানে বাজে, চৌকিদারের মুখ কঠিনতর হয়, এই নির্জন বিমর্ষ বনে দিব্যি অসামাজিক রসালো ব্যাপার চলেছে! অপরাধীদের পালাবার বিন্দুমাত্র ফুরসত না দেবার বাসনায় শিকার করা পশুর চুরি প্রতিরোধের কৌশলে হোচেত্তর গুটি-গুটি এগুতে থাকে এবং একসময় ঐ অপরাধী নর-নারীকে বিলক্ষণ কৌতুকপ্রদ আপত্তিজনক অবস্থায় পাকড়াও করে ফেলে।

ঘটনাটা এ রকমই ঘটেছিল ; এতটুকু হেরফের না ক'রে বনরক্ষী তার তারিফযোগ্য কাজের বর্ণনা দেয়।

মেয়র কিন্তু রীতিমত অবাক, অপরাধীদের দিকে তাকিয়ে আত্মপ্রসাদের বদলে তাঁর জমাট বিস্ময়—কারণ, লোকটার বয়স তো ষাট হবেই এবং মহিলাও পঞ্চাশের কাছাকাছি! এই পড়তি বয়সে বনে ঢুকে ঐ সব কাজকর্ম···ধ্যান-ধারণায় আসে না!

মেয়র প্রথমে লোকটিকে জেরা করতে শুরু করলেন। তাঁর প্রশ্নের বহরে ওর বুড়ো হাড়ে কাঁপুনি, জবাব আসে এমন ক্ষীণ স্বরে, যা শুনতে গেলে যথেষ্ট মনোযোগের দরকার।

"নাম ?"

"নিকোলাস ব্যুরেন'

"কি করা হয় ?"

"কাপড়ের ব্যবসা, প্যারির রু' দু মারতারসে।"

"বনে কি করছিলে ?"

কিছু একটা বলতে গিয়ে হোঁচট খায় অপরাধী, সঙ্গে সঙ্গে একেবারে চুপচাপ, মৌন দৃষ্টি লেপ্টে আছে নিজেরই স্থূল বপুর ওপর, হাতদুটো ঝুলছে জানুর ওপর। এমন নীরবতার তাৎপর্য বোধগম্য না হবার নয়।

মেয়র চেপে ধরেন, "অভিযোগ অস্বীকার করতে পারো ?"

"না স্যার।"

"তাহলে দোষ স্বীকার করছো ?"

"হাঁ স্যার।"

"বেশ, তাহলে একটা বিহিত করা দরকার। কিন্তু অপকর্মের জন্য ঐ মেয়েমানুষটাকে জোটালে কোত্থেকে ?"

"ও আমার স্ত্রী স্যার।"

"তোমার স্ত্রী !"

"হাঁ স্যার, আমার স্ত্রী।"

"কিন্তু—কিন্তু প্যারিতে কি তোমরা একসঙ্গে থাকো না ?"

"মাপ করবেন স্যার, আমরা একসঙ্গেই থাকি।"

"পাগল—যত সব পাগলের কাণ্ড! তবে কি চৌকিদারের হাতে ধরা পড়বার জন্যই স্বামী-স্ত্রীতে বনের মধ্যে ঐ কুকর্মটি করছিলে ?"

এতক্ষণ তবু জোর পটুত্বের সঙ্গে জেরার জবাব দিচ্ছিলো লোকটি, এবার যেন লজ্জায় একেবারে ভেঙ্গে পড়ে, চক্ষুদ্বয় রীতিমত সজল, ফিস ফিসিয়ে কোন রকমে বললো, "আমি কি করবো হুজুর, ওর যে ঐ রকমই একটা ইচ্ছা জেগেছিল। আর জানেন তো, মেয়েদের মাথায় যদি এ মতলবটা একবার ঢোকে, তা হলে আর রেহাই নেই !"

ঘটিয়াল ভুঁড়ি বুড়োর অসহায় অথচ, রসাল উক্তি শুনে মেয়রের গাম্ভীর্য আর বজায় থাকে না, তদনন্তর তাঁর হাসি শুরু হয়, কেননা—আদতে তিনি রসিক লোক, রসিকতা করতেও ছাড়লেন না।

"হক কথা। স্ত্রীর মাথায় এমন একটি মতলব না এলে, তোমার আর কি সাধ্যি এখানে এসে ঢোকো।"

বুড়ো ব্যবসায়ী এবার তার স্ত্রীর দিকে ঘুরে ফোঁস করে ওঠে, "বোধগম্য

হচ্ছে এবার ব্যাপারটা? তোমার প্যান প্যানানির জ্বালায় আমার এই ফ্যাসাদ। ছি-ছি, এই বয়সে অশালীনতার অভিযোগে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে! শেষঅব্দি দোকানপাট বিক্রি করে তল্পিতল্পা গুটিয়ে স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের খোঁজে অন্য কোথাও পাড়ি জমাতে হবে! বেশ রোমহর্ষক মজার ব্যাপার হলো একটা, তাই না?"

স্বামীর আক্রমণ অক্লেশে হজম করলো মেয়েমানুষটি অথবা, সে যেন ভ্রূক্ষেপও করলো না ইত্যাকার অভিযোগের। সময়োচিত স্থৈর্যে অবিচল সে, বিপদের ঘনঘটায় বুদ্ধিভ্রংশতার লক্ষণ নেই, এতক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট অবিকৃত গলায় বলতে থাকে :

"জানি, আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনা আপনাদের মতো পাকা নয়। কিন্তু যদিও একজন নগণ্য মেয়েমানুষ, ঘটনাটা গুছিয়ে বলবার জন্য আমি যারপরনাই ব্যস্ত, আপনি অনুমতি দিন। আমার ধারণা, সবটুকু শুনবার পর আপনি অন্ততঃ আমাদের কাঠগড়ায় দাঁড়াবার লজ্জা থেকে রেহাই দেবেন। এই মুমূর্ষ অবস্থা কাটিয়ে আবার ঘরে ফিরে যাবার শক্তি খুঁজে পাবো।

"অনেকদিন আগের কথা, আমি তখন একটি কিশোরী, নিজস্ব জগৎ নিয়ে মশগুল; এমন সময় এই অঞ্চলেই মঁসিয়ে ব্যুরেনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচিতি ঘটে। যদিও অনেক কাল আগের কথা, আমার স্মৃতি এ ব্যাপারে অতিমাত্রায় তীক্ষ্ণ, যেন গত কালের ঘটনা; এখনো বলতে গেলে ত্বরিতে লজ্জা আসে, গর্বও জাগে; ও কাজ করতো এক কাপড়ের দোকানে, আমি কাজ শিখছি সেলাইয়ের। আমার এক বান্ধবী ছিল—রোজলাইভাকু, প্রায়ই আমরা এক সঙ্গে থাকতুম, ছুটি-ছাটার দিনে ঘুরতে ঘুরতে ঐ দোকানের কাছাকাছি চলে আসতুম। আমার কোন পুরুষ বন্ধু ছিল না, ছেলেদের সম্পর্কে তখনো ধারণাটা আবছায়া-আবছায়া; কিন্তু রোজ প্রগলভা এবং তার একটি পুরুষ বন্ধু জুটেছিল। ঐ পুরুষ বন্ধুটি প্রায়শই আমাদের সঙ্গে ঘুর ঘুর করতো। একদিন সে হাসতে হাসতে আমাকে শুনিয়ে বললো, আগামী ছুটির দিনে সে তার এক বন্ধুকে নিয়ে আসবে। আমার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেনি, সে কারণে পুরুষটির কথার ইঙ্গিত ধরতে পেরেছিলাম। বলেছিলাম, তবে তো আপনার বন্ধুর শুধু শুধু সময় নষ্ট হবে মাত্র। নিশ্চয় ধারণা করতে পারছেন হুজুর, আমি তখনো একটি খাঁটি মেয়ে, যার দিক্‌ভ্রম ঘটেনি।

"পরের দিনই কৌশলে পরিচিত হলাম মঁসিয়ে ব্যুরেনের সঙ্গে। সেইকালে

ব্যুরেনের চেহারা ছিল নজর করবার মতো, রীতিমত সুশ্রী যুবা। আমি অবিশ্যি আগেই ঠিক করেছিলাম, মুখ টিপে সংযত ও নিস্পৃহ থাকবার চেষ্টা করবো। পেরেও ছিলাম তাই।

"আমাদের পরবর্তী মুলাকাৎ বেজনস-এ। এতাহারে সেই দিনটির কথা বলতে গিয়ে এখনো আমার শরীরে কাঁটা দিচ্ছে, চমৎকার নির্জনতা-অন্বেষী দিন, যার নিস্তরঙ্গ আবরণে দাঁড়িয়ে বাসনা জাগে চোখের জল ফেলতে—অকারণে অশ্রু বিসর্জনে একপ্রকার তৃপ্তি পাওয়া যায়। বিশাল ও উন্মুক্ত প্রকৃতি যে কোন বেদনার বিহিত করতে পারে, যদিও কোন সম্যক উপলব্ধি না রেখে আমি তখন বার বার অন্যমনস্ক, আচরণে পাগল-পাগল। এটা আমার আবাল্য স্বভাব। শ্যাম্পেন পানে যে বৈচিত্র্যময় নেশা, বিশেষত অনভ্যস্ত লোক যখন সেই নেশায় সন্তরণরত হয়, আমার অবস্থা তদ্রূপ—আলোময় এমত হেমকান্তি চরাচরে সবুজ নরম দূর্বা, বাতাসের হিল্লোল পাকা ফসলের ধ্যান বানচাল করে দেয়, আকাশে দোয়েল পাখিরা দিনের পরমায়ু বাড়িয়ে পাখা ঝাপটায়, ডেইজি ফুল আর হরেক জাতের পাখি রৌদ্রে আরোগ্য-স্নান সারে, সেই সঙ্গে বুনো আফিমের শঙ্কাপ্রদ গন্ধও বর্তমান···। সুখ ও আনন্দের সঙ্গে ওতঃপ্রোত জড়িত একটা উজ্জ্বল দিন, চোখ ভরে যত দেখি মনের আনন্দ ও বেদনা ততই নিগূঢ় হয়। হাঁটছি পাশা-পাশি ঘঁসিয়ে ব্যুরেনের সঙ্গে, এ যেন পরমার্থ লাভের বিরল মুহূর্ত, মাঝে-মধ্যে একটা-আধটা কথা একে অপরের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছি, অবিশ্যি অপরিচিত যুবকের সঙ্গে বাক্যালাপে আমার এক ধরণের লজ্জাময় লালিত্য আছে। লজ্জা আমার একার নয়, অনুরূপ সলজ্জ অভিব্যক্তি ও হেঁয়ালি ব্যুরেনের আচরণেও পরিস্ফুট এবং ওর এই উদ্‌ব্যস্ত লজ্জা আমার কাছে বিশেষ প্রীতিপদ।

আমাদের আগে আগে আর একজোড়া—রোজ ও সিঁম, আবেগে ডগমগ, একে অপরকে জড়িয়ে ঘন ঘন চুমু খায়। এতে আমার অস্বস্তি আরো বৃদ্ধি পায়। এক সময় আমরা বনের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লাম, যেখানকার পরিবেশ যে কোন ধরণের বীতশ্রদ্ধাকে দূর করতে পারে; আমরা নরম ঘাসে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়লাম, যেন এইমাত্র হিম জলে স্নান করে উঠেছি এমন একটি স্নিগ্ধ মধুর আমেজ। আমার অমন সংঘাতপ্রসূত লজ্জা ও গাম্ভীর্য নিয়ে রোজ ও তার প্রেমিক হাসাহাসি করলো কম নয়। কিন্তু আমি কি বা করতে পারতাম? এ যাবৎ যে পরিবেশে মানুষ, তার রেশ মুহূর্তে কি ভাবে অস্বীকার করতে পারি? এখানে বসেও রোজ ও তার বন্ধু অস্থির পঞ্চম, আমাদের উপস্থিতিকে বিন্দুমাত্র

আমল না দিয়ে অহরহ ফিস ফাস হাসাহাসি করে, ঘন ঘন চুমু খায়। তারপর একসময় বলা নেই কওয়া নেই, দু'জনে উঠে গিয়ে এক ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তখন আমার কী দুর্ভাবনা ও লজ্জা, কেন না সামনে একজন প্রায়-অপরিচিত যুবক এবং ঝোঁপের আড়ালে বান্ধবী তার নাগরের সঙ্গে না জানি কি রোমহর্ষ খেলায় মেতেছে! ঝোঁপের আড়ালে ঐ অদৃশ্য হয়ে যাওয়াটা সরীসৃপ-ভঙ্গীর সঙ্গে তুলনীয়। সংকোচের জগদ্দল পাহাড়টাকে একটু হাল্কা করবার মানসে দুটি একটি বাক্যালাপে আগ্রহ দেখাই। জেনে নিলাম, ও কি করে—কাপড়ের দোকানে কাজ করে। কিছুক্ষণ কথা বলাতেই ওর সাহস বেড়ে গেল, সাহসের সঙ্গে লোভও। কিন্তু ঐ লোভকে আমি বাড়তে দেইনি, সঙ্গে সঙ্গে নিরস্ত করেছি। কি ব্যুরেন, ঠিক বলছি না?"

ব্যুরেন কিন্তু মাটির দিকেই চেয়ে আছে, জবাব নেই।

মাদাম পুনর্বার শুরু করে, "সেদিনই ওর মালুম হলো, আমি কেমন ধাতুর মেয়ে! এরপর থেকে আমার সঙ্গে ওর ব্যবহার ছিল শিষ্ট ও সন্তর্পণ। প্রতি রবিবার আমাদের দেখা হতো। নিজের ইচ্ছাসুখকে সংযত রেখেও ও আমাকে সত্যি ভালোবেসে ফেললো, ভালোবাসলাম আমিও। সে সময় কী চমৎকার ছেলে ছিল এই ব্যুরেন।

"অল্প কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, সেপ্টেম্বর মাসটা আমাদের জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয় মাস। আমাদের বিয়ে হয় এই মাসে এবং এই মাসেই রু দু মারত্যারসে দোকান খুলে আমরা একাগ্রভাবে ব্যবসা শুরু করি।

প্রথম প্রথম অবশ্য দোকান ভালো চলতো না; বিসদৃশ অনটনে দিন কাটিয়েছি; গ্রামে গিয়ে যে একটু চক্কর কাটবো, গোলাপ ফুল সংগ্রহ করবো, আকাশমার্গে পুলকে তাকিয়ে থাকবো, তেমন সঙ্গতিও ছিল না। ক্রমশ আমরা বেড়াতেও ভুলে গেলাম। কোন এক অন্তরীক্ষের তাগিদে আমরা জীবনের অন্যসব ভুলে গিয়ে ব্যবসাকেই জড়িয়ে ধরলাম এবং আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন, একজন ব্যবসায়ীর কাছে গোলাপের চেয়ে ক্যাসবাক্সের কদর অনেক বেশি। কাজের চাপেই ডুবে থাকি, সময় পেরিয়ে যায়। কবে যে আমাদের বয়স বাড়লো, যৌবন শেষ হয়ে গেল, টেরই পেলাম না। দাম্পত্য-জীবনের একঘেয়েমিতেই দিব্যি অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম।

"তারপর আমরা আমাদের দুরবস্থা কাটিয়ে উঠলাম, ভবিষ্যতের জন্য অঢেল

সঞ্চয় ; এখন কিন্তু আমার ভেতর একটা মানসিক প্রতিক্রিয়া ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠতে থাকে, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচ থেকেও আমি আপনাকে এই মানসিকতাটা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারবো না।

"আমি যেমত বা স্কুলের একটি কিশোরী ছাত্রী, চপলতায় অশিষ্ট, অল্পেতেই আশ্চর্যান্বিত, যত সব সুখ-কল্পনায় পুলকে নেচে উঠি। যদিও সামনে ক্যাসবাক্স, তবু মন এখন কাতরোক্তি করে এবং নাকে এসে লাগে গোলাপের ঘ্রাণ। পথে কোন ফুলওয়ালা দেখলে রক্তে আমার যুবতীর ঔদ্ধত্য, চিৎকার করে ওকে ডেকে নিয়ে আসতাম আমাদের দরজায়। রাস্তার দু'পাশে যতই বিশাল বিশাল অট্টালিকা থাকুক না কেন, মাথার ওপর বিশাল নীলাকাশ চোখ মেললেই দেখা যায়, আকাশ তো নয়—বুঝি প্যারির বুকের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া এক দীর্ঘ নীল নদী। আকাশে ভাসমান দোয়েলপাখিরা যেন নদীর গহনে সন্তরণরত মিন্-সন্তানের দল। আমার এমন বয়স, যা স্পষ্টতই গাম্ভীর্যে সমীহ আদায় করবে, কেন যে এমত ভাবপ্রবণ হ'য়ে উঠলো! দুঃখ হয়, সারাটা জীবন কেবল কাজ-কাজ করে জীবনের মধুময় সময়টাকে হেলায় হারিয়েছি। আমার যৌবন বিগত, দেহসৌষ্ঠব নষ্ট। অথচ, দেখুন, গত বিশ বছর ধরে আমি তো আর দশটা যুবতীর মতো জীবনকে উপভোগ করতে পারতাম, যখন-তখন আরণ্যক পরিবেশে ছুটিয়ে প্রেমলীলা উপভোগ করতে পারতাম। ম্রিয়মান না থেকে মনের মানুষটিকে পাশে নিয়ে, গাছ-গাছালির ছায়ায় অনাবিল সুখ উপভোগ করবার সম্ভাবনা নিশ্চয় আমার ছিল। এই যে ভাবনা, আক্ষেপ, আমাকে কি দিন কি রাত অধিকার করে রাখে, আমি কখনো অতিমাত্রায় চঞ্চল, কখনো প্রস্তরবৎ। ক্রমশই আমি স্বাপ্নিক হয়ে উঠলাম, স্বপ্নই আমাকে উজ্জীবিত করে, বয়সোচিত গাম্ভীর্যের বদলে পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নায় ভেসে যেতে থাকি। বৈষয়িক ভাবনা-চিন্তা এবং তৎসংলগ্ন শব্দস্রোত আর আমাকে নাড়া দেয় না, প্রেমসুধা উপভোগের বাসনায় আমি উন্মাদপ্রায়।

কিন্তু মঁসিয়ে ব্যুরেনের কাছে তো একথা চট করে খুলে বলতে পারি না ; কারণ, সে অবাক হবে, মস্করা করবে, টুকি টাকি কেনাকাটার ব্যবসায়িক উপদেশ দেবে, ফলতঃ আমার অকাল-প্রাপ্ত সবুজতা উপেক্ষায় ফিকে হয়ে যাবে। সত্যি কথা বলতে কি, ব্যুরেনের কাছে এই প্রস্তাব দেবার বিশেষ আগ্রহও আমার ছিল না—প্রেম ও কামনার তাগিদে কল্যাণময়ী রমণীটি হয়ে থাকবার বাসনা করিনি। কিন্তু বিপদ, আয়নার বুকে প্রতিবিম্বিত আমার দেহ বিগতযৌবনা, রূপ

ও রস-হীন, যাকে পুঁজি করে অন্য কোন নাগর সংগ্রহের ফিকির খোঁজা বৃথা।

"অতএব, একদা বুকের সাহস মুখে এনে হাতের হক্কা খেলিয়ে ওকে বললুম, চলো না গো আমাদের সেই মিলনের প্রথম স্থানটি বেড়িয়ে আসি। ও আমার মনের কথা টের পায়নি; হয়তো ভেবেছিল, কচিৎ মুক্ত-বায়ুর আকর্ষণে সহ-ধর্মীণীর এই প্রস্তাব। ব্যুরেন রাজি হয়ে গেল।

অনেক কাল পর আমরা তাই যৌথ বিহারে এসে পৌছলাম; ফসল ভরা মাঠের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে বর্তমান তছনছ, বুঝি আমি আমার কৈশোরে, সেমত চপলা, চোখের রঙও বদলে গেল স্যার—স্বামীটিকে দেখছি ঠিক তেমনি শান্ত চোখ সুদর্শন তরুণ। এতটুকু দোমনা হলুম না, আমার কাছে এই সুখটুকুই বাস্তব হয়ে গেল, কারণ নারীর মনে বসন্ত চিরায়ত। যুবতীসুলভ ছলাকলায় আমি তখন মনস্থ, রাগ নিষ্পত্তির সূচনায় ব্যুরেনকে অহরহ চুমু খেতে লাগলাম, আমার এই জুত করে জড়িয়ে ধরা ও সোহাগের প্রাবল্য দেখে বিস্মিত ব্যুরেন বললো, 'কি ব্যাপার বলতো? এমন করছো কেন?'

এ কথার জবাব দেবার মতো মানসিকতা তখন আমার নয়, দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস ও বুকের ওঠা-নামাই একমাত্র সত্য, আমি ওকে জোর করে বনের আড়ালে নিয়ে গেলাম। তারপরের ব্যাপারটা আপনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন এবং জেনেও গেছেন। আমি যা বলবার, অকপটে বললুম।"

মেয়র সাহেব লোক খারাপ নন। মুচকি হেসে রায় দিলেন: "নির্বিঘ্নে ফিরে যাও। তবে, হাঁ, বনের মধ্যে ও কাণ্ড করতে আর এসো না।"

মডেল

[Model]

মোঁমার্ত্রে'র সেই পুরনো মদের আড্ডা আবার এখন জম জমাট। সন্ধ্যা থেকে শুরু হয়েছে, চলবে রাত গভীর অব্দি। এখানে যারা জমায়েত হয়, তারা সকলেই সাবালক শিল্পী। বিভিন্ন মুখ, হরেক চেহারা, কেউ লিক পিকে লিক পিকে, কেউ বা সিন্ধু ঘোটকের মতন থপ্ থপিয়ে চলতে অভ্যস্ত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সস্তা মডেলকে চোখের সামনে রেখে শ্বাসরোধকারী নীরবতার মধ্যে তুলির আঁচড় কাটতে কাটতে যারা হাঁপিয়ে ওঠে, তারাই নিজেদের দুর্গন্ধময় দেহটাকে

টেনে আনে এখানে, হৈ-হল্লোড়ে মেতে ওঠে, কমদামী সাধারণ মদ আকণ্ঠ গিলে যেন ট্রাপিজের খেলা দেখায়। সময় সময় ওরা টেবিল বাজিয়ে গান গায়, কেউ আবার ঘুম-জড়ানো গলায় প্রলাপ বকতে বকতে গণিকা পাড়ার দিকে রওনা দেয়। অধিকাংশ স্বল্প ক্ষমতাসম্পন্ন চিত্রকরের কপালে যা জোটে, এরা তার ব্যতিক্রম নয়—অর্থাৎ সেই দারিদ্র্যভরা খামখেয়ালী জীবন। প্রতি মুহূর্তে শক্তিক্ষয় এবং কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করবার মরীনীয় বাসনায় বিরাট টিউলিপ আকৃতির গেলাসে ক'রে আগুনের মতন পানীয় গলায় ঢালা।

সাত মাথা এক হ'য়ে নরক গুলজার করছে। তাদের পায়ের তলাটা স্যাঁতসেঁতে, নাকের কাছে পাইপের ধোঁয়া আর বাতাসে বাসি মদের গন্ধ।

পিয়ের তার লাল গালটা চুলকাতে চুলকাতে বললো, "কাল আমি পিগালে যাবো। বিশ্বাস কর, ওখানকার মডেলরা যে কী সুন্দরী! পাকা আপেলের মতন বুক আর নেসপাতির মতন পাছা।"

ফ্যাঁস্ করে হেসে উঠলো ষণ্ডা চেহারার রাস্ত, "পিগালে তো বেশ্যাদের আড্ডা। বহুল ব্যবহারে ওদের শরীর সব বেঢপ। তুই বুঝি ইদানীং ওদেরই মডেল পাকড়েছিস?"

পিয়ের প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, "বেশ্যা হোক, যাই হোক শরীর তাদের অটুট। যাস একদিন পিগালে, দেখিয়ে দেবো মডেল কাকে বলে।"

মডেল নিয়ে এদের বাদ-প্রতিবাদ ক্রমশ তুঙ্গে ওঠে এবং সেই শব্দে কাঠের ছাদটা কাঁপতে থাকে। ঠিক তখনই হঠাৎ এক বৃদ্ধের আগমন ঘটলো এদের টেবিলে। খুব পুরনো ওভারকোটে তার সর্বাঙ্গ ঢাকা, একমুখ সাদা দাড়ি তির তিরিয়ে কাঁপছে, চোখ দুটো লাল হলেও অসম্ভব উজ্জ্বল, সারা কপালের চামড়া কুঁচকে আছে।

রাস্ত ফিস ফিসিয়ে ওঠে, ম'সিয়ে জিদলার!"

পিয়েরও সম্ভ্রমপূর্ণ স্বরে বলে, "বসুন জিদলার।"

হাঁটুতে হাত রেখে জিদল্যার আসন নেন। ওঁর নখে তখনো রঙের ছোপ লেগে আছে, হয়তো এইমাত্র স্টুডিও থেকে আসছেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কি নিয়ে আলোচনা করছিলে?"

ছোকরা শিল্পী এডগার উৎসাহের সঙ্গে বলে ওঠে, "মডেল নিয়ে। আমরা সবাই যে যার মডেলের সুখ্যাতি করছি।"

বৃদ্ধ রহস্যময় হাসি হাসেন।

রাস্তু বললো, "পিয়ের তার মডেলের পশ্চাদ্দেশ দেখে তৃপ্তি পায়। আর আমি দেখি মডেলের সর্বাঙ্গ।"

সঙ্গে সঙ্গে পিয়ের প্রতিবাদ জানায়, "একদম বাজে কথা।"

জিদলার হাত তুলে ওদের থামিয়ে দেন। এক গেলাস মদের অর্ডার দিয়ে কি যেন ভাবেন, তারপর সামান্য গম্ভীর স্বরে বলেন, "তোমরা মডেল নিয়ে কামড়া-কামড়ি করো। অথচ, আমি কোন মডেল ছাড়াই দিনের পর দিন ছবি আঁকছি।"

অন্য এক শিল্পী প্যাস্তো বেফাঁস বলে ওঠে, "সেই জন্যই তো আপনার ছবি বাজারে বিকোয় না।" দপ্ করে জ্বলে ওঠে জিদলারের চোখ ও গলার স্বর, "তোমাদের ছবি বিক্রী হয়? যথেষ্ট পয়সা পাও তোমরা? যদি পেতে, তাহলে আর এখানে বসে আড্ডা মারতে না।"

পিয়ের জিজ্ঞেস করে, "আপনি কি কোনদিন মডেলের সাহায্য নেন নি?"

গেলাসে চুমুক দিলেন জিদলার। আবার তাঁর মুখে সেই রহস্যময় হাসি। ক্রমশ সেই হাসি অদ্ভুত বিষণ্ণতায় ভরে যায়। কাঁপা কাঁপা গলায় বিড় বিড় করতে থাকেন, "হাঁ, এককালে আমারও চোখের সামনে মডেল ছিল। একটি মাত্র মডেল, যার রূপ ও গভীরতার কোন ব্যাখ্যা ভাষায় সম্ভব নয়, একমাত্র রঙেই তা ব্যক্ত করা সম্ভব।...সে ছিল লিসা, আমার স্ত্রী লিসা।..."

এডগারের গলায় আবার সেই উৎসাহ, "কোথায় আছেন তিনি? নিশ্চয় এতদিনে বুড়ি হয়ে গেছেন। তবু আমরা তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে চাই।"

বৃদ্ধের সর্বাঙ্গ যেন কেঁপে ওঠে, যেন তিনি কারুর কথা শুনতে পাননি এমন ভাবে বলে চলেন, "আমার সেই মডেল চুরি গেল।...কোথাকার এক কাউন্ট বাজারে লিসার পোর্ট্রেট দেখেই শয়তান হয়ে উঠেছিল।...আমি গরীব শিল্পী! আমার মডেল হারিয়ে গেল!...আর তোমরা নিত্য-নতুন মডেল নিয়ে হল্লোড় করো, গর্বে ডগমগ হয়ে ওঠো।...যত্তো সব!..."

এক গেলাস মাল খেয়েই টলতে টলতে ফিরে গেলেন জিদলার।

ওঁর দেহটা মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে টেবিল চাপড়ে রাস্তু মন্তব্য করে, "পাগল! পুরনো যুগের বদ্ধ পাগল!'

"পাগল!"

—সেই মন্তব্যের সামিল হয়ে এরা সকলে আর এক দমক হেসে ওঠে।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত